দূর কে নিকট করেছে
ভারতবর্ষ এক গৌরবোজ্জ্বল অতীতের অধিকারী। সে অতীত প্রায় প্রাগৈতিহাসিক। তার সমৃদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখেনা। তার শিল্প, স্থাপত্য, চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের যে অসংখ্য চিহ্ন এই মহান উপমহাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে তা এই দেশবাসীর কাছে গর্ব ও প্রেরণার চিরন্তন উৎস।
শতাব্দীর পর শতাব্দী যোগাযোগের অভাবে এই গৌরব চিহ্নগুলি অজ্ঞাতই ছিল। ভারতীয় রেলপথ সেই যোগাযোগ সম্ভব করে দূর কে নিকট করেছে এবং ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির অমূল্য অবদানকে সমগ্র জাতির সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করেছে।
পূর্ব রেলওয়ে

কৃষি সংবাদ

১৯৭২-৭৩ সালে সমগ্র দেশ যে অপ্রত্যাশিত এক খরার কবলে পড়েছিল তা থেকে পশ্চিমবঙ্গও রেহাই পায়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিকল্পনার কর্মসূচীকে পরিপূরক হিসাবে, জরুরী ভিত্তিতে, ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে, পশ্চিম বাংলা ব্যাপক আকারে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনাকে কার্যকর করে তোলে।
১৯৭২ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭৩ সালের জুন পর্যন্ত
মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন দাঁড়ায় ৬ লক্ষ ২৮ হাজার মেট্রিক টন।

গ্রামাঞ্চলে জরুরী ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের পাইলট কর্মসূচী, ক্ষুদ্রচাষীর উন্নয়ন সংস্থা, ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষিতে কর্মতৎপরতার ফলে আরও অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদনের পথে এগোনো যাচ্ছে।
রাজ্য সরকারও এ উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক কৃষিভিত্তিক
সামগ্রিক উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

॥ কৃষি অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত ॥

This supersonic fighter could never get off the ground...

but for the special ground-starting batteries from world renowned CHLORIDE

Chloride India are the unrivalled leaders in battery making. They have the finest trained experts, advanced research and development, the longest experience—all backed by the latest know-how of the world-wide, world renowned Chloride Group. This gives Chloride all it takes to bring you batteries not only designed specifically for ground-starting supersonic jets—but with built-in quality none can beat.

And this same unrivalled battery technology is playing a major role in India, providing battery power for industry, agriculture, defence, transport and communication.
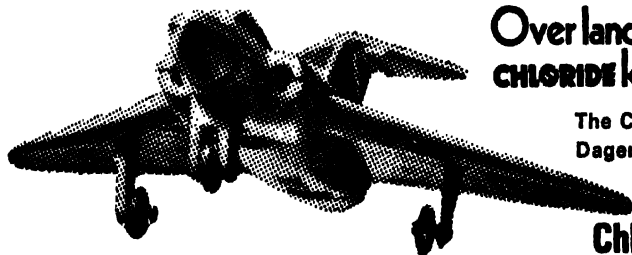
Over land, air or sea- CHLORIDE know batteries best

The CHLORIDE brands : Exide, Dagenite, Index, Chloride.

Chloride India Limited

Calcutta Bombay New Delhi
Madras Nagpur Jullundur

একটি ব্যাংক—কিন্তু বহুমুখী তার কাজ।

ব্যাংকঘটিত যে কোনো ঝামেলায় পড়ুন,—আসুন **স্টেট ব্যাংকে**।

স্টেট ব্যাংক নাবালকের একাউন্ট রাখা থেকে

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রচেষ্টায় অর্থব্যবস্থা করা (ও সৌজন্যসূচক কার্ড) পর্যন্ত

সব কাজেই সাহায্য করে।

স্টেট ব্যাংকের ৪০০০ শাখা থেকে আমরা

আপনাদের জন্যে এই সব কাজ করি।

সকলের সেবায় **স্টেট ব্যাঙ্ক**

With the compliments of

Fulchand Kanahiyalal & Co., Private Limited.

Exporter of Jute & Jute Goods

12, India Exchange Place,
Calcutta-700001
Telephone: 22-9503 (4 lines)

সংগীত-চিন্তা

সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা এবং সংগীত সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এই গ্রন্থে সংকলিত। অনেকগুলি রচনাই ইতিপূর্বে গ্রন্থভুক্ত হয়নি। মূল্য ৭·০০ টাকা।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

পাঠভেদ সংবলিত সংস্করণ। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কবির মন্তব্য ও বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থ থেকে বর্জিত কবিতাও এই সংস্করণে সংকলিত। এ ছাড়া, প্রথম সংস্করণ থেকে পদাবলী রাগ-তাল ও শব্দের অর্থ সংকলিত হয়েছে। মূল্য ৬·০০ টাকা।

রূপান্তর

সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত তথা ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা থেকে অনূদিত বা রূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথের প্রকীর্ণ কবিতাবলী নানা মুদ্রিত গ্রন্থ, সাময়িক পত্র ও পাণ্ডুলিপি থেকে মূল-সহ এই গ্রন্থে একত্র সমাহৃত হয়েছে। মূল্য ৭·০০ টাকা।

সচিত্র চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা প্রথম প্রকাশকালে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা যে চিত্রাবলী এই কাব্য গ্রন্থখানিকে অলংকৃত করেছিল--সেই চিত্রাবলীসহ এই স্বতন্ত্র শোভন সংস্করণ প্রকাশিত। ছবিগুলি ভিন্ন রঙে মুদ্রিত। মূল্য ২·৫০ টাকা।

লেখন

রবীন্দ্রনাথের অনিন্দ্যসুন্দর হাতের লেখায় তাঁর কবি-মানসের অপরূপ পরিচয়-লিপি। এই গ্রন্থের বাংলা ও ইংরাজী কবিতাগুলি সংখ্যায় আড়াই শতের অধিক, ইতিপূর্বে অন্য কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয়নি। জাপানী বাঁধাই, মূল্য ১০·০০ টাকা।

বিশ্বভারতী

১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

বরষার
পথে
ভরসা
বাটার ওয়াটারপ্রুফ জুতো টেকসই রবারে তৈরি, তাই সহজে জীর্ণ-ছিন্ন হবে না। ভিতরে উৎকৃষ্ট কাপড়ের আস্তর, বৃষ্টির মধ্যে হাঁটবার সময়েও পায়ের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকবে। আর তলি-গোড়ালির এমনই সংযোগ যে সহজে পা হড়কাবে না।
ভালকান
পয়েন্টেড ক্যাজুয়াল
সাইজ ১-২
৬.২৫
ভালকান ক্যাজুয়াল
সাইজ ৩-১০
৭.৯৫
ভালকান, নিউকাট
সাইজ ৩-১০
৬.৮০
ভালকান
পয়েন্টেড ক্যাজুয়াল
সাইজ ৩-১০
৭.৯৫
Bata

বর্ষ ৩৫ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০

সূচিপত্র

সম্পাদক : দিলীপকুমার গুপ্ত

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত
৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের
পাস ও অনার্স স্তরের উপযোগী পশ্চিমবঙ্গে
অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনুমোদিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী
বাংলা ভাষায় কলেজ পাঠ্য বিষয়ের ওপর পাঠ্যপুস্তক (মৌলিক ও অনুবাদ)
লিখিবার জন্য প্রাক্তন অধ্যাপক এবং অধ্যাপনায় নিযুক্ত
ন্যূনতম তিন বৎসরের অভিজ্ঞ এবং আগ্রহী অধ্যাপকগণের নাম
লেখক অথবা অনুবাদক হিসাবে তালিকাভুক্ত করিবার জন্য
টোডি ম্যানসন (একাদশ তল),
পি-১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনসন,
কলিকাতা-৭০০০১২ ঠিকানায় অবস্থিত
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক কর্তৃক,
পর্ষদ দপ্তর হইতে প্রাপ্তব্য নির্ধারিত ফরমে বুধবার,
৩১শে অক্টোবর, ১৯৭৩ তারিখ পর্যন্ত
দরখাস্ত আহ্বান করা

অবনী মিত্র
মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক

বর্ষ ৩৫ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০

সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ভারতবর্ষ কি এগিয়ে চলেছে? একদিক থেকে উত্তরটা সদর্থকই হবে। ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের বন্ধন হতে মুক্তি অর্জন করেছে। ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ক্ষত নিরাময় করে গড়ে তুলতে চাইছে শিল্পায়ত আধুনিক দেশ। চিরায়ত ঐতিহ্যানুসারী ধ্যান-ধারণা ক্রমশঃই পরিত্যক্ত হচ্ছে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধ্যানধারণা ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হচ্ছে সমাজে।

ইংলন্ড-এ ও ফরাসীদেশে জার্মান ট্রাইবগুলির সহজ, সরল ধ্যানধারণাগুলির পরিণত ফল হিসাবে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের চিন্তা জন্ম নেয়। নানা ভাষা, নানা বেশ, নানা পরিধান, নানা ধর্ম, নানা সংস্কৃতির এই যে দেশ ভারতবর্ষ—সেই দেশেও জাতীয় রাষ্ট্রের সাধনা আজও চলেছে। প্রশ্ন জাগে, ভারতবর্ষের মৌলিক রূপান্তর কত দ্রুত সম্পন্ন হবে, কবে আবির্ভাব হবে এমন এক ভারতবর্ষের যার মূলমন্ত্র এক জাতি, এক প্রাণ, একতা অথচ যার আদর্শ হবে বিশ্বসৌভ্রাত্র?

একদা মনে হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্তি পেলেই বুঝি বা মোক্ষ-প্রাপ্তি। এখন দেখা যাচ্ছে ঐ সূত্র ছিল খণ্ডিত, একদেশদর্শী। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পেলেই যে অনিবার্যভাবে বৈষয়িক ও আত্মিক দিক থেকে সম্পন্ন দেশ গড়ে ওঠে, অভিজ্ঞতা থেকে তা বলা যায় না। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে আমরা তাই দেখেছি জাতপাত, সম্প্রদায়, ভাষা ও ধর্মের পিছুটান। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে যে দেশপ্রেম আমাদের ছিল, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দেখা গেল সেই দেশপ্রেম অনেকাংশে অগভীর। তবুও আমরা আর মধ্যযুগের ভারতবর্ষে ফিরে যেতে পারি না। ইতিমধ্যে এদেশে এসেছে বিজ্ঞান, টেকনোলজি, নতুন উৎপাদনপদ্ধতি। দেশে স্থাপিত হয়েছে বিরাট বিরাট শিল্প, গড়ে উঠেছে মহানগরী, শিল্পনগরী। নানা ধরনের শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে দেশের নানা অঞ্চলে। এ-সব ফেলে পুরাতন, ফেলে-আসা সমাজে প্রত্যাবর্তন আর সম্ভব নয়। অর্থাৎ পরিবর্তনের অমোঘ দাবি অস্বীকার করে অতীতের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে কোন লাভ নেই।

এ-কথা সত্য যে স্বাধীনতার শুধু উপকরণমূল্যই আছে। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে

'স্বাধীনতা' চাই বলাই যথেষ্ট। আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে স্বাধীনতার দাবি সমস্ত ভারতবর্ষকে এক করেছিল যদিও আমাদের কল্পনাবিলাসী, রোমান্টিক জাতীয়তা-বাদীদের চিন্তায় ভাবী সমাজের রূপরেখা ছিল অস্পষ্ট, অর্থনীতির কথা ছিল সামান্য। বরং তাঁদের ভাষণে ও বক্তৃতায় এমন ধারণাই সৃষ্টি হত যে স্বাধীনতার পর অর্থনীতির উন্নতি অনিবার্য হয়ে উঠবে, পত্তন হবে সম্পন্ন, ঐশ্বর্যময় ভারতবর্ষের।

রাজনীতিবিদেরা—বিশেষত ঔপনিবেশিক দেশের দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদেরা—আশু ভবিষ্যৎটাই দেখেন। স্বাধীনতার বেদীমূলে তাঁরা হয়তো জীবন উৎসর্গ করেছেন। স্বাধীনতাই তাঁদের পরমপুরুষার্থ। স্বাধীনতা কেন, স্বাধীনতা কাদের জন্য, স্বাধীনতার সুফল কারা পাবে, স্বাধীন দেশের অর্থনীতির রূপরেখা কেমন হবে—এ-সব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তার অবসর তাঁদের কম। আমরাও ভেবেছিলাম, স্বাধীনতা এলে সাধারণ ভারতবাসী—কৃষক, মজদুর, নিম্নবিত্ত—সকলেরই জীবনমানের প্রভূত উন্নতি হবে। কিন্তু দেখা গেছে আমাদের চিন্তায় ছিল অতিসরলীকরণের প্রবণতা। আমরা দেখেছি, আজও গ্রামের অগণিত মানুষের দারিদ্র্য পর্বতপ্রমাণ এবং সাধারণভাবে এটা আমরা বুঝেছি প্রগতির পথ দুর্গম, ঋজুকুটিল। সেই পথপরিক্রমায় উৎপাদনপদ্ধতি ও উৎপাদনসম্পর্কের যেমন পরিবর্তন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সামাজিক প্রথা, আচার-আচরণ, বিশ্বাস ও মানসিকতার রূপান্তরের।

এই রূপান্তরের কাজ চলেছে এমন এক যুগে যে যুগটাকে বলা যায় মহাজাগরণের ও সমাজতন্ত্রের যুগ। এ যুগে ক্রমশঃ সাম্রাজ্যবাদী নীতির অবলুপ্তি ঘটেছে, ঔপনিবেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে তোলা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলি গেছে ভেঙে এবং এর জায়গায় আবির্ভাব ঘটেছে একাধিক নতুন জাতীয় রাষ্ট্রের। পৃথিবীর এই এলাকাগুলির কোটি কোটি মানুষ নতুন জীবনের সন্ধান করছে।

সাবেকী পুঁজিবাদী দেশগুলিরও পরিবর্তন ঘটেছে নানাদিকে। এ-সব দেশে প্রগতির আন্দোলন নতুন শক্তি লাভ করেছে। ফলে পুঁজিবাদী চক্র চালু সমাজকাঠামোর মধ্যে শ্রমজীবী জনগণকে প্রচুর সুবিধা দিতে এবং কিছু কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার মঞ্জুর করতে বাধ্য হচ্ছে। এই সব সমাজেও অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে এবং শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের দাবির মান উন্নত হচ্ছে। পরিবর্তনশীল বাস্তবের উপযোগী হয়ে উঠতে পুঁজি-বাদের প্রয়াস এ যুগের একটি ঐতিহাসিক সত্য।

১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার সময় কিংবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে পৃথিবী যেরকম ছিল আজ আর সেরকম নেই। সমাজতন্ত্র নানা দেশে উল্লেখযোগ্য জয় অর্জন করেছে। যে রাশিয়া পথ দেখিয়েছিল শুধু সেখানেই নয়, অন্য একাধিক দেশেও সমাজতন্ত্র নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই ব্যবস্থার নিজস্ব অসুবিধা ও দ্বন্দ্ব আছে, সমস্যা আছে, এই ব্যবস্থা অপাপবিদ্ধও নয়। তবুও একথা স্বীকার করতেই হয় যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমাদের কালের অন্যতম নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠছে। সমগ্র ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার উপর অসামান্য প্রভাব ফেলছে। এ যুগে তাই কোন দেশ সাম্রাজ্যবাদী পন্থা অনুসরণ করতে ইচ্ছুক হলেও সে যে সহজেই পৃথিবীতে এক সাম্রাজ্যের বিস্তার করতে পারবে এমন সিদ্ধান্তটা হবে হঠকারিতা। সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের পক্ষে আজ অন্যতম বাধা হল সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরাট শক্তি এবং বিরাট শক্তির সম্ভাবনাময় চীনের অস্তিত্ব। এখন যেহেতু দুনিয়ায় একাধিক শক্তিকেন্দ্র রয়েছে তারই ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ক্ষুদ্রতর জাতিগুলি স্বাধীনতা ও তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সুযোগ ও সম্ভাবনা লাভ করবে। ইতিহাসে

সর্বদা এমনটি ঘটতে দেখা যায়। বড় বড় শক্তিগুলির মাঝে দুর্বলতর ও ক্ষুদ্রতর জাতি-গুলিই ভারসাম্য রক্ষা করে।

আমরা দেশশাসনের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। পঁচিশ বছর একটা জাতির জীবনে খুব একটা বড় সময় নয়। তবুও ভারতবর্ষের গণতন্ত্র কি দেখাতে পেরেছে যে এই ব্যবস্থা দেশকে শিল্পসমৃদ্ধ করে ও দেশের সাধারণ উন্নতি সাধন দ্বারা এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম? ভারতের গণতান্ত্রিক যন্ত্রটি দেশের প্রাথমিক স্তরের দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূর করে দেশকে কি নতুন পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে? সক্ষম যে হয় নি তার প্রমাণ ভারতের অধিকাংশ মানুষ আজও দারিদ্র্যসীমার নীচে আছে। মাথাপিছু আয় তাদের দৈনিক ছয় আনা; শিক্ষিতের সংখ্যা এদেশে শতকরা ৩০ ভাগ। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এদেশে নেই বললেই চলে। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক স্বাধীনতালব্ধ দেশে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। এমতাবস্থায় শুধু গণতন্ত্র বহাল রাখাটাই নিশ্চয় ভারতবর্ষের কৃতিত্ব। কিন্তু শুধু এই কৃতিত্ব দেখেই এই দেশের গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করা চলে না। সব দেখেশুনে মনে হয় ইংলন্ডের ছকে আমরা যে সংসদীয় বহুদলভিত্তিক গণতন্ত্র গ্রহণ করেছিলাম তা অন্তত ভাল কাজ দেয় নি। দোষটা গণতন্ত্রের নয়। এর একটাই তাৎপর্য এবং তা হল, ভারতবর্ষে সামাজিক, প্রথাগত, ইতিহাসগত অবস্থা এমন নয় যে অবস্থায় ইংলন্ডীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কার্যকরী হতে পারে।

আমাদের গণতন্ত্র মধ্যযুগীয়তা এবং ঔপনিবেশিক শাসনের তুলনায় এক বিরাট ঐতিহাসিক অগ্রগতি। তবুও অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে এটা সব সময়ই খণ্ডিত, ভগ্ন, অনেকাংশে মিথ্যা ও কপটতায় পূর্ণ। এই গণতন্ত্র প্রধানতঃ বিত্তবানদের সুযোগসুবিধা করে দেয়। গরীবরা যে উপকার গণতন্ত্র থেকে পায় তা একেবারেই প্রান্তিক। সত্য কথা আমাদের সর্বজনীন ভোটাধিকার আছে, তত্ত্বগতভাবে স্বাধীন নির্বাচন আছে, বক্তৃতাদানের স্বাধীনতা আছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে। এ সব অধিকার নির্মূল্য নয়। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে এই গণতন্ত্র যে খুবই সীমিত, সম্পত্তিবানেরা ছাড়া এই গণতন্ত্রের সুফল যে ভোগ করা সম্ভব নয়, এ অভিজ্ঞতা অস্বীকার করা যায় না। এ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, লোকের মুখে অন্ন যোগাতে, দেহ ঢাকার মতো বস্ত্র যোগাতে এবং এই ধরনের সাধারণ জিনিসের ক্ষেত্রে ভারতীয় গণতন্ত্রের ফল উৎসাহব্যঞ্জক নয়। আমরা গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে জাতীয় প্রচেষ্টার ও উৎপাদনের বড় অংশ মূলধনী দ্রব্যাদি, পুঁজি ও সঞ্চয়ের জন্য নিয়োগ করতে সক্ষম হইনি। তাই ভবিষ্যতে আয়ের দ্রুত উন্নতির জন্য বর্তমানে সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলির আয়কে নিম্নহারে রাখতেও সক্ষম হইনি। কথা ছিল তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে পুঁজির মাত্রা শতকরা ১১ ভাগ, চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে শতকরা ১৬ ভাগ এবং ১৯৭৫-৭৬ সালে শতকরা ১৭ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এ সব অলীক কল্পনাই রয়ে গেছে।

একটি দেশের উন্নয়নকে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে নিতে হলে মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় শতকরা ১০ থেকে ১১ ভাগ পর্যন্ত পুঁজির মাত্রা বৃদ্ধি না করলেই নয়। ভারতবর্ষ যে এখনও সেই স্তরে পৌঁছতে পারল না এবং সংকল্প বরাবরই কাগজপত্রে রয়ে গেল তাতে প্রশ্ন জাগে, তাহলে এদেশের গণতন্ত্র ও পরিকল্পনা কতটা সফল হল?

আমাদের গণতন্ত্রে মোট জাতীয় উৎপাদন যদি ৪ ভাগের বেশী বৃদ্ধি না পায়, অথচ জনসংখ্যা যদি বিপুল বেগে বৃদ্ধি পায় তবে দেশের অগ্রগতি যে যৎসামান্যই হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রতি বছর ভারতবর্ষে যদি শতকরা ২·৫ ভাগ লোকসংখ্যা বাড়ে এবং খাদ্য

সরবরাহ-বৃদ্ধি যদি শতকরা ৪ ভাগ অন্ততঃ না বাড়ে, তাহলে খাদ্যসংকটই দেখা দেওয়া সম্ভব। ভারতে শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে লোকসমাগম চলছে। এদেশে শুধু যে এক বিরাট জনসংখ্যাকে খাওয়াতে হবে তাই নয়। সেই বিরাট জনসংখ্যার যে মোটা অংশ শহরে বাস করে অথচ যারা নিজেরা খাদ্য উৎপন্ন করে না, তাদেরও খাওয়াতে হবে। কিন্তু ভারতবর্ষের গণতন্ত্রে আজও কৃষির আমূল সংস্কার করা গেল না। ১৯৭৩ সালেও তাই শোনা গেছে যে দেশের লোককে নিছক খাওয়াবার জন্য কোটি কোটি বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা ব্যয় করতে হবে কেননা বিদেশ থেকে খাদ্য না কিনলে খাদ্যসমস্যার কিনারা করা যাবে না।

কৃষিব্যবস্থা পশ্চাৎপদ থেকে যাওয়ায় ভারতের শিল্পবিকাশও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ফলে আমাদের গণতন্ত্রকে বাঁচাবার তাগিদে মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজনে আমাদের বিদেশ থেকে সাহায্য নিতে ও ধার করতে হয়েছে। কিন্তু তবুও আমাদের অর্থনীতির সংকট আজও গেল না। পরিকল্পনা আমরা করেছি কিন্তু অন্তে দেখা গেছে গণবেকারি ও মন্দা।

বৃক্ষের পরিচয় যেমন ফলে তেমনি অনুন্নত ভূখণ্ডের গণতন্ত্রের পরিচয় তার সাফল্যে। গণতন্ত্রকে দেখাতে হবে যে তা দেশকে শিল্পোন্নয়ন ও দেশের সাধারণ উন্নতি সাধন দ্বারা এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম। অনুন্নত ভূখণ্ডে এই হলো শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রের টিকে থাকার একটি শর্ত।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের যে ছক আমরা গ্রহণ করেছিলাম, যা নিয়ে ২৫ বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হল, সেই প্রচেষ্টার মূল্যায়ন কেমন হবে? যে সামাজিক পরিবেশে ঐ গণতন্ত্র কার্যকর হয়েছে আমাদের দেশে সেই পরিবেশ নেই। আমাদের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ভঙ্গুর, ভারত-ঐক্যের বনিয়াদ দুর্বল। আমাদের চিরায়ত সমাজ প্রথা-ও সংস্কারনির্ভর। আমাদের জনসাধারণ দারিদ্র্য, বুভুক্ষা, অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যে জর্জর। আমাদের গণতন্ত্রের অসাফল্যের প্রমাণ করপোরেশন ও মিউনিসিপালিটিগুলি। সেসব সংস্থা আজও ঘোড়ার আস্তাবল। আমাদের পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে তাই ভোট আছে, দলীয় সংঘাত আছে, টাকার খেলা আছে, নেই কোন জাতীয় ঐকমত্য। এখানে রোজই আইন পাশ হয়, তবে সেই আইন চালু করবার ক্ষমতা নেই নরম সরকারের। এবং আইনকে অমান্য করাটাই এখানকার রেওয়াজ। এখানে গণতন্ত্রের কাঠামো তাই প্রচলিত শক্তিকাঠামোকে স্পর্শ করতে অক্ষম এবং সুবিধা-ভোগী শ্রেণী—ধনপতি, জোতদার, মহাজন, ব্যাবসাদার, কালোবাজারি, চাকুরিজীবী ভদ্রলোক বাবুদেরই এই ব্যবস্থায় যা কিছু লাভ। অর্থাৎ ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে ব্রিটিশ প্যাটার্নের গণতন্ত্র এখানে ফলপ্রসূ হতে পারছে না। তার কারণ ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা আলাদা, এদেশের লোকের মানসিকতা গণতন্ত্রের অনুকূল নয় এখনও।

পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র এযাবৎ তেমন ফলপ্রসূ হয় নি, তার থেকে এ সিদ্ধান্ত করা চলে না যে এদেশে একনায়কতন্ত্র চাই। প্রথমতঃ আমাদের সমাজে রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী শক্তির প্রভাব সামান্য না হলেও এদেশে 'ফ্যাশিস্ট একনায়কতন্ত্র' স্থাপনের বাস্তব অবস্থা নেই। একে তো ভারতবর্ষ বিরাট জনবহুল দেশ। তার উপর যে দর্শনের উপর এবং জাত্যভিমানের উপর ফ্যাসিবাদ নির্ভর করে সেই দার্শনিক পরিমণ্ডলও এখানে নেই। এখানকার পুঁজিবাদ একচেটিয়া রূপ নিলেও, গণতান্ত্রিক কাঠামো বাতিল করে উন্মুক্ত স্বৈরাচারের পথ নেওয়া এর পক্ষে শক্ত। এবং ভারতবর্ষ বহুজাতিক দেশ, এবং এমন দেশকে জাতিগত উন্মাদনায় মাতিয়ে তুলে ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব গ্রহণ করানো প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া ভারতবর্ষে ফ্যাসি-

বাদী শক্তিশালী অন্যদিকে সাবেকি ধরনের সর্বভারতীয় দলও নেই।

এখানে 'প্রলেটারিয় ডিক্টেটরশিপ' অর্থাৎ কমিউনিস্ট একনায়কতন্ত্র স্থাপন করাও অসম্ভবের কোঠায় পড়ে। কমিউনিস্ট আন্দোলন এখানে খণ্ডিত এবং বিশেষ অঞ্চলে সীমাবন্ধ। এই আন্দোলনের হোতা প্রায়শঃ মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এলিটেরা। এরা রোমান্টিক বিপ্লবী, কিন্তু বিপ্লবী তত্ত্বে ও কর্মে অপটু। এদেশে জনসাধারণের শ্রেণীভিত্তিক স্তরবিভাগ সম্পূর্ণ হতে এখনও দেরি আছে এবং এখনও এমন বহু মধ্যবর্তী স্তর আছে যাদের শ্রেণীগত অবস্থা নির্ধারিত হয় নি। উপজাতীয় আনুগত্য ও জাতি-বিচারের আনুগত্যের শক্তিশালী প্রভাব এদেশে এখনও যথেষ্ট। এইসব অসুবিধার জন্য ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের রক্তশূন্যতার কারণে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রেণীর বিপ্লবী চেতনা ও সংগঠনের বিকাশ এদেশে বহুল পরিমাণে ব্যাহত। এ হেন অবস্থায় ভ্রান্ত উপমা টেনে সোভিয়েট ছকে কিংবা চীনা ছকে বিপ্লবের মডেল খাড়া করা কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাহলে কি গণতন্ত্রের নামে স্রোতহীন বন্ধ অবস্থায় আটকে থাকবে আমাদের সমাজ? গ্রামাঞ্চল থাকবে সনাতনী কাঠামোর চৌহদ্দিতে বাঁধা? দেশের আভ্যন্তরিক বাজারের বিস্তার হবে না এবং কৃষিজাত পণ্যসামগ্রী শিল্পখাতে নতুন প্রবাহ সৃষ্টি করবে না? বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে আশার আলোকদ্যুতিতে উদ্ভাসিত হওয়া শক্ত। ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিকাশধারায় আজও পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এমন কোন শ্রেণী সৃষ্টি হয় নি কৃষিক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উৎপাদনবৃদ্ধিতে যাদের উৎসাহ আছে। কৃষিতে আজও সামন্তবাদের অবশেষ টিকে আছে। তার ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি। অথচ গ্রামসমাজের আমূল রূপান্তর না হলে শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও দ্রুত অগ্রগতি হবে না। সত্য কথা, এসব কাজে অনেক অসুবিধা আছে, পরিবেশ সর্বদা অনুকূলও নয়। কিন্তু শুধু অসুবিধার কথা শোনালে কোন লাভ নেই। রাজনৈতিক নেতাদের ও দলসমূহের মহত্ত্ব ও কৃতিত্ব এখানে যে বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তাঁরা প্রথাগত ও কাঠামোগত পরিবর্তন নিয়ে আসেন সমাজে। যদি শুধুই বাক্‌বিভূতির প্রকাশ ঘটে এবং লক্ষ্যহীনতার প্রাবল্য দেখা যায় তাহলে গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয়, নেতাদের মহত্ত্ব সম্পর্কেও।

গণতন্ত্র যদি কাজ দেখাতে না পারে, যদি দেখা যায় যে, কৃষিনীতি, শিল্পনীতি নিয়ে কথা হয় অনেক, কাজ হয় কম, তবে গণতন্ত্রের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হবে কেন? গণতন্ত্রপ্রেমীদের মধ্যে কেউ হয়তো বলবেন, গণতন্ত্রের গতি তুলনায় শ্লথ অনেকটা কচ্ছপের মতো। তবুও আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাম্যবাদী দেশে যে নৃশংসতা মিশে থাকে, গণতন্ত্রে তা নেই। গণতান্ত্রিক আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার গতিবেগ হয়তো কম, কিন্তু তা অনেক বেশী মানবিক। কথাটা অংশত সত্য। কচ্ছপগতিতে চললে মানুষের দুঃখদুর্দশার যে মোট দাম দিতে হয় তার পরিমাণ সত্যই বিপুল। ভারতবর্ষে কত লোক প্রায় অনাহারে থাকে, কত মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে, কত লক্ষ লক্ষ মানুষ চিকিৎসার অভাবে মারা যায় তার হিসাব নিলে বোঝা যায় কচ্ছপগতির দায়ভাগ কতখানি। দেশের উন্নতি যদি অতি দ্রুত না করা যায় এবং জনসংখ্যা যদি বর্তমান হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে কত বিপুল সংখ্যক মানুষ যে অলক্ষ্যে মৃত্যুর মুখোমুখি হবে তা কল্পনাতীত।

গণতন্ত্রের অর্থ কি? গণতন্ত্রে প্রত্যেকটি মানুষ সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ পাবে বৈষয়িক ও আত্মিক দিক হতে, মানুষের মতো জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে। ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে তো বটেই, শহরাঞ্চলের অনেক এলাকায়ই আজও এই অবস্থা আসে নি। যদি গণতন্ত্র আনুষ্ঠানিক রয়ে যায়, উন্নয়নের হার যদি দ্রুত না বাড়ে, সমাজে বৈষম্য ও অসাম্য যদি

গণতান্ত্রিক নৈষ্কর্ম্যের ফল হিসাবে দেখা, দেয় তবে সমাজ ভারসাম্য হারাবে ক্রমশঃ, এবং পরিণতিতে গণতন্ত্রই বিপন্ন হবে। অধুনা গ্রামাঞ্চলে ধনী কৃষকশ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছে। একটা গণতান্ত্রিক পথ হতে পারে এদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া। এরা 'সবুজ বিপ্লব' ঘটাক, তবে সরকার শক্ত হাতে লাভের উপর ট্যাক্স বসাক, বাজার সংগঠিত করুক এবং মহাজনের কবল থেকে গ্রামাঞ্চলকে মুক্ত করুক। এর ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, ক্ষেত্র তৈরী হবে বিচিত্র শিল্পস্থাপনের। শিল্পবিকাশ ঘটলে গ্রামাঞ্চল হতে চলে-আসা বাড়তি শ্রমজীবী মানুষকে শিল্পে নিযুক্ত করা যাবে। আবার শিল্প ও কারিগরি জ্ঞানের বিকাশ হলে কৃষকের ঘরে তার সুফল পৌঁছে দেওয়া যাবে। এ পথ হবে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক পথ।

আর যদি 'সমাজতান্ত্রিক পথ' নিতে হয় তাহলে অর্থনীতি রাজনীতি, সমাজের উপর অনেক বেশী জোর খাটাতে হবে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি বিচক্ষণ, উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ও যোগ্যতা-সম্পন্ন হয় তবে তাকে বিপ্লবী কৃষিনীতি চালু করতেই হবে। প্রথম পর্যায়ে চাষীর হাতে জমি দিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে হয় সমবায় কৃষি নয়তো যৌথখামারের কর্মসূচী চালু করতে হবে। অর্থাৎ গণতন্ত্রকে হতে হবে সংগ্রামী, সমাজরূপান্তরের প্রয়োজনে জোর খাটাতে প্রস্তুত। এই প্রস্তুতি না থাকলে শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্র নগণ্য সংখ্যালঘুর-গণতন্ত্রই হবে, যার সুবিধা নেবে গ্রামাঞ্চলে ধনীকৃষক, মহাজন, উচ্চবর্ণের মানুষেরা, শহরাঞ্চলে পুঁজিপতি, ব্যাবসাদার, চাকুরিজীবী বাবুরা। গণতন্ত্র যদি সমাজতন্ত্রে পূর্ণতালাভ না করে, শ্রেণীনিপীড়নকে বহাল রাখে, অধিকাংশ মানুষকে মানবিক জীবনের সুযোগসুবিধা না করে দেয়, তবে এ ব্যবস্থা শ্রেণীসংগ্রামকে অনিবার্য করে তোলে, নিজের অপদার্থতার দ্বারা নিজেরই মৃত্যুর পরোয়ানায় স্বাক্ষর করে।

উপরের প্রহরা

জাঁ জেনে

[বাষট্টি বৎসর বয়স্ক, সমকামী, জ' জেনে চুরি, জালিয়াতি, আফিমের চোরা কারবার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অপরাধের জন্য দীর্ঘকাল জেলে কাটান। তাঁর প্রথম রচনা "লা কোঁদানে আমর" (মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত) নামক একটি বড় কবিতা ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৪ সালে "নোত্র্ দাম দ্যুফ্লর" (ফুলের কুমারী মাতা) উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। উপন্যাসটি তিনি জেলে বসে রচনা করেন। "নোত্র দাম দ্যুফ্লর" প্রকাশিত হবার পরেও জেনে অপরাধ ত্যাগ করেননি। ১৯৫৮ সালে রচিত "বালকোঁ" (বারান্দা) নাটকটি ১৯৬০ সালে ব্রডওয়ের বাইরে প্রযোজিত সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে নির্বাচিত হয়। এই নাটকে সমাজকে একটি বেশ্যালয় হিসাবে দেখানো হয়েছে। ১৯৫৮ সালে রচিত নাটক "লে নেগ্র" (নিগ্রো) লন্ডন থেকে লস-এ্যাঞ্জেলস পর্যন্ত সর্বত্র অসামান্য সাফল্য লাভ করে। নাটকটিতে সবকটি চরিত্রই নিগ্রো। তাঁর গ্রন্থসমূহ 'পরিবর্তের ক্রিয়া' ব'লে নিন্দিত।

১৯১০ সালে পিতামাতা-পরিত্যক্ত সন্তান জাঁ জেনে দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত মেহেতে একটি চাষী পরিবারে পালিত। দশ বৎসর বয়সে চুরির অপরাধে সংশোধন-বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় এবং তার পর থেকেই ক্রমশঃ অপরাধীতে রূপান্তরিত হন। আঠার থেকে তিরিশ বৎসর বয়সের মধ্যে সারা ইউরোপে ঘুরে বেড়ান, যেখানেই গেছেন চুরি করেছেন ও দণ্ডিত হয়েছেন।

জাঁ জেনে ফরাসী তথা পৃথিবীর কোনও সাহিত্যিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নন। তাঁর ছিন্নমূল জীবনের মতোই তাঁর রচনা সমস্ত সাহিত্যিক আন্দোলন থেকে ভিন্ন। একটু বিস্তৃত অর্থে ষোড়শ শতকের ফরাসী চোর-কবি ভিয়োঁ ও সুইটজারল্যান্ড-জাত ফরাসী বাউণ্ডুলে লেখক জাঁ জাক রুশোকে তাঁর সমগোত্রীয় বলা যায়, কিন্তু রুশোর আলোয় ভরা, মধুর প্রাকৃতিক জগতের বিপরীত হ'ল জেনের জগৎ, সহরের নোংরা গলি ও জেনের পূতিগন্ধময়, অন্ধকার ঘর।

রুশোর রচনার উৎস তাঁর মনন, জেনের রচনার উৎস তাঁর জীবন। সে জীবন হ'ল অপরাধী, ভিক্ষুক, সমকামী ও প্রবঞ্চকের জীবন। তাঁর রচিত চরিত্রগুলি আসলে হ'ল জাঁ জেনেরই বিভিন্ন রূপ, প্রায় প্রত্যেক চরিত্রের আড়ালে লুকিয়ে আছেন জাঁ জেনে। নিজের সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে জেনে বলেছেন, 'আমার জেলে বন্দী অবস্থার একঘেয়েমি আসার আগেকার ছন্নছাড়া, কঠোর, নিষ্ঠাবান বা হাভাতে জীবনে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। পরে স্বাধীন অবস্থায় পয়সা রোজগারের জন্য লিখতাম। সাহিত্য কর্মের কথা ভাবাটাও আশ্চর্যের ছিল'। এতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে জাঁ জেনে কোনও সাহিত্যিক বা দার্শনিক আন্দোলনের অংশীদার হ'তে চাননি। কথাটা সহজেই বোঝা যায়, আঠারো বৎসর বয়সের এক যুবক স্পেনের বার্সেলোনা সহরে ভিক্ষা, ছিঁচকে চুরি ও ছোটখাট জালিয়াতি করত। তার আদর্শ পুরুষ এবং প্রেমিক ছিল সেই "স্তিলিতানো", বাঁ হাত না থাকা সত্ত্বেও যে চুরি ও রাহাজানিতে ছিল সবার সেরা।

১৯৬৪ সালে সিমোঁ দ্য বোভওয়ারের অনুরোধে রাজী হ'য়ে "প্লে বয়ের" সাক্ষাৎকারে জাঁ জেনে বলেন—'আমার সমস্ত রচনায় আমি নিজেকে উলঙ্গ করে দেখাই...'। তাঁর রচনা তাঁর জীবনেরই অনুলিপি। ১৯৪২ সালে প্রকাশিত বড় কবিতা 'ল্য কোঁদানে আমর' হ'ল ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত মরিস পিলাগর নামক এক খুনীর উদ্দেশে রচিত জয়গান। জেনে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান এবং অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হওয়াকে শ্লাঘনীয় বলে মনে করেন। পাঁচ বৎসর ধরে রচিত, ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত আত্মজীবনী "ল্য জুর্নাল দ্যয় ভোলর" (একটি চোরের ডায়েরী)-এ জেনে বলেছেন 'তারা (কয়েদী, খুনী : হতভাগ্যের সন্তানরা) যে গৌরবের দ্যুতি ছড়ায় আমি তার প্রতি আকৃষ্ট।' এই আকর্ষণের ফলেই তিনি ধাপে ধাপে পাপের পথে এগিয়ে গেছেন। "নোত্র্ দাম দ্য ফ্লর" উপন্যাসটির নায়ক-নায়িকা হ'ল দিভীন নামে একটি চোর মেয়ে ও নোত্র্ দাম দ্য ফ্ল্যর নামক এক গুণ্ডা। মেয়েটি ও গুণ্ডাটি ছিল জেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, গুণ্ডাটি ছিল তাঁর আদর্শ—তাকে শেষ পর্যন্ত ফাঁসীতে প্রাণ দিতে হয়। উপন্যাসটি তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত হ'লেও লেখকই প্রধান হয়ে উঠেছেন, কেবলমাত্র কথক হিসাবেই নয়, উপন্যাসের একটি প্রধান চরিত্র হিসাবেও বটে। দুটি চরিত্রকে কেন্দ্র ক'রে লেখকের জীবন ও ভাবনা উপন্যাসটির একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে। তিনি শুধু ঘটনার নৈর্ব্যক্তিক কথকই নন অংশীদারও বটে এবং ঘটনার অভিঘাতে তাঁর

নিজের মনের প্রতিক্রিয়াটিও তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। নোত্র দাম দ্যু ফ্লর ও দিভীনের প্রতি লেখক মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে আছেন। উপন্যাসটি রচিত হয় ফ্রেসেন জেলে ১৯৪২ সালে। ১৯৪৩ সালে তুরেল জেলে রচিত এবং ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত উপন্যাস "মিরাক্ল দ্য লারোজ"এর উপজীব্য হ'ল জেলের জীবন ও সমকামী প্রেম। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত নাটক "লা ওত সুরভেইয়'স" (উপরের প্রহরা) নাটকে দেখি ল্যফ্র' চরিত্র বিখ্যাত খুনীদের ছবি জমায় এবং তাদের প্রায় দেবতাজ্ঞানে পুজো করে, শুধু তাই নয়, সে কেবলমাত্র খুনীর গৌরবের জন্য জেলে তার সহবাসী বন্ধুকে খুন করছে। "জুর্নাল দ্যয়' ভেলর"-এ দেখি জাঁ জেনে ল্যফ্র'র মতোই বিখ্যাত খুনী ও অপরাধীদের ছবি জমিয়ে রাখেন ও প্রায় দেবতাজ্ঞানে পুজো করেন।

কিন্তু পাপের প্রতি তাঁর কেন এই আকর্ষণ? এর উত্তর তিনি ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত "ফুন' বুল"-এ দিয়েছেন, 'তুমি জনসাধারণের চিত্তবিনোদন করতে আসনি, এসেছ তাকে বিস্মিত করতে।' তিনি হতে চেয়েছেন জগতে অনন্য; তাঁর জীবনীতে আমরা দেখি কি ভাবে ধাপে ধাপে তিনি নিজেকে অনন্যতার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিটি ধাপে তাঁর একজন গুরু আছে, আস্তে আস্তে তিনি যার সমকক্ষ হয়ে উঠছেন এবং ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। বার্সেলোনার আদর্শ ও প্রেমিক স্তিলিতানো অ্যান্টোয়ার্প হয়ে যাচ্ছে সহকর্মী; অ্যান্টোয়ার্প-এর আদর্শ প্রেমিক আরম' ক্রমশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাঁর সমকক্ষ বন্ধু। এই অনন্যতার প্রতি আকর্ষণের ফলেই তিনি অন্ধকারের জগৎকে বেছে নিয়েছেন। এর অর্থ এই নয় যে তিনি সহজ রাস্তাটি বেছে নিয়েছেন। আলোর জগতের বিপরীত জগৎ হ'ল অন্ধকারের জগৎ। সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হ'লে, একলা হওয়া সম্ভব নয়, তাই একলা হতে হলে, হতে হবে সামাজিক মানুষের বিপরীত, অর্থাৎ মূল্যবোধটিকে উল্টে দিতে হবে। জেনের জীবনে ও রচনায় বিপরীত মূল্যবোধটিই উপস্থিত।

"জুর্নাল দ্যয়' ভেলর"-এর গোড়ার দিকে দেখি চোর হবার কারণ হিসাবে জেনে বলেছেন 'পেটের দায়ে চোর হয়েছি'। ধরে নেওয়া যাক তাই ঠিক, কিন্তু "নোত্র দাম দ্য ফ্লর" প্রকাশিত হবার পরেও তিনি কেন চুরি করছেন? বা কেন তিনি মেত্রে-র সংশোধন-বিদ্যালয়ে অকৃত দোষগুলি স্বীকার করতেন, এবং কেনই বা অকৃত দোষের জন্য শাস্তি গ্রহণের পরও সেগুলি তিনি করতেন? উত্তরটি তিনি "জুর্নাল দ্যয়' ভোলর"এ দিয়েছেন, তাঁর সমস্ত কর্মের লক্ষ্য হ'ল, সন্ত হয়ে ওঠা। অর্থাৎ তিনি সন্ত হয়ে ওঠার জন্য পাপের পথটি বেছে নিয়ে, সমাজের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে একা হতে চেয়েছেন। "জুর্নাল দ্যয়' ভোলর"এ জেনে বলেছেন, প্রতিটি কু-কর্ম প্রথমবার করবার আগে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব আসত, কিন্তু সর্বদাই তিনি জোর করে নিজেকে দিয়ে তা করিয়েছেন।

প্রশ্ন ওঠে, তাহ'লে সন্তত্ব বলতে জাঁ জেনে কি বোঝেন? "জুর্নাল দ্যয়' ভোলর"এ তিনি বলছেন 'সন্তত্বর সংজ্ঞা না দিতে পেরে—সেটিকে সৌন্দর্যের চেয়ে বেশী কিছু বলতে পারব না—প্রতি মুহূর্তে তাকে আমি সৃষ্টি করতে চাই, অর্থাৎ আমার সমস্ত কর্ম যেন সেই দিকেই নিয়ে যায় যা আমি জানি না।' কিন্তু একটু পরেই তিনি আবার বলছেন 'নীতি ও ধর্মের অনুশাসন থেকে শুরু ক'রে তাঁর লক্ষ্যে তখনই পৌঁছতে পারেন যখন তিনি সেগুলিকে ত্যাগ করতে পারেন। যেমন সৌন্দর্য—এবং কবিতা—যেগুলির সঙ্গে আমি তাকে গুলিয়ে ফেলি, সন্তত্ব হল অনন্য।' এই সন্তত্বে পৌঁছবার জন্যই জাঁ জেনে সারাজীবন পরিশ্রম করছেন এবং শিক্ষানবীশের নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে সমাজ থেকে নিঃসঙ্গতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। জাঁ পল সার্ত্র ১৯৫২ সালে প্রকাশিত তাঁর "স্যাঁ জেনে কমেদিয়্যাঁ এমারাতির"-এ দেখিয়েছেন, যে নিষ্ঠার সঙ্গে 'জাঁ জেনে' পাপের পথ অতিবাহন করছেন তা যে কোনও খৃষ্টান সন্তের নিষ্ঠা থেকে ভিন্ন নয়। ১৯৬৪ সালে "প্লে বয়"-এর সাক্ষাৎকারে জেনে বলেছেন 'হ্যাঁ, আমি এখনও চুরি করি, এটা দেখার জন্য যে আমি এখনও সমাজের প্রতি বেইমানি করি।' "জুর্নাল দ্যয়' ভোলর"-এ সন্তত্বের চিহ্ন সম্পর্কে জেনে বলেছেন 'সন্তত্ব হল যন্ত্রণাকে ব্যবহার করা। এ হল সয়তানকে ঈশ্বর হতে বাধ্য করা।'

বলা যায় যে জেনে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে অন্ধকারকে অতিক্রম ক'রে আলোর পৌঁছতে চান। তিনি সন্ত হ'তে চান কারণ তাঁর মতে সন্ত শব্দটিতে মানুষের সর্বোত্তম অবস্থাকে বোঝায়। এই অবস্থাতে পৌঁছতে পারলেই মানুষ সৃষ্টি করতে পারে। স্রষ্টা নিঃসঙ্গ। এই নৈঃসঙ্গ্যে পৌঁছবার জন্যই তিনি পাপের পথটি বেছে নিয়েছেন।

১৯৫৮ সালে প্রকাশিত "ফুন'বুল"-এ জেনে বলেছেন যে শিল্পী তার শিল্পের মধ্য দিয়ে মুহূর্তের জন্য এই সন্তত্বকে ছোঁয়। এই পর্যায়ে শিল্পকে উন্নীত করতে হ'লে শিল্পীকে হ'তে হবে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। শিল্পীকে সম্পূর্ণভাবে নিজের শিল্পের আড়ালে লুকিয়ে ফেলতে হবে। "ফুন'বুল" (ট্র্যাপিজের খেলা)-এর উপজীব্য হ'ল, ট্র্যাপিজের খেলোয়াড় একটি মেয়ে,

যে দিনের বেলায় নোংরা, দুর্গন্ধ ঘরে পশুর জীবন যাপন করে, সন্ধ্যায় দশ মিনিটের জন্য সে-ই হয়ে ওঠে তারের ওপর উজ্জ্বল, স্বর্গের অপ্সরী; সে তার শিল্পের মাধ্যমে সত্তাকে ছোঁয়। শিল্পের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে হ'লে, শিল্পীকে হ'তে হবে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। জাঁ জেনে এই নিঃসঙ্গতা অর্জন করেছেন পাপের পথে, সমাজ থেকে জোর করে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন সমাজের সঙ্গে বেইমানি করে। আমরা দেখছি যে 'শুধুমাত্র পেটের দায়েই' জেনে অন্ধকারের পথ বেছে নেননি, নিজের আত্মারও এর প্রয়োজন ছিল। দেখা যায় জেনের মতে শিল্পীর সঙ্গে নিঃসঙ্গতার অঙ্গাঙ্গী যোগ। এবং স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, শিল্পী কেন সৃষ্টি করবে ও কার জন্য সৃষ্টি করবে? তাঁর মতে শিল্পী সৃষ্টি করবে, শিল্পের মধ্য দিয়ে সত্তাকে ছোঁয়ার জন্য নিজের তাগিদে। সে সমাজকে আনন্দ দেবার জন্য সৃষ্টি করবে না, সমাজ শিল্পীর সৃষ্টির দিকে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে চেয়ে থাকবে। "ফুন'বুল"-এ তিনি বলছেন 'না না, আরও একবার বলছি—না, তুমি সমাজকে আনন্দ দিতে আসনি, এসেছ তাকে হতবাক করে দিতে।'—অনুবাদক]

দৃশ্যপট

দুর্গের কয়েদ-ঘর। পলেস্তারা নেই, ইঁট দেখা যাচ্ছে, ঘর দেখে মনে হয়, কয়েদখানার গড়ন বেশ অদ্ভুত। পেছনে জাল-দেওয়া জানালা, তাতে বর্শার ফলক লাগানো, ফলকগুলি ভেতরের দিকে। ইঁটের বেদী দিয়ে খাট তৈরী করা হয়েছে, তার ওপরে কয়েকখানা কম্বল। ডানদিকে গরাদ দেওয়া দরজা।

দু একটি ইঙ্গিত

নাটকটি এমনভাবে চলবে, মনে হবে যেন স্বপ্ন। দৃশ্যপটে ও পরিচ্ছদে ডোরাকাটা মোটা কাপড়, উৎকট রঙ—অত্যুজ্জ্বল সাদা ও কুচকুচে কালো রঙ ব্যবহার করতে হবে। অভিনেতারা হয় অতি মন্থর না হয় অতি দ্রুত, অকারণ ত্বরায় চলাফেরা করবে। সবাই একই গলায় কথা বলবে। আলোর পরিচ্ছন্নতাকে এড়াবার চেষ্টা করতে হবে। যতদূর সম্ভব চড়া আলো হবে। অভিনেতাদের পায়ে জুতোর তলায় রবার লাগানো থাকায় তারা নিঃশব্দে পদচারণা করছে, শুধু মরিসের খালি পা। মরিস ইয়ো-ভ্যার নামটির উচ্চারণ করবে 'জিও-ভ্যার'।

পাত্র-পাত্রী

ইয়ো-ভ্যার। বয়স ২২ বছর (পা দুটি শিকল দিয়ে বাঁধা)
মরিস। বয়স ২৭ বছর
ল্যাফ্রঁ। বয়স ২৩ বছর
পাহারাদার। বয়স ২৫ বছর

ইয়ো-ভ্যার। তোরা ক্ষ্যাপা, তোরা দুজনেই ক্ষ্যাপা। আমি এক ঘুঁসিতে তোদের ঠাণ্ডা করে দিতে পারি। (ল্যাফ্রঁকে) আর এক মিনিট দেরি হ'লেই মরিস মরত। হাত সম্বন্ধে সাবধান জুল, ভয় দেখানর খেলা খেলিস না, ঐ নিগ্রোটাকে নিয়ে কোনো আলোচনা করিস না।

ল্যাফ্রঁ। (উত্তেজিত) আমি না ওই.........

ইয়ো-ভ্যার। (ঠাণ্ডা গলায়) না তুই (একটা কাগজ এগিয়ে দেয়). পড়ে যা।

ল্যাফ্রঁ। ও তো চুপ করে থাকতে পারে।

ইয়ো-ভ্যার। জুল তুই আমাদের শান্তি দে। বুল দ্যানেজকে নিয়ে কথা নয়। না সে, না তার ঘরের লোকরা, কেউই আমাদের নিয়ে কথা বলে না। (শোনে) সাক্ষাৎ শুরু হয়েছে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমার পালা।

(সে এর পর থেকে ঘরের মধ্যে অনবরত পায়চারী করতে থাকে, কখনও লম্বা-লম্বি, কখনও আড়াআড়ি।)

মরিস। (ল্যাফ্র'কে দেখিয়া) ও সব সময় গোলমাল করতে চেষ্টা করে, কখনো আমাদের সঙ্গে একমত হবে না। ওর কাছে ব্যুল দ্যনেজ ছাড়া আর সবাই ফালতু।

ল্যাফ্র'। (উত্তেজিত) হ্যাঁ ব্যুল দ্যনেজ। ওই, ওরই একমাত্র অধিকার আছে। ওর কাঁধেও তোদের হাত পেঁছিয় না। ও একটা কাফ্রী, একটা বুনো......

মরিস। কেউই.........(কথাটা শেষ করল না)

ল্যাফ্র'। (একটু চুপ ক'রে থেকে, যেন নিজেকেই বলছে) ও একটা বুনো, কাফ্রী, কিন্তু ও যেন আলো ক'রে দেয়, ইয়ো-ভ্যার.........

মরিস। কি?

ল্যাফ্র'। (ইয়ো-ভ্যারকে) ইয়ো-ভ্যার? ব্যুল দ্যনেজ তোকে গুঁড়ো করে দিতে পারে।

মরিস। সকালে ঘরের ভিতরে ও তার দিকে তাকিয়ে হেসেছে ব'লে তুই আবার শুরু কর্‌লি?

(ইয়ো-ভ্যার ঘুরে দাঁড়ায়, একবার মরিসের একবার ল্যাফ্র'র চোখে চোখ রাখে।)

মরিস। আমরা কেবল তিনজনই ছিলাম। যদি পাহারাদারের দিকে তাকিয়ে না হেসে থাকে, তবে ও আমাদেরই একজনের দিকে তাকিয়ে হেসেছে।

ল্যাফ্র'। কখন?

মরিস। একটু আগে—কোথায় জানিস? ঠিক মাঝখানের ঐ গোল চত্বরটায় যখন পেঁছালাম। আহা, কি মিষ্টি হাসি, পাখির পালকের মতো। এখানকার চারতলা বাড়ি কাফ্রীটার দম আটকে দেয়।

ল্যাফ্র'। তুই তার থেকে কি বুঝলি?

মরিস। ঘরে তুই-ই গোলমালের মূলে।

ল্যাফ্র'। হবে হয়ত। কিন্তু ব্যুল দ্যনেজ একটা মরদ বটে, ওর ফুঁয়ে তোরা উড়ে যাবি। ও মেঘের মতো। ওকে কেউই গুঁড়িয়ে দিতে পারে না, কোন শাস্তি ওকে ঠাণ্ডা করতে পারবে না। ও হ'ল আসল মাস্তান। ও অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিল।

মরিস। কে বলছে যায় নি? ও খাসা ছেলে, কেউ ওকে কিছু বলতে পারবে না। ব্যুল দ্যনেজ হ'ল খুব শান্ত ছেলে। ও, ও হ'ল কালি-মাখান ইয়ো-ভ্যার, অন্ধকারের ইয়া-ভ্যার......

ল্যাফ্র'। ইয়ো-ভ্যার ওর কাছে দাঁড়াতে পারে না। ব্যুল দ্যনেজের ব্যাপার তুই জানিস?

মরিস। আর ইন্সপেক্টারকে ইয়ো-ভ্যারের উত্তর?

ল্যাফ্র'। ব্যুল দ্যনেজ? ও হ'ল অজানা। ওর ঘরের লোকেরাও স্বীকার করে। আশপাশের ঘরের লোকরা, এই জেলের সব লোক, আর ফ্রান্সের সব কটা জেলের কয়েদিরাও এ কথা স্বীকার করে। ও কালো, কিন্তু ও দুহাজার ঘরে আলো দেয়। ওকে কেউ দমাতে পারে না। ও হ'ল এই কারাগারের আসল রাজা, ওর দলের প্রত্যেকটি লোক ওর (ইয়ো-ভ্যারকে দেখায়) চেয়েও ভয়ঙ্কর।

মরিস। ইয়ো-ভ্যার যদি চাইত.........

ল্যাফ্র'। তুই তো দেখিস নি। চেন-বাঁধা অবস্থায় জেলের দালান দিয়ে মাইলের পর মাইল ওর হেঁটে যাওয়া। কিন্তু তার কি ওজন আছে ব'লে মনে হয়? চেনগুলো যেন ওর গয়না। ব্যুল দ্যনেজ রাজা। ও যদি মরুভূমি থেকেও আসে তো সোজা হেঁটেই আসে। ওর কাজ, তার পাশে ইয়ো-ভ্যারের কাজ......

ইয়ো-ভ্যার। (নিষ্পলক চোখে ল্যাফ্র'র দিকে তাকায়) জ্বল যথেষ্ট হয়েছে। আমি নিজেকে রাজা বলে চালাতে চাই না। জেলে সম্রাট নেই, ব্যুল দ্যনেজও আর পাঁচজনের মতোই।

ভাবিস না যে ও আমাকে চেপে দেয়। তার ব্যাপারটা হয়তো একটা ভাঁওতা।

ল্যাফ্র্‌। সাহারা মরুর 'সিরোক্কো'।

মরিস। (ল্যাফ্র্‌কে) ওকে থামাস্ না (দরজায় কান পাতে) সাক্ষাৎপ্রার্থীরা প্রায় এসে গেল, ওরা ৩৮ নম্বর ঘরে।

(ঘরের মধ্যে মরিস ঘড়ির কাঁটার মত চক্রাকারে ঘোরে।)

ইয়ো-ভ্যার। হাওয়া, ফাটল দিয়ে আসা হাওয়া। ওর ব্যাপার আমি কিছুই জানি না।

ল্যাফ্র্‌। মেল ডাকাতি......

ইয়ো-ভ্যার। (শুষ্কভাবে) আমি জানি না, আমি শুধু নিজের ব্যাপারগুলোই জানি।

ল্যাফ্র্‌। তোরগুলো! তোর কাজ তো একটাই।

ইয়ো-ভ্যার। আমি যদি ব'লে থাকি কাজগুলো, তার মানে আমি তাই বলতে চাই। ও নিয়ে বেশী কথা হলে আমার মাথায় রক্ত চড়ে যাবে। আমাকে কেউ যেন না ক্ষ্যাপায়। তোকে আমি একটা কাজই করতে বলছি তা হ'ল আমার চিঠি পড়ে দেবার কাজ।

ল্যাফ্র্‌। আমি তো পড়ে দিয়েছি।

ইয়ো-ভ্যার। আর কি লিখেছে?

ল্যাফ্র্‌। কিছুই নয়, আমি সবটাই পড়েছি।

ইয়ো-ভ্যার। (চিঠির একটা ছত্র দেখায়) ঠিক আছে তুই সবটাই পড়েছিস, কিন্তু এ জায়গাটা পড়িস নি।

ল্যাফ্র্‌। আমার ওপর তোর আস্থা নেই?

ইয়ো-ভ্যার। (নাছোড়বান্দা) কিন্তু এ জায়গাটা?

ল্যাফ্র্‌। এ জায়গায় কি? ওখানে কি আছে? আমায় ব'লে দে।

ইয়ো-ভ্যার। জুল, আমি পড়তে পারি না ব'লে সুযোগ নিচ্ছিস।

ল্যাফ্র্‌। তুই যদি আমায় সন্দেহ করিস তো চিঠিখানা ফেরৎ নিয়ে নে। আশা করিস না যে আর কখনো আমি তোর বউয়ের চিঠি পড়ে দেব।

ইয়ো-ভ্যার। জুল, পিছনে লাগিস না, ভাল হবে না বলছি, ঘরে একটা মজার খেল হবে।

ল্যাফ্র্‌। জ্বালাতন করে মারলি। বলছি তো আমি ঠিক ঠিক সব পড়ে দিয়েছি। কিন্তু আমি জানি আমার ওপর তোর আস্থা নেই, তুই ভাবছিস, আমি হয়ত তোর বউকে নিয়ে তোকে ল্যাং মারছি। মরিসের কথায় কান দিস না। ও আমাদের লড়িয়ে দিতে চায়।

মরিস। (চিবিয়ে চিবিয়ে) আমি ভাই গোবেচারী মানুষ।

ইয়ো-ভ্যার। আমি বলছি, তুই আমায় ঠকাচ্ছিস।

ল্যাফ্র্‌। তা হ'লে নিজে নিজে চিঠি লেখগে যা।

ইয়ো-ভ্যার। শালা হারামী।

মরিস। (মৃদু গলায়, ধীরে ধীরে) ইয়ো-ভ্যার, চেঁচামেচি করিস না। তুই হাসলেই হবে। তোকে বড্ড ভাল দেখতে। ও বাঁধা আছে, যাবে কোথায়?

ইয়ো-ভ্যার। (অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, প্রায় লজ্জিত ভাবে) শালা হারামী—

মরিস। দুঃখ করিস না, ও ঐ রকমই, একটু কেমন যেন, ও তোকে মানে।

ল্যাফ্র্‌। চিঠিতে কি ছিল বলছি। আজ সাক্ষাতের সময় যদি দেখা হয় তবে জিজ্ঞাসা করিস, সত্যি কি না। তুই চাস যে আমি পড়ি (ইয়ো-ভ্যার উত্তর দেয় না, কোনও রকম নড়া-চড়াও করে না) তুই যে লিখিস না তা তোর বউ টের পেয়েছে। এখন ওর সন্দেহ হয়েছে

যে তুই কিছুই লেখাপড়া জানিস না।

মরিস। পয়সা দিয়ে চিঠি লেখাবে কিনা, সেটা ইয়ো-ভ্যার নিজের ব্যাপার।

ল্যাফ্র'। তুই চাস আমি পড়ি? (পড়ে) 'ওগো আমি বেশ বুঝতে পারছি এত সুন্দর সুন্দর কথা তোমার নিজের নয়। এর চেয়ে নিজের হাতে, যেমন পারো তেমনই লিখো।'

ইয়ো-ভ্যার। শালা হারামী!

ল্যাফ্র'। তুই আমাকে দোষ দিচ্ছিস?

ইয়ো-ভ্যার। হ্যাঁ, তাই. ও হয়ত আমাকে ঠকানোর কথা ভাবছে. আর তুই শালা ওকে বুঝিয়েছিস যে আসলে তুই-ই চিঠি লিখছিস।

ল্যাফ্র'। আমাকে যা বলেছিস, আমি তাই লিখেছি।

মরিস। (ল্যাফ্র'কে) তুই যতই জ্ঞানী-গুণী হোস, ইয়ো-ভ্যার এখনই তোকে শেষ করে দিতে পারে। উনি চুপি চুপি কাজ সারেন।

ল্যাফ্র'। বিশেষ করে, মরিস, আমি ওকে নিচু করতে চেষ্টা করিনি।

ইয়ো-ভ্যার। আমি অশিক্ষিত? ও কথা কখনও ভাবিস না। এমনকি তুই যখন বলিস ঐ কাফ্রীটা আমার চেয়েও মস্তান, তখনও না। শালা কাফ্রীদের আমি......(কুৎসিত ভঙ্গি করে) কে তোকে পড়তে আটকাচ্ছিল বল? কারণ তুই আমার বউয়ের কাছে যেতে চাস। তিন দিন বাদে, এখান থেকে বেরিয়েই ওর কাছে যেতে চাস।

ল্যাফ্র'। শোন ইয়ো-ভ্যার, আমি কোন অশান্তি করতে চাইনি একথা তুই বিশ্বাস করছিস না। তোকে ঠিকই বলতাম কিন্তু (মরিসকে দেখিয়ে) ওর সামনে নয়।

মরিস। আমি? বললেই হ'ত। আমি যদি তোদের অসুবিধা করি, তাহ'লে এখনও কুয়াশায় মিলিয়ে যেতে পারি। সবাই জানে আমি তেমনি ছেলে যে দেওয়াল ফুঁড়ে চলে যেতে পারে। না, না, জুল গল্প করিস না, স্বীকার কর যে তুই ওর বউকে চেয়েছিলি, তোকে বিশ্বাস করবো।

ল্যাফ্র'। (উত্তেজিত ভাবে) মরিস, আবার ঝামেলা পাকাতে শুরু করিস না। তোর জন্যই যত গোলমাল। তুই মেয়েরও বাড়া।

মরিস। আমি সব চেয়ে রোগা ব'লে, তোর সব রাগ আমার ওপর মেটাবার ফালতু চেষ্টা করিস না। গত আটদিন ধরে তুই ঝগড়া বাধাচ্ছিস। শুধু শুধু বাজে সময় নষ্ট করছিস। ইয়ো-ভ্যারের সঙ্গে আমার দোস্তি ঠিকই বজায় থাকবে।

ল্যাফ্র'। তোরাই ত আমার বিরুদ্ধে। তোরা আমাকে বাঁচতে দিতে চাস না।

মরিস। একটু আগে তুই যখন আমার কলার ধরেছিলি তখন তুই আমাকে মাটিতে পিষে ফেলার চেষ্টায় ছিলি। আমি মাটিতে মিশে গিয়েছিলাম, ইয়ো-ভ্যার না থাকলে আমার হয়ে যেত। ওর জন্যেই এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। তুই বিদায় হচ্ছিস। আমরা শান্তি পাব।

ল্যাফ্র'। কথা বাড়াস না।

মরিস। দেখছিস? দেখলি জুল, আমার একটা কথা বলারও অধিকার নেই। তুই ইয়ো-ভ্যার আর আমাকে একেবারে ফালতু ক'রে দিতে চাস। তাই না, মঁসিয়ে ল্যাফ্র'?

ল্যাফ্র'। আমার নাম জর্জ।

মরিস। তোকে জুল বলা আমাদের অভ্যাস। না রেগে বললেই হত। আমাদের সব সময়েই ছোট করতে চেষ্টা করিস।

ল্যাফ্র'। যা করা উচিত, তাই করি।

মরিস। কাকে? আমরা কয়েদে আছি, তোর উচিত আমাদের সম্মান করা। কিন্তু তুই যেন আমাদের মারবার তাল করছিস। মনে রাখিস তুই একা।

ল্যাফ্র°। আর তুই? তোর অঙ্গ-ভঙ্গি দিয়ে কি করিস? ওর চারদিকে, জমাদারদের সামনে? ওদের তেলাবার চেষ্টা কর কিন্তু আমার কিছু করতে পারবি না। এক্ষুনি তোকে পিট্টি দিতে পারলাম না, কারণ তোর মুখভঙ্গি। তোকে ইয়ো-ভ্যার বাঁচিয়েছে? আমার দয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি বেরোবার আগেই তুই মরবি।

মরিস। যতক্ষণ খেয়াল না করি ততক্ষণ আমার ওপর মস্তানি ক'রে নে। একটু আগেই আমাকে নিকেশ করতে যাচ্ছিলি, কিন্তু এমন রাতও যায়, যখন তুই আমার গায়ে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিস। যাতে আমার ঠান্ডা না লাগে। অনেক আগেই তা টের পেয়েছি। ইয়ো-ভ্যারও টের পেয়েছে। তোকে অপমান করার একটা সুযোগ ছিল।

ল্যাফ্র°। তুই আমাকে চিনিস না, তাই ভাবছিস আমি তোর জন্য ত্যাগ স্বীকার করব।

মরিস। আমার যেন তার কতই দরকার? তুই আমার সঙ্গে ভালমানুষি করতে চাস? তুই ভাবছিস, তাতে আমি তোকে কম ঘেন্না করব? ভাগ্যিস আর মাত্র তিনটে দিন পরে তুই এখান থেকে বিদায় হচ্ছিস।

ল্যাফ্র°। অত আশা করিস না মরিস। তুই-ই বিদায় হবি। তোর আসার আগে ইয়ো-ভ্যারের সঙ্গে বেশ ভালই দিনগুলো কাটছিল, দুজন পুরুষ মানুষের মধ্যে যেমন চলে, তেমনি। আমি ওর ব্যাপারে নতুন বউয়ের মতো কথা বলতাম না।

মরিস। তুই আমাকে বকাচ্ছিস।

(মরিস কপাল থেকে অবাধ্য এক গোছা চুল সরিয়ে ফেলার ভঙ্গি করে।)

ল্যাফ্র°। (এখনো উত্তেজিত) তোকে আর সহ্য করতে পারছি না। তোকে আর সহ্য হচ্ছে না। তোর মুদ্রাদোষগুলোতেও আমার গা জ্বালা করে। আমি বেরোবার সময় ওগুলো সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে চাই না।

মরিস। অল্পদিন আমি এই জেলে এসেছি বলে, তুই আমাকে সহ্য করতে পারিস না। আমার চুলগুলো নাপিতের ক্লিপে পড়তে দেখলে তুই খুশি হতিস।

ল্যাফ্র°। চুপ কর।

মরিস। আমাকে নাপিতের চেয়ারে আর আমার কোঁকড়া চুলগুলো ঘাড়ে, কাঁধে, কোলে আর মাটিতে পড়তে দেখলে খুশি হতিস। খুব খুশি? আমার রাগে তুই খুশি। আমার দুঃখ তোকে খুশিতে উপচে তোলে।

ল্যাফ্র°। একজনের সঙ্গে গল্পের সময় আর একজনের অঙ্গ-ভঙ্গির খোঁচা খেয়ে, তোদের সঙ্গে থাকা, আমার ঢের হয়েছে। তোদের চোখের পাতা পর্যন্ত আমি চিনি! তোরা আমায় কমজোর ক'রে দিলি। খিদেয় মরা আর বন্ধ দেওয়ালের মধ্যে হাতগুটিয়ে বসে থাকাই যথেষ্ট নয়।

মরিস। তোর রুটির আধখানা আমাকে দিস সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে আমাকে ভেজাতে চাস? আর তোর সুপের অর্ধেক? (একটু চুপ করে থেকে) তা গিলতে আমার কষ্ট হয়। তোর দেওয়া বলেই আমার বিস্বাদ লাগে।

ল্যাফ্র°। আর ইয়ো-ভ্যার সেটা গেলে।

মরিস। তুই কি চাস যে ও না খেয়ে মরে?

ল্যাফ্র°। তোদের ভাগাভাগিতে আমার কিছু আসে যায় না। তোদের সকলকে খাওয়ানোর দিল

আমার আছে।

মরিস। তোর সুপ তুই নিজের কাছে রেখে দিস, শহীদ। আমার অর্ধেকটা ইয়ো-ভ্যারকে দেবার দিল এখনো আমার আছে।

ল্যাফ্‌র্। ওর গায়ের জোরটা বাঁচিয়ে রাখ, ওটা ওর দরকার। কিন্তু আমাকে দলে টানার চেষ্টা করিস না। আমি তোদের থেকে অনেক দূরে।

মরিস। (চিবিয়ে চিবিয়ে) ফাঁসী কাঠের জন্য।

ল্যাফ্‌র্। আবার বল।

মরিস। আবার বলছি, ফাঁসী কাঠের জন্য।

ল্যাফ্‌র্। তুই আমায় ঘাঁটাচ্ছিস? তুই আবার আমায় এক কোণে দাঁড়াতে বলছিস, বাঘের মতো? মরিস, তুই চাস যে আবার শুরু করি?

মরিস। তোর সম্বন্ধে কেউ কিছু বলে নি। প্রথমে তুইই আমাদের কাছে তোর কব্জির দাগের কথা বলেছিস।

ল্যাফ্‌র্। আর পায়ের গোছে? হ্যাঁরে মরিস, কব্জিতে আর পায়ের গোছে? আমার সে অধিকার আছে। আর তোর আছে মুখ বন্ধ করে থাকার অধিকার (চিৎকার কোরে) হ্যাঁ, আমার অধিকার আছে, সে কথা বলার অধিকার আমার আছে। তিনশ বছর ধরে, আমি জাহাজে দাঁড় টানার দাগ বয়ে বেড়াচ্ছি, তোরা আমায় কথা শুনচ্ছিস? আমি সাইক্লোন হয়ে ধ্বংস করতে পারি। ঘরটা সাফ করে দিতে পারি। তোদের কোমলতা আমাকে যন্ত্রণা দেয়। আমাদের দুজনের মধ্যে একজনকে চলে যেতে হবে। তোরা আমাকে শুষে নিচ্ছিস, তুই আর তোর ঐ সুন্দর চেহারার খুনীটা।

মরিস। দেখছিস? তুই এখনও ওকে দোষ দিচ্ছিস। তোর বিশ্বাসঘাতকতা ঢাকবার জন্য ওকে দোষ দিচ্ছিস। কিন্তু সবাই জানে যে তুই ওর বউ চুরি করবার চেষ্টা করছিস। তামাক চুরি করবার জন্য তুই যেমন রাতে উঠিস, তেমনি। অথচ দিনের বেলায় যদি তামাক দেওয়া হয় তো তুই নিস না। চাঁদের আলোয় ওটা গ্যাঁড়ানো অনেক ভাল। অনেক দিন ধরেই ওর বউয়ের ওপর তোর লোভ।

ল্যাফ্‌র্। তুই চাস যে আমি হ্যাঁ বলি, না? তুই খুশি হবি? ইয়ো-ভ্যারের সঙ্গে আমার ছাড়া-ছাড়ি হ'লে তুই আনন্দে নাচবি? হ্যাঁ, ঠিক তাই। হ্যাঁরে মরিস, সোনা তুই ঠিকই বুঝেছিস। অনেক দিন ধরে আমি চেষ্টা করছি যাতে ওর বউ ওকে ত্যাগ করে।

মরিস। হারামী!

ল্যাফ্‌র্। অনেক দিন ধরেই ও আর ওর বউয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার চেষ্টা করছি। ওর বউকে আমি পাত্তাও দি না। ওদের ব্যাপারে আমার বয়ে গেল। আমি শুধু চাই ইয়ো-ভ্যার একেবারে একা হোক। একদম একা। কিন্তু সে এক কঠিন ব্যাপার। ও ওর পায়ের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত আমার সুযোগ ফস্কে গেছে, কিন্তু হার স্বীকার করি নি।

মরিস। তুই কি করতে চাস? কোথায় ওকে নিয়ে যেতে চাস? (ইয়ো-ভ্যারকে) ইয়ো-ভ্যার, শুনেছিস ওর কথা?

ল্যাফ্‌র্। এ ব্যাপারে তোর মাথা গলানোর দরকার নেই। ওটা আমাদের দুজনের ব্যাপার, এমনকি ঘরও পাল্টালেও চেষ্টা করে যাব। যদি জেল ছাড়ি, তাহলেও।

মরিস। ইয়ো-ভ্যার!

ল্যাফ্রঁ। বাকিটাও তোকে বলব: তুই হিংসুটে। আমি যে ওর বউকে চিঠি লিখি তা তুই সহ্য করতে পারিস না। আমার কাজটা ভাল। খাঁটি কাজ : আমি হচ্ছি পোস্ট অফিস। আর তুই রাগে ফুঁসতে থাকিস।

মরিস। (দাঁত চেপে) কথাটা সত্যি নয়।

ল্যাফ্রঁ। (মরিসকে নকল ক'রে) কথাটা সত্যি নয়! তুই তা বুক ঠুকে বলতে পারছিস না। তোর চোখে জল এসে গেছে। আমি যখন টেবিলে বসি, যখন কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে সুরু করি, তুই তখন স্থির থাকতে পারিস না। ঠিক না? তুই ছটফট করিস। তোকে দিয়ে আর কিছুই করান যায় না। যখন লিখি তোর চেহারাটা তখন দেখবার মতো হয়ে ওঠে। যখন লেখার পর পড়ি, তখন তুই নিজের খ্যাঁকখ্যাঁকে হাসিটা শুনতে পাস না। চোখে তোর পলক পড়ে না।

মরিস। তুই যেন নিজের বউকে লিখছিস, এমন ক'রে তুই লিখিস। কাগজের ওপর নিজেকে ঢেলে দিস।

ল্যাফ্রঁ। তাতে তুই জ্বলতে থাকিস। তুই কাঁদকাঁদ হয়ে যাস। আমি তোকে রাগে আর হিংসায় কাঁদাচ্ছি। এখনও শেষ করি নি। একটু অপেক্ষা কর, সাক্ষাৎ করে ও ফিরুক। বউকে দেখে খুশি হয়ে ও ফিরবে।

মরিস। আমি বিশ্বাস করি না।

ল্যাফ্রঁ। তুই ভাবিস ওর বউ অত সহজে ওকে ভুলতে পারবে না। ইয়ো-ভ্যারকে কেউ কখনও ভুলতে পারে না। বউকে ত্যাগ করবার মতো মনের জোর ওর নেই। তুই দেখতে পাস না গেটের গরাদের সঙ্গে ও লেপটে যায়? ওর জীবন আবার শুরু হয়।

মরিস। হারামী!

ল্যাফ্রঁ। এখনও বুঝতে পারিস নি যে তুই একটা ফালতু? কেবল ওই মানুষ। ওকে দেখ, গরাদের সঙ্গে লেপটে গেছে। ও সরে আসছে যাতে ওর বউ ওকে ভাল ক'রে দেখতে পায়। দেখ, ভাল ক'রে দেখ।

মরিস। হিংসুটে। তুই হিংসা করিস। ইয়ো-ভ্যারকে নিয়ে সারা ফ্রান্সে যেমন গুঞ্জন উঠেছিল, তুই চাস যে তোকে নিয়েও তাই হোক। তুই জানিস যখন মড়া খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন কি দারুণ ব্যাপার হয়েছিল? চাষীরা খুঁজছিল। টিকটিকিরা কুকুর নিয়ে খুঁজছিল। লোকে কুয়ো, পুকুর সব ছেঁচে ফেলেছিল। একটা বিপ্লব শুরু হয়েছিল। পাদ্রী, ওঝা সকলেই ব্যস্ত। তারপর যখন মড়াটাকে খুঁজে পাওয়া গেল তখন মাটি এবং সারা পৃথিবী সুগন্ধি হয়ে উঠেছিল। আর ইয়ো-ভ্যারের হাত? জানলার পর্দা সরাবার পক্ষে তাতে বড্ড বেশি রক্ত ছিল।

ইয়ো-ভ্যার। (অবাক হয়ে) রক্ত, মরিস! ভগবানের দিব্যি।

মরিস। কি বললি?

ইয়ো-ভ্যার। রক্ত নয়, ফুল।

(ইয়ো-ভ্যার আক্রমণের ভঙ্গিতে এগোয়।)

মরিস। ফুল কি?

ইয়ো-ভ্যার। দাঁতের ফাঁকে, মাথার চুলে। আর এখন আমাকে সতর্ক করছিস! (মরিসকে চড় মারে)। একটা পুলিশও আমাকে কিছু বলে নি। আমার যে কথাটা ভাবা উচিত ছিল, তা বড্ড দেরিতে ভাবা হয়েছে। তোর কেবল সেখানে গেলেই হ'ত। আমাকে জানাবার

জন্য তোর সেখানে যাওয়া উচিত ছিল, আমি অনুতাপে বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। তোর কর্তব্যপরায়ণ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তুই হয়ত আমার বউয়ের সঙ্গে ব্যস্ত ছিলি।

মরিস। ইয়ো-ভ্যার......

ইয়ো-ভ্যার। সব শালাকে চিনে নিয়েছি। তোরা আমার কেউ নোস। এক মাসের মধ্যেই আমি খাঁড়ার নিচে যাব। যন্ত্রটার একদিকে থাকবে আমার ধড় আর মুণ্ডুটা থাকবে অন্যদিকে। তাই আমি ভয়ঙ্কর। ভয়ঙ্কর। আমি তোকে লোপাট করে দিতে পারি। তোর যদি আমার বউকে পছন্দ হয় তো কুড়িয়ে নে গিয়ে যা। আমি তা জানতাম। অনেক দিন থেকেই তুই আমার চারদিকে ঘুরঘুর করছিস। আমি যে তোকে শেষ করে দিতে পারি সে কথা না ভেবে, তুই আমার সঙ্গে একলা হবার চেষ্টা করিস।

মরিস। (দরজায় কান পেতে) ইয়ো-ভ্যার...এখনও সব ঠিক হয়ে যেতে পারে। তুই যদি ওর সামনে যাস। ঐ শোন। শোন। এখন ৩৪ নম্বরের পালা।

ইয়ো-ভ্যার। ও যদি হাসির ঢঙ পাল্টায় তাহ'লে ঠিকই করবে। আমি ওর মতোই করব। এখানে শুরু আর নদীর ওপারে শেষ করবার জন্য। আমি ওর সামনে গেলে ও নিষ্ঠুর হয়ে আমাকে তা জানাবে। দুমাসের মধ্যেই ও বিধবা হবে তাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। ঠাণ্ডা মাথায় ওর আমাকে ছেড়ে যাওয়া উচিত। ও হয়ত আমার কবরে প্রার্থনা করবে, তার ওপর......(একটু ইতস্তত ক'রো) ফুল দিতে আসবে......

মরিস। (কোমল ভাবে) ইয়ো-ভ্যার!

ইয়ো-ভ্যার। বলছি তো বিধবা! আমার আদরের বিধবা!

মরিস। ইয়ো-ভ্যার......বল বিরাট......

ইয়ো-ভ্যার। আমার বিধবা! আমি মৃত! তোদের হাসাচ্ছি, না? ও আমাকে ঘেন্না করে, আমার প্রিয়া আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে অথচ আমি রাগে পাগল হচ্ছি না। এখন বুঝতে পারছি, আমি একটা অপদার্থ। জুল, তুই আশা করিস, আমাকে কাঁদতে দেখবি? আমি রাগে অজ্ঞান হব? আমি জানি আমার বউকে নিয়ে তোর মাথা ব্যথা নেই।

ল্যাফ্রঁ। ও আসবে। সাক্ষাৎকার এইমাত্র শুরু হয়েছে।

(ল্যাফ্রঁ পেরেকে টাঙানো একটা কোট নিতে যায়।)

মরিস। ওটা তোর না, ওটা ইয়ো-ভ্যারের।

ল্যাফ্রঁ। (কোটটা আবার টাঙিয়ে দিতে দিতে) ঠিকই বলেছিস, আবার ভুল হয়েছিল।

মরিস। ভুল তোর হামেশাই হয়। এই নিয়ে পাঁচ ছ বার তুই ওর কোটটা পরলি।

ল্যাফ্রঁ। তাতে কি এল গেল? ওতে তো কিছুই লুকানো নেই, ওতে পকেটই নেই। (একটু পরে) কিন্তু মরিস বল তো, তুই কি ইয়ো-ভ্যারের জামাকাপড়ের পাহারাদার?

মরিস। সেটা আমার ব্যাপার।

ইয়ো-ভ্যার। ছোট্ট লাবণ্যময়ি, মরুভূমির মধ্যে ও আমায় একা ফেলে চলে যাচ্ছে। তুমি পালাচ্ছ, তুমি উড়ে যাচ্ছ।

মরিস। মাইরি বলছি, ওর সঙ্গে দেখা হলেই আমি ওকে নামিয়ে দেব।

ইয়ো-ভ্যার। বড্ড দেরী হয়ে গেছে, ওকে দেখলেই ইয়ো-ভ্যারকে বলবি। আচ্ছা চলি।

মরিস। কক্ষনো নয়।

ইয়ো-ভ্যার। কক্ষনো নয়, বলিস না। যেসব বন্ধু জ্ঞান দেয়, তাদের আমি বড্ড ভাল করে চিনি। ওকে ছোঁয়াও উচিত নয়, মেয়েটা অভাগী। ওর একটা পুরুষ মানুষের দরকার।

একটা আসল পুরুষ। আমি তো মরে ভূত হয়ে গেছি। আমার কেবল লিখতে জানা উচিত ছিল। সুন্দর সুন্দর কথা শেখা উচিত ছিল। (একটু চুপ ক'রে) কিন্তু আমি নিজেই তো সুন্দর কথা।

মরিস। তা হ'লে তুই ওকে ক্ষমা করেছিস?

ইয়ো-ভ্যার। ও ক্ষমার অযোগ্য, কিন্তু কীই বা আমি করতে পারি।

মরিস। ওকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। ঘরে ভিতু কেউ নেই।

ইয়ো-ভ্যার। তোরা দুজনেই আমাকে হাসালি। তোরা আমার অবস্থাটা বুঝিস না কেন? তোরা কি বুঝিস না যে লোকে এখানে যেসব ঘটনা তৈরি করে তা এই চার দেওয়ালের বাইরে ঘটতে পারে না। জীবনে মানুষ ও সূর্য আর আমি দেখতে পাব না, আর তোরা আমাকে নিয়ে মজা করছিস? তোরা আমাকে সম্মান করিস না। তোরা কি বুঝিস না যে আমার পায়ের সামনে কবর খোঁড়া হয়ে গিয়েছে? আর এক মাসের মধ্যেই বিচারকদের সামনে যাব। এক মাসের মধ্যে ওরা স্থির করবে যে আমার মুণ্ডুটা কেটে ফেলা উচিত। মশায়রা, মাথাটা কাটা হ'লে আমি আর বেঁচে থাকব না। আমি এখন একা। একেবারে একা। নিঃসঙ্গ। আমি আর তাপ ছড়াই না। বরফ হয়ে গেছি।

মরিস। আমি তোর সঙ্গে আছি।

ইয়ো-ভ্যার। বুল দ্যনেজকে গড় করে তোরা ঠিকই করিস। ও হ'ল বিরাট মস্তান। যা, ওর পায়ে পড়, ওর বুনো হবার ভাগ্য আছে। মানুষকে মেরে ফেলা, এমনকি তা খাওয়ার অধিকারও আছে। ও, ও বনে বাস করে। এই হ'ল, আমার চেয়ে ওর যোগ্যতা। ওর পোষা চিতা আছে। আমি বড় নিঃসঙ্গ। ঘরে থেকে থেকে পচে গেছি। বড্ড ফ্যাকাশে, কমজোর হয়ে গেছি। কিন্তু আমায় যদি তোরা আগে দেখতিস, পকেটে হাত, ফুলবাবু, সারাক্ষণ মুখে ফুল। আমায় লোকে বলত......তোরা জানতে চাস? খুব ভাল ডাক নাম—মুখে-ফুল পাওলো! আর এখন? একেবারে একা, আমার বউ আমাকে ত্যাগ করছে......(মরিসকে) আমার বউকে তোর পছন্দ হয়?

মরিস। স্বীকার করছি ও আমার মাথাটা ঘুরিয়ে দেয়। তোর ভেতর দিয়ে ওকে দেখে পাগল হয়ে যাই।

ইয়ো-ভ্যার। আমরা সুন্দর এক জোড়া। মন খারাপ হলো?

মরিস। আমি তা বলছি না। ওর ক্ষমতা তোর মতো নয়, তা আমি বুঝি। ওর কাছ থেকে মুক্তি পাওয়া তোর পক্ষে কষ্টকর। তার জন্যই তোর প্রতিশোধ নেওয়া উচিত। ওর ছবিটা দেখা তো।

ইয়ো-ভ্যার। রোজ সকালে ঘুম ভেঙে ওঠার সময় তুই তো ছবিখানা দেখিস।

মরিস। আর একবার দেখা না?

ইয়ো-ভ্যার। (হঠাৎ একটানে জামা খুলে ফেলে। নগ্ন বুকে ওর স্ত্রীর মুখ উল্কি করা) কেমন দেখতে?

মরিস। সুন্দর! কপাল মন্দ যে আমি ওর মুখে থুতু দিতে পারছি না। আর এখানে কি (ইয়ো-ভ্যারের বুকের একটা জায়গা দেখায়), এখানেও তোর বউ?

ইয়ো-ভ্যার। ছেড়ে দে। ওকে নিয়ে আর কোন কথা নয়।

মরিস। আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ইয়ো-ভ্যার। আমি বলেছি, আর কথা নয়। আমার কি হবে সে ব্যাপারে তুই এর মধ্যেই বেশ

খুশি। হয়ত বা আনন্দই তোদের উত্তেজিত করছে আমার বিরুদ্ধে। একমাত্র তোরাই তাকে দেখতে পাবি সেই আনন্দে তোরা ডগমগ।

মরিস। রাগ করিস না। বন্ধু বলেই ওকে নিয়ে তোর সঙ্গে কথা বলছি।

ইয়ো-ভ্যার। খুব বুঝেছি, এখন ভাগ্।

মরিস। আমার ওপরেও রাগ করবি? আমি তোর বউকে খুন করতে যেতে পারি......

ল্যফ্রঁ। যখন রক্ত বইবে তখন তোর মুখের চেহারাটা খাসা হবে। প্রথমে নিজের গায়ে রক্ত চাই।

মরিস। গোড়ায় আমার মুখের মতো মুখ হ'তে হবে......

ল্যফ্রঁ। তুই যদি তা দেখতে পেতিস। হয়ত বা ইয়ো-ভ্যারের মুখ আর তোর মুখ একই ছাঁচে গড়া হয়েছিল।

মরিস। (অজ্ঞান হবার মতো) ও কথা বলিস না, আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি। তোকে স্বীকার করতেই হবে এই জেলে আমি সবচেয়ে সুপুরুষ। চেহারায় আমার পৌরুষের ছাপ আছে।

ল্যফ্রঁ। আবর্জনা।

মরিস। (অজ্ঞানের মতো, কিন্তু এক্কেবারে নোংরা মেয়েমানুষের ঢঙে) রুপোর পাতে মোড়া এমন মুখ নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করবার অধিকার আমার আছে। নির্দোষ হলেও লোকে আমায় দোষী ভাবে। আমি সুন্দর। আমার মতো মুখই লোকে খবরের কাগজ থেকে কেটে রাখে! মাগীরা দেখে ক্ষেপে উঠবে। রক্ত আর চোখের জল বইবে। সমস্ত খোকারা ছুঁড়ি নিয়ে খেলতে চাইবে। রাস্তায় লোকে নাচবে। খুনীদের ১৪ই জুলাই।

ল্যফ্রঁ। আবর্জনা।

মরিস। রুপোর পাতে মোড়া! তার পর বাকি থাকবে গোলাপ হয়ে যাওয়া। গোলাপ না বেল! বেল না জুঁই। কিন্তু তুই এসব সুন্দর জিনিস হতে পারবি না। তোকে দেখলেই বোঝা যায় তুই এসবের জন্য জন্মাসনি। আমি বলছি না তুই নির্দোষ, এ কথাও বলছি না যে চোর হিসাবে তুই নিচুস্তরের, কিন্তু বড় অপরাধ করা অন্য জিনিস।

ল্যফ্রঁ। তুই তার কি জানিস?

মরিস। আমি সব জানি। সাচ্চা লোকেরা আমাকে পাত্তা দেয়। আমি এখনও নীচুতলার, কিন্তু ওদের বন্ধুত্ব পাই। ওরা তোকে তা কক্ষনও দেবে না, কক্ষনও না। তুই আমাদের জাতের নস। তুই কক্ষনও তা হ'তে পারবি না। এমন কি তুই যদি কাউকে নামিয়েও দিস, তা হলেও নয়।

ল্যফ্রঁ। ইয়ো-ভ্যার তোর মাথা ঘুরিয়ে দেয়, ও তোকে পাগল করে।

মরিস। (আস্তে আস্তে, আরও উত্তেজিত) বাজে কথা, আমি যতটা চাই ততটা সাহায্য আমি হয়ত ওকে করতে পারি না, কিন্তু তুই চাস যে ও তোকে সাহায্য করুক।

ল্যফ্রঁ। কি—?

মরিস। (হঠাৎ ক্ষেপে যায়) কি? তুই শুনতে চাস? যখন ওয়ার্ডার তোর বিছানার ভেতর খুনীদের ছবি পেয়েছিল, তখন তোর মুখের ভাব কেমন হয়েছিল মনে কর। ওগুলো নিয়ে তুই কি করতিস? ওগুলো দিয়ে তোর কি লাভ হ'ত? তোর কাছে সবার ছবি ছিল, সোলাকির, উইডমানের, ভাশের, অ'জ-সোলেইয়ের, বাকিগুলো ভুলে গেছি। সব মনে নেই। তুই ওদের পুজো করতিস? ওদের কাছে প্রার্থনা করতিস? রাতে, বিছানার মধ্যে ছবিগুলোতে তুই চন্দন মাখাতিস।

ইয়ো-ভ্যার। ঝগড়া করিস না। তোরা যদি আমার বউকে নিতে চাস তবে লটারী কর কে নেবে।

ল্যাফ্র‍ ও মরিস। (একই সঙ্গে) কেন? দরকার নেই।

ইয়ো-ভ্যার। লটারী কর। আমি নেতা, লটারীতে ছুরিটা বাছা হবে, কিন্তু ঘাতক আমিই।

ল্যাফ্র‍। ইয়ো-ভ্যার, তুই ঠাট্টা করছিস।

ইয়ো-ভ্যার। দেখে কি তাই মনে হচ্ছে? তোরা কি ভাবছিস? সাবধান, একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। চারদিক ভালো করে দেখে নে। তোরা ঠিক আছিস ত? আমার বউকে নেবার ব্যাপারে তোদের মন স্থির আছে ত? তাড়াতাড়ি করতে হবে। আর খুব তাড়াতাড়ি বাছতে হবে, যাতে এ ব্যাপারে আর কোনও কথা না হয়। যাতে, যাকে পছন্দ করা হবে তার বেরোন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কেউ আর কথা না বলে। তোরা তৈরি? লাঠির একটা ঘা দেওয়া হবে। তোদের একজনের মাথায় লাঠি পড়বে। (সে মুষ্টিবন্ধ হাত মরিসের কাঁধে রাখে) মরিস, তুই হবি? তোকে ক্ষুদে খুনী বানান হবে?

মরিস। আমার ওপর তোর আর রাগ নেই?

ইয়ো-ভ্যার। শোন, এরই মধ্যে বাতাসের অভাবে আমি ভারী বোধ করছি, আমাকে বেশি ঘাঁটাসনি। বুঝিয়ে দিচ্ছি। তোদেরই ভালর জন্য। খেয়াল রাখতে হবে, কারণ এই ধরনের মুহূর্তগুলো সাংঘাতিক। জোর করে বিনয়ী হওয়া এক সাংঘাতিক কাজ। বুঝিস তা? কাজটা বড্ড বেশি কোমল।

মরিস। কোনটা বড্ড বেশি কোমল?

ইয়ো-ভ্যার। (তার গলার স্বর ক্রমশ গম্ভীরতর হয়ে ওঠে) এতেই সর্বনাশটা বোঝা যায়। আমি ডুবেছি। আমার আর কোনও বিপদ নেই, আমি ধীরে ধীরে ডুবছি। যে আমায় ডোবাচ্ছে সে এত অমায়িক আর বিনয়ী যে আমি বিদ্রোহ পর্যন্ত করতে পারছি না। অপরাধের দিন......তুই শুনছিস? অপরাধের দিনটি এমনিই ছিল। তোরা শুনছিস! মশায়রা এতে আপনাদেরই লাভ হবে। আমি বলছি 'অপরাধের দিনটি', আমার তাতে লজ্জা নেই। এই জেলে কে তোদের চেনে, সব কটা তলায় কে আমার পাশে বসতে পারে? কারা আমার মতো কম বয়সী? আমার মতো এত বড় দুর্ভাগা, আমার মতো এত সুন্দর কে? বলছিলাম 'অপরাধের দিনটি'। এই দিন বাড়তে বাড়তে......

ল্যাফ্র‍। (মৃদু গলায়) শ্বাস-প্রশ্বাস।

ইয়ো-ভ্যার। আমার প্রতি সমস্ত কিছুরই কোমলতা আস্তে আস্তে বেড়ে গিয়েছিল। আমি হলপ করে বলছি রাস্তার লোকে আমায় নমস্কার জানাচ্ছিল।

মরিস। ইয়ো-ভ্যার, চুপ কর।

ল্যাফ্র‍। (ইয়ো-ভ্যারকে) না, থামিস না, বলে যা......

মরিস। না চুপ কর। যা বলছিস তা ওকে উত্তেজিত করছে। তাতে ওর লাভ হচ্ছে। (ল্যাফ্র‍কে) তুই অন্যের দুঃখ গিলিস।

ইয়ো-ভ্যার। (বাগাড়ম্বর করছে না একেবারে বোকামী করছে) বুঝিয়ে দিচ্ছি। লোকটা টুপি তুলল, আর তারপর আচ্ছাদনগুলো—

ল্যাফ্র‍। (অবিচলিত ভাবে) ঠিক ক'রে বল।

ইয়ো-ভ্যার।—ঘটতে শুরু করল। আর কিছুই করার ছিল না। ফলে খুনটা করতেই হ'ল। এবার তোদের পালা। তোরা আমার বউকে দখল করতে যাচ্ছিস। কিন্তু সাবধান। আমি

তোদের জন্য সব তৈরি করে দিয়েছি। এখন তোদের সুযোগ দিচ্ছি। আমার শেষ হয়ে গেছে। আমি বাঁশের চোঙা আর তালগাছের দেশে চলে যাচ্ছি। নূতন জীবন শুরু করা সহজ, তোরা দেখবি। যে মুহূর্তে মেয়েটিকে খুন করেছি তখনই এ কথাটা মনে হয়েছিল। বিপদটা বুঝতে পেরেছি। তোরা বুঝতে পারছিস? আর একজনের সাজে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার বিপদ? আমার ভয় করছিল। আমি পিছিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু থামা অসম্ভব। পিছিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলাম। ডাইনে বাঁয়ে ছোটাছুটি করলাম। খুনী না হবার জন্য সব রকম চেষ্টা করলাম। কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, বাঘ, টেবিল, পাথর সব কিছু হতে চেষ্টা করেছি। এমন কি একটা গোলাপ হতেও চেষ্টা করেছি। হাসিস না। যা কিছু করা সম্ভব ছিল সবই করেছি। যন্ত্রণায় আমি ছটফট করেছি। লোকে বলত আমি কাতরাচ্ছি। আমি অতীতে ফিরতে চাইতাম, কর্মময় জীবনে, সহজ জীবন আবার শুরু করতে চাইতাম। খোলা হাওয়ায় বেরোতে চাইতাম, আমার দেহ পারত না। বারবার চেষ্টা করেছি, অসম্ভব। আমাকে নিয়ে লোকে হাসাহাসি করত। সেই দিনটি পর্যন্ত লোকে বিপদের আশঙ্কা করে নি। আমার নাচ। আমার নাচ ছিল দেখবার মতো। বুঝলে বাবুরা—আমি নেচেছি, আমি নেচেছি।

(এখানে ইয়ো-ভ্যার এমনভাবে নাচে যাতে মনে হয় সে অতীতে ফিরে যেতে চাইছে। কথা বলছে না, ছটফট করছে। একাই ঘুরে ঘুরে নাচতে চেষ্টা করে। মুখে অসীম যন্ত্রণার ছাপ। মরিস ও ল্যাফ্র‍্ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে।)

ইয়ো-ভ্যার। (নাচতে নাচতে) আমি নেচেছি, মরিস আমার সঙ্গে নাচ। (মরিসের কোমর ধ'রে দু'এক পদক্ষেপ নাচে, কিন্তু তক্ষুনি তাকে সরিয়ে দেয়) ভাগ। কাঁধ হেলিয়ে, তুই যেন বড়লোকদের বল-এ নাচছিস। আমি নেচেছি। তার পর লোকে খুঁজেছে। আমাকে সন্দেহ করেছিল। পর পর সব হ'ল। আমি এমন ব্যবহার করেছি যাতে সবচেয়ে নিশ্চিন্তে ফাঁসীতে পেঁছন যায়। এখন আমি শান্ত। আমার কাজ হ'ল তোদের জন্য ব্যবস্থা করা। এখন তোরা লটারী করবি। (ল্যাফ্র‍্কে) তোর ভয় করছে?

ল্যাফ্র‍্। আমাকে বাদ দে।

ইয়ো-ভ্যার। অভ্যাস হয়ে যাবে। ব্যাপারটার মধ্যে ডুবে যেতে হবে। গোড়ায় আমারও ভয় করত। এখন ভালোই লাগে। আমাকে তোদের ভাল লাগে না?

ল্যাফ্র‍্। আমাকে বাদ দে।

মরিস। তুই ওকে বিপদে ফেলেছিস, ও একটা বেত গাছ।

ইয়ো-ভ্যার। নিজেদের মুক্ত করে দে। নিজেকে মুক্ত করে দে জুল। সাহায্য করবার জন্য সব সময়েই কাউকে না কাউকে পাবি। আমি যদি না থাকি, তাহ'লে বুল দ্যানেজ।

ল্যাফ্র‍্। আমাকে ছেড়ে দে।

ইয়ো-ভ্যার। তুই পালাচ্ছিস। তোর চালচলন মরিসের মতো সুন্দর নয়। কিন্তু তুই হলেই বোধহয় আমার ভাল লাগত।

মরিস। (ব্যঙ্গভরা স্বরে) খুনী!

ইয়ো-ভ্যার। লটারী। লটারী করতে হবে।

মরিস। কিন্তু...কি করে...কি দিয়ে...তুই এতে জড়াস?

ইয়ো-ভ্যার। সে কথা বাদ দে। আমার হাত দুটোই নিয়তি। ঠিক বিচার করলে গলার বদলে ও দুটোকেই কাটা উচিত। আমার কাছে সমস্তই খুব সোজা হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটি

আমার শরীরের তলাতেই ছিল। কেবল আলতো করে একটা হাত মুখে আর একটা হাত গলায় দিতে হয়েছিল, ব্যাস। মুহূর্তেই হয়ে গেল। কিন্তু তুই...

মরিস। আমায় উপদেশ দে।

ল্যাফ্র'। আবর্জনা।

মরিস। রূপোরে পাতে মোড়া। (ইয়ো-ভ্যারকে) একেবারে ঠিকঠাক উপদেশ দে। তারপরে কি করলি?

ইয়ো-ভ্যার। সে সব তোকে ত বলেছি। সব কিছুই কেমন যেন অস্বাভাবিকভাবে ঘটেছিল। গোড়ায় মেয়েটিকে ঘরে নিয়ে এলাম। ওকে কেউই আমার ঘরে ঢুকতে দেখেনি। ও আমার ফুলগুলি চেয়েছিল।

মরিস। কি?

ইয়ো-ভ্যার। আমার মুখে একগুচ্ছ ফুল ছিল। মেয়েটি আমার পিছন পিছন আসছিল। ওর মুখ জ্বলজ্বল করছিল...আমি সবই তোদের বলেছি, কিন্তু তাতে তোদের কি লাভ হবে? তারপর...তারপর, লাগছিল বলে ও চ্যাঁচাতে গিয়েছিল, আমি ওর নাকমুখ চেপে ধরেছিলাম। ভেবেছিলাম মরে যাওয়ার পর আমি ওকে বাঁচিয়ে দিতে পারব।

মরিস। তারপর?

ইয়ো-ভ্যার। তারপর? এইখানে দরজাটা ছিল (ডানদিকের দেওয়ালে হাত রেখে দেখায়) লাসটা বার করা অসম্ভব ছিল। যথেষ্ট জায়গা ছিল না। দেহটা বড় নরম ছিল। বাইরের দিকটা দেখবার জন্য জানালার ধারে গেলাম। বেরোতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল রাস্তাটাও আমার ওপরে নজর রাখছে। মনে হচ্ছিল, আমাকে জানালার ধারে দেখতে পাবার জন্য লোকে অপেক্ষা করছিল। পর্দাটা একটু সরালাম...(মরিস নড়ে উঠল) কি?

মরিস। ফুলগুলো তুই ওর চুলে গুঁজে দিয়েছিলি?

ইয়ো-ভ্যার। (বেদনাকাতর) তুই আমাকে এখন সাবধান করছিস?

মরিস। ইয়ো-ভ্যার, আমি জানতাম না। আমি তোকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। আমার সেখানে থাকা উচিত ছিল, তোকে সাহায্য করা উচিত ছিল......

ইয়ো-ভ্যার। চুপ কর, ভুলে যাচ্ছিস প্রথম দিন থেকেই তুই ওর প্রেমে পড়েছিলি, সকালে, যখন তুই আমাকে খালি গায়ে স্নান করতে দেখেছিস, তার পর থেকেই। আমরা যখন ফিরে এলাম তখনই বুঝেছি। যতকিছু দোস্তি আমাকে দেখাচ্ছিলি, আসলে তা ওরই প্রতি। আমি ভুল করি না। তুই যখন আমার দেহ দেখতে চেয়েছিলি তখন আসলে আমার দেহে ওর দেহটা জোড়া লাগলে কেমন দেখাবে সেটা জানাই তোর মতলব ছিল। লেখা-পড়া জানি না ব'লে তুই আমায় গাধা ভাবিস! কিন্তু আমার চোখ আছে! (মরিস মারখাওয়া বাচ্চা ছেলের মতো মুখ করে) বল, আমি ত জানোয়ার নই! আমি বাজে বকছি? আমাকে সান্ত্বনা দিতে হবে না। আমার মাথাটা দড়িতে ঝুলছে। তুই আমাকে হারিয়েছিস। তুই ঈশ্বরের সঙ্গে মিতালি করেছিস। তার চুলে ছোট্ট একগুচ্ছ ফুল ছিল। সাবধান করবার জন্য কেউ ছিল না। আর এখন? আমার কি করা উচিত? (ল্যাফ্র'র দিকে তাকায়) অ্যাঁ, কি করা উচিত?

মরিস। (ইয়ো-ভ্যারকে) ওকে আর কিচ্ছু জিজ্ঞাসা করিস না। দেখছিস না ও কেমন মুখ করেছে? ও তোকে গিলছে।

ইয়ো-ভ্যার। বল, আমি কি করব?

মরিস। আরে ওর মুখটা দেখ না। কী ভীষণ খুশি। তুই যা বলেছিস সমস্তই ওর ভেতরে গেঁথে যাচ্ছে। তুই এখন ওর ভেতরে। তুই জানিস না কেমন করে বেরোবি। ছেড়ে দে।

ল্যাফ্র'। আমি তোকে বিরক্ত করছি।

মরিস। তুই ওকে ছোট করে দেবার চেষ্টা করছিস।

ইয়ো-ভ্যার। (দুঃখিত ভাবে) শোন, এটা বড়ই দুঃখের। আমি চাই, আমার বলতে লজ্জা নেই, আমি চাই, আমি চাই, আমি চাই...নিজেকে নিজের হাতে পিষে মারতে!

মরিস। একটু ঠাণ্ডা হ'।

ইয়ো-ভ্যার। (এখনও দুঃখিত) আর তোরা এখন আমাকে দুর্ভাগা বলে মনে করছিস, ইয়ো-ভ্যার পুরোপুরি চুপসে গেছে। তোরা কাছ থেকে দেখতে পারিস, আমার দেহ কাঁপছে। ছুঁয়ে দেখ, তোরা ছুঁতে পারিস। (হঠাৎ উত্তেজিত) কিন্তু তা করতে সাহস করিস না। লাফিয়ে উঠে তোদের পিষে মারবার জন্য কোন কারণের প্রয়োজন হবে না। যাই হোক তোরা সাবধান হোস। পুলিশ আমাকে যতটা না চিনতে পেরেছে তার চেয়ে তোরা অনেক বেশি চিনলি, তোরা আমার আসলকে স্পষ্ট হতে দেখলি, কোনও দিনই হয়ত তোদের ক্ষমা করতে পারব না। আমাকে উন্মুক্ত করে দেখার দুঃসাহস তোদের হয়েছিল, কিন্তু ভাবিস না আমি এইরকম টুকরোই থাকব। ইতিমধ্যেই ইয়ো-ভ্যার নিজেকে সামলে নিতে শুরু করেছে। আমি নিজেকে নতুন করে গড়ছি। নিজেকে জুড়ে নিচ্ছি। আমি জেলের চেয়েও কঠিন ও ভারি। আমিই এই জেল। আমার ঘরগুলোতে গুণ্ডা, বদমাস, সৈন্য, চোর এদের সবাইকে রাখি! সাবধান, আমি জানি না, ওদের ছেড়ে দিলে, দারোয়ান আর কুকুরগুলো পর্যন্ত তাদের আটকাতে পারবে কিনা। দড়ি, ছুরি, মই, সমস্তই আমার আছে, সাবধান হ! গোল পথে আমার প্রহরী আছে। সর্বত্র চর আছে। আমিই এই জেল, এ পৃথিবীতে আমি একা।

মরিস। ইয়ো-ভ্যার!

ইয়ো-ভ্যার। আমি আমার ফাঁসী কাঠ গুছিয়ে নিচ্ছি। খিল খুলছি, খোকারা সাবধান (দরজার খিল খুলল, কিন্তু কাউকে দেখা গেল না) আমি? না? সে এসেছে (দ্বিধা-গ্রস্ত) সে এসেছে? ঠিক আছে, বলে দে চলে যেতে।

(পাহারাদার ঢোকে।)

পাহারাদার। তাড়াতাড়ি কর, তোর বউ সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছে।

ইয়ো-ভ্যার। আমি যাব না।

পাহারাদার। (শান্তভাবে) কেন?

ইয়ো-ভ্যার। বলছি যাব না, ওকে বল গিয়ে, ও যেন এখান থেকে চলে যায়।

পাহারাদার। ঠিক তো?

ইয়ো-ভ্যার। কারণ সে মহিলাটি মৃত।

পাহারাদার। সেটা তোর ব্যাপার। আমি আমার কাজে চললাম। এখানে সব ঠিক তো?

ল্যাফ্র'। সবই ঠিক আছে, তা দেখতেই তো পাচ্ছেন।

পাহারাদার। হুঁ, তাই বটে। (অগোছাল বিছানাটি দেখায়) তোমরা উত্তর দেবে না? জিজ্ঞাসা করছি বিছানাটা অগোছাল কেন?

(অনেকক্ষণ নীরবতা)

ইয়ো-ভ্যার। (মরিস ও ল্যাফ্র‌্'কে) ওহে তোমরা বাকিরা? তোমরা কি কিছুই জান না? ওকে বল যে তোমরাই করেছ, সোজা হওয়া উচিত, তাহলেই ও আর গণ্ডগোল করবে না।

ল্যাফ্র‌্'। তোর চেয়ে বেশি আমরা কেউই জানি না।

পাহারাদার। তাতে আমার আশ্চর্যই লাগত। সোজা কথা তোমাদের দম বন্ধ ক'রে দেয়। (ল্যাফ্র‌্'কে) কবে ছাড়া পাচ্ছ?

ল্যাফ্র‌্'। পরশু।

পাহারাদার। বাঁচা যাবে।

ল্যাফ্র‌্'। (খোঁচা দেয়) আমি আপনাকে বিরক্ত করি? সে কথা কাল আপনার বলা উচিত ছিল। আজ সকালেই চলে যেতাম।

পাহারাদার। তুই আমার সঙ্গে কথা বলার ঢঙ পাল্টা, নয় তো অন্ধকূপে ভরে দেব।

ল্যাফ্র‌্'। আপনাকে আমি কিছুই বলতে চাই না। মশায়কে কিছুই বলতে চাই না। (ইয়ো-ভ্যারকে ইঙ্গিত করে) আপনাকে কেউই প্রশ্ন করছে না।

পাহারাদার। আঃ এত চ্যাঁচাস না (সে ইয়ো-ভ্যার ও মরিসের দিকে ফেরে) দেখছ! ভাল হতে চাইলে, এই সব লোকের সঙ্গে তা' হওয়া অসম্ভব। তোমাকে অমানুষ করে ছাড়বে। লোকে বলে পাহারাদারেরা জানোয়ার (ল্যাফ্র‌্'কে) তুমি যদি একটু কম গবেট হতে তা হ'লেই বুঝতে যে আমি আমার কাজটুকুই করি; কেউ বলতে পারবে না যে আমি তোমাদের তল্লাসী করি, আমি তোমাদের চেয়েও বেশি বন্দী।

ল্যাফ্র‌্'। প্রমাণের প্রয়োজন।

পাহারাদার। প্রমাণ হ'য়ে গেছে। পাহারাদার হতে হলে কত কি দেখতে,, কত কি সহ্য করতে হয় তা তোমরা জান না। তুমি জান না যে বদমাইসের ঠিক বিপরীত হতে হয়। ভেবেই বলছি : ঠিক বিপরীত হ'তে হয়। বলছি না আমরা তাদের শত্রু। ভেবে দেখ। (পকেট থেকে দুটো সিগারেট বার ক'রে ইয়ো-ভ্যারকে দিয়ে বলে) তোর দোস্ত বুল দ্যনেজ তোকে দুটো সিগারেট পাঠিয়েছে।

ইয়ো-ভ্যার। ঠিক আছে।

(সে নিজে একটা সিগারেট নেয়, অন্যটা মরিসকে বাড়িয়ে দেয়)

মরিস। দরকার নেই।

ইয়ো-ভ্যার। তুই নিবি না?

পাহারাদার। ও ঠিকই করেছে। বাচ্চাদের সিগারেট খাওয়া উচিত নয়। কাফ্রী তোকে বলতে বলেছে যে তোর চিন্তা করা উচিত নয়। ও তোর আসল দোস্ত (চাপা নিস্তব্ধতা) আচ্ছা, তোর বউ?

ইয়ো-ভ্যার। তোকে ত বলেছি, শেষ হয়ে গেছে।

পাহারাদার। অথচ ওকে দেখে তো মনে হচ্ছিল সে তোর বেড়াল-চোখ দেখতে চায়। এই তো এক্ষুনি দেখলাম, মেয়েটাকে খাসা দেখতে। বেশ আঁট-সাঁট গড়ন।

ইয়ো-ভ্যার। (হেসে) এখান থেকে বেরোনর পর তুই ওর সঙ্গে দেখা করতে চাস না?

পাহারাদার। (হেসে) তোর তাতে খারাপ লাগবে?

ইয়ো-ভ্যার। মোটেই না, যদি তোর ওকে পছন্দ হয় তা হলে লড়ে যা।

পাহারাদার। চেষ্টা করতে আপত্তি কি?

ইয়ো-ভ্যার। করবি না কেন? আমি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। জীবন আমাকে ক্লান্ত করে।

পাহারাদার। (বোকা বোকা মুখ ক'রে হেসে) তাহ'লে সত্যি? তুই ওকে আমার হাতে তুলে দিচ্ছিস।

ইয়ো-ভ্যার। লেগে পড়।

(তারা হাত মেলায়)

পাহারাদার। এখন বুঝতে পারছি। ও যখন গরাদের পেছন থেকে তোকে ভাল করে দেখছিল তখন ও তোকে শেষবার দেখে নিচ্ছিল।

ইয়ো-ভ্যার। ঠিকই বলেছিস, গত বৃহস্পতিবার ও আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। চিরকালের মতো বিদায়। ছলছল চোখে ও বিদায় নিচ্ছিল।

পাহারাদার। কি মনে হয়, ও বদলাতে রাজী হবে?

ইয়ো-ভ্যার। ওকে তুই আমার কথা বলবি। তুই আমার জায়গাটা নিবি। আমার মাথাটা কাটা হয়ে গেলে আমি চাই যে তুইই আমার জায়গাটা নিবি।

পাহারাদার। ঠিক আছে তোর ভার নিলাম। খাবারের দরকার হলেই বলিস। তুই যা চাইবি তাই পাবি। (ল্যাফ্র'কে) তুমি এখনও জান না সাহস কাকে বলে। জানতে হলে (ইয়ো-ভ্যারকে দেখিয়ে) ওর অবস্থায় পড়তে হবে।

ল্যাফ্র'। যদিও ও চেয়েছিল সব কিছু মরিস আর আমার ভাগে পড়ে। আর আমরা অন্ধকূপে যাই। কারণটা স্বাভাবিক, ও পুরুষের মতো পুরুষ।

ইয়ো-ভ্যার। তুই এত অল্পে চটে যাস?

ল্যাফ্র'। তোর কাছে এটা খুবই অল্প, (মরিসকে) দেখলি ও আমাদের দোষী করে—

মরিস। ইয়ো-ভ্যার? ও তো কাউকেই দোষ দেয়নি। ও কেবল জিজ্ঞাসা করেছে, বিছানাটা অগোছাল ছিল কেন।

ল্যাফ্র'। আমি ঘাড় পেতে সব মেনে নিয়েছি।

ইয়ো-ভ্যার। আঃ! আমাকে বলতে দে। ওকে আমি কি বলেছি? সত্যি কথা। আমি তা ওর সামনেই বলেছি, কারণ ও ভদ্র। ওর কাছ থেকে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।

ল্যাফ্র'। পাহারাদার, পাহারাদারই থাকে।

(ইয়ো-ভ্যার যে কোটটা খাটের উপর ছুঁড়ে ফেলল, ল্যাফ্র' সেটা পরে)

ইয়ো-ভ্যার। ওর কথা আলাদা।

ল্যাফ্র'। নিশ্চই, তোর জন্যই আমাদের ঘরটার প্রতি ওর পক্ষপাতিত্ব। পুরুষ-সিংহটির জন্য। উল্কি পরা পুরুষটির জন্য।

ইয়ো-ভ্যার। তুই তাই হ'তে চাস, পুরুষসিংহ। সে জানে যে সে পুরুষ, তাই যথেষ্ট।

ল্যাফ্র'। (মরিসকে) ওর কথা শুনছিস।

মরিস। (শুষ্কভাবে) ও ঠিকই বলেছে।

ল্যাফ্র'। ও যাই বলুক তাই তুই মেনে নিস। ওর বদলে তোর মাথা কাটাও তুই মেনে নিস। এটাই স্বাভাবিক; ও ইয়ো-ভ্যার।

মরিস। এটা আমার ব্যাপার।

ল্যাফ্র'। শুধু শুধু ঠকিস না, ওর আসল বন্ধুরা থাকে ওপর তলায়। এক্ষুনি ওকে ডাকবার কোন দরকার ছিল না। ওপর থেকে ইয়ো-ভ্যারের কাছে হুকুম আসে। কোথা থেকে ওকে সিগারেট পাঠান হয়? ওপাড়া থেকে! ভাল পোশাক পরা এক অতি অমায়িক এবং সজ্জন পাহারাদার নিয়ে আসেন প্রাণের বার্তা। তুই বুল দ্যনেজের হাসির কথা

বলছিলি না? ভেবেছিলি যে আমাকে দেখে কয়েদিরা দুদলে ভাগ হয়ে লড়ে মরছে। আর দুই রাজা আমাদের মাথার ওপর দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন—আমাদের পেছনে—এমনকি সামনেও বউ ভেট দিচ্ছেন।

ইয়ো-ভ্যার। জুল, কথা বাড়াস নি। আমার বউ যাকে ইচ্ছা তাকে দেব।

ল্যাফ্র°। যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার তোর আছে, তুই পুরুষ-সিংহ। মুখের কথায় ঘরের মধ্যে আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে উনি ঘোরাতে পারেন।

পাহারাদার। তোমাদের ঝামেলা, তোমরা মেটাও। আমি ব্যুল দ্যনেজের কাছে চললাম। ও সারাদিন গান গায়...সেলাম।

(পাহারাদার চলে যায়)

ইয়ো-ভ্যার। হ্যাঁ মশায় হ্যাঁ! ইচ্ছে হ'লে তোমাদের আমি কলুর বলদের মতো পাক খাওয়াতে পারি। ছুঁড়িগুলোকে যেমন নাচাতাম, তেমনি। এতে সন্দেহ আছে? আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। এখানে আমিই পুরুষ, আজ্ঞে হ্যাঁ তাই। দালানে বেড়াতে পারি, উঠোনের চত্বর আর মহল পার হতে পারি, লোকে আমাকেই ভয় করে, ভক্তি করে করে। হয়ত ব্যুল দ্যনেজের চেয়ে আমি কমজোর কারণ ওর অপরাধটা আমার চেয়ে আরো একটু বেশি। কারণ ও চুরি এবং লুট করবার জন্য খুন করেছে, কিন্তু ওর মতো আমিও বাঁচার জন্যই খুন করেছি, সেই জন্য এই নমস্কার। আমি ওর অপরাধ বুঝি আর আমার সবার সামনে একা থাকার সাহস আছে।

ল্যাফ্র°। মাতামাতি করিস না, আমিও সব বুঝি। তোর সব কিছুই মানি আমি। তোর বউয়ের কাছে চিঠিগুলো আকর্ষণীয় করবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম। তুই আমার ওপর রাগ করতে পারিস, আমি তোর জায়গাটা নিতে যাচ্ছিলাম।

ইয়ো-ভ্যার। আমি তোর ওপর রাগ করিনি। আমার বয়ে গেল। চিঠিগুলো বড্ড বেশি ভাল হ'ত। তুই হয়ত ভাবতিস নিজের বউকে লিখছিস—

ল্যাফ্র°। ঠিক উল্টো। চিঠিগুলো অত ভাল লিখতাম কারণ নিজেকে একেবারে তোর জায়গায় নিয়ে যেতাম। আমি তোর চামড়াটা পরতাম।

ইয়ো-ভ্যার। কিন্তু আমার চামড়া পরতে হ'লে আমার মতো হ'তে হবে। আমার মতো হ'তে হ'লে আমার মতো কাজ করতে হবে। অস্বীকার করিস না যে তুইও পাহারাদারের সঙ্গে তুই-তোকারী করতে চাস। তুই চাস কিন্তু তোর ক্ষমতা নেই। সাহস কাকে ব'লে তা হয়ত তুই একদিন জানবি। কিন্তু তার দাম দিতে হবে।

ল্যাফ্র°। তোর বউয়ের কাছ থেকে তোকে আলাদা করতে চেয়েছিলাম, তার জন্য চেষ্টাও করেছি। তোকে পৃথিবী থেকেও আলাদা করে দিতে চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি পৃথিবী থেকে এই কয়েদঘরকে, এমনকি এই জেলখানাকে আলাদা করে দিতে। মনে হয় তা পেরেছি। সারা পৃথিবীকে জানাতে চেয়েছিলাম যে নিজেদের মধ্যে আমরা এখানে শান্তিতে আছি। চাইতাম, যেন এতটুকু বাইরের হাওয়া এখানে না আসে। তার জন্য আমি খেটে খাচ্ছি সবচেয়ে বেশি। চেয়েছিলাম আমরা সবাই যেন ভাই ভাই। তারই জন্য ভাই পাতিয়েছিলাম। মনে আছে? আমি জেলের হয়ে কাজ করেছি।

ইয়ো-ভ্যার। জেল আমার, আমিই তার রাজা।

মরিস। (তিক্ত) আর তুই দিস।

ইয়ো-ভ্যার। কি বললি?

মরিস। কিছু না।

ইয়ো-ভ্যার। আমি কি? আর তার পর? আমাকে সরল হতে বলা তোরা উচিত বলে মনে করিস না, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো একজনের কাছ থেকে এটা দাবি করা অমানুষিক হবে। আমি যা করেছি তারপর সহজ হতে বলার কি অর্থ? শূন্যে ঝাঁপ দেবার পর, অপরাধের ভেতর দিয়ে এত পরিষ্কার ভাবে মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর, তোরা এখনও কি ক'রে আশা করিস যে আমি তোদের নীতি মানব? আমি তোদের চেয়ে জোয়ান, আমার সব কিছুতেই অধিকার আছে।

ল্যাফ্র'। আমি তোকে বুঝি। আর এও বুঝি যে ও যাকে শঠতা বলে, তার জন্যই তোকে আমার ভাল লাগে। নিচেই নেমে চল।

মরিস। ইয়ো-ভ্যার!

ইয়ো-ভ্যার। তোর বকুনি শোনার জন্য তৈরি।

মরিস। আমি তো কিছু বলি নি।

ইয়ো-ভ্যার। তা হ'লে?

মরিস। কিছু না, মনে হয় তুই ঠকিয়েছিস। এখন বুঝছি তুই চিরকালই ঠকাচ্ছিস। আমার একথা বলার অধিকার আছে। তুই বুল দ্যনেজের বন্ধু ছিলি জেনে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। একথা তুই আমাদের কখনো বলিস নি।

ইয়ো-ভ্যার। আমার যদি ঠকাতে ভাল লাগে, তোরা কে রে, তুই আর জুল? দুটো ফালতু চোর। আমাকে বিচার করবার অধিকার তোদের নেই। জেলে বন্ধু খোঁজার অধিকার আমার আছে। বুল দ্যনেজ আমার সঙ্গে যাবে। ও আমায় সাহস যোগায়। যদি বেঁচে যাই, তাহলে একসঙ্গে কাইয়েনে দ্বীপান্তরে যাব, আর যদি খাঁড়ার নিচে যাই, ও আমার পেছনে পেছনে আসবে। কিন্তু তোদের কাছে আমি কী? তোরা ভাবিস যেন আমি কিছু বুঝি না? এখানে, এই ঘরের সব ভার আমাকে বইতে হয়। কিসের ভার তা আমি বলতে পারব না, আমি লেখাপড়া জানি না, কিন্তু জানি যে কোমরে আমার জোর দরকার, যেমন বুল দ্যনেজ একাই ভার বয়। সারা জেলের জন্য হয়ত সর্দারের সর্দার আছে যে সারা পৃথিবীর জন্য এর ভার বয়! তোরা আমাকে ঠাট্টা করতে পারিস, কিন্তু আমার অধিকার আছে, আমি পুরুষ।

মরিস। আমার কাছে তুই চিরকালই ইয়ো-ভ্যার। একটা ভয়ঙ্কর লোক। কিন্তু তুই তোর জোর হারিয়েছিস, তোর সুন্দর অপরাধীর জোর। যতটা না ভাবিস তার চেয়েও বেশি, তুই তোর বউয়ের—

ইয়ো-ভ্যার। না।

মরিস। যখন ১০৮ নম্বর ঘরে থাকতাম, তখন তোর দরজার সামনে দিয়ে যাবার সময় ফোকর দিয়ে বেরোনো থালা-ধরা তোর হাতখানাই কেবল দেখতে পেতাম। তোর আঙুলে বিয়ের সোনার আংটি দেখতাম। তোর আংটি দেখে ভাবতাম তুই আসল মরদ, কিন্তু মনে হতো আসলে তোর বউ নেই। এখন জানি তোর বউ আছে। আমি তোর সব দোষ ক্ষমা করছি কারণ একটু আগেই তোকে গলে যেতে দেখেছি—

ইয়ো-ভ্যার। আমায় হাসালি, চেপে যা, জুলের সঙ্গে কথা বল।

মরিস। এটাও আমার বড় লাগছে : আমি যদি তোর সঙ্গে না থাকি তা হ'লে ওর সঙ্গে থাকতে আমি বাধ্য (ল্যাফ্র'র দিকে তাকিয়ে) আমি তোকে ঘৃণা করি। তোকে আমার

সন্দেহ করা উচিত। তুই রাতে উঠে আমার গলা টিপে দিতে পারিস।

ল্যাফ্রঁ। রাতের দরকার নেই।

মরিস। আমি তোকে ঘৃণা করি। তুইই ইয়ো-ভ্যারকে উপরে উঠিয়েছিস। তুইই, আমাদের বন্ধুত্ব ভেঙেছিস। তুই ওকে হিংসা করতিস। তুই ক্ষেপে যাস কারণ তুই ওর মতো কিছু করিস নি। তুই ওর সঙ্গে সমান হতে চাস।

ল্যাফ্রঁ। হায়রে আমার ছিঁচকে চোর; ওর সঙ্গে সমান হবার জন্য কোন কাজটা তুই করবি না?

মরিস। মিথ্যে কথা। আমি ওকে সাহায্য করব। এখনও সাহায্য করব। আমি ভিতু কিন্তু ল্যাফ্রঁ, সাবধান, আমি ওকে রক্ষা করব—

ল্যাফ্রঁ। তুই ওর অপরাধের কথা শুনেছিস? খুনীকে কাঁদতে পর্যন্ত দেখেছিস।

মরিস। জ্বল তোর অধিকার নেই! শুনছিস? তোর হাসার অধিকার নেই! যখন থেকে ওকে এই অবস্থায় দেখছি তার পর থেকে ওর প্রতি শুধু বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছু নেই। এখন দয়া আছে, পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দর খুনীর প্রতি দয়া। যখন এত বড় স্তম্ভ ভেঙ্গে পড়ছে, তখন তার প্রতি দয়া হওয়াও সুন্দর। কেবল আমার জন্য ওকে এতটা ভেঙ্গে পড়তে দেখে আমার দয়া হচ্ছে অথচ তোর—

ল্যাফ্রঁ। আমার?

মরিস। শোনার জন্য ছটফট করছিস?

ল্যাফ্রঁ। আচ্ছা, এটাও, আমার করবার ইচ্ছে ছিল। আমি জিতেছি। ইয়ো-ভ্যার যা করতে বাধ্য ছিল, তাই করেছে—

মরিস। আর তুই? আর তুই? এর চেয়ে ভাল আর কি করেছিস? তুই কি নিয়ে বড়াই করতে পারিস? কি নিয়ে? তোর কব্জির দাগ নিয়ে? জাহাজে দাঁড় টানা, সিঁদ কেটে চুরি? সবাই ও সব কথা বলে।

ল্যাফ্রঁ। স্যার্জের সঙ্গে, রুদ্য লানেভার কাজের সময়, ওখানে তোকে দেখতে ইচ্ছে করে। অন্ধকারে বাড়ির মালিকরা জানালা থেকে আমাদের ওপর গুলি ছুঁড়ছিল।

মরিস। (ব্যঙ্গাত্মক) কোন স্যার্জ? হয়ত লেন্সের স্যার্জ।

ল্যাফ্রঁ। হ্যাঁ লেন্সের স্যার্জ সশরীরে। ওর সঙ্গেই আমি শুরু করি, তোর সন্দেহ আছে?

মরিস। প্রমাণ করতে হবে। কারণ ঘরগুলোয় পৃথিবীর সবচেয়ে সাংঘাতিক সব গল্প শোনা যায়! মাঝে মাঝে তার ধোঁয়ায় ঘরের হাওয়া ভারী হয়ে ওঠে, তাতে তোদের মুখ দিয়েও অনেক কিছু বেরোয়। আর যখন লোকেরা ক্ষেপে যায় তখনই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর গল্প-গুলি তৈরি হয়। জালিয়াতি, চোরাকারবারি, সোনা, মুক্ত, হীরে। ধোঁয়ায় ঢেকে যায়, জাল ডলার, সিন্দুক, ফারকোট! আর জাহাজের দাঁড় টানা।

ল্যাফ্রঁ। তোকে চ্যালেঞ্জ করছি।

মরিস। জাহাজের দাঁড়!

ল্যাফ্রঁ। তুই আমায় ভয় দেখাচ্ছিস?

(সে মরিসের দিকে এগিয়ে গিয়ে মরিসকে ধরতে
চেষ্টা করে, ইয়ো-ভ্যার ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।)

ইয়ো-ভ্যার। এখনো সময় হয়নি। তোরা দুটোই পাগল। আমি মাটিতে শুয়ে আছি। ঝটা-পটিতে মরিস ল্যাফ্রঁর জামা ছিঁড়ে দিয়েছে। (ল্যাফ্রঁর বুকের দিকে তাকিয়ে) আরে তুইও উল্কীপরা।

মরিস। (পড়ে) আরে বাপস্।

ল্যাফ্র্। আমাকে নিশ্চিন্তে থাকতে দে।

ইয়ো-ভ্যার। কালভি যাবার আগে, আমি ওতে কাজ করেছি। একটা ছোট ডুবো জাহাজ। তুই খালাসী ছিলি, জ্যুল?

ল্যাফ্র্। আমায় ছেড়ে দে।

ইয়ো-ভ্যার। খালাসী?

ল্যাফ্র্। আমি জীবনে জাহাজে কাজ করিনি।

মরিস। তা হ'লে ভ'জর?—

ইয়ো-ভ্যার। ক্ল্যারিভোর সেন্ট্রালে, এক মাস্তানের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, নাম ছিল ভ'জর। গায়ে দারুণ জোর আর ওখানেই অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, জাহাজী আর ডকের কুলি। ওখানে ব্রেস্টের প্যান্থার।

ল্যাফ্র্। পোয়াসির সেন্ট্রাল।

ইয়ো-ভ্যার। বিউমের সেন্ট্রালের ল্যা স'ংল'।

ল্যাফ্র্। বেরবুর্গের।

ইয়ো-ভ্যার। লা তর্নাদ, ফোঁতভেরল।

ল্যাফ্র্। ব্রেস্টের।

ইয়ো-ভ্যার। তুই যদি কোথাওই না গিয়ে থাকিস ত সবাইকে চিনলি কি করে?

ল্যাফ্র্। সবাই জানে। ওরা কি কাজ করে পার হয়েছে, তা সবাই জানে।

মরিস। তুই যদি কেবল চিহ্নগুলোই জানিস, তা হলে, ব্যাপারটা এমন কিছু ভাল করে জানা হ'ল না।

ইয়ো-ভ্যার। আর লা ভাল'কা।

ল্যাফ্র্। তুলোঁ!

ইয়ো-ভ্যার। ল ভাল'কা, বিরাট পুরুষ, অপূর্ব উরুত। তিনটে লোকের পেট ফাঁসিয়েছে। জেলে কুড়ি বছরের মেয়াদ খাটছিল।

মরিস। ও যুদ্ধজাহাজের কথা বলছে আর তুই বলছিস কাইয়েনের মাস্তানদের কথা।

ল্যাফ্র্। আমরা ঐ ওর কথা বুঝতে পারছি।

ইয়ো-ভ্যার। ভ'জর হ'ল উপাধি। ওটা বয়ে বেড়ান শক্ত। ও নামে ইতিমধ্যেই তিনজন আছে ক্ল্যারিভোতে। ল্যা ভ'জর গোটা দশেক সশস্ত্র সিঁদকাটা, পনের বছরের মেয়াদ। তেরুসেতেও ল্যা ভ'জর আছে। পুলিশ খুনের চেষ্টা। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হ'ল রোবের গারসিয়া বলা হয় রোবের ল্যা ভ'জর, ফ্রেজ্যুসের অন্ধকূপে। হ্যাঁ ঐ লড়িয়েকে চিৎ ক'রে ফেলায় বাহাদুরী আছে। তার জন্য পুরোপুরি খুন করতে হবে। অন্য কিছু হ'লে চলবে না।

ল্যাফ্র্। ইয়ো-ভ্যার!

ইয়ো-ভ্যার। (হেসে) চিন্তা করিস না লক্ষ্য স্থির রাখ, আমি তোকে পথ দেখাব, তুই বুঝতে পারছিস ব্যুল দ্যনেজের বন্ধুত্বে আমার প্রয়োজন আছে। ওই আমাদের ধরে রাখে। চিন্তা করিস না ওর ক্ষমতা আছে। অপরাধের ব্যাপারে ও বেশ শক্ত। কেন্দ্রে স্থির। তুই ঠিকই বলেছিলি, পুরো জেল ওর শাসনে চলে। কিন্তু ঠিক ওর নিচেই আমি... আর...তুই, তোরও আমার বউয়ের উপর অধিকার থাকবে।

মরিস। (ল্যাফ্‌র কাছে গিয়ে) কিন্তু মাপ করো, মশায় উল্কী পরা নন। ওটা কেবল কালি দিয়ে আঁকা।

ল্যাফ্‌। আবর্জনা!

মরিস। রূপোর পাতে মোড়া। ভ'জর উপাধিটার কথা জেলের ইতিহাসে পড়েছে।

ল্যাফ্‌। তোকে চুপ করতে বলছি, নইলে নামিয়ে দেব।

মরিস। কারণ, ইয়ো-ভ্যার তোর সঙ্গে কথা বলেছে, কারণ ও তোর কথা শুনছে, তুই ওর কাছে মান পাচ্ছিস। শুধু ইয়ো-ভ্যারের উল্কীটা ঝুটো নয়। ছুঁচ ফোটাতে ওর ভয় নেই।

ল্যাফ্‌। (উত্তেজিত) মুখ বন্ধ কর।

মরিস। (ইয়ো-ভ্যারকে) আমি ওকে ঘৃণা করি। আর তোর বউ, ইয়ো-ভ্যার, তুই ওকে তোর বউয়ের ওপর অধিকার দিবি?

ইয়ো-ভ্যার। তুই চাস?

মরিস। তোর বউ! যে তোর চামড়ায় খোদাই করা আছে! ও তোর এতদূর পর্যন্ত!

ল্যাফ্‌। উত্তেজিত হোস না, শান্ত হ।

মরিস। ওর বউয়ের কথা বলছি, তাতে আমার অধিকার আছে।

ল্যাফ্‌। আমি যদি অনুমতি দিই।

মরিস। ওর বউ।

ল্যাফ্‌। এখন থেকে আমার অনুমতি নেবার ব্যাপারটা মেনে নে।

মরিস। তা সত্ত্বেও তোকে ওর কথা জিজ্ঞাসা করতে পারব না। তুই ওকে তোর চামড়ায় খোদাই ক'রে নেবার কথা ভাবিস না, যেমন...(সে কপাল থেকে অদৃশ্য চুলের গোছাটি সরিয়ে ফেলার ভঙ্গি করে) যেমন ভ'জর। আমি যদি ওর বউয়ের ব্যাপারে কথা বলি, তার মানে ইয়ো-ভ্যার তা যদি বলতে দেয়।

ল্যাফ্‌। তুই না একটু আগে ওকে ঘৃণা করছিলি।

মরিস। কক্ষন নয়, তুই। তুই ওকে দিয়ে ওর নিজের দুঃখের কাহিনী বলিয়ে খুশি হচ্ছিলি।

ল্যাফ্‌। তুই ওর কাছ থেকে ওর ইতিহাস টেনে বার করছিলি। তুই আস্তে আস্তে ওর কথা যুগিয়ে যাচ্ছিলি...

মরিস। মিথ্যা কথা। আমি ওকে যথাসাধ্য হাল্কা করবার চেষ্টা করছিলাম। ও তা জানে। আমি আশা করি না যে কেউ আমার কাজ ক'রে দেয়। যে কঠিন আঘাত আমার ওপর আসবে আমি তা সহ্য করব। আমি তার জন্য তৈরী হয়েছি। কিন্তু তুই এখন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। তুই যখন দাঁড়াস তখন তুই আমাদের জীবন্ত দেখিস। আমাদের নড়াচড়া দেখে তোর হিংসা হয়। ফুলের ঘটনাটায় তোর মুখ চক্‌চক্‌ ক'রে উঠেছিল! স্বীকার কর! তোর মুখটা এখনও সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। ঐ মরা চোখ তুই এখনও ঘরের মধ্যে ঘুরতে দেখছিস। ফুলের ঘটনাটা নিয়ে তুই জাবর কাটবি! তোর গলাটা এর মধ্যেই ফুলে উঠেছে।

ল্যাফ্‌। ঘটনাটা আমায় ভাবিয়ে তুলেছে, তুই ঠিক বলেছিস।

মরিস। ওটা তোকে ক্ষমতা দেয়? উঠে আসছে। তোর ঠোঁটে পেঁাছে গেছে? তোর দাঁতে ফুল পেঁাছে গেছে?

ল্যাফ্‌। নখে পেঁাছে গেছে, মরিস। অপরাধ আর ফুলের ঘটনাটা আমার মধ্যে দয়ার জন্ম

দেয় না। তা আনন্দের জন্ম দেয়। বুঝেছিস? আনন্দ! যা তাকে পৃথিবীতে ধরে রাখে তার একটা সুতো ইয়ো-ভ্যার ছিঁড়ল। ও পুলিশ থেকে বিযুক্ত হ'ল। শিগগীর ও ওর বউয়ের কাছ থেকেও বিযুক্ত হবে।

মরিস। হারামী! তুই তার ব্যবস্থা করছিস—

ল্যাফ্রঁ। আমার কাজ আমার নিজের।

মরিস। আর ইয়ো-ভ্যার তার দাম দেয়। দাম দিয়েছে। ওকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল। আর আমি যদি দুঃখকে টেনে আনি তাহ'লে তা অন্যের অভিযানকে হজম ক'রে নয়: আমার মুখের জন্য। তোকে তা বলেছি। আমিও চিহ্নিত, আমার আসল চিহ্ন আমার মুখ, বদমাসের মিষ্টি মুখ। আমি আত্মরক্ষার জন্য তৈরী হব ব'লে ঠিক করেছি। তুই এই ঘরকে বিষিয়েছিস আজ আমি ময়লা সাফ করবো! আমরা তোকে ঘৃণা করি। তুই নকল। মজ্জায় মজ্জায় নকল। তোর জাহাজে দাঁড় টানার গল্প আর তোর কব্জির দাগ মিথ্যা, আমাদের বউয়ের সঙ্গে গোপনতা মিথ্যা, নিগ্রোটাকে নিয়ে চক্রান্ত মিথ্যা, তোর উল্কী মিথ্যা, মিথ্যা তোর রাগ, মিথ্যা......

ল্যাফ্রঁ। চুপ কর!

মরিস। তোর সরলতা নকল, নকল তোর বক্তৃতা।

ল্যাফ্রঁ। চুপ, নয়তো চেপে ধরব।

মরিস। আমি তোর জামা কাপড় খুলে দিচ্ছি। তোকে উলঙ্গ ক'রে ছেড়ে দেব। তোর পরিধান আমাদের সৌন্দর্য, তুই সাজিস আমাদের সৌন্দর্য দিয়ে, তার জন্য আমি তোকে অপরাধী সাব্যস্ত করছি! তুই অপরাধের ঠিক পন্থাটা জানতে চেয়েছিলি, ওকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া লক্ষ্য করেছি।

ল্যাফ্রঁ। চুপ কর।

মরিস। তোর দয়াকে কেয়ার করি না। চুপ করব না।

ল্যাফ্রঁ। উঃ চুপ কর, আমায় দম নিতে দে।

মরিস। আমার জীবন তোকে অহঙ্কারী করে তুলেছে। (সে চুলের গুচ্ছ সরিয়ে ফেলার ভঙ্গি করে।)

ল্যাফ্রঁ। মরিস, আর বাড়িস না। দয়া করে ওরকম খারাপ ভঙ্গি করিস না।

মরিস। কেন? (হেসে) মশায়ের ফুলের জীবন নিয়ে জাবর কাটার অসুবিধা হচ্ছে?

ল্যাফ্রঁ। হ্যাঁ! তুই এখন আমার সঙ্গে একটা বিরাট লাফ দিবি। আমাকে নেওয়ার জন্য তৈরী হ'। আমি আসছি, ল্যা ভ'জর ইয়ো-ভ্যারের ডানার তলায় তোর সুখে কাটান শেষ।

মরিস। (ইয়ো-ভ্যারকে) মস্তান।

(ল্যাফ্রঁকে দেখে আবার চুল সরাবার ভঙ্গি করে)

ল্যাফ্রঁ। বড় দেরি হয়ে গেছে। চ্যাঁচাস না।

(ইয়ো-ভ্যার একটা উল্টান গামলার ওপর দাঁড়িয়ে দৃশ্যকে শাসন করছে, ইতিমধ্যে ল্যাফ্রঁ হাসি হাসি মুখে মরিসের দিকে এগোয়। এই মধুর হাসিতে মরিসের মুখেও হাসি ফোটে)

ইয়ো-ভ্যার। (থমথমে মুখে) তোরা দুজনেই আমাকে ক্লান্ত করছিস। তোদের চেয়ে বেশী চেষ্টা করতে বাধ্য করছিস, তাড়াতাড়ি কর যেন সব কথার শেষ হয়।

মরিস। (ভীত) আরে জুল, পাগল হ'লি নাকি, আমি তোর কোন ক্ষতি করিনি।

ল্যাফ্রঁ। চ্যাঁচাসনি, বড় দেরি হয়ে গেছে।

[সে মরিসকে দেওয়ালের খাঁজে চেপে ধ'রে গলা টিপে মারে। মরিস ল্যাফ্রঁর পায়ের ফাঁকের মধ্যে পিছলে নেমে আসে। ল্যাফ্রঁ সোজা হয়ে দাঁড়ায়]

ইয়ো-ভ্যার। (এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে, গলার স্বর পালটে) তুই কী করলি? ওকে মেরে ফেললি নাকি? (সে মৃত মরিসকে দেখে) খুব ভাল কাজ। (ল্যাফ্রঁকে ক্লান্ত লাগে) কাইয়েনে যাবার পক্ষে, খুবই ভাল কাজ।

ল্যাফ্রঁ। এখন কি করব? ইয়ো-ভ্যার সাহায্য কর।

ইয়ো-ভ্যার। (দরজার কাছে গিয়ে) হারামী! আমি তোকে সাহায্য করব?

ল্যাফ্রঁ। (নিশ্চল হয়ে) অ্যাঁ? কিন্তু?

ইয়ো-ভ্যার। তুই যা করলি? মরিস তোর কোনও ক্ষতি করেনি, তুই ওকে মারলি? শুধু শুধু ওকে মেরে ফেললি? খ্যাতির জন্য?

ল্যাফ্রঁ। ইয়ো-ভ্যার...তুই আমায় ত্যাগ করবি?

ইয়ো-ভ্যার। আর কথা বলিস না। আমায় স্পর্শ করবি না। তুই জানিস দুঃখ কাকে বলে? আশা ছিল আমি দুঃখকে এড়াতে পারবো? তুই ভেবেছিলি ভগবানের সাহায্য ছাড়াই আমার মতো বড় হতে পারবি! হয়ত বা আমাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারবি। হতভাগা তুই কি জানিস না যে আমাকে ছাড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব? আমি কিছুই চাইনি, বুঝেছিস, আমি যা পেয়েছি সমস্তই আমাকে দেওয়া হয়েছে। এ উপহার ঈশ্বরদত্ত বা শয়তানের দেওয়া হতে পারে। এ জিনিস আমি চাইনি। এখন একটা মড়া নিয়ে ঝামেলায় পড়লাম।

ল্যাফ্রঁ। দুঃখের প্রেমে আমি যা পেরেছি তাই করেছি।

ইয়ো-ভ্যার। দুঃখের কিছুই জানা হ'ল না। যদি তুমি ভাবো যে তাকে খুঁজে নেওয়া যায়, তা ঠিক নয়। আমি চাইনি। সে আমাকে বেছে নিয়েছে। ও আমার ঘাড়ে পড়েছে। আমি তা ঝেড়ে ফেলার সমস্ত চেষ্টা করেছি। আমি লড়েছি, মারামারি করেছি, নেচেছি, এমনকি গান গেয়েছি, লোকে তাতে হাসতে পারে। প্রথমে আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি। যখন বুঝেছি যে তা অবশ্যম্ভাবী তখনই শান্ত হয়েছি। এই সবেমাত্র আমি তাকে মেনে নিয়েছি।

(দরজায় ধাক্কা দেয়)

ল্যাফ্রঁ। কি করছিস?

ইয়ো-ভ্যার। আমি পাহারাদারকে ডাকছি। ওকে দেখে বুঝবি, তুই কে।

ল্যাফ্রঁ। ইয়ো-ভ্যার।

ইয়ো-ভ্যার। (নিচু গলায়) শালা হতভাগা।

ল্যাফ্রঁ। সত্যি সত্যিই আমি একা।

(চাবি খোলার শব্দ। দরজা খোলে। হাসিমুখে পাহারাদারকে দেখা যায়। সে ইয়ো-ভ্যারকে চোখ মারে)

মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ : নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

মিশে গেছি শব্দের সহিত

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

শব্দের নিজস্ব কিছু ক্ষিধে আছে, ক্ষুন্নিবৃত্তি আছে;
যা নেই, তা হলো এই পরিপাক করার ক্ষমতা।
শব্দ যেন হাওয়া খায়, ভাত খায়, মাছমাংস খায়
যেহেতু খায় না জল—সেহেতু ধরে না কোনো পচ্
স্তূপকরা অন্নে-শস্যে, শব্দের বিষণ্ন গন্ধ আছে।
তবুও কয়েকটি শব্দ হাসিখুশি, স্তব্ধ কোনোটি বা
যুগলে মানায় কাউকে, অন্যে বসে নিভৃতে, বিরহে—
এইসব সহজাত শব্দেরা কখনো করে খেলা
মানুষের শিশুদের মতো মাঠে, সমুদ্রের তীরে
বালু নিয়ে অকারণ, বল নিয়ে, ইয়ো-ইয়ো নিয়ে—
সেই স্বাভাবিক খেলা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি
একদিন, তারপর মিশে গেছি তাদের সহিত :
আমিও অব্যর্থ শব্দ, আমাকে খেলায় নিতে হবে
এই ব'লে; ব্যবধান না রেখে অন্দরে চলে গেছি॥

তেমন স্বতন্ত্র হলে

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

তেমন স্বতন্ত্র হ'লে নিতে পারি তোমাকে এখনো।
খালি পড়ে আছে ব্যবধানভরা ঐ মৌলিক আসন
নিচে যার ভারতীয় মাটি কিন্তু মাথার উপরে যে আকাশ
তার কোনো নামকরণ এখনো করিনি; এ তো ভালবাসা নয়
এ তো নয় শরীরের সনির্বন্ধ স্ফীতি
শিশুর আমোদে শেখা অক্ষরের ভগ্ন উচ্চারণ!
এ আমার নতুন প্রার্থনা, লৌকিক থেকেই পায়ে হেঁটে হেঁটে
বাস্তবিক পেঁছে যাওয়া অলৌকিক কথোপকথনে।

তেমন স্বতন্ত্র হলে নিতে পারি তোমাকে এখনো
মুচড়ে প্রচন্ড টানে অদেখা শিকড়ে, অভিমানে!
একটি আসন আমি রেখেছি ভীষণ সংগোপন,
তুমি এসে বসো, এক সৃজনপিপাসু
চোখ স্পর্শ করো; যেন সে এবার চোখ বন্ধ করে দ্যাখে
মৃত্যুর আগামী শিল্প; অক্ষর কাকের মতো ঠুকরে ঠুকরে
সর্বাঙ্গ খেয়েছে; আছে যা এখনো বাকী
তার নাম কবির কঙ্কাল!
মানুষের থেকে তাঁর হাড়ের শুভ্রতা কিছু বেশী।

বিপরীত মেঘগুলো

রত্নেশ্বর হাজরা

কেউ খুব সহজেই ভুলে যায়
কেউ বহু চেষ্টাতেও ভুলতে পারে না—
এক ও দুই-এর মধ্যে দেখা হয়—অমিল এবং দুটো মিল
যে কোনো রাস্তায় ঘোরে, শহরতলীতে
ভাঙা সাঁকো পার হয়—তার
এপাশ ওপাশ দিয়ে আকৃতিবিশিষ্ট কিছু মেঘ
যে-পাহাড় থেকে আসে—খোঁজে সে-পাহাড়...

পাহাড়ে কোথায় যেন একটা অরণ্য থাকে, সেখানে গহন থাকে
সবার গহনে শব্দহীন
কিছু ধ্বনি প্রতিধ্বনি মুখোমুখি বসে থাকে—হেঁটে গেলে দেখা হয়
সমস্ত অমিল
পরস্পর মুখগুলো—প্রত্যেকের দিকগুলো—সমস্ত আকাশগুলো
আরম্ভ এবং শেষগুলো
যেকোনো রাস্তায় ঘোরে মুখোমুখি, শহরতলীতে
ভাঙা সাঁকো পার হয়, তার
যেখানে যাবার কথা—যেখানে ফেরার কথা ছিল
কেউ কেউ ভুলে যায়—অনেকে ভোলে না কিন্তু, অমিল এবং দুটো মিল
বিপরীত দিকগুলো পরস্পর মেঘগুলো কখনো আকাশগুলো
আরম্ভ এবং শেষগুলো............

পুতনার প্রতি

নবনীতা দেব সেন

পুতনা তোমার সত্যি
কোনো দোষ ছিলো না কখনো।
তুমি শুধু ভাড়া-করা সামান্যা দানবী।

কী ক'রে জানবে তুমি, দেবশিশুদের
আকণ্ঠ রক্তের তৃষ্ণা?
সদ্যোজাত দেবতার ঠোঁটে
তীব্রতর বিষ!

পুতনা, অকৃতকার্য হয়েছিলে বলে
আত্মাতে রেখো না ক্ষোভ—
তুমি তুচ্ছ নশ্বরী দানবী।

মৃত্যুহীন দেবতার দাঁতে
মারণাস্ত্র অমোঘ শানানো।

নরকে বা স্বর্গে

ওমর আলী

নরকে যাবার পথে দারোয়ান আছে
স্বর্গে যাবার পথে দারোয়ান আছে
নরকে অথবা স্বর্গে কোন্ পথে যাবে?
নরকে যেতে হলেও দারোয়ান প্রথমে থামাবে
স্বর্গে যেতে গেলেও দারোয়ান সামনে দাঁড়াবে—
নরকের অধিকর্তা ভেতরে আসীন তার অনুমতি নেবে
স্বর্গের প্রধান চাবে নাম ও ঠিকানা
নরকে বা স্বর্গে যাওয়া প্রথমেই সহজ হবে না।

সম্মুখে বাগান তার মধ্যে যে বিরাট গাছ আছে
তার নীচে বসে থেকে মত ঠিক করো
নরকে যাবে না তুমি স্বর্গে যাবে—মত ঠিক করো।
অদ্ভুত পাখীরা, ফুল শাখা প্রশাখায়।
বান্ধবী রমণী আসে এদিকে দুচোখ তার ভারী সুন্দর
নরকে বা স্বর্গে গেলে সেও হবে তোমার দোসর।

বাংলায় পাল-সেন যুগের আঞ্চলিক শিখর-মন্দির

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলার পাল-সেন যুগের শিখর-মন্দির সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা বেশিদূর অগ্রসর হয় নি। যেটুকু হয়েছে তার মধ্যেও যে সবগুলো মন্দিরের কথা বলা হয়েছে, এমন নয়। যে মন্দিরগুলো বর্তমান পুরুলিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত সেগুলোকে বাংলার মন্দির সম্পর্কিত আলোচনা থেকে দীর্ঘকাল বাদ দিয়ে রাখা হয়েছিল। পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সম্প্রতিকালে। এই কারণে পুরুলিয়ায় অবস্থিত মন্দিরগুলো বাংলার মন্দির সম্পর্কিত আলোচনা থেকে বাদ পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু বাঁকুড়ার মন্দির সম্পর্কে এ ধরনের যুক্তি কার্যকর হবে না। বাঁকুড়া জেলার সোনাতপাল গ্রামের পাল আমলের মন্দিরটিও অতি সম্প্রতিকালের আগে কোন আলোচনায় স্থান পায় নি। মনে হয় বাংলার পাল-সেন যুগের মন্দির সম্পর্কিত আলোচনা ছিল বেগলারের বিখ্যাত প্রতিবেদনের পরবর্তী প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার প্রতিবেদনসমূহের উপর একান্ত নির্ভরশীল। বেগলার পুরুলিয়া-বাঁকুড়া জেলার সবগুলো পাল-সেন মন্দিরেরই বর্ণনা দিয়ে গেছেন।

পাল-সেন যুগে নির্মিত যে কয়টি শিখর-মন্দিরের কথা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় তার অধিকাংশেরই অবস্থান বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবর্তী উচ্চাবচ, কঙ্করময় উষরভূমি অঞ্চলে, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় এবং বর্ধমান জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে। এর বাইরে আছে মাত্র দুটি মন্দির। বর্ধমান জেলার পলিমাটি-সমৃদ্ধ মধ্য অংশে সাতদেউলিয়া গ্রামে একটি, আর অপরটির অবস্থান সুন্দরবনের (২৪ পরগনা জেলা) জলবেষ্টিত জঙ্গলময় গ্রাম পশ্চিমজটায়। উত্তর-পশ্চিম বর্ধমানে পাল আমলের মন্দির একটিই আছে। সিদ্ধেশ্বর শিবের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত মন্দিরটির অবস্থান বরাকর শহরে (উপাস্য দেবতার নামে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও প্রত্নতাত্ত্বিক রচনায় মন্দিরটিকে বরাকরের ১নং মন্দির বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে)। বাঁকুড়ার মন্দিরগুলো নির্মিত হয়েছিল দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী সোনাতপাল, বোলাড়া ও ডিহর গ্রামে। সোনাতপালের পরিত্যক্ত মন্দিরটি সূর্যমন্দির বলে পরিচিত। বোলাড়ার মন্দিরে উপাস্য দেবতা বর্তমানে সিদ্ধেশ্বর শিব। ডিহরের মন্দিরটিও শিবের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। দেবতা এখানে ষাড়েশ্বর শিব নামে পরিচিত। পুরুলিয়াতেই পাল-সেন যুগের শিখর-মন্দিরের সংখ্যা সর্বাধিক। কংসাবতী নদীর তীরবর্তী দেউলঘাট গ্রামের তিনটি পরিত্যক্ত মন্দির, পারা গ্রামের উদয়চণ্ডী মন্দির এবং দামোদর-বিধৌত তেলকুপি গ্রামের একটি পরিত্যক্ত মন্দির পাল-সেন আমলের মন্দির-স্থাপত্যের নিদর্শন হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।

এই মন্দিরগুলোর নির্মাণকাল নির্ণয়ের প্রধান সূত্র হ'ল মন্দিরগাত্রের অলঙ্কার। প্রায় প্রতিটি মন্দিরই পরস্পরবিজড়িত ক্ষুদ্রাকৃতি চৈত্য গবাক্ষ, কীর্তিমুখশীর্ষ উল্টান চৈত্য গবাক্ষ, রত্নমালা, হংসলতা, অলঙ্কৃত বঙ্কিমরেখার প্রবাহ, ঘট, পল্লবশীর্ষ ঘট, অতি ক্ষুদ্রকায় শিখর-মন্দিরের প্রতিকৃতি, বিশেষ ধরনের ফুল, লতা ও পাতা—এইসব দিয়ে রচিত সুবিস্তৃত অলঙ্কারসম্ভারে সুসজ্জিত। দীর্ঘদিন ধ'রে আলোচনা-গবেষণার ফলে পাল-সেন যুগের বিভিন্ন সময়ের শিল্পধারা সম্পর্কে আমাদের ধারণা আজ স্পষ্ট। মন্দিরগুলোর জটিল, সূক্ষ্ম ও ব্যাপক অলঙ্কারসজ্জা পাল-সেন আমলের সুপরিচিত অলঙ্করণবস্তু নিয়েই রচিত।

অলঙ্কারসজ্জার মধ্যে এবং মন্দিরদেহ ও তার অঙ্গসজ্জার পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে যে শিল্পধারা ও শিল্পাদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলোকে দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকে বাংলায় যে আঞ্চলিক শিল্পধারা ও শিল্পাদর্শ গড়ে উঠেছিল তাদের সঙ্গে অভিন্ন বলে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না।

মন্দিরগুলোতে অলঙ্কার রচিত হয়েছে কাটা ইট বা পাথরের ওপর মিহি চুন-বালির পলস্তারা দিয়ে। অলঙ্কার রচনার প্রথম স্তর অর্থাৎ এই কাটা ইট ও পাথরের খণ্ডগুলো মন্দিরদেহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বেগলারের মতে এগুলোকে পরবর্তীকালের সংযোজন বলে অনুমান করবার কোন কারণ নেই। তাই অলঙ্কারসজ্জার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মন্দিরগুলো দশম থেকে দ্বাদশ শতকের অর্থাৎ পরবর্তী পাল ও সেন আমলের বলে চিহ্নিত হতে পারে।

একমাত্র বরাকরের মন্দিরে অলঙ্কার রচনা করা আছে প্রধানত মূর্তি সাজিয়ে। মন্দির-দেহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এই মূর্তিগুলোর রূপগত দিকটা বিচার করলে এগুলোকে নবম শতকের মাঝামাঝি সময়ে সৃষ্ট বলে মনে হবে। মন্দিরটিকেও তাই ঐ সময়ের বলে অনুমান করতে পারি। ব্রাউন মন্দিরটির নির্মাণকাল হিসাবে যে সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন সেও অনেকটা এই রকম (ব্রাউন, ১৯৬৫)।

ভগ্নাবস্থায় রয়েছে বা একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেছে এমন শিখরমন্দিরের সংখ্যা বাংলায় প্রচুর। এর মধ্যে কিছু যে পাল-সেন যুগে নির্মিত একথা প্রমাণ করা হয়ত অসম্ভব নয়। একানী চাঁদপাড়া (মুর্শিদাবাদ), বংশীহারী (পশ্চিম দিনাজপুর), বামুনগোলা (মালদহ) প্রভৃতি স্থানে যেসব মন্দির-ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে সেগুলোকে তো পাল-সেন আমলের শিখর-মন্দিরের অঙ্গাবশেষ বলেই মনে হয়। এ ছাড়া পুরুলিয়া জেলার পাকবীড়্যা, তেলকুপি প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসপ্রায় মন্দিরগুলোর মধ্যে পাল-সেন যুগের স্থাপত্যাবশেষ খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু ভগ্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে আহরণ করা তথ্য স্বভাবতই অসম্পূর্ণ এবং প্রায়শই বিচ্ছিন্ন। ব্যাপক সমীক্ষা এবং পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা না শেষ হলে এ সব তথ্য নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করা চলে না। উপরন্তু বাংলার পাল-সেন যুগের শিখর-মন্দিরের বৈচিত্র্য এত বেশী যে আংশিক তথ্যের ওপর নির্ভর করে কিছু অনুমান করাটাও কঠিন হয়ে পড়ে। বর্তমান অবস্থায় তাই পাল-সেন যুগের শিখরমন্দির সম্পর্কিত আলোচনা দণ্ডায়মান মন্দিরগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব।

পাল-সেন আমলের এই শিখর-মন্দিরগুলো সবই স্বল্পায়তনের দেবগৃহ। এদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম হ'ল বরাকরের মন্দিরটি। এর চতুরস্র আসনে বাহুর বিস্তার ১৪ ফুট ২ ইঞ্চি। আসনের বিস্তারের প্রশ্নে বৃহত্তম হ'ল জটার দেউল। এর সমচতুষ্কোণ আসনে প্রত্যেকটি বাহু ৩০ ফুট ৯ ইঞ্চি বিস্তৃত। মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট। বোলাড়া মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৩০ ফুট ১ ইঞ্চি, কিন্তু উচ্চতায় কিছুটা বেশী—৬৪ ফুট। মন্দির দুটোরই শীর্ষদেশ ভেঙে পড়ে গেছে। উচ্চতার মাপটা তাই উভয় ক্ষেত্রেই ভগ্নশীর্ষের ওপরে নেওয়া। সম্পূর্ণাবস্থায় দুটোরই উচ্চতা আরও একটু বেশী ছিল।

অতি সম্প্রতিকালে পুরুলিয়ার দেউলঘাট-পারা-তেলকুপি এবং বাঁকুড়া জেলার সোনাত-পাল গ্রামের মন্দিরগুলোকে নতুন করে জনসমক্ষে পরিচিত করবার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৪, ১৯৭১; ম্যাককাচ্চন, ১৯৬১, ১৯৬৭ এবং মিত্র, ১৯৬৮) কিন্তু সব-গুলো দণ্ডায়মান পাল-সেন শিখর-মন্দির নিয়ে সুসংহত ঐতিহাসিক আলোচনার প্রয়াস এখন পর্যন্ত আরম্ভ হয় নি। পূর্ববর্তী লেখাগুলোতে পাল-সেন যুগের মন্দির নিয়ে আলোচনা

বরাকর-সাতদেউলিয়া-পশ্চিমজটা-বোলাড়া-ডিহর গ্রামের মন্দিরগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই অসম্পূর্ণ তথ্যের ওপর নির্ভর করেই অনেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে বাংলার এই মন্দির-গুলো ওড়িশার শিখর-মন্দির, রেখ-দেউলের, বিবর্তনধারার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত—প্রকৃত-পক্ষে এগুলো ওড়িশার রেখমন্দির চর্চার একটা শাখাপ্রবাহ মাত্র (সরস্বতী, ১৯৩৩ এবং ১৯৪৩ ও বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৪ এবং ১৯৭১)।

বলা হয়েছে, বাংলার শিখর-মন্দির চর্চা একেবারে আদিকাল থেকেই অর্থাৎ, বরাকরের সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরের সময় থেকেই, উড়িষ্যার মন্দিরের বিবর্তনধারার অনুবর্তী। বরাকরের মন্দিরটির আসন ত্রিরথ, বাড়ে রথ-পগের দুই পাশে ক্ষুদ্রাকৃতি দুটি শিখর-মন্দিরের প্রতিকৃতি, এবং পাঁচটি পগে বিভক্ত গণ্ডী, এসবই ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। এই সাদৃশ্যের যুক্তিতেই বরাকরের সিদ্ধেশ্বর মন্দিরটি অষ্টম শতকীয় পরশুরামেশ্বর মন্দিরের সমপর্যায়ভুক্ত এবং সমকালীন বলে উল্লিখিত (ড. সরস্বতী, ১৯৩৩ ও ১৯৪৩)। অন্যদিকে মন্দিরটির গণ্ডীতে রাহাপগের যে প্রলম্ব বিভাগ, রাহাপগের ওপরে ভূমি আমলকের পুনরা-বৃত্তি এবং অন্তবর্তুল আমলক শিলা দেখা যায় সে সমস্তই পশ্চিম ভারতের শিখর-মন্দিরের বৈশিষ্ট্য (ড. সরস্বতী, ১৯৩৩)। এতেই বোঝা যায় শুধুমাত্র উড়িষ্যার প্রভাবটাই একমাত্র প্রশ্ন নয়। এছাড়া মন্দিরটির আরও দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যায়। বরাকর মন্দিরে গর্ভগৃহের দৈর্ঘ্য ও মন্দিরের উচ্চতার মধ্যে অনুপাত ১:৫·৭ (বসু, ১৯৫৪), পরশুরামেশ্বর মন্দিরে উচ্চতার অনুপাত ১ : ৩·৯৭ (বসু, ১৯৬৭) দ্বিতীয়টি হল গণ্ডীর লঘুভার দীঘল গঠন। এর ফলে রূপগতভাবে বরাকরের এই মন্দিরটি পরশুরামেশ্বর মন্দিরের প্রায় খর্বাকৃতি ও গুরুভার দেহের থেকে অনেকটাই পৃথক। এই মন্দিরের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে পুরুলিয়ার মন্দিরে অনুসৃত হয়েছিল।

সাতদেউলিয়া ও সোনাতপালে ইঁটের তৈরী মন্দির দুটোই দৃঢ় গঠনের এবং কিছুটা গুরুভার। উদ্গত রথ-পগগুলো দৃঢ় এবং ভারী; এদের ধারগুলো কোণাল এবং বলিষ্ঠ। মন্দির দুটোরই আসন পঞ্চরথ। তবে সাতদেউলিয়া মন্দিরে অনুরথপগ এবং রাহাপগের মধ্যে রয়েছে গভীর নিম্নায়ত অংশ; দৈর্ঘ্যে এটা প্রায় অনুরথপগর সমান। আসনের বিন্যাস অনুসারে মন্দিরের দেহেও রাহাপগর দুই দিকে দেখা যাবে গভীর নিম্নায়ত অংশের সমাবেশ। এরকমটা অন্য কোনো মন্দিরে দেখা যায় না। মন্দিরটির দেওয়ালের নীচে কোনো মোলডিং নেই। তবে মাঝখানে উল্টো কার্টনির একসার আনুভূমিক বন্ধনী দেওয়ালকে বেষ্টন করে রয়েছে। কিন্তু কোনো অলঙ্কার এখানে নেই, পগবিভক্ত দেওয়াল পলস্তারা-করা। সুপ্রচুর অলঙ্করণে সমৃদ্ধ গণ্ডীর নীচেই এই রকম দেওয়াল দেখে মনে হয় মন্দিরটির নিম্নাংশ ঘিরে ছিল ঢাকা প্রদক্ষিণ-পথ। পশ্চিম ভারতের কাঠিয়াওয়ারে হর্ষদ্‌মাতা, রোডা, পাস্থর, ওয়াধওয়ান ও ঘুমলি প্রভৃতি স্থানের কয়েকটি মন্দিরেও দেখছি বৈচিত্র্যপূর্ণ গণ্ডীর নীচে পলস্তারা-করা নিরাভরণ দেওয়াল। এদের মধ্যে শেষ দুটি মন্দিরের গণ্ডী বিচিত্র অলঙ্কারে পরিশোভিত। এরই নীচে এমন নিরাভরণ দেওয়াল দেখে স্বতই মনে হয় এই মন্দিরগুলোতে অলঙ্কারবৈচিত্র্যবিহীন দেওয়াল ঘিরে দেওয়া হয়েছিল ঢাকা প্রদক্ষিণ-পথ দিয়ে। সাতদেউলিয়া মন্দিরেও দেওয়াল সম্ভবত এমনি ঢাকা প্রদক্ষিণ-পথ দিয়ে আবৃত ছিল।

সাতদেউলিয়া মন্দিরে দেওয়ালের উপরে রয়েছে কয়েক সার উল্টো কার্টনি। তার উপরে গণ্ডীর অবস্থান। গণ্ডীর ওপরে মস্তক অংশটি; বেকী ও আমলক প্রভৃতির পরিবর্তে যোজিত হয়েছে গোলাকার একটি স্তম্ভ। এর ঠিক মাঝখানে বসানো রয়েছে একটি লোহার দণ্ড।

সোনাতপাল মন্দিরের নীচের দিকটা ক্ষয়ে গেছে। তাই পাভাগ মোলডিং সেখানে ছিল কিনা জানা যায় না। কিন্তু বাকি অংশের বিভাগে ওড়িশার উন্নত রেখমন্দিরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বান্ধনা রেখা দ্বারা জাংঘ দুই ভাগে বিভক্ত। বাড় শেষ হয়েছে বরণ্ডতে। কিন্তু ওড়িশার সঙ্গে বাড়ের সাদৃশ্য ঐ পর্যন্তই। বান্ধনা বা বরণ্ড কোনটাই উড়িষ্যার মত সারিবন্ধ মোলডিং দিয়ে তৈরী নয়। উল্টো ও সোজা কার্টনির দুইটি সার একত্র করে বান্ধনা গড়া। বরণ্ড তৈরী করা হয়েছে দুই প্রস্থ উল্টো কার্টনির মধ্যে একটি নিম্নায়ত অংশ দিয়ে। এই রকম নিম্নায়ত অংশ সমন্বিত বরণ্ড পুরুলিয়া ও বোলাড়ার শিখর-মন্দিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পগবিভক্ত দেওয়ালের উপর বৈচিত্র্য সঞ্চারের জন্য রাহা ও কণিক পগর ওপরে বসানো হয়েছে সুউচ্চ শিখর-মন্দিরের প্রতিকৃতি। বাড়ের এই রকম অঙ্গসজ্জা প্রথমে দেখা গিয়েছিল বরাকরের সিদ্ধেশ্বরমন্দিরে।

সাতদেউলিয়া মন্দিরের ক্ষয়-ক্ষতি কিছুটা হয়েছে বটে, কিন্তু তার সুপ্রচুর অলঙ্কার-সমৃদ্ধির অধিকাংশই আজও অক্ষত। সোনাতপাল মন্দিরের গণ্ডী বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত; বহিরাবরণের অনেকটাই পড়ে গেছে। তবু, গণ্ডীটি যে বিস্তৃত অলঙ্কার-সম্ভারে সুসজ্জিত ছিল সেকথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। মন্দির দুটোতেই গণ্ডীর অলঙ্কার-বিন্যাস প্রলম্ব বিভাগগুলোর অনুসারে। অলঙ্কারসজ্জার প্রধান গতি তাই নীচের থেকে ওপরের দিকে। সাতদেউলিয়া মন্দিরে আনুভূমিক গতির ওপরে কিছুটা জোর দিয়ে গণ্ডীর সজ্জায় একটা বৈপরীত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কণিকপগর সর্বাঙ্গে ও অন্য পগগুলোর ধার বেয়ে রয়েছে আনুভূমিক টালির ছড়। কণিক ছাড়া অন্যত্র সারিবন্ধ টালির ছড়ের মাঝখান দিয়ে উঠে গেছে ঊর্ধ্বমুখী অলঙ্করণের ধারা। আনুভূমিক ও প্রলম্ব বিন্যাসের এই বৈপরীত্য সাতদেউলিয়া মন্দিরে গণ্ডীর অন্যতম আকর্ষণ।

শিখর-মন্দির। দেউলঘাট, পুরুলিয়া

সোনাতপাল মন্দিরে আনুভূমিক ভাগ করা হয়েছে গণ্ডীর এক কোণ থেকে অন্য কোণ পর্যন্ত প্রসারিত ভূমি-বরণ্ড ও ভূমি-আমলক বসিয়ে। কিন্তু আনুভূমিক গতির প্রভাব এখানে অনেক মন্দীভূত। অলঙ্কারবিন্যাসে প্রলম্ব ধারাটাই অনেক বেশী স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ। অলঙ্করণের এই ঊর্ধ্বগতির প্রভাবেই পগর ঊর্ধ্বগতিতে ঘটেছে আলঙ্কারিক গুণের সমাবেশ। এই প্রচেষ্টা সাতদেউলিয়া মন্দিরেও লক্ষণীয়। তবে এ মন্দিরে আনুভূমিক টালির ছড়গুলোও তো দৃষ্টি এড়াবার নয়। এদেরই প্রভাবে অলঙ্করণ সম্পূর্ণ একমুখী হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু দুটো মন্দিরেই অলঙ্করণের মূলগত উদ্দেশ্য এক। অলঙ্কারের সমাবেশ ও তার বিন্যাসপরিকল্পনা স্থাপত্যের গতিকে অলঙ্কৃত করে তোলবার জন্যই। মন্দির দুটোরই
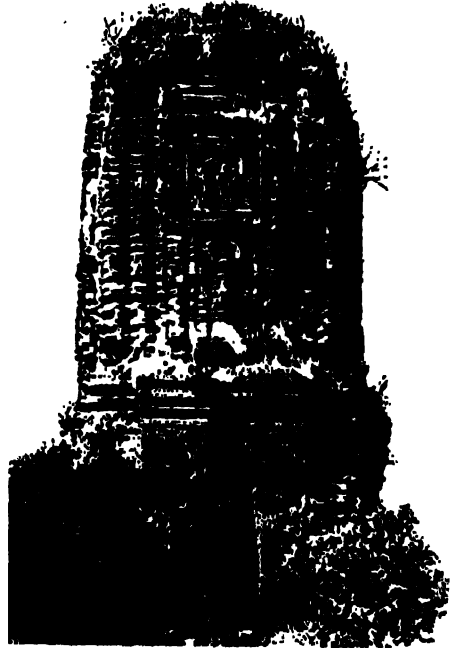
দেহ কিছুটা গুরুভার, প্রলম্বভাগগুলো দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ। অলংকারগুলোও খুব একটা সূক্ষ্ম নয়; তত্রাপি স্থাপত্য ও অলঙ্করণের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটা একটু মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করলেই অনুধাবন করা সম্ভব।

পশ্চিমজটা গ্রামের জটার দেউল, বোলাড়ার সিদ্ধেশ্বর ও ডিহরের ষাঁড়েশ্বর মন্দিরের সঙ্গে উড়িষ্যার সমুন্নত রেখ-মন্দিরের সম্পর্ক অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ। মন্দির তিনটিতেই আসন পঞ্চরথ এবং বাড় পঞ্চাঙ্গ উড়িষ্যার রেখ-মন্দিরের মতই এ মন্দির দুটোর পাদমূলে রয়েছে সারিবদ্ধ পাভাগ মোলডিং-এর বিন্যাস—তিন সারি মোলডিং দিয়ে রচিত হয়েছে বান্ধনা। জটার দেউলে পাঁচসার মোলডিং দিয়ে বরণ্ড তৈরী করা হয়েছে। বোলাড়া মন্দিরের বরণ্ডটি কিন্তু সোনাতপাল মন্দিরের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। একটি খাঁজের ওপরে ও নীচে মোলডিং-এর পাড় বসিয়ে বরণ্ডটি গড়া। নীচের পাড়টির তলে রয়েছে আরও দুই সার মোলডিং; এই ধরনের বরণ্ড পুরুলিয়ার পাল-সেন যুগের শিখর-মন্দিরে এবং পরবর্তীকালে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বর্ধমানের উত্তর-পূর্ব অংশের অনেক শিখর-মন্দিরেই লক্ষ্য করা যায়। ডিহর মন্দিরে গণ্ডীর সামান্যই মাত্র অবশিষ্ট আছে। অন্য দুটোতে গণ্ডী ভূমি-আমলক দিয়ে সাতটি ভূমিতে বিভক্ত। গণ্ডীর বহিঃরেখাও সমুন্নত রেখমন্দিরের মত প্রায় সোজাভাবে খানিকটা উঠে গেছে। তারপরে কেন্দ্রের দিকে গণ্ডীর দেওয়ালের ঝোঁকটা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে, তবে অত্যন্ত মৃদুভাবে; একেবারে শীর্ষের কাছাকাছি ঝোঁকটা সুস্পষ্ট।

উড়িষ্যার রেখমন্দিরের সঙ্গে এই মন্দিরগুলোর পার্থক্যটাও কিন্তু গণ্ডীতেই ধরা পড়বে। উড়িষ্যার গণ্ডীতে বৈচিত্র্য আনা হয় আনুভূমিক মোলডিং বা ভূমিবরণ্ড এবং উন্নত ও দৃঢ় প্রলম্ব পগভাগের বিপরীত গতির সহাবস্থানের মাধ্যমে। প্রবন্ধ ধারাকে আরও প্রকৃষ্ট করে তোলা হয় অনুরথ-পগর ওপরে উপর্যুপরি ক্ষুদ্রাকৃতি শিখর-অঙ্গশিখর প্রলম্ব-ভাবে সাজিয়ে দিয়ে। বোলাড়া ও পশ্চিমজটার মন্দিরে আনুভূমিক ধারাপথের পরিচয় রয়েছে গণ্ডীর নীচের দিকে কয়েক সার অখণ্ড, ক্ষীণায়ত মোলডিং ও খাঁজের বিন্যাসে; পগগুলোর ধারে ধারে পাতলা টালির ছড়ে; ভূমি-আমলকের প্রয়োগে ও রাহাপগের আনুভূমিক বিভাগে। সামগ্রিক অলঙ্করণ পরিকল্পনায় কিন্তু এগুলোর স্থান নিতান্তই গৌণ। প্রলম্ব পগের ধারা বেয়ে উঠে গেছে সূক্ষ্ম ও বিচিত্র অলঙ্কারের প্রলম্ব সারি। এইটাই অলঙ্করণ-পরিকল্পনার প্রধান ধারা।

এ বৈশিষ্ট্যগুলো সবই বহিরঙ্গের। উড়িষ্যার রেখমন্দিরের সঙ্গে পার্থক্যটা আসলে মননগত এবং গভীরতলশায়ী; বোলাড়া ও পশ্চিমজটার মন্দিরে মূল ধারণাটাই আলঙ্কারিক। এই ধারণার ইঙ্গিত প্রথমেই ধরা পড়বে মন্দিরগুলোর দীঘল লঘুভার দেহের পরিমার্জিত সুঠাম গঠনের মধ্যে। বরাকরের সিদ্ধেশ্বর-মন্দিরে যে লঘুভার দীঘল শিখর গঠনের প্রয়াস দেখা গিয়েছিল সেইটাই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এই দুইটি মন্দিরের দেহে। দেহরূপকে পরিমার্জিত ও সুঠাম করে তোলবার জন্য রথপগগুলো ক্রমোন্নত বিভিন্ন উপপগের স্তরে ভাঙা। প্রতিটি স্তরেই আবার ধারগুলো মার্জিত এবং বর্তুলায়িত। ফলে রথপগর উদ্গমন হয়েছে ধীরে এবং ক্রমান্বয়ে, সুকুমার এবং বর্তুলায়িত আকারে। হালকা দীঘল গড়নের সঙ্গে এই গুণাবলী যুক্ত হবার ফলে মন্দিরদেহে এসেছে সুস্পষ্ট আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য। উড়িষ্যার সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ গঠনের গুরুভার রেখমন্দিরদেহের পৌরুষ ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে বাংলার এই মন্দির দুটোর সুকুমার লালিত্যের এবং রূপকল্পনার মননগত পার্থক্যটা এতই অধিক এবং গভীর যে তুলনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

স্থাপত্যের এই মূলগত আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে গণ্ডীর সর্বব্যাপী সূক্ষ্ম, পরিমার্জিত অলঙ্কারের বিন্যাস ও সুষমায়। পগর উদ্গমন তো আগেই মন্দীভূত হয়েছিল। অলঙ্করণের প্রভাবে এইসব উদ্গত পগ এখন ঈষৎ-উন্নত কয়েকটি স্তরে পর্যবসিত; পগগুলো হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ আলঙ্কারিক। শিখরের ঊর্ধ্বগতি স্পষ্ট করে তোলার ব্যাপারে পগ-প্রবাহের যে ভূমিকা ছিল সেটা সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। কিন্তু গতির ইঙ্গিত লুপ্ত হয় নি—অলঙ্করণের প্রলম্বসজ্জার মধ্যে তা নবতররূপে ফুটে উঠেছে। অলঙ্করণের প্রভাবে সোনাতপাল ও সাতদেউলিয়া মন্দিরে পগপ্রবাহের ঊর্ধ্বগতি আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল। বোলাড়ার মন্দিরে ও জটার দেউলে স্থাপত্যের আলঙ্কারিক চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে অলঙ্করণের মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠেছে গতির ইঙ্গিত। স্থাপত্য ও তার অলঙ্কার এ মন্দির দুটিতে মূলগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রশ্নে একেবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; বস্তুত পরস্পরের পরিপূরক।
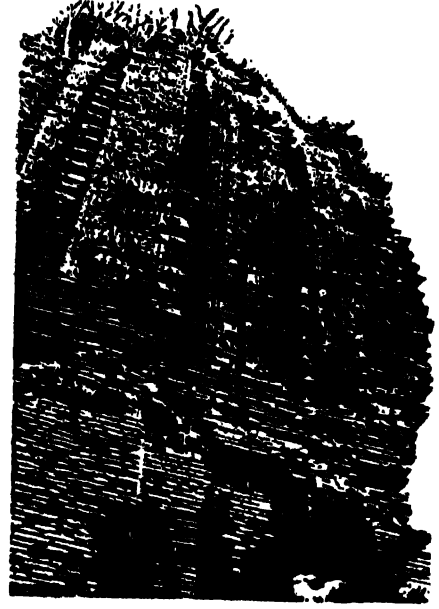
গণ্ডীর অলঙ্করণ। শিখর-মন্দির। সাতদেউলিয়া।

স্থাপত্যের এই মূলগত আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য সমানভাবে প্রকাশ পেয়েছে পুরুলিয়ার দেউলঘাট গ্রামের তিনটি মন্দিরে এবং পারা গ্রামের উদয়চণ্ডী মন্দিরে। ইঁটের তৈরী এই মন্দির চারটির অঙ্গবিন্যাস করা হয়েছে বরাকরের সিদ্ধেশ্বর-মন্দিরের উত্তরাধিকার নিয়ে। মন্দিরগুলোর মূলত ত্রিরথ আসন ক্রমোন্নয়মান উপপগর সমাবেশে বৈচিত্র্যময় এবং জটিল আকার ধারণ করেছে। বর্তুলায়িত ধার সমন্বিত এইসব পগ উপপগর প্রভাবেই মন্দিরদেহ হয়ে উঠেছে বোলাড়া এবং পশ্চিমজটার মন্দিরের মত বর্তুলায়িত, সুঠাম এবং সুকুমার। বাড় তিনটি অঙ্গে বিভক্ত। জাঙ্ঘে রাহা পগর ওপরে রয়েছে অলঙ্কৃত শিখরমন্দিরের প্রতিকৃতি এবং তার পাশে কণিক পগর। ওপরে দেখা যাবে অলঙ্কৃত দণ্ডের সমাবেশ। দেউলঘাটের দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্দিরে তো কণিক পগর ওপরেও লালিত্যময় অলঙ্কৃত শিখরের প্রতিকৃতি বসানো, পারার মন্দিরেও কণিক পগর ওপরে শিখর মন্দিরের প্রতিকৃতি দৃষ্টিগোচর। এইসব অলঙ্কারবস্তুর সমাবেশ বরাকর ও সোনাতপাল মন্দিরেই দেখা গিয়েছিল। মন্দিরগুলোর বরণ্ড ও গণ্ডীর বহিঃরেখা বোলাড়ার মন্দিরটির অনুরূপ। বিচিত্র ও সূক্ষ্ম অলঙ্কারমণ্ডিত গণ্ডীতে অবশ্য ভূমি-আমলক ও ভূমি-বরণ্ডের স্থান নেই।

ত্রিরথআসন, ত্রিঅঙ্গবাড় এবং জাঙ্ঘের উপর অলঙ্কৃত দণ্ড এই কটি বৈশিষ্ট্যের প্রশ্নে অবশ্য পুরুলিয়ার এই মন্দিরগুলি শিখররীতির একটা বৃহত্তর আঞ্চলিক রূপভেদের অংশ। এই রূপভেদ পরিব্যাপ্ত হয়েছিল উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ থেকে বিহারের সিংভূম অতিক্রম করে উত্তরে ধানবাদ জেলা পর্যন্ত।

পুরুলিয়ার মন্দির গণ্ডীর অলঙ্করণবিন্যাসে ও বিষয়বস্তুতে বোলাড়া ও পশ্চিম-

জটার মন্দির থেকে কিছুটা পৃথক বটে; কিন্তু অলঙ্করণের নীতি ও উদ্দেশ্য একই। লঘু-ভার; পরিমার্জিত সুঠাম মন্দিরদেহের দীঘল গড়নের মূলগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলঙ্কারিক স্থাপত্যের গতিপথবাহী সূক্ষ্ম, সুষমামণ্ডিত অলঙ্করণ স্থাপত্যের ওই বৈশিষ্ট্যকেই প্রস্ফুটিত করে তুলেছে। দেউলঘাটের দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্দির দুটিতে বাড়ের ওপর যে অলঙ্করণ দেখা যায় সে মন্দিরের আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যকেই আরও দীপ্যমান করে তুলেছে। আসন এবং বাড়ের অঙ্গবিন্যাস ও অলঙ্কারে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাই মূলগত ধারণার প্রশ্নে বোলাড়া-পশ্চিমজটা-দেউলঘাট-পারার মন্দিরগুলো একই সূত্রে গ্রথিত।

পুরুলিয়া জেলায় পাথর সহজলভ্য। এই কারণে পাথরের মন্দিরই নির্মিত হয়েছে সর্বাধিক। তবে পাল-সেন যুগে নির্মিত বলে চিহ্নিত করা যায় এমন পাথরের মন্দিরের সংখ্যা অল্প। যে দুটি রয়েছে তার মধ্যে একটিতে, তেলকুপির ছয় নম্বর মন্দিরটিতে, ইঁটের মন্দিরে যে ধারণা ও উৎকর্ষ প্রকাশ পেয়েছে তার বিশেষ কোনো পরিচয় নেই। অপর মন্দিরটি হ'ল কাশীজোড়া গ্রামের শিবমন্দির। সাম্প্রতিককালে পুনর্গঠিত এই মন্দিরের নীচের দিকে আদিরূপ এখনো অক্ষত আছে। এখানে দেখতে পাই পাভাগর মোলডিং দেউলঘাটের মন্দির-গুলোর অনুরূপ। দেউলঘাটের দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্দিরে রাহা এবং কণিক পগর উপর অলঙ্কৃত শিখর-মন্দিরের প্রতিকৃতি বিন্যস্ত।

তেলকুপির ছয় নম্বর মন্দিরটি এই গ্রামের অন্যান্য মন্দিরের সঙ্গে পাঞ্চেৎ জলাধারের গর্ভে নিমজ্জিত। ১৮৭২ সালে বেগলার ও ১৯০৩ সালে ব্লক মন্দিরটির যে আলোকচিত্র তুলেছিলেন সেগুলো সম্প্রতি শ্রীমতী দেবলা মিত্রের তেলকুপির মন্দির সম্বন্ধীয় গ্রন্থে ছাপা হয়েছে (মিত্র, ১৯৬৮)। ছবি দেখে মনে হয় তেলকুপির এই মন্দিরে যে স্থাপত্যভাবনা প্রকাশ পাচ্ছে সেটা ইঁটের মন্দিরের স্থাপত্যভাবনা থেকে পৃথক। নবরথ মন্দিরটির বাড় ত্রিঅঙ্গ। জাঙ্ঘে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছে রাহা পগর ওপরে শিখরমন্দিরের প্রতিকৃতি এবং অন্য পগগুলোর ওপরে দণ্ড স্থাপন করে। বেগলারের তোলা ছবিতে মন্দিরটিকে খর্বাকৃতি বলেই মনে হয়। মন্দিরটির দেহও কিছুটা গুরুভার। গণ্ডীটি প্রথমাবধিই কেন্দ্রের দিকেই ঝুঁকে উঠেছে। খানিকটা ওঠবার পর গণ্ডীর বহিঃরেখায় ellipsoidal বাঁকের লক্ষণ সুস্পষ্ট।

গণ্ডীর আনুভূমিক বিভাগের উপর জোরটা পড়েছে। সাতটি ভূমি-আমলকের বিভাগের সঙ্গে রয়েছে ঘনসন্নিবিষ্ট ভূমি-বরণ্ডের সমাবেশ। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ভূমি-বরণ্ডগুলো গণ্ডীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তারিত। ডিহরের ষাঁড়েশ্বর মন্দিরে গণ্ডীর যে সামান্য অংশটুকু অবশিষ্ট আছে তাতেও দেখছি ভূমি-বরণ্ড গণ্ডীর ওপরে এমনিভাবেই প্রসারিত করা। তবে এই মন্দিরটিতে ভূমি-বরণ্ডের গড়ন অনেক বেশী দৃঢ় এবং ভারী। বিপরীতমুখী পগ ও ভূমি-বরণ্ডে বিভক্ত তেলকুপির এই মন্দিরে গণ্ডীটি কিন্তু অলঙ্কৃত। অলঙ্করণের বিষয়বস্তু এবং রূপ ইঁটের মন্দিরে যে অলঙ্কার দেখা যায় তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে সাদৃশ্যযুক্ত। কিন্তু সুস্পষ্ট ও দৃঢ় গঠনের ভূমি-বরণ্ড বিভক্ত গণ্ডীতে অলঙ্করণের ব্যাপকতা এবং প্রভাব দুই-ই অনেক সীমিত।

খর্বদেহী গুরুভার মন্দিরটির স্থাপত্যরূপের বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের কোথাও আর দেখা যাচ্ছে না। বাংলার বাইরে খিচিং-এর কুতাইতুণ্ডী মন্দিরে অনেকটা এই ধরনের স্থাপত্যরূপের পরিচয় মিলবে। উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী ময়ূরভঞ্জের সঙ্গে বাংলার সীমান্তবর্তী পুরুলিয়ার সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের একটা যোগাযোগ থাকাই সম্ভব। খিচিং-এর চন্দ্রশেখরমন্দিরে যে আলঙ্কারিক চরিত্রবৈশিষ্ট্য, তা সম্ভবত এই সূত্রেই বাংলা থেকে ময়ূরভঞ্জে গিয়ে থাকবে।

পুরুলিয়ার, পরবর্তী সময়ে নির্মিত, পাথরের শিখরমন্দিরগুলোতে কিন্তু পাল-সেন যুগের ইঁটে তৈরী শিখরমন্দিরের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। মনন ও রূপরচনার সেই গভীরতা ও উৎকর্ষ আর নেই বটে, তবে এই পাথরের মন্দিরগুলোর লঘুভার, দীঘল দেহের গঠন যে পাল-সেন যুগের ইঁটের মন্দিরগুলোর উত্তরাধিকার নিয়ে করা তাতে সন্দেহ নেই। মন্দির-স্থাপত্যে আলঙ্কারিক চরিত্রের আভাসও এই মন্দিরগুলো থেকে লুপ্ত হয়ে যায় নি।

মন্দিরদেহের এই আলঙ্কারিক চরিত্র যে শুধুমাত্র বাংলার পাল-সেন যুগে নির্মিত শিখরমন্দিরেরই বৈশিষ্ট্য এমন নয়। বস্তুত এই আদর্শের সন্ধান ভারতের অন্য অঞ্চলেও পাওয়া যাবে। আলঙ্কারিক চরিত্র সৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত নবম ও দশম শতকে নির্মিত ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর শিবের অপরূপ মন্দিরটি। সুবিস্তৃত অলঙ্কারসজ্জিত অষ্টম-নবম শতকীয় ও সিয়ার (রাজস্থান) ক্ষুদ্রকায় মন্দিরগুলি, খাজুরাহোর (মধ্যপ্রদেশ) একাদশ শতকীয় আদিনাথ মন্দির, নবম-দশম শতকীয় ওয়াধওয়ান, ঘুমলি ও মিয়ানীর (কাঠিয়াওয়ার) এবং চন্দ্রেহীর (উত্তরপ্রদেশ) মন্দিরটিও একই ভাবানুসারী। কিন্তু ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বরের সমধর্মী কোন মন্দির আগে বা পরে নির্মিত হয় নি। সুঠাম লালিত্যময় অলঙ্কারসজ্জিত মন্দিরদেহের পরিবর্তে দৃঢ় গঠনের বলিষ্ঠ, গাম্ভীর্যপূর্ণ মন্দিরই উড়িষ্যাবাসীর মনোহরণ করেছিল। রাজস্থান বা মধ্য ভারতের মন্দিরে আলঙ্কারিক চরিত্র এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়। মধ্য ভারতে আলঙ্কারিক চরিত্রের মন্দির বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত মাত্র। রাজস্থানে এই ধরনের মন্দিরচর্চা উড়িষ্যার প্রথম পর্যায়ের মন্দিরগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কাঠিয়াওয়ারে মন্দিরের এই চরিত্র যে পরিত্যক্ত হতে চলেছে সেটা তো সুনকের মন্দিরেই স্পষ্ট হয়ে যায়। শুধুমাত্র বাংলাতেই দেখছি সুদীর্ঘকাল ধরে একটা নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে স্থাপত্যের আল-ঙ্কারিক চরিত্র পরিস্ফুট করে তোলবার চেষ্টা ক্রমশ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এই প্রচেষ্টার প্রারম্ভ, ক্রমবিকাশ ও ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করলে মনে হয় না যে উড়িষ্যা বা পশ্চিম ভারতের মন্দিরগুলো বাংলার পাল-সেন যুগের শিখরমন্দিরগুলোর অনুকরণের ফল।

দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় এই মন্দিরগুলোর সঙ্গে বাংলার সমকালীন আঞ্চলিক ভাস্কর্যের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যটা লক্ষ্য করবার মত। দশম শতকে যে 'দৃঢ় শক্তিগর্ভ স্থূল দেহগঠনের আদর্শ আত্মপ্রকাশ' করেছিল (রায়, ১৯৪৯) তার সঙ্গে দশম-শতকীয় সোনাতপাল-সাত-দেউলিয়া গ্রামের মন্দির দুটোর গুরুভার দৃঢ় গঠনের মন্দিরের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়বে। মূল প্রতিমার সঙ্গে অলঙ্করণের সম্পর্কটাও অনেকটা সোনাতপাল-সাতদেউলিয়ার মন্দির-দেহের সঙ্গে অলঙ্করণের সম্পর্কেরই মত। একাদশ শতকের ভাস্কর্যে দৃঢ় শক্তিগর্ভ দেহে মোগল 'রসমাধুর্যের স্পর্শ...দেহরূপের ক্ষীণতার দিকেও প্রবণতা' বেড়ে গেল। ক্ষীণদেহে কোমল পেলব গড়নের রীতি প্রাধান্য লাভ করল। 'অন্যদিকে পৃষ্ঠপটের বৈচিত্র্য ও অলঙ্কার ক্রমবর্ধমান।...তবু, একাদশ শতকের প্রথমার্ধে প্রতিমা ও পার্শ্বদেবতা, প্রতিমা ও পৃষ্ঠপটের মধ্যে একটা ভারসাম্য বিদ্যমান' (রায়, ১৯৪৯)। বাহুলাড়া-পশ্চিমজটা-দেউলঘাট-পারার মন্দিরেও তো দেখছি ক্ষীণায়ত লালিত্যময় গঠনে অলঙ্কার-প্রাচুর্যের সমাবেশ এবং স্থাপত্য ও অলঙ্করণের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য। আঞ্চলিক ভাস্কর্যের শিল্প-ধারার সঙ্গে মন্দিরস্থাপত্যের সাদৃশ্যটা এতই ঘনিষ্ঠ যে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকে একই আঞ্চলিক শিল্পাদর্শ ও শিল্পচিন্তার দুটি পৃথক প্রকাশ বলে বুঝতে অসুবিধা হয় না।

স্থাপত্যচর্চায় আঞ্চলিক চেতনার বিকাশ অবশ্য দশম শতকের বহু পূর্বেই ঘটেছিল। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে বাংলার আঞ্চলিক মন্দিরস্থাপত্য আর একরূপে পরিণতি লাভ

করেছিল। এই পরিণত রূপের পরিচয় পাওয়া যাবে পাহাড়পুরের (রাজসাহী জেলা, বাংলাদেশ) সুবিখ্যাত বিহার-মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। খননাবিষ্কারের ফলে পাহাড়পুরে বিপুলশ্রীমিত্রের নালন্দালিপিতে যে বিহারকে বসুধার একতম নয়নানন্দ বলে বর্ণনা করা হয়েছে সেই সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়েছে। বিহারটির সুপ্রশস্ত অঙ্গন ঘিরে চারদিকে রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাস-কক্ষ, আর কেন্দ্রস্থলে একটি অতিকায় মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ। অতি বৃহৎ যোগচিহ্নাকৃতি আসন সমন্বিত মন্দিরটি উত্তর-দক্ষিণে ৩৫৬´ ৬´´ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩১৪´ ৬´´ বিস্তৃত। ভগ্নাবস্থায় ক্রমহ্রস্বমান তিনটি তলে বিভক্ত মন্দিরটির উচ্চতা ৭৫´। মন্দিরটি গঠিত হয়েছে একটি দৈত্যাকার স্তম্ভকে ঘিরে। স্তম্ভটি সোজা ওপরের দিকে উঠে গেছে, তার চারপাশে বিস্তার লাভ করেছে মন্দিরের বিভিন্ন অঙ্গ। প্রথমেই ভিত্তিস্তরের সমতলে সুপ্রশস্ত চত্বরের শেষে যোগচিহ্নাকৃতি প্রাচীরবেষ্টিত প্রদক্ষিণ-পথ। এর ওপরে কেন্দ্রীয় স্তম্ভের চারদিকের প্রত্যেকটি দেওয়াল থেকে প্রসারিত হয়ে রয়েছে একটি করে আয়তাকার বাহু। কেন্দ্রীয় স্তম্ভের চারদিকে সমান্তরালভাবে এই বাহু চারটি যোগ করবার ফলেই উদ্ভূত হয়েছে মন্দিরটির যোগচিহ্নাকৃতি আকার। নীচের প্রদক্ষিণ-পথটি এই আকারেরই অনুসারী। এই বাহু চারটিকে ঘিরে প্রথমতলের প্রাচীরবেষ্টিত প্রদক্ষিণ-পথ ঘুরে এসেছে। প্রথম তল থেকে সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে পৌঁছলে দেখা যাবে এখানে হ্রস্বায়ত আকারে একই রকম প্রসারিত বাহু ও বাহুচতুষ্টয়কে ঘিরে প্রদক্ষিণ-পথ বিদ্যমান। তবে প্রথম তলের ভরাট বাহুগুলোর ওপরে দ্বিতলের বাহুগুলো পূজাকক্ষ ও তার সম্মুখবর্তী প্রশস্ত মণ্ডপে রূপান্তরিত হয়েছে। দ্বিতল থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে ত্রিতলে। এখানে সবটাই প্রায় ভগ্ন। এ পর্যায়ে অবশ্য প্রসারিত বাহুর সংযোজন হয় নি। কেন্দ্রীয় শূন্যগর্ভ স্তম্ভটির চারদিক বেষ্টন করে রয়েছে প্রদক্ষিণ-পথ। সম্ভবত এরই কেন্দ্রস্থলে—কেন্দ্রীয় স্তম্ভটির ওপরে উঠেছিল একটি সুউচ্চ শিখর-সৌধ (দীক্ষিত, ১৯৩৮ এবং সরস্বতী, ১৯৪৩)।

মন্দিরটির বেষ্টনপ্রাচীর, আচ্ছাদন, শিখর, চূড়া সবই আজ ভগ্ন। কিন্তু এখনও এই চতুঃসংস্থানসংস্থিত, সর্বতোভদ্র মন্দিরটির যা অবশিষ্ট আছে তাতে এই মন্দিরটি যে সুপরিণত স্থাপত্যচিন্তার ফল সে কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই বিপুল বিস্তারের মধ্যে এতগুলি প্রদক্ষিণ-পথ, পূজাগৃহ, মণ্ডপ এবং সর্বোপরি শিখর-সৌধের সমাবেশ নিঃসন্দেহে সুদীর্ঘ চর্চা ও ভাবনা-কল্পনার ফল। সত্যই, মন্দিরটির গঠনপরিকল্পনা, আকৃতি, অঙ্গবিন্যাস ও বিস্তারের কথা ভাবলে একথা স্বীকার করতে বাধা থাকে না যে পাহাড়পুরের এই মন্দির প্রাচীন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিস্ময় (রায়, ১৯৪৯)।

অনুরূপ যোগচিহ্নাকৃতি আকারের আরও দুটি মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে বৃহত্তর যেটি তার সন্ধান পাওয়া গেছে সম্প্রতিকালে, ময়নামতীতে (কুমিল্লা জেলা, বাংলাদেশ) প্রাচীন শালবন-বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। বিহার-অঙ্গনের কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান মন্দিরটি উত্তর-দক্ষিণে ১৭০ ফুট প্রসারিত। পূর্ব-পশ্চিমেও তাই। মন্দিরটির আকার ও গঠন-পরিকল্পনা পাহাড়পুর মন্দিরেরই মত। ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না (খান, ১৯৬৩)। দ্বিতীয় মন্দিরটির অবস্থান সোমপুর বিহারের অঙ্গনের মধ্যেই। মূল মন্দিরের অনুসারী এই মন্দিরটি অবশ্য আকারে মূল মন্দিরের তুলনায় ক্ষুদ্র।

কাশীনাথ দীক্ষিত অনুমান করেছিলেন যে জৈন চতুর্মুখ আকার থেকেই পাহাড়পুরের চতুসংস্থান-সংস্থিত সর্বতোভদ্র স্থাপত্যরূপের উদ্ভব হয়েছিল (দীক্ষিত, ১৯৩৮)। এ অনুমানকে অনেকেই যথার্থ বলে মনে করেন (সরস্বতী, ১৯৪৯ এবং রায়, ১৯৪৯)। কিন্তু

বিভিন্ন অঙ্গসমাবেশে রচিত তলবিভক্ত প্রসারিতবাহু মন্দিরদেহের যে রূপটি পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও ফুটে ওঠে, ভারতবর্ষের অন্য কোথাও তার সঙ্গে তুলনীয় কোন সৌধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। এই স্থাপত্যরূপ বাংলার আঞ্চলিক স্থাপত্যচিন্তারই ফল।

রংপুর জেলার (বাংলাদেশ) বিরাট গ্রামে একটি বৃহৎ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছিল। চারদিকে প্রবেশ-পথসম্বলিত মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ১৯৫´×১৫০´। গঠনকৌশল ও অঙ্গসজ্জার প্রশ্নে মন্দিরটি পাহাড়পুরের মূল মন্দিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সাদৃশ্যযুক্ত। তবে চতুর্মুখ আসন ও গঠন-পরিকল্পনা পাহাড়পুর মন্দির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই মন্দিরে পূজাকক্ষটি ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তাকে ঘিরে চতুর্মুখ মন্দিরসংস্থানটি গড়ে উঠেছে।

খননাবিষ্কারের ফলে মহাস্থানগড়ে (বগুড়া, বাংলাদেশ) বেশ কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে। গোবিন্দভিটায় প্রাপ্ত একটি অষ্টম-নবম শতকীয় মন্দিরের সুউচ্চ ভিত্তিভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে। ভিত্তিটির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে চারটি দেওয়ালের সমবায়ে গঠিত একটি সংস্থান। কিছুটা দূরে সমান্তরালভাবে অবস্থিত আর এক সার দেওয়ালের সঙ্গে এই কেন্দ্রীয় সংস্থানটিকে যুক্ত করা হয়েছে ছোট ছোট সংযোজনকারী দেওয়াল তুলে। এইভাবে কেন্দ্রীয় সংস্থানটিকে ঘিরে রচিত হয়েছে অনেকগুলি ছোট ছোট কোষকক্ষ। কেন্দ্রীয় সংস্থানের মধ্যস্থলে একটি চত্বর দেখা যায়। এই চত্বরটিকে ঘিরে গড়ে তোলা সমান্তরাল ও সংযোগকারী দেওয়ালের সমাবেশে সৃষ্ট হয়েছে আরও কতগুলি কোষকক্ষ (দীক্ষিত, ১৯৩৩)। মহাস্থানের নিকটবর্তী গোকুলপল্লীতে সুবৃহৎ মেঢ়স্তূপের মাটি খুঁড়ে আর-একটি বৃহদাকার মন্দিরের ভিত্তিভূমি উন্মোচিত হয়েছে। বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত একশত বাহাত্তরটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষকক্ষের সমাবেশে ভিত্তিভূমিটি গঠিত। এখানেও উপরের স্তরে রয়েছে একটি ইঁটের চত্বর, তারই চারদিক ঘিরে সমান্তরাল ও সংযোগকারী দেওয়াল তুলে কোষকক্ষগুলোকে গড়ে তোলা হয়েছে। এই দুটি ভিত্তিভূমির গঠন দেখে মনে হয় কেন্দ্রীয় চত্বরের চারদিকে সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি গড়ে তোলবার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। দ্বিতীয় মন্দিরটিতে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত কোষ-কক্ষগুলির গভীরতা ৫ ফুট-৭ ফুট পর্যন্ত। সর্বোচ্চ স্তরে মন্দিরের চত্বরটি রয়েছে ভূপৃষ্ঠের ৪০ ফুট ওপরে। কোষকক্ষগুলোকে মাটি দিয়ে ভরাট করে শক্তভাবে পিটিয়ে নেবার পর যে ভিত্তিভূমি প্রস্তুত হয়েছিল সেটা যে সুবিশাল মন্দির নির্মাণ করবার জন্য তাতে আর সন্দেহ কি (মজুমদার, ১৯৩৭)। মহাস্থানের বৈরাগীর ভিটায় অষ্টম-নবম শতকীয় যে মন্দিরটির ভিত্তিভূমি আংশিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে তার আকৃতিও বিশাল ছিল বলেই মনে হয়। পূর্ব-পশ্চিমে ভিত্তিভূমিটির পরিমাপ ৯৮ ফুট (দীক্ষিত, ১৯৩৩)।

বাংলাদেশের আঞ্চলিক স্থাপত্যের প্রায় সাড়ে চারশ' বছরের কথা আলোচনা করা হল, এর মধ্যে বাংলাদেশের ইতিহাসে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এর প্রথম দিকে রয়েছে ভারতবর্ষে আঞ্চলিক রাষ্ট্রশক্তি ও সংস্কৃতি বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে পাল রাজবংশের উত্থানের কাহিনী। গোপাল এই রাজবংশকে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠা ও শক্তির ওপর নির্ভর করে বাংলার আঞ্চলিক পাল-রাষ্ট্র উত্তরাপথে সাম্রাজ্য বিস্তার করে প্রাধান্য অর্জনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। ধর্মপাল (আঃ ৭৭০-৮১০ খৃঃ) ও দেবপাল (আঃ ৮১০-৮৫০) যে এই প্রচেষ্টায় অনেকটা সফলও হয়েছিল সে কথা আজ সুপরিজ্ঞাত। দেবপালের পর এই সাম্রাজ্য ক্রমশ ভেঙে পড়েছিল। এমনকি আঞ্চলিক রাষ্ট্রশক্তিও দেখছি

দুর্বল ও বিপর্যস্ত। পাল রাজ্যের অনেকটাই ক্রমে 'অনধিকৃতবিলুপ্ত' হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আবার বাংলার কেন্দ্রীয় পাল রাজ্য সুসংহত ও পালসাম্রাজ্য পুনর্বিস্তৃত হ'ল প্রথম মহীপালের (আঃ ৯৮৮-১০৩৮) বাহুবল ও প্রচেষ্টায়। কিন্তু ইতিমধ্যেই পাল-রাষ্ট্রের মধ্যে স্থানীয় আত্মকর্তৃত্বের প্রভাব প্রবল হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন স্থানে, পরাক্রান্ত রাজবংশের উদ্ভবও হয়েছে। এমনি একটি রাজবংশ, চন্দ্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলার পূর্বপ্রান্তে শ্রীহট্ট-কুমিল্লা অঞ্চলে। অবশেষে 'অনন্তসামন্তচক্রের' মধ্যে পাল-রাষ্ট্র খন্ড খন্ড হয়ে ভেঙে পড়ে গেল। রামপাল (আঃ ১০৭৭-১১২০) এবং তাঁর পরে সেনবংশীয় বিজয়সেন (আঃ ১০৯৫-১১৫৮), বল্লাল সেন (আঃ ১১৫৮-১১৭৯) এবং লক্ষণ সেন (আঃ ১১৭৯-১২০৫ (?)) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তিকে আবার সংহত ও শক্তিশালী করে তোলবার প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের এই সাফল্য যেমন সাময়িক তেমনি আংশিক। 'অনন্তসামন্তচক্রের' ভেদবুদ্ধি ও পরাক্রম লাঘব করবার মত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র আর কখনই ফিরে পায় নি। অবশেষে তুর্কী আক্রমণে বাংলাদেশের একটা বৃহৎ অংশ সেনশক্তির হস্তচ্যুত হয়ে গেল। হতমান সেনরাজবংশ আশ্রয় নিলেন পূর্ববঙ্গে।

রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে অর্থনৈতিক জীবনের পরিবর্তন। পাল আমলের মধ্যকালে বা তার আগে থেকেই বাংলার বাণিজ্যসমৃদ্ধিতে ভাঁটা পড়তে শুরু করেছে। তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতন বোধহয় পাল আমলের আগেই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে (রায়, ১৯৪৯)। ভারতবর্ষের মধ্যে স্থল ও উপকূলবাহী বাণিজ্যও অবশেষে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। বাংলার অর্থনীতি পাল আমলের মধ্যকাল থেকেই ক্রমশ ভূমিনির্ভর হতে আরম্ভ করল এবং শেষে দেখতে পাচ্ছি এ অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবেই কৃষিভিত্তিক। রাজনীতি ও অর্থনীতির মাধ্যমে জীবনের যে বিস্তার এতকাল ছিল, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে ঐহিক ও মানসিক ঐশ্বর্য সঞ্চয়ের সুযোগ ছিল সে সবই ক্রমশ কমতে কমতে একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেল। পরবর্তী পালরাজা ও সেনরাজাদের আমলে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশবাসী গৃহ-প্রান্তের মধ্যে একান্তভাবে আবদ্ধ।

পালযুগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের এইসব পরিবর্তন ও উত্থান-পতনের মধ্যে গড়ে উঠছিল বাঙালীর আঞ্চলিক চেতনা ও সত্তা। লিপি, ভাষা, শিল্পচর্চা, ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় সত্তাকে আশ্রয় করে বাংলার আঞ্চলিক চেতনা বিকাশ লাভ করছিল এবং বাংলা-দেশবাসী জনের আঞ্চলিক চেতনা গড়ে উঠছিল। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই সত্তার সূচনা হয়েছিল সপ্তম শতকেই। কিন্তু পালরাজাদের সময়েই বাংলার রাষ্ট্রীয় ও ভৌগোলিক সত্তা সুনির্দিষ্ট রূপলাভের পথে অগ্রসর হতে থাকে। এর সঙ্গে একই সময়ে হচ্ছিল বাংলার আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশ। পাল-সেন আমলের ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় এই সৃজনশীল আঞ্চলিক সংস্কৃতির পরিচয় বিধৃত হয়ে রয়েছে (রায়, ১৯৪৯)। মন্দিরস্থাপত্য সম্বন্ধেও এই কথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে।

পাল-সেন আমলের যে সমস্ত আঞ্চলিক মন্দিরের কথা বলা হয়েছে আপাতদৃষ্টিতে তাদের মধ্যে কিন্তু নিরবচ্ছিন্নতার লক্ষণ দেখা যায় না। আয়তন ও আকৃতি উভয় প্রশ্নেই পাহাড়পুর-ময়নামতী-বিরাট-মহাস্থানের মন্দিরগুলোর সঙ্গে দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর শিখরমন্দিরের বিপুল প্রভেদ। পাহাড়পুর প্রভৃতি মন্দিরগুলোর তুলনায় দশম শতক ও পরবর্তী সময়ের মন্দিরগুলো ক্ষুদ্রায়তন দেবগৃহমাত্র। আঞ্চলিক স্থাপত্যের মধ্যে এই বিরাট পার্থক্যের কারণটা আঞ্চলিক ইতিহাসের ধারার মধ্যে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। অষ্টম-

নবম ও দশম শতকে বাংলার আঞ্চলিক চেতনা ও সত্তা বিকাশের প্রথম পর্যায়ে পাল রাষ্ট্রশক্তি বাংলাদেশ হয়ে উত্তরাপথে সাম্রাজ্যবিস্তারে উন্মুখ। পূর্বে, ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরে চন্দ্র রাজবংশও পরাক্রান্ত ও দৃঢ় ভিত্তির ওপর অবস্থিত। সামুদ্রিক ও স্থল বাণিজ্যের দূরপ্রসারী যোগাযোগ তখনও অব্যাহত। এই শক্তি, সাহস ও বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে পাহাড়পুর-ময়নামতী-বিরাট-মহাস্থানের মন্দিরসমূহের সৃষ্টি। সুপ্রতিষ্ঠিত শক্তি ও জীবনের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃত অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্থাপত্যরূপের বিশালত্ব ও মহত্ত্বের যোগাযোগের প্রশ্নটা উপেক্ষা করা চলে না।

ক্ষুদ্রায়তন শিখরমন্দিরগুলো নির্মিত হয়েছে দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকে। এই সময় বাংলাদেশবাসী সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ও ভূমিনির্ভর, প্রসারবিমুখ জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র দুর্বল, অক্ষম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় শক্তিসমূহ—অনন্তসামন্তচক্র—তখন রাষ্ট্রক্ষমতার নিয়ামক। বহির্বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ। একান্তই কৃষিভিত্তিক জীবনের অতিসীমিত বিস্তারের মধ্যে জীবনের অভিজ্ঞতা অল্প; চিন্তা ও মননের ক্ষমতা এবং সাহসও সীমিত। দুঃসাহসী বিরাট পরিকল্পনা, অতিদৃঢ় গঠনের, বিপুল-বিস্তার সুউচ্চ প্রাসাদ-সৌধশ্রেণী গঠন করবার মত মানসিক ক্ষমতা আর নেই। এই সময়ের মন্দিরগুলো ক্ষুদ্রায়তন। শক্তি ও সাহস প্রকাশের পরিবর্তে অন্তর্মুখী ভাবে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য চর্চার প্রবণতাই হয়ে উঠেছে বড়। সংক্ষিপ্ত আয়তনের মধ্যে সূক্ষ্ম এবং অনুভূতিসাপেক্ষ সৌন্দর্যসৃষ্টি, লঘুভার, পরিমার্জিত এবং অলঙ্কারবহুল মন্দিরদেহ গঠনই তখন স্থাপত্য-চর্চার আদর্শ।

পাহাড়পুর-ময়নামতী-বিরাট-মহাস্থান থেকে সোনাতপাল-সাতদেউলিয়া-পশ্চিমজটা-বোলাড়া-দেউলঘাট-পারা-তেলকুপি-ডিহরের এই প্রভেদ যে বিরাট পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে তাতে সন্দেহ নেই। আয়তনের প্রশ্নে প্রতিষ্ঠাতার অর্থসঙ্গতি একটা যুক্তি হতে পারে। এ কথাও বলা যেতে পারে যে বিরাটকায় মন্দিরগুলো সবই পূর্ববঙ্গে অবস্থিত এবং স্বল্পায়তন শিখর-মন্দিরগুলো সবই রাঢ়ভূমির সৃষ্টি, তাই প্রভেদ স্থানীয় সংস্কৃতিগত। কিন্তু এসব যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় মন্দিরনির্মাণে আদর্শের যে পরিবর্তন ঘটেছিল তার মূল কারণ নিহিত আছে আঞ্চলিক ইতিহাসের গতি পরিবর্তনের ধারার মধ্যে। বৃহত্তর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে সব পরিবর্তন ঘটছিল মন্দির-স্থাপত্যের আদর্শ পরিবর্তন তারই প্রভাবকে স্পষ্ট করে তুলেছে। পালযুগের মাঝামাঝি সময়ের পরে বৃহৎ কর্মশক্তি ও উদ্যমের কোন পরিচয়ই আর নেই। বিপুলায়তন মন্দিরের কথাও আর শোনা যাচ্ছে না। বস্তুত একান্ত গ্রাম্য, কৃষিনির্ভর জীবনে তার সুযোগই বা কোথায়! জীবনটাই হয়ে এসেছে সংকীর্ণ, অভিজ্ঞতাও অল্প। এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই স্বল্পায়তনের মধ্যে সূক্ষ্ম রূপচর্চা মন্দিরস্থাপত্যের আদর্শ হিসাবে গড়ে উঠেছে।

তথ্য-সূত্র

এফ. এ. খান—১৯৬৩, *Mainamati*, Ministry of Education, Govt. of Pakistan করাচী (?)।

নির্মলকুমার বসু—১৯৫৪, Barakar Temple No. IV, *Proceedings of the Indian History Congress, History Congress,* 17th Session, আহমেদাবাদ।

ঐ ১৯৬৭, Methods of Dating Indian Temples, *Culture and Society in India,* Asia Publishing House, Bombay।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—১৯৬৪, "বাঁকুড়ার মন্দির", কলিকাতা।
ঐ ১৯৭১, "বাঁকুড়ার পুরাকীর্তি", কলিকাতা।
জে. ডি. বেগলার—১৮৭৮, Report of a Tour Through the Bengal Provinces in 1872-73, *Annual Report of the Archaeological Survey of India, VIII.* কলিকাতা।
পার্সি ব্রাউন—১৯৬৫, (নবমুদ্রণ), *Indian Architecture* (Hindu and Buddhist Periods), বোম্বাই।
ননীগোপাল মজুমদার—১৯৩৭, Exploration in Bengal, *Annual Report, A.S.I, 1934-35,* দিল্লী।
দেবলা (শ্রীমতী) মিত্র—১৯৬৮, *Telkupi, Memoirs* of the A.S.I, No. 76, দিল্লী।
ডেভিড ম্যাককাচ্চন—১৯৬১, Temples of Purulia District,, *Census Handbook,* 1961 *—Purulia.* কলিকাতা।
কাশীনাথ দীক্ষিত—১৯৩৩, Excavations in Bengal, *Ann. Rep, A.S.I., 1928-29,* দিল্লী।
—১৯৩৮, *Excavations of Paharpur,* Memoirs of the A.S.I., No. 55, দিল্লী।
নীহাররঞ্জন রায়—১৯৪৯, "বাঙ্গালীর ইতিহাস", আদিপর্ব, কলিকাতা।
সরসীকুমার সরস্বতী—১৯৩৩, The Begunia Group of Temples, *Journal of the Indian Society of Oriental Art,* 1, 2.
ঐ ১৯৪৩, *Architecture, History of Bengal,* I. ঢাকা।

রাজনগর

অমিয়ভূষণ মজুমদার

নয়নতারার মনে ছিলো রানী ফরাসডাঙ্গার মন্দির দেখে আসার কথা দুবার বলেছিলেন অল্প সময়ের মধ্যে। সুতরাং দুএকদিন পরেই একদিন দুপুরের রোদ প'ড়ে গেলে নয়নতারা রাজবাড়ির পাল্কীতে ফরাসডাঙ্গা যাচ্ছিলো।

একজন বরকন্দাজ পাল্কীকে অনুসরণ করছে। রূপচাঁদও আছে। তারও নাকি ওদিকে দরকার। পাল্কীটা আটবেহারার।

আগে ছিলো গঞ্জ এখন কেউ বলে স্কুলডাঙ্গা কেউ বলে সাহেবপাড়া। স্কুল, বাগচীর বাড়ি, কিছু দিন হয় সেখানে নিয়োগী মাস্টারের জন্যও একটা বাড়ি হয়েছে,—এই মিলেই সাহেবপাড়া।

সাহেবপাড়ার কাছে রূপচাঁদ পাল্কীর দরজার কাছে এসে বললো,—রাজকুমারকে দেখছি, মা, বাগচী সাহেবের দরজায়।

পাল্কীর দরজায় মুখ বাড়িয়ে নয়নতারা দেখতে পেলো হেডমাস্টারের কুঠির লতার বেড়ার দরজার এপারে রাজকুমার, ওপারে কেট এবং বাগচী নিজে। অনুমান হয় রাজু কোথাও যেতে যেতে এইমাত্র থেমেছে। কারণ তখনও সে ঘোড়ার পিঠেই।

নয়নতারা বললো,—রূপচাঁদ, পাল্কীকে ধরতে বলো একটু।

ওদিকে পাল্কীর হুমহুম শব্দে রাজুও মুখ ফিরিয়েছিলো।

পাল্কী ধরতে নয়নতারা মুখ বাড়িয়ে বললো,—ঠিক একটা ছবিই যেন।

রাজচন্দ্র বললো,—সে কি, কোথায় চলেছো এই পড়ন্ত বেলায়? কেট, তুমি কি নয়নঠাকরুনের এই কবরেজি সম্বন্ধে কিছু ভেবেছো? সে নিশ্চয় কবরেজিতেই বেরিয়েছে।

নয়নতারা বললো,—রাজকুমার নিজে কি ভাবেন তা জানলে প্রজাদের সুবিধা হয়। তা নয়, ক্যাথারীন?

বাগচী বললো,—তা অবশ্যই। কিন্তু যদি রোগীর সে রকম আশু প্রয়োজন না থাকে, নয়নঠাকরুনও যদি কিছুক্ষণের জন্য আসতেন আমাদের কুটীরে আমরা ধন্য হই।

বাগচীর সঙ্গে রসিকতা চলে না। সুতরাং নয়নতারা জানালো সে চিকিৎসা করতে যাচ্ছে না। সে যখন বললো সে ফরাসডাঙ্গায় যাচ্ছে মন্দির দেখতে এবং কেটের যদি তেমন কাজ না থাকে তবে তাকেও নিয়ে যেতে ইচ্ছুক তখন বাগচী উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো। কেট বললে একটু আগে জানতে পারলেও আর কিছু না হ'ক, নয়নতারার সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্যকে সে আঁকড়ে ধরতো। একথা শুনে নয়নতারা বললো কিছু আগে জানা যদি আধঘণ্টা আগে জানা হয় তবে কেটের পোশাক বদলানোর জন্য সে আধঘণ্টা অপেক্ষা করতেও পারে।

একটা হাল্কা স্ফূর্তির আবহাওয়া গড়ার দিকেই যেন আলাপের ঝোঁক।

নয়নতারাই বললো,—পোশাক বদলানোর দরকারও করছে না, কারণ যে পোশাকে রাজকুমারকে অভ্যর্থনা করা যায় সে পোশাকে রাজ্যের সর্বত্র যাওয়া যায়, তাই নয় মাস্টারমশাই?

বাগচী হেসে বললো,—এরপরে, কেট, তোমার ওজোর খাটছে না।

রাজচন্দ্র বেহারাদের হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলো পাল্কী নামাতে। কেট গেট খুলে বাইরে

এসে বললো,—গেট্ ইন, প্লিজ গেট্ ইন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কেট ও রাজকুমার নয়নতারার সঙ্গী হ'লো। রাজকুমার, নিশ্চিতই, এজন্য নয় যে নয়নতারা তার বিলোল কটাক্ষপাত ক'রে বলেছিলো দুজন স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজকুমারের সঙ্গী হওয়া উচিত। বরং রাজুর নিজেরই মনে হয়েছিলো তার কি ভালো লাগবে এদের দুজনের সঙ্গী হ'তে?

নয়নতারা রাজকুমারের মুখের দিকে চাইলো এই দ্বিধার সময়ে। মনে হ'লো, মুহূর্তের জন্য হ'লেও, তার দীর্ঘশ্বাস পড়বে। তা ঢাকতেই যেন সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—কোন কোন দেবতা বর দেয়ার আগে বড্ড বায়নাক্কা ক'রে থাকেন। দেরি হ'য়ে যাচ্ছে। এসো।

আর বাগচী তাদের সঙ্গী হ'লো না এজন্য যে নয়নতারার আমন্ত্রণের উত্তরে সে বললো,—আমার পোশাকের দুশ্চিন্তা নেই। টাট্টুও সাজিয়ে আনতে বলেছি। কিন্তু সত্যি আমাকে কবরেজি করতে যেতে হবে।

পাল্কীটা দুজনের পক্ষেও যথেষ্ট। সেটা দ্রুত চলেছে। কখনও রাজুই বরং একটু পিছিয়ে পড়ছে।

নয়নতারা একবার বললো,—আহা, ঘোড়ার কি দুর্গতি। অন্য আর একবার বললো,—রাজকুমার, রাস্তাটা চওড়াই দেখো। পাশে পাশে চলো। গল্প করবে।

পাল্কী বাহকদের প্রথা এই তারা আস্তে চলতে চায় না। তাদের ভঙ্গি দেখলে মনে হতে পারে যেন কাঁধের বোঝাই তাদের সম্মুখে ঠেলছে কিংবা তারা যেন সব সময়েই চেষ্টা করে কত তাড়াতাড়ি বোঝাটাকে নামানো যায়। চাপা হুঁহুঁ শব্দ ক'রে আটজন ছুটছে। একটা ক'রে হাত পাল্কীর দাঁড়ায়, অন্য হাত ভাঁজ ক'রে বুকের কাছে নেয়া; সেটা সেই অবস্থাতেই হুঁ-কারের তাল রাখছে।

পিছনে, কখনও পাশে, ঘোড়ার পিঠে জিনের ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে। ঘোড়াটা ঘাড় বাড়িয়ে মাথা উঁচু নিচু ক'রে চলছে। যাকে জগ্‌ট্রট্ বলে। রূপচাঁদ হাসি হাসি মুখে পিছিয়ে পড়ছে।

পথে একবার পাল্কী আর ঘোড়ার ছাড়াছাড়ি হ'লো। পিছিয়ে পড়লো রাজকুমারের ঘোড়া। আর সেই সময়ে, যেন বা এই অধ্যায়ে প্রক্ষিপ্ত, এই ব্যাপারটা ঘটলো। পথের পাশে দাঁড়িয়ে একজন গ্রামবাসী রাজকুমারকে নমস্কার করলো। তার ভঙ্গিটা এমন যেন সে কিছু বলতে চায়। লোকটি কৃষক নয়। তার গায়ে মেরজাই, পায়ে চীনা জুতো। লক্ষ্য করে রাজচন্দ্র বুঝলো লোকটিকে সে ইতিপূর্বে কোথাও দেখেছে। রাজচন্দ্র ঘোড়ার লাগাম টানলো। পাল্কী এসে পার হ'য়ে গেলো। লোকটি পথের ধারের একটা ন্যাড়া জিওলগাছের গোড়ায় স'রে দাঁড়ালো। সে কি ইতিপূর্বে রাজচন্দ্রকে এমন ধীরগতিতে কখনও যেতে দেখে নি তাই এটাকে পথের এক দর্শনীয় দৃশ্য মনে ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছে যার সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে তার জীবনের গল্পের কোন যোগ নেই। অকিঞ্চিৎকর ন্যাড়া জিওল গাছ, তার তলায় একটি বিষণ্ণ চেহারার মানুষ। তা, পথের ধারের সব দৃশ্য সব গাছপালা মনের ভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে সে তো কবিদের একটা কৌশল মাত্র।

লোকটি যেন ভাবলো, এমন নির্জন, এমন ধীরগতি রাজকুমারকে দেখা যায় না। সে বোধটাই যেন তাকে উৎসাহিত করলো।

রাজু বললো,—কিছু বলবে?

—আজ্ঞে? লোকটি দ্বিধা করলো। যেন বা নিজেকেই প্রশ্ন করলো। অনুমান করার

যুক্তি আছে যে সে যেন রাজকুমারকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিলো এবং যেন তার ফলে এরকম এক সিদ্ধান্তে পৌঁছালো রাজকুমার হয়তো নিজের বুদ্ধিতে চলার মতো বড় হয়েছেন এখন। ইতিপূর্বে যেন তাঁকে বলা আর দেওয়ান অথবা নায়েবকে বলা একই ব্যাপার ছিলো। সুতরাং বিশেষভাবে তাঁকে বলা নিরর্থক ছিলো।

রাজু জিজ্ঞাসা করলো,—তোমার নাম কি? কিই বা বলতে চাও।

—চরণদাস। আমি রাজবাড়ির স্কুলে পণ্ডিতিও করি।

একটু থেমে আবার বললো,—আমি, আমরা, খুব বিপন্ন হ'য়ে পড়ছি হুজুর।

—বিপন্ন? কি তোমাদের বিপন্ন করছে? তুমি কি সে বিষয়ে নায়েব মশায়ের সঙ্গে আলাপ ক'রে দেখেছো?

—তিনি আমাদের অবস্থা জানেন। বিপদের কথা নতুন ক'রে বলা হয় নি।

চরণদাস দ্বিধা করতে লাগলো। সে ভাবলো এখন কি বলা ভালো হবে এই অঘ্রানে ধান কাটার আগে যে ঢিলে মরসুম তার সুযোগ নিয়ে ডানকান এ গ্রামের প্রজাদের মধ্যেও নীলের দাদন দুহাতে বিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ যেন সে বেড়ে উঠেছে। শোনা যাচ্ছে নীলের নতুন হৌস গাঁথছে। এটা যেন এক বৃদ্ধিই। ডবল হ'তে চলেছে ডানকান।

রাজচন্দ্র কিছু বলার আগে ব্যাপারটা ঘটলো। রূপচাঁদ পিছিয়ে পড়েছিলো। রাজকুমার থেমে দাঁড়িয়েছেন সুতরাং তার পাল্কীর কাছে থাকা উচিত। বোধ হয় এরকম কিছু ভেবে গলিপথে বনবাদাড় কেটে পাল্কীর সঙ্গ ধরতে চেষ্টা করলো। রাজচন্দ্রের কয়েক হাত দূর দিয়ে সে এক ঝোপের মধ্যে দিয়ে ছুটলো। রাজচন্দ্র প্রায় হেসে ফেলেছিলো। কিন্তু সামনে চরণদাস, তাই গাম্ভীর্য বজায় রাখতে হ'লো। বললো,—আচ্ছা, তুমি এক কাজ ক'রো। যে কোনদিন রাজবাড়িতে গিয়ে আমার খোঁজ ক'রো। সন্ধ্যার পরেই সুবিধা হবে।

চরণদাসের মনে হ'লো সেটাই ঠিক হবে। পথের মাঝে রাজকুমারকে দাঁড় করিয়ে রাখাই বরং উচিত হচ্ছে না। সে নমস্কার করে স'রে দাঁড়িয়ে বললো,—অপরাধ নেবেন না, হুজুর, তাই হবে।

চরণদাস ভাবলো, ঝোঁকের মাথায় কাজটা কি ভালো হ'লো? সেদিনের লাগে রাজকুমার ছিলেন না, আর সেদিনই ডানকানের অমন সাধের সুরকিপাকা সড়ক কেটে দেয়া হয়েছে এ দুটোকে যোগ ক'রে কি তার ভাবা উচিত হয়েছে রাজকুমারকে বিশেষ ক'রে বিপদের কথা বলা যায়? একটু উদাস হ'লো তার মন। সে ন্যাড়া গাছটাকে লক্ষ্য করলো। তখন যেন সহিষ্ণুতাই আবার এলো মনে। সে আশা করলো—রাজকুমার আনন্দে পাল্কীর সঙ্গে ছিলেন, আবার এখনই সেখানে পৌঁছে যাবেন, মাঝখানের এই ব্যাপারটা ভুলে যাবেন।

রাজচন্দ্র লাগাম দিয়ে ঘোড়াকে আঘাত করলো। কিছুক্ষণ আগে যে পথে রূপচাঁদ অদৃশ্য হয়েছে সেদিকে চাইলো সে। না, ঝোপ নয়। আমগাছ বেয়ে বেশ ঝোপড়া মাধবীলতা, যার লতানো ডগার কিছু কিছু গলিপথটার উপরে নুয়ে এসেছে। মৌমাছি, নাকি উড়ন্ত অন্য কোন পতঙ্গ মাধবীর পাতা ও কলিতে? রাজচন্দ্র হাসলো। পাল্কীটা খানিকটা এগিয়েছে। রাজু লাগাম খাটো ক'রে পা দিয়ে আঘাত করতেই ঘোড়া ক্যান্টার করতে সুরু করলো।

খানিকটা দূরে পাল্কী ও ঘোড়া বরকন্দাজের পাহারায় রেখে তারা পায়ে হেঁটে অগ্রসর হ'লো। রূপচাঁদ অনুমতি নিয়ে নদীর ঘাটে গেলো। কে নাকি আসবে। তার একটা সহজ কারণ এই বেহারা বরকন্দাজ কাছে থাকলে কিছুটা আড়ষ্ট থাকতো তারা। নয়নতারার প্রস্তাব।

সে রাজুকে বললো,—আজকাল এত কারণ জানতে চাও কেন? তোমার সঙ্গে দুটো প্রাণের কথা বলবো না আমরা। এই ব'লে সে সাড়া তুলে হেসেছিলো।

মন্দিরটার কাছে এসে পৌঁছালো তারা। এ কখনও ঠিক নয় যে নয়নতারা তত্ত্বাবধানে আসে নি ব'লে মিস্ত্রিরা কাজে ঢিল দিয়েছে। মন্দিরটা ইতিমধ্যে আকাশ ছুঁতে চাইছে। আন্দাজে মনে হয় যাকে মন্দিরের শিখর বলা হবে তার কাছে ভারা বেঁধে কাজ হচ্ছে। চত্বরের সিঁড়ির নিচের ধাপের থেকে মিস্ত্রিদের বাঁদরের মতো ছোট দেখাচ্ছে। নয়নতারা যেখানে দাঁড়িয়েছিলো তার ডান দিকে নদী। নদী দেখা যায় না। নদীর পাড় বাঁধানো। মনে হচ্ছে আকাশ যেন বাঁধের ওদিকটা ছুঁয়ে আছে। পড়ন্ত দিনের আলোর প্রায় রঙীন আকাশ।

কেট বললো,—চত্বর সমেত কি বিরাট ব্যাপারই না হচ্ছে।

নয়নতারা বললো,—আজ আমরা মন্দিরটাকে ভালো ক'রে দেখবো চলো।

কেট বললো,—আমি?

সিঁড়ির দু এক ধাপ ইতিমধ্যে উঠেছে নয়নতারা। বললো,—সেদিন তো ডানকানরাও উঠেছিলো। উঠে এসো। এখনও প্রাণ পায় নি বিগ্রহ।

দ্রষ্টব্য বিষয় যদি আকারে প্রকারে বিশিষ্ট হয় তবে তার পাশে একা দাঁড়ানো আর অনেক মানুষের ভিড়ে দেখা অনেকটা পৃথক ব্যাপার। মন্দিরটার কাঁধের কাছে শিখরের গোড়ায় ইঁটের গাঁথুনি চলেছে। নিচেও, বলা যায় মন্দিরের কোমরের কাছে, কাজ হচ্ছে আস্তরের। ইঁট গাঁথবার সময়ে খাঁজ রেখে গিয়েছে এখন মশলার সাহায্যে টালি বসানো হচ্ছে। নিচে ওই টালির কারখানা থেকেই টালিগুলো এসে থাকবে। কাঁচা মাটির তাল কাঠের ছাঁচে চেপে টালি তৈরি ক'রে তা রোদে শুখানো হচ্ছে। ওদিকে আবার একটা পোয়ান ধোঁয়াচ্ছে। সেখানে টালিগুলো পুড়ে লাল হয়। টালিগুলো এক মাপের নয়। বড়-বড়গুলোতে একটা একটা পুরো দৃশ্য। বেলতলায় এক তপস্বী, অন্নপাত্র হাতে কোন সীমন্তিনী। পাশাপাশি বসালে এক একটা পৌরাণিক গল্প হবে। ছোটগুলোর কোনটাতে একটা হাতি, কোথাও একটা ধুমসো ককুদ-ষাঁড়। এক সারি টালি ইতিমধ্যে বসানো শেষ হয়েছে চার দেয়ালেই। বোঝা যাচ্ছে এখন তার ফলে একটা পুরো শোভাযাত্রার দৃশ্য আঁকা হয়েছে। হাতি, ঘোড়া, মানুষ, শিংএ কারুকার্য ষাঁড়, রামশিঙ্গা নিয়ে পাগড়িবাঁধা মানুষ, ঢোল নিয়ে মানুষ। কেট বললো,—এদের আকৃতিতে কিন্তু নতুনত্ব আছে।

নয়নতারা মুগ্ধ হ'য়ে দেখছিলো। সে বললো,—যেমন চোখে দেখি তেমন নয়; তাই বলছো না?

কেট বললো,—কিন্তু মনে হয় না হাতিটা যেমন অসাধারণ ঘোড়াটাও ঠিক তাই, বেশীও নয়, কমও নয়।

রাজচন্দ্র বললো,—অর্থাৎ সবই সমান অবাস্তব। কিন্তু ওদের রাজ্যের হিসাব মানো তবে সকলেই মানানসই।

নয়নতারা বললো,—রামশিঙাটা মানুষের সমান কারণ রামশিঙা বাজছে, এই ঘোড়াটা খুব কায়দা ক'রে গলা বেঁকিয়েছে সেজন্যই গলার গহনায় এত কাজ; এই হাতিটা খুব দাম্ভিক পিঠে সওয়ার নিয়ে, সেজন্য চোখ অত বড় আর কানের দুপাশে বাঁধা ঝুমকো ঝুলে মাটি ছুঁয়েছে। এমন সুন্দর আর হয় না।

হঠাৎ কেট হেসে উঠলো,—এদিকে দেখুন।

—আ-রে, এ যে দেখছি আমাদের বন্ধু! একেবারে টুপি সমেত।

টালির গায়ে হাতির পিঠে শিকারীর ছবি। হাওদা থেকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সে বাঘ শীকার করছে। বাঘটির চেহারায় দুর্গোৎসবের সিংহের ধাঁচ। আকারেও হাতির অর্ধেক অন্তত। রাজু নিজের সেই সম্ভাব্য ব্যঞ্জনা দেখে হেসে উঠলো। একটু পরেই সে বললো,—ছবি হিসাবে এটা কিন্তু বেমানান হ'য়ে গেলো। ওই রামশিঙা আর ককুদ্মান বৃষের পাশে বন্দুকটুপিধারী শিকারী মানায় না।

—কেন? বললো নয়নতারা। এই ব'লে সে একটু ভেবে নিয়ে বললো,—আচ্ছা, রাজকুমার, আকবর বাদশার সময়ে কি রামশিঙা বাজতো না, কিংবা তখন কি বলদের শিঙে সোনা রূপোর গহনা দেয়া হ'তো না কিংবা ঘোড়ার পিঠে মাটি ছোঁয়া সোনারূপোর কাজ করা রেশমের জামা?

—হতো হয়তো।

—এবং আকবর বাদশার সময়ে, শুনেছি কিংবা তসবীরে দেখেছি মনে পড়ছে না, বন্দুকে গাধা কিংবা সিংহ শিকারের ছবি আছে। এখানেও বন্দুকের গায়ে কত কারুকাজ লক্ষ্য করে দেখো।

—অর্থাৎ বন্দুক সত্ত্বেও এই শোভাযাত্রা দুতিনশ' বছরের পুরনো? কেট বললো।

—অর্থাৎ আমাকে, রাজু বললো,—তুমি আকবর বাদশায়ের সময় থেকে উঠে আসা একজন মনে কর।

নয়নতারা বলতে যাচ্ছিলো মানুষ নিজের মন দিয়ে কথার অর্থ করে। কিন্তু বললো,—তাতে কি লোকসান হবে? কিন্তু দেখো দেখো এদিকে লক্ষ্য করো টালিগুলোর পাড়ের নক্সাটা যেন আধখানা বাঁশের। একটা বাঁশিকে লম্বায় আধখানা করলে যা হয়। র'সো হয়েছে। উপরের টালির থাকের নিচের পাড়ে বাঁশের বাকি আধখানা পাওয়া যাবে।

—তাতে কি হবে?

—তখন, দেখো, আমার মনে হচ্ছে, এই শোভাযাত্রার দৃশ্যের উপরে গোটা মন্দিরটা ঘিরে যেন একটা বাঁশিগিরে রুলির নকসা ফুটবে।

না কেট, না রাজু, বাঙালিনীর প্রিয় অলঙ্কার রুলি সম্বন্ধে তাদের কল্পনা উত্তেজিত হওয়ার কিছু পেলো না। কিন্তু নয়নতারার সুন্দরের দৃষ্টিতে যেন স্বপ্নের সাময়িক ঘোর। কোন এক রমণীর রুলির ঘেরের মধ্যে মন্দির? কার হাতের রুলি হ'লে তা মানায়? নিজের হাত দিয়ে বা হৃদয় দিয়ে ঘেরা ছবিতে ফোটানো যায় না। তাই যেন নিজের বলয় দিয়ে ঘেরা। কার বলয়?

নয়নতারা বললো,—রাজকুমার, এখনও কি আকবর বাদশায়ের সময়ের কথা ভাবছো?

—কই, না!

কথাটা বোধ হয় নয়নতারার নিচের চিন্তাকে ঝুলিয়ে দেবার খিল। হেসে বললো,—অন্য ভাবেও এটা দেখা যায়, রাজকুমার। মন্দিরটা মহাকালের তো। তাঁর চোখে শিঙে সোনার টোপর পরা বলদ, কিংখাবের জামা পরা ঘোড়ার আর তোমার বন্দুক দাগা টুপি পরা আধুনিকতার মধ্যে সময়ের তফাৎ নেই যে এক শোভাযাত্রায় বেমানান হয়।

—অর্থাৎ এইসব আধুনিকতা, প্রাচীন থেকে এমন কিছু পৃথক নয়। রাজু যেন এক সমস্যার অভিনয় করলো।

নয়নতারা বললো,—আচ্ছা আমরা পরে তা ভাববো। স্বর নিচু ক'রে বললো,—লোকগুলিকে দেখো। কাছে থেকে আমাদের আলাপ শুনতেও চাইছে। লজ্জায় দূরে স'রেও যাচ্ছে। কাঁহাতক কষ্ট দেবে। ডাকো, ডেকে কথা বলো। দরকারের কথাও আছে।

রাজ্ন শোন মিস্ত্রী ব'লে ডাকতেই যে এগিয়ে এলো সে এদের মধ্যে প্রবীণ। সে বোধ হয় নিজে হাতে এখন আর কাজ করে না।

সে কাছে আসতেই নয়নতারা জিজ্ঞাসা করলো,—তোমাদের সব কাজ শেষ হ'তে আর কতদিন লাগবে মনে হয়?

সেই প্রধান মিস্ত্রী বললো,—এখন তো কাজ ভালোই চলেছে, হুজুর, শীতের বাদলে যদি বেশী না দ'মে যাই বড় পুজার আগেই রঙের কাজ সুরু করা যাবে। ওদিকে ততদিনে নাটমন্দিরের খিলান গাঁথা শেষ করতে পারবো।

রাজচন্দ্র হেসে বললো,—অর্থাৎ আরও আট ন' মাস তো বটেই। বর্ষায় কাজ অনেকদিন বন্ধ থাকলে আরও দু এক বছরও হ'তে পারে। দেখো কি মুস্কিল।

শেষ কথাটা লঘুস্বরে নয়নতারাকে বলা।

নয়নতারা বললো,—তা হ'লে কি এবারের শিবচতুর্দশীতে পুজো হবে না।

—আজ্ঞে, চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে হয়। সে জন্যই উপরের ছাতিতে সব লোক লেগেছে। এখন চার মাস ওই কাজ। পদ্মটা বসিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্দি, তারপরে ভিতরে পুজো বাইরে টালির কাজ চলবে।

নয়নতারা উপরে চাইলো। দড়ির জালে আটকানো অনেকগুলো শাখামৃগ যেন, প্রকৃত-পক্ষে বাঁশের ভাড়া বেঁধে মিস্ত্রিরা কাজ করছে। গা শিরশির করে দেখলে।

আচ্ছা, ব'লে বিদায় দিলো নয়নতারা। তারা তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো। কিছু দূরে যেখানে কুমোররা টালি গড়ছে সেদিকে যেতে চাইলো কেট।

ঠিক এরকম সময়ে কথাটা মনে হ'লো নয়নতারার। রানীমা জানতে চেয়েছিলেন মন্দিরটা কেমন দেখায় তার চোখে। এখন মন্দিরের আকার স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। বোঝা যাচ্ছে বাইরের দেয়ালটার যতটা হ'লে মানায় নকশা টালির কারুকার্যে ঢাকা থাকবে, আর তা হবে অপূর্ব রকমে সুন্দর। অন্যদিকে চত্বর সমেত মন্দিরটার বিরাট আকারও দেখো, যেন সৌন্দর্য গাম্ভীর্যে সংযুক্ত। নয়নতারার মনে হ'লো—রানীমার এরকম নির্দেশের অর্থ কি এই হ'তে পারে তিনি নিজে অত্যন্ত উৎসুক মন্দিরটা সম্বন্ধে? তা স্বাভাবিক। সেই রক্তচন্দনের পাত্রে যা ছিলো তা তাঁর বুকের রক্ত। বুকের চামড়া অনেকটা চিরে না দিলে ফোঁটায় ফোঁটায় অতটা রক্ত জমে না। কিন্তু অন্যদিকে, চলো দেখে আসি ব'লে মন্দির শেষ হওয়ার আগে আর একবার আসাটাকে লঘুতা হবে মনে করছেন। এটা কি কৌতুকের এই দোটানা? একটু পরে নয়নতারা অনুভব করলো এমন ভঙ্গিটাই মানায় রানীদের।

কেট ততক্ষণে কুমোরদের টালি কারখানার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। তাদের চারিদিকে নানা চেহারার টালি মাটিতে ছড়ানো। একেবারে কাঁচাগুলো কালো। রোদে শুকিয়ে সেগুলো ক্রমশ সাদা হচ্ছে। শুকনো টালিগুলোতে নরুনের চেহারার কিন্তু তার চাইতে শক্ত যন্ত্র দিয়ে নকসাকে কোথাও কোথাও গভীর করা হচ্ছে। পরে এগুলোকে পুড়িয়ে লাল করা হবে।

এ টালিগুলির নকসায় অন্য ধরনের ছবি। প্রত্যেকটিতে তিনটি ক'রে স্ত্রীলোক হাতে হাত ধরা। চোখের কোণ কান পর্যন্ত, কানের গহনা কাঁধ পর্যন্ত, পিঠের বেণী বুকের উপরে আনা, মাথায় ঘট বরং ডেকচির আকারে চ্যাপ্টানো, কিন্তু তাতে ফুলপাতার নকসার যেন শেষ নেই। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ত্রিভুজ আকারের ঘাগরা, তা যেন পায়ের বেঁকি মলের নকশা দেখাতেই। আর ঘাগরা তেমন হয় যদি দুর্গাপ্রতিমার মতো শোলার কাজ হয়।

সৌন্দর্য, কিংবা প্রকৃত শব্দ হয়তো রূপ, তাদের উৎফুল্ল করলো অনুমান হচ্ছে। কেটের

মুখ সুখে চক্ চক্ করছে। হাসি হাসি মুখে সে বললো,—কি সুন্দর, কি সুন্দর যে!

তারা ঘুরে দাঁড়ালো। আর তখন আবার তারা অন্য কিছুতে আকৃষ্ট হ'লো। বাঁধের নিচে নদী। আকাশরেখা যেন বাঁধের কাঁধ ছুঁয়ে আর সে আকাশে ইতিমধ্যে রঙ জমতে সুরু করেছে। আলো আসছে। সে আলোও যেন রঙীন। তারা পায়ে পায়ে বাঁধের দিকে এগিয়ে গেলো। কিন্তু ততদূর যাওয়ার আগে চত্বরে উঠবার সিঁড়ির একটা অংশ দিনশেষের রোদে যেন রঙীন ব'লে মনে হ'লো।

নয়নতারা বললো,—আমরা কি এখানে বসবো।

—অনায়াসে। এই ব'লে রাজচন্দ্র সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলো। নিজেই বসলো। বললো,—তোমরা? কিংবা সে আমার ভাবনা নয়। অনুমতি করো পাইপ ধরাই।

কেট বললো,—ধুলো নয়?

সিঁড়ির উপরে ধুলো এবং শুকনো পাতাও কয়েকটি।

রাজচন্দ্র বললো,—যথেষ্ট বলতে পারো। সে নিচের সিঁড়িতে বসে উপরের সিঁড়িতে হেলান দিয়ে তামাকের পাউচ পাইপ বার করলো।

নয়নতারা সামনে দাঁড়িয়ে রাজুকে দেখছিলো। সে বললো,—ভারি সুন্দর, না, কেট?

রাজু,—কি?

কেট,—সত্য বললে কম বলা হবে, মিথ্যা বলতে বাধছে।

রাজু,—কি?

নয়নতারা,—তুমি, রাজকুমার।

রাজু প্রথমে একটু অবাক, পরক্ষণেই হো হো ক'রে হেসে উঠলো।—কি যেন, কেট, বলো তোমরা? সেদিন বাগচীর কথায় হেসে বলেছিলো। ও—কা. পি. টা. ল। কিংবা রসো. আলো থেকে স'রে বসি।

কিন্তু পলকে নয়নতারাই সরে গেলো। বললো,—রাজকুমার, এখনও রাজকার্য বাকি। শিবপূজায় যথেষ্ট জল লাগে। তার ব্যবস্থা তো দেখছি না।

—নদীর ধারেই আমাদের আকণ্ঠ তৃষ্ণা? বসো রানীমার উজীরাইন। খোঁজখবর নিই। সে পাইপে তামাক ভ'রে ধরালো।

কিছুদূরে পাল্কীর বেহারারা। রাজচন্দ্র পাইপ ধরিয়ে তাদের দিকে হাত তুলে ইশারা করলো। একজন এগিয়ে এলে সে বললো,—পুরোহিতঠাকুরকে ডেকে দাও।

লোকটি চ'লে যেতেই নয়নতারার দিকে ফিরে সে বললো,—এবার কেমন ব্যবস্থা হ'লো দেখো উজীরাইন। তুমি, কেট, আমার পাশে ব'সো। অন্তত রাজকুমারকে কিছু মূল্য দাও।

হেসে নয়নতারা রাজচন্দ্রর পাশে বসলো, এবং তারপর কেটও। সিঁড়িটা যথেষ্ট চওড়া। কিছু ঘেঁষাঘেঁষি হ'লো না।

নদীর দিকের রং তাদের আকর্ষণ করলো। না, এখনও সন্ধ্যা দূরে। তার আগেই নদীর উপরের আকাশ দর্শনীয় হ'য়ে উঠেছে। অনবরত রং বদলে যে রং-এর খেলা কিছু পরে সুরু হবে এখনই তার মহড়া সুরু হয়েছে ব'লে তেমন বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কিন্তু এখানে অন্য ব্যাপারও আছে। সব এখন শান্ত নয়। নতুবা কোথা থেকে শুকনো পাতা এলো সিঁড়িতে। এক ঝলক শিরশিরে হাওয়া খানিকটা হাল্কা ধুলোর ঝাপটা দিয়ে গেলো। রাজচন্দ্র হাসলো। মুখ থেকে পাইপ সরালো। উপরের সিঁড়িতে রাখলো। রুমাল বার ক'রে নাক মুখ চোখ ঘষতে হ'লো। নয়নতারাও হাসলো ধুলোর দুষ্টুমিতে। কিন্তু ভাবলো, রাজকুমারের

এই পাইপে তামাক খাওয়াটা নতুন, যেমন মুখের দাড়ি। এটা ভারি মজার যেন যে রাজু পাইপ ধরালো। কি আছে ওতে? পুরুষালি? ওর গুমোর পুরুষ না হ'লে বোঝা যায় না। অর্থাৎ রাজু এখন পুরুষ।

নয়নতারা যেন চোখ মেলে সিঁড়ির উপরে রাখা পাইপ, পাউচ, তাদের পাশে রাখা বিলেতি দেশলাই-এর বাক্স দেখলো কৌতূহলভরে।

একটা সুন্দর উদাস কবোষ্ণ অনুভূতির অবসর—যার চারিদিকে রঙীন হ'য়ে আসা রোদ। এবং তা যেন তিনজনের মুখেই পড়েছে।

কিন্তু এরকম পরিবেশে চিন্তা কখনও একই জায়গায় থাকে না। এতক্ষণ নজরে পড়েনি। এবার নয়নতারার চোখে পড়লো। সামনে মাঠ, ঘাসে ঢাকা, তার ওপারে একটা গাছ। গাছটার আকৃতি যেন তার বিশেষ পরিচিত মনে হ'লো। গুঁড়িটা মানুষের কাঁধসমান উঁচুতে উঠে দুভাগ হয়ে দুদিকে ছড়াতে গিয়ে যেন মতি বদলে পরস্পরের দিকেই আবার ঝুঁকেছে। একেবারে মিলতে পারেনি। তা আর যায়ও না। সন্ধ্যার অস্পষ্টতায় আর দিনের আলোয় দেখা এক নয়। নয়নতারার কিন্তু মনে হ'লো গাছটার তলাতেই সে পিয়েত্রোর হাতিটাকে বাঁধা দেখেছিলো। হাতিটা যেন অস্বস্তিতে চঞ্চল ছিলো। যদি কেউ ভাবে অবোধ প্রাণী পিয়েত্রোর মৃত্যু বুঝে থাকবে তবে তাকে যুক্তির কাছে বিশ্বাস্য করা যায় না। সেই সন্ধ্যায় নয়নতারা পিয়েত্রোর বাংলোর বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলো। তখন পিয়েত্রোর মরদেহ ঘিরে তার চাকর বাবুর্চি'রা নিশ্চয় হাহাকার করছে।

গাছটার আকৃতি যেন কেমন ছন্নছাড়া। কিন্তু বিষণ্ণতার জন্য নয়নতারার মন প্রস্তুত ছিলো না।

নয়নতারা বললো,—আচ্ছা, কেট, তুমি কি কখনও দাবা খেলেছো?

কেট বললো,—নয়নঠাকরুন, আমি অনেক কিছুই করিনি।

রাজচন্দ্র বললো,—কেন, কেট, দাবা খেলা তো তোমাদের দেশেও আছে। বাগচীই প্রমাণ। দাঁড়াও, দাঁড়াও। কি যেন বলে?

কেট বললো,—চেস্।

কিন্তু হঠাৎ যেন নিজের কথাটা 'আমি কিছু করি নি' তাকে বিড়ম্বনায় ফেললো। তাতে যেন নিজের উপরে বিরক্ত হ'লো। ভ্রূ কোঁচকালো, কিন্তু তার সুন্দর ঠোঁটের রং কিছুই বদলালো না। বরং একটু জোর ক'রে হেসে সে বললো,—আমি পাদরির মেয়ে, শৈশব থেকে কোন কোন বিষয় এড়িয়ে চলতে হ'তো।

নয়নতারা বললো,—তার চাইতে মজার গল্প শোনো, কেট। আমিও আজ অবধি কোনদিন ঘোড়ায় চড়িনি।

রাজু বললো,—আমি জানি, কেট, তোমার কিন্তু ঘোড়া ছিলো। তুমি ঘোড়া আর সহিসের ছোকরা ছেলে সেই নোংরা পুঁটেটাকে খুব ভালোবাসতে।

কেট বললো,—আমি চেস্ শিখতেও রাজী আছি যদি তেমন শিক্ষক পাই।

রাজচন্দ্র বললো,—সে আর বেশী কথা কি? আর আমার তো মনে হয় সেই উদ্দেশ্যেই অর্থাৎ শিষ্য যোগাড় করতেই কথাটা তুলেছে নয়ন।

সে যে সিঁড়িতে বসেছিলো তার উপরের ধাপে দুই কুনুই রেখে সামনের দিকে পা ছড়িয়ে দিলো। যেন ঘরে সোফায় বসেছে। সামনের দিকে চাইলো সে।

হাওয়াঘর তো। বাতাস চলে ব'লেই তেমন নাম। ঘাসের উপরে একটা একহাত পরিমাণ

ঘূর্ণি কয়েকটি পাতা নিয়ে খেলা করে গেলো। তাই যেন চেয়ে চেয়ে দেখলো রাজু। চৈত্র এখনও দূরে। এ ঘূর্ণিটাও তেমন উদাস নয়। কিন্তু উদাসীন কালকে কি মনে করিয়ে দেয়? রাজু একটা অস্বস্তিতে যেন উঠে বসলো।

নয়নতারা ভাবলো: যেমন সে রাজকুমারের কাছে শুনেছে পিয়েত্রোর বরকন্দাজদের সঙ্গে রাজবাড়ির বরকন্দাজদের এরকম কোন মাঠে, হয়তো এখানেই, সেই শতরঞ্জ খেলা হয়েছিলো, তরোয়াল হাতে বরকন্দাজরা ছিলো যার গুটি। সৈন্য চালনার খেলা, খেলার ছলে তরোয়াল নিয়ে আত্মরক্ষা শেখা। বল চালিয়েছিলো বুজরুক আর রাজকুমার। পিয়েত্রো ছিলো বিচারক। দাবা খেলতে ব'সে একদিন গল্পটা রাজুই বলেছিলো। আর তখন নয়নতারার ঘোড়ায় চড়া দরকার হ'তে পারে এরকম কথায় হাসাহাসি হয়েছিলো। কেমন যেন দূরের বলে মনে হয় না?

রাজু নিজের হাত দুটোকে একত্র ক'রে আঙুলের ডগায় ডগায় ঠুকলো। দেখা গেলো ঘূর্ণিটা মরেনি। শেষ চেষ্টায় বেশ খানিকটা উঠে রাজচন্দ্রর সম্মুখে ছড়ানো পায়ের কাছাকাছি এলো, কিন্তু তারপরই অন্যমনস্ক হ'য়ে যেন স'রে গেলো।

রাজু বললো,—নয়ন, কথাটা তুমিই বলেছিলে। সময়ের কথাই, তাই নয়? মহাকালের মন্দিরের টালিতে আকবরের যুগের হাতিতে এ যুগের রাজুকে দেখা যায় আর তার বাঘটা হয়তো মুঘল ছবির সিংহই, কিন্তু মন্দিরের নিচে এখানে তা হয় না।

নয়নতারার সিঁথির নিচে কপালের রংটা যেন কিছু মলিন দেখালো। রাজু একটু ভাবলো যেন। আবার বললো,—ওখানে এ-কাল থেকে ও-কালের তফাৎ এক আঙুলও নয়। আর তারা একত্র থাকতে পারে। আমাদের এখানে সময়ে যা বিচ্ছিন্ন তা আর যুক্ত হয় না।

নয়নতারা নিজের উঁচু ক'রে তোলা হাতের পিঠে মুখ নামালো। সে অনুমান করলো রাজু বুজরুক-পিয়েত্রোর সঙ্গে অতিবাহিত কালের কথাই ভেবে থাকবে। বুজরুক ও পিয়েত্রো দুজনেই গত। তাদের সঙ্গে রাজুর জীবনের একটি পরিচ্ছেদও। কিন্তু তখনই লম্বা লম্বা পা ফেলে আসতে দেখা গেলো সেই বেহারাটিকে। সে জানালো পুরোহিত স্নানে গিয়েছেন নদীতে।

তা হ'লে? নয়নতারা যেন এটাকেই এতক্ষণ মনে ক'রে বসেছিলো এমন ক'রে বিচলিত হ'লো।

কিন্তু কেট হাততালি দিয়ে উঠলো।

সে বললো,—আমি কি স্বপ্ন দেখছি? ওটা কি একটা নৌকাই নয়? কি সুন্দর খয়েরি পাল।

সে উঠে দাঁড়ালো সামনের দিকে দূরের সেই নৌকাটাকে দেখতে।

নয়নতারা যেন গভীর ক'রে কিছু ভাবতে সুরু করেছিলো। হঠাৎ সমাধান পেয়ে বললো,—চলো আমরা বাঁধে গিয়ে দাঁড়াই। নৌকাটাকে আরও স্পষ্ট ক'রে দেখা যাবে। চলো, চলো।

আসলে, সে ভাবলো, পিয়েত্রো আর বুজরুক বয়সের অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও রাজকুমারের বন্ধু ছিলো। বুজরুক সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলো। যত বরকন্দাজ পিয়েত্রোর থাকা স্বাভাবিক, তার চাইতে অনেক বেশী বরকন্দাজ নিয়ে গিয়েছিলো সে তার সঙ্গে। এখানে এই শতরঞ্জ খেলা ছিলো প্রকৃতপক্ষে বরকন্দাজদের তরোয়াল আর বন্দুক চালাতে শেখানোর একটা কৌশল। এ-সব সে জানে রাজকুমার তাকে বলেছে বলে। কিন্তু রাজু এ

বিষয়ে কি ভাবে তা কি সে জানে?

ফরাসীরা ক'রে থাকবে, কিন্তু কেন এমন করা হয়েছিলো? নদীর খাত থেকে এই পার ইট দিয়ে গে'থে তোলা। নদীর খাত থেকে দেখলে মনে হবে যেন কেল্লার উ'চু প্রাচীর। তীরের লোককে মনে হবে কেল্লার প্রাচীরে পাহারাদার। উপর থেকে নিচের দিকে দেখলে গা শিরশির করে। এখানে ওখানে গাঁথুনির খাঁজে ঘাসের ছোট ছোট ঝোপ। মনে হয় শূন্যে ঝুলছে।

রাজচন্দ্র বললো,—অত ধারে যেয়ো না, কেট।

কেট বললো,—কিন্তু জল কোথায়?

বাঁধের নিচে বালি সম্মুখে ডাইনে বাঁয়ে। তারপর দূরে চর ঝাউ কাশকুশের ঝোপ ঝাড়।

রাজচন্দ্র বললো,—নৌকাটা যে দিকে চলেছে দেখো। জল বোধ হয় চরটার পিছনে।

নয়নতারা বললো,—চলো চলো আমরা জলের কাছে যাই।

নামতে হ'লে ঘাট দরকার। ডানদিকে খানিকটা চলে তারা ঘাট দেখতে পেলো। পরিত্যক্ত ইটবাঁধানো ঘাট। এত চওড়া এত সি'ড়ির ঘাট অনেক খরচ ক'রে তৈরি হ'য়ে থাকবে। জল আর সময় দুই-ই স'রে গিয়ে এখন অর্থহীন।

—তোমরা কি নামবে? কিন্তু নামবে কি ক'রে? র'সো আমার হাত ধরো।

প্রথম কেটকে, পরে নয়নতারাকে হাত ধ'রে নামতে সাহায্য করলো রাজচন্দ্র।

যেখানে তারা এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে পায়ের নিচে শুকনো মিহি মাটি। পলি গুঁড়ো হ'লে যা হয়। একটা জলে ভেসে আসা গাছের কঙ্কাল। তাদের সামনে আর উপরে নদীর সেই বাঁধানো পার।

কেট বললো,—এক সময়ে এই বাঁধের গায়ে নদী ছিলো। দেখুন রাজকুমার, জলের রেখা এখনও মাটির দাগে বোঝা যাচ্ছে ইটের গায়ে।

নয়নতারা বললো,—কতদূরে স'রে গিয়েছে নদী, তাই নয়? আচ্ছা, রাজকুমার, তাহ'লে নৌকাগুলো এখন কোথায় ভিড়বে?

রাজচন্দ্র বললো,—এটা ফরাসডাঙ্গার ঘাট। কুতঘাট আর কিছু উজানে হবে। সেখানে নিশ্চয় নদীর পাড় ঢালু হবে। গরুরগাড়িগুলোকে যেতে হয় জল পর্যন্ত। প্রতি বছরই নদীর গতি অনুসারে ঘাট বদলায় কিন্তু ঝিলের মুখটাকে ছেড়ে নয়। কিন্তু তার চাইতেও মূল্যবান কথা, উজিরাইন, তোমার স্নানার্থীদের কি হবে?

—পুরোহিত নদীর জলেই স্নান করেন। শিবচতুর্দশীর রাত্রির জন্য রানীমাকে ই'দারা বসাতে হবে দেখছি। কিন্তু, রাজকুমার, নদীটা এত দূরে থাকলে তখন কিন্তু তোমার মরেল-গঞ্জের সুলুপে নিশানা দাগা হতো না।

—তা তো বটেই। অন্যমনস্কের মতো বললো রাজচন্দ্র।

নয়নতারা হেসে বললো,—কেট, সে এক ভারি মজার গল্প তুমি হয়তো জানো না। এই ব'লে সে পিয়েত্রোর হাওয়া-ঘর থেকে কিশোর রাজুর মরেলগঞ্জের সুলুপের মাথায় ইউনিয়ান জ্যাকে গুলি করার গল্পটা বললো।

সরে যাওয়া জলের রেখা, মিহি মোলায়েম পলিভাঙা মাটি, সময়ের দাগের মতো যেন সে মাটির উপরে শুকিয়ে যাওয়া তরঙ্গের দাগ। তার উপর দিয়ে চলতে চলতে গল্পটা হচ্ছিলো।

নয়নতারা বললো,—রাজকুমার, বুজরুক আলি তোমাকে নিশানা দাগতে বলেছিলো। প্রথম বন্দুক হাতে পেয়ে তোমারও খুব উৎসাহ হয়েছিলো। কিন্তু সত্যি বলো তো তুমি বুজরুকের উর্দুমিশানো বাংলার নিশানা আর নিশান শব্দ দুটোর পার্থক্য ধরতে পারো নি?

নয়নতারার ঠোঁট দুটি হাসছে। চোখের কোণও।

রাজচন্দ্র বললো,—হয়তো ভুল শুনে থাকবো।

—তোমার কি এখন অনুতাপ হয়, রাজকুমার?

—ওটা তো একটা সামান্য ব্যাপার। ওর জন্য অনুতাপ করার কি আছে?

—কিন্তু সেজন্য বুজরুকের কয়েদ হয়েছিলো।

কেট বললো,—অনুতাপ যদি না হ'য়ে থাকে তবে বুঝতে হবে ওটা ঠিক ভুল ক'রে করা কিছু ছিলো না।

কিংবা, বললো নয়নতারা,—ওটা তেমন একটা কাজ যার জন্য তোমার মন গোপনে প্রস্তুত ছিলো কিন্তু যা হিসেবী বুদ্ধির কাছে অযুক্তির ছিলো। তাকেও আমরা ভুল কাজ বলি হিসেব নিতে গিয়ে।

রাজচন্দ্র বললো,—আ, নয়ন, তুমি সার্বভৌমপাড়ার মেয়ে তা বুঝতে পারছি। হয়তো আমরা মনকে হিসেবী বুদ্ধির নিচে চেপে রাখি কিন্তু কখনও কখনও তলে তলে অনেকটা উত্তপ্ত হয়ে সে মন দাবানল সৃষ্টি করে।

বাঁধানো পাড় বরাবর তারা চলতে লাগলো। এক জায়গায় তারা পাড়ের গায়ে একটা বড় ফাটল দেখতে পেলো। আগাগোড়া ফেটেছে পাড়টা। এমন কি কোথাও কোথাও ইটগুলি পর্যন্ত দু' টুকরো। আর কিছু দূরে গিয়ে তারা দেখতে পেলো বাঁধানো পাড়টা ঠিকই আছে কিন্তু তার নিচে একটা গভীর গর্ত। যেন নদীর খাত আর পাড়ের মধ্যে কোন বন্যজন্তু গুহা তৈরি করেছে।

রাজুর যেন অবাক লাগছে ভাবতে। তখন নদী অত কাছে ছিলো ব'লেই সুলুপটার পালে এবং নিশানে নিশানদাগা হয়েছিলো। সে সময় থেকে নদী এখন স'রে গিয়েছে। কিন্তু গল্পটা আছে। আর সে গল্প শুনেই কি শুকনো গাছের নিচে দাঁড়ানো লোকটি তাকে বিপদে শরণ নেয়ার উপযুক্ত মনে করেছে? তার মুখে যেন ঠাট্টার হাসি খেলা করলো। কিন্তু লোকটি নিশ্চয় বিপন্ন, বিশেষভাবেই বিপন্ন। সাধারণ বিপদে কেউ রাজকুমারকে বিব্রত করে না।

কিন্তু চোখ তুললো সে। আর তখনই আবার সেই গহ্বরটা চোখে পড়লো তার।

রাজচন্দ্র বললো,—আশ্চর্য, ঠিক এখানেই এত বড় ফাটল, আশ্চর্য!

মন যখন অন্যত্র ব্যস্ত থাকে তখন দ্রষ্টব্য বিষয় একবারেই মনকে দখল করতে পারে না, কিছু সময় নেয়। এক্ষেত্রেও তাই হ'লো। রাজুর কথাতেই যেন গহ্বরটার দিকে তিনজনেরই মন আকৃষ্ট হ'লো।

যেখানে তাঁরা দাঁড়িয়েছিলো তার বাঁদিকে খানিকটা জায়গা ধ'রে চর উঁচু হ'য়ে উঠেছে। তার ঢালুদিকে একটানা খানিকটা কাশঝোপ। অন্যত্র চার-ঝাউ। মনে হয় তার মধ্যে দু-একটা ছোট ছোট গাছও আছে। আর এই সবুজ ব্যাপারটা প্রমাণ করে জল কাছেই হবে। অন্যদিকে তাদের পিছনে নদীর বাঁধানো পাড়ে এ পর্যন্ত আবিষ্কার করা সেই সবচাইতে বড় ফাটলটা। মনে হয় সমস্ত পাড়টা যেন শূন্যে ঝুলে আছে। তারা যেন বিস্মিত হয়ে থেমে পড়লো। যেন গহ্বরটাই সবচাইতে বড় আবিষ্কার। অন্তত আলাপ করার মতো বিষয়। আর তখন চরের দিক থেকে একজন মানুষকে আসতে দেখলো তারা। খালি গায়ে, কাঁধে ভিজে কাপড়, হাতে পিতলের কমণ্ডলু। সে পূজারীঠাকুরই হবে। তারও পিছনে আরও কয়েকজন মানুষ যেন নদীর দিকে। তারা এখনও অনেক দূরে। যেন এই মানুষগুলো এগিয়ে আসার আগে তারা যথেষ্ট সময় পাচ্ছে গহ্বরটাকে নিয়ে আলাপ করার। কিংবা মানুষগুলি তো দূরে, এখন

গহ্বরটাই বেশী মূল্যবান।

—হঠাৎ রাজচন্দ্র হেসে বললো,—ওদিকেও দেখো মন্দিরটার আভাস।

কেট জিজ্ঞাসা করলো,—মন্দিরটা কাছেই, তাই নয়?

—আর এখানেই এত বড় ফাটল। দেখো, নয়ন।

নয়নতারা কিছু বলার আগেই পূজারী লম্বা লম্বা পায়ে তাদের কাছে এসে পড়লো। নয়নতারা তাকে জানালো তার মন্দিরের কতদূর বাকি খোঁজ নিতে এসেছিলো। পূজারী বোধ হয় স্বল্পভাষী এবং কাউকে নমস্কার করে না। সে এদের একবার মাত্র দেখে নিয়ে আপন মনে চলতে লাগলো।

নয়নতারা বললো,—চলো আমরাও ফিরি।

পাড়ের গর্তটাই আবার চোখে পড়লো।

কেট বললো,—রাজকুমার, পাড়ের নিচে গর্তটা কি কাঁকড়াদের হ'তে পারে?

নয়নতারা বললো,—এটা বরং শেয়ালের মতো কোন বড় প্রাণীর বাড়ি হ'তে পারে।

—হাসছে যে, রাজু? তা হয় না?

—হাসছি? রাজচন্দ্র নিঃশব্দে হাসলো, অথবা তার আগেকার হাসিটাই ফুটলো,—ভাবছি ওই মন্দির আর এই ফাটল। রানীমার এত আয়োজনের ঠিক নিচেই এতবড় ফাটল।

নয়নতারা বললো,—তা হ'লে কি মন্দিরের বিপদ হ'তে পারে?

রাজু বললো,—নদী যদি ফেরে?

পূজারীর বোধ হয় এক রকম রসবোধ আছে। সে তার ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললো,—নাম যাই বলুক, আসলে তো গঙ্গা মাঈ। আমরা লোটা ক'রে গঙ্গা এনে দিই বুঢ়াকে। তা হ'লেও গঙ্গা তো কোলে নিতে চাইবে কখনও কখনও।

রাজচন্দ্রর মুখে চাপা হাসি, কেটের গালে ঈষৎ রক্তাভা।

নয়নতারা বললো,—তাতে রানীমার লোকসান কিন্তু, মানে মন্দিরের।

পূজারী যেন এদিকটাকে ভাবেনি। সে দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বললো,—আচ্ছা, আচ্ছা? তারপর সে তার দীঘল পা ফেলে ফেলে চ'লে গেলো।

নয়নতারা বললো,—আমি ভাবছি মন্দিরের শিবের এখনও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি, পূজারী এখন কি করে।

রাজু হেসে বললো,—সমস্যা, সমস্যা।

নয়নতারা বললো,—মোটেই নয়। তার নিজের শালগ্রাম শিলা থাকতে পারে।

—দেখো কান্ড। অর্থাৎ এই মন্দির ফন্দির না-হ'লেও পূজা আটকাচ্ছে না।

ঘাটের কাছে এসে নয়নতারা বললো,—এবার?

সামনে পূজারী তার লম্বা লম্বা পায়ে অবলীলায় উঠে গেলো।

কেট বললো,—লোকটি পাহাড়ী, আমি বাজি রাখতে পারি, কিংবা হিমালয়ে ঘোরা অভ্যাস আছে।

রাজচন্দ্র বললো,—আমাদের তা নেই। সুতরাং আগে কে?

প্রথমে নয়নতারা পরে কেটকে রাজচন্দ্র হাত ধ'রে ধ'রে তুললো নদীর পাড়ে।

কেট বললো,—রাজকুমার, ঘাটটাকে নতুন ক'রে বাঁধিয়ে দেয়া উচিত আপনার।

—কেন, এখানে কি মাঝে মাঝে তুমি আসবে? রাজচন্দ্র হাসলো। এবার তার হাসিটা স্বচ্ছ হ'লো।—কিংবা রাজকার্যের আমি কিই-বা জানি। রানীমার প্রতিনিধি হয়তো এতক্ষণে

ঘাটবাঁধানোর হিসাব কষছেন। কিন্তু নয়ন, তা তুমি করো না। বৃথা হবে। ফাটলটার বা ফাটল-গুলোর কথা মনে রেখো। গঙ্গার কথা তো শুনলে। আবাল্য হয়তো ন্যাংটো সন্ন্যেসী; কিন্তু প্রেমের কথা বোঝে, দেখো।

ঘড়ি দেখলো সে। বেলা পড়ে আসছে। এখন আকাশে লাল রঙের প্রাচুর্য দেখা দিচ্ছে।

নয়নতারা বললো,—এখন ফেরার সময় হয়েছে। ইঁদারা না পাতলে চলবে না। রানীমাকে বলতে হবে।

নয়নতারা ও কেট পাল্কীতে উঠলো। রাজুর ঘোড়া পাল্কীকে অনুসরণ করলো। মানুষের মনের খেয়াল বিচিত্র হ'য়ে থাকে। যে পথে তারা এসেছিলো সে পথে না গিয়ে যেন তাড়াতাড়ি হবে ব'লে নদীর পাড়-বরাবর যে পথ তা ধ'রে চললো। ইতিপূর্বে কুতঘাটের খোঁজ করেছিলো নয়নতারা। এখন তাদের এই পথ দ্রুত সেই পথের দিকে এগোচ্ছে।

তখন পড়ন্ত বেলা। দূরে থেকে দেখা মানুষকে নদীতীরের রঙীন ধূসরতার পটে আঁকা ব'লে মনে হয়। তারা কি ক্লান্ত? অথবা মানুষ ক্লান্তির সময়েও কাজ করে।

আর একটা পথ এসে মিশেছে তাদের এই পথটায় সামনের সংযোগে। সেই অন্য পথ দিয়ে দুখানা গোরুগাড়ি বোধ হয় মালপত্র নিয়ে নৌকার ঘাট থেকে এগিয়ে আসছে। গড়ানে পথ। গাড়োয়ানকে গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির পিছন দিক ধ'রে ঠেলতে হচ্ছে যেন। গাড়ি দুটোর পিছনে অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে পূজারীর পিছনে যাদের দেখা গিয়েছিলো তারাই সম্ভবত ঘাটের পথ দিয়ে আসছে। দলের সামনের লোকটির গায়ে বিলেতি পোশাক। তাদের পিছনে তাদের ভৃত্য-পরিচারকেরা হবে। ভৃত্যদের কাঁধে পিঠে মাথায় মোটঘাট।

এরকম পথে গোরুগাড়ির সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলতে হয় ধুলোর ভয়ে। হয় আগে নতুবা অনেকটা পিছনে। আগে চলতে হ'লে সব সময়েই আগে চলার উৎকণ্ঠা ভোগ করতে হয়। রাজু পাল্কী বেহারাদের বললো,—গোরুগাড়িকে এগিয়ে যেতে দাও। দাঁড়িয়ে যাও।

কিন্তু দলের মধ্যে রূপচাঁদও ছিলো। রূপচাঁদ অবশ্যই রাজবাড়ির আদব-কায়দা ভালো-ভাবেই জানে। এখন সেজন্যই তার অসুবিধা হ'লো। এই আগন্তুক দলের পুরোধা, যার পরনে বিলেতী পোশাক নিখুঁত, এবং যার স্বাস্থ্য ও রূপ লক্ষণীয়, সে ছ-আনির কুমার। তাকে কি এখনই এখানে রাজকুমারের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দেয়া উচিত হবে? তা হ'লে কি কার্যত এরকম হচ্ছে না যে রাজকুমার স্বয়ং তাঁকে অভ্যর্থনা করছেন এই নৌঘাটায়? অন্যদিকে রাজ-কুমার অবশ্যই তাদের লক্ষ্য করবেন। সেক্ষেত্রে কিছু না ব'লে পাশ দিয়ে চ'লে যাওয়াটা কি বেআদবি হয় না?

অথবা সে যা করলো সেটাই রাজবাড়ির আদব-কায়দাকে অসুবিধায় না ফেলা হেতু আদবসম্মত হ'লো। অলক্ষিতে পিছিয়ে পড়ে সে যাত্রীদলকে এগিয়ে যেতে দিলো। রাজ-কুমারের কাছে এসে বললো,—ছ-আনির কুমার, হুজুর।

রাজু ঘোড়ার উপরে ছিলো। মাথা নাড়লো যেন। নাড়লো কি?

রূপচাঁদ হেসে বললো না থেমে,—আর ও সেই আর্মেনি শিশাওয়াল মেলা চিঁবলি ডুম্ (চিমনি, ডোম) এনেছে। নৌকাতে আরও আছে।

তেমনি অলক্ষিতে এগিয়ে রূপচাঁদ ছ-আনির কুমারের পিছনে চলতে সুরু করলো।

রূপ কিন্তু সব সময়েই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দু'আনির কুমার নিশ্চয়ই রূপবান।

নয়ন বললো,—কে, রাজকুমার?

—রূপচাঁদ।

—আর ওটা বুঝি সেই মদওয়ালা আর্মেনিটা।

নয়নতারা কেটকে বোঝালো,—লোকটা আর্মেনি। নিশ্চয়ই নাম আছে। কিন্তু এ অঞ্চলে ওকে সকলেই শিশাওয়ালা বলে। প্রতি বছরেই কাচের ঝাড়, ডোম, চিমনি প্রভৃতি এবং বিলেতি মদ বিক্রি করতে আসে কলকেতা থেকে। এবার আগে এসেছে। বোধ হয় জন্মতিথির উৎসবে কিছু আলোর কাচ বিক্রি করবে।

শিশাওয়ালাকে সে গ্রামের পথে দেখে থাকবে। দু'আনির কুমার সম্বন্ধে সে ভাবলো হয়তো কোন সরকারি হাকিম হবে। হয়তো কলকেতা থেকে শিশাওয়ালের নৌকাতেই এসেছে। শিশাওয়ালের সমগোত্র তো মনে হয় না।

শেষ হেমন্তের বেলা টুপ্ ক'রে পড়ে যায়। পাল্কী সেজন্য এখন তাড়াতাড়ি চলেছে। রাজারগ্রামে এসে পথ বদলে গোরুগাড়ির ধুলো এড়িয়ে চলা সম্ভব। সার্বভৌমপাড়ার মাঝ দিয়ে পাল্কী চলেছে এখন। রাজুর ঘোড়া আড়াআড়ি মাঠ পার হ'য়ে এগিয়ে গিয়েছে।

নয়নতারা সম্মুখে চেয়েছিলো। সে দেখলো কেটের চুলে যেন সন্ধ্যার রাঙা রোদ চিক্-চিক্ করছে, যেমন কাঁচের উপর করে। বালির কণা লেগে থাকবে হয়তো। কেটকে কি ক্লান্ত দেখাচ্ছে এখন। কিন্তু সুখীও বটে। রাজু চ'লে গিয়েছে অন্য পথে। তা অবশ্য স্বাভাবিকই। রাজুর তো সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিলো না মন্দিরে। অর্থাৎ সাধারণত একই উদ্দেশ্যে কোথাও গেলে সাধারণত যেমন একই সঙ্গে ফেরার কথা, এটা তেমন ঘটনা নয়।

কেট বললো,—সেই গরম জামাটা এখন বুনতে হয়।

নয়নতারা কেটের কথাটা নিশ্চয়ই বুঝলো। কেটকে দেখেই সে একটা সোয়েটার বুনতে সুরু করেছিলো। তারপর সেটা অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় কেটের সেলাই-ঝুড়িতে থেকে গিয়েছে। সেই বিলেতি উলের রংটা এবং যে শিকলির নক্সা ফুটে উঠছিলো সোয়েটারটার গায়ে কাঁটায় কাঁটায় তা কি মনে হ'লো নয়নতারার। (বলা বাহুল্য বিলেতি উল তখন দুষ্প্রাপ্য ছিলো এবং উলবোনা ছিলো অতি আধুনিকতা এমন কি কলকেতাতেও।) নয়নতারা কিছুক্ষণ কেটের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। এখন যে কেটের মনে হ'লো কথাটা আবার বলা দরকার, খেয়াল ক'রে শোনেনি নয়নঠাকরুন।

নয়নতারা হাসলো অবশেষে। বললো,—তুমি কি বুনে দিতে সময় পাবে না, কেট?

নয়নতারা জামাটা রাজুর জন্যই বুনতে সুরু করেছিলো।

বাগচীর কুটীরের সামনে পাল্কী থামলে কেট নামলো। ইতিমধ্যে বাংলোর জানালায় আলো। বাগচী ফিরেছে তাহ'লে। দেখা গেলো রাজু অন্যপথে গিয়েও এখানেই এসেছে। তার ঘোড়াটা স্থির, বালামচি দোলাচ্ছে। নয়নতারা ও কেট পাল্কী থেকে নামলো।

রাজচন্দ্র বললো,—না, কেট, আমরা আর দাঁড়াবো না। দেখো আলো তোমাকে অভ্যর্থনা করতে পথে এসে পড়েছে।

কেট বলতে যাচ্ছিলো, সে কি শুধু আমাকেই? কিন্তু হঠাৎ পাশের একটা গাছে ঝুলে-থাকা আধখানা চাঁদ তার চোখে পড়লো। সে হেসে বললো,—আমিও আর মাঝখানে থাকতে চাই না। গুড্ নাইট, ডিয়ারস্।

কেট চ'লে গেলো। সে যে চাঁদ দেখেছিলো তার আলো সন্ধ্যাকে আজ কিছুতেই কালো হতে দেয়নি। যে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তাকে বরং রঙীন আলোয় এগিয়ে আনা বলা যায়। এর জন্য বোধ হয় কেউ প্রস্তুত থাকে না।

রাজু ঘোড়া থেকে নামলো। পাল্কী থেকে কয়েক পা দূরে হে'টে এলো নয়নতারা।

রাজু বললো,—আমরা কি এখান থেকে হেঁটে যাবো? যেন প্রস্তাবটা আলোচনা করতেই তারা পথের ধারে স'রে দাঁড়ালো। এমন আলো যে দূরের মানুষ অস্পষ্ট। কাছের মানুষের মুখাবয়ব দেখতে অসুবিধা নেই। পথের শেষে রাজবাড়ির হাতার আলো।

হঠাৎ নয়নতারা বললো,—কত সুন্দর হয়েছো তুমি, রাজু!

তখনই যেন হাত বাড়িয়ে সে রাজুর হাত ধরবে। সেই স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় যেন রাজুর বুকের মৃদু ওঠাপড়াও চোখে পড়বে। মৃদু অন্ধকারেও নয়নতারার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

এটা একটা বেশ কৌতূহলের ব্যাপার মনে হচ্ছে যে আমরা যা ভাবি আর যা বলে ফেলি তা এক নয় সব সময়ে। নয়নতারার ভাবনাটা এইরকম ছিলো: যে কয়েকমাস ছিলাম না, দূরে ছিলাম, সেই অবসরে রাজু সুন্দরতর হয়েছে। তারপর সে কথাটা বললো। তারপর আবার ভাবলো প্রায় ছ' মাস দূরে ছিলাম। নয়নতারা নিজের বাড়ানো আঙুলগুলোকে মুঠি ক'রে গুটিয়ে আনলো। যেন তা দূরে থাকার ভাবটা নিজের মনে ফোটাতে। সে বললো,—রাজু, আমাকে রাজবাড়ি যেতে হবে। বাহ্, রানীমাকে খবর দিতে হবে না? একটু সে হাসলো, বললো আবার,—আমি যাই, রাজু, আমি কিন্তু গুড্ নাইট বলতে জানিনে।

নয়নতারা পিছিয়ে গিয়ে পাল্কীতে উঠলো। পাল্কীটা এবার আবার ছুটে চলতে সুরু করলো। রাস্তা এখানে ভালো। এবং জোরে চলেছে ব'লে বেয়ারাদের হুঙ্কার দ্রুত আর উচ্চ।

নয়নতারা কিছুক্ষণ যেন পাল্কীর ভিতরের অন্ধকারকে দেখলো। তারপর ভাবলো কি যেন ভাবছিলাম। কিছু একটা স'রে যাওয়ার অনুভব হ'লো তার।

এটাও এক ভারি কৌতুকের প্রশ্ন—আমাদের চিন্তা কি সিঁড়ি বেয়ে চলে অথবা তা কি নিত্যপ্রবহমান স্রোত? অথবা তা কি ফল্গুর মতোও বটে? একটা ধারা কোথাও হারিয়ে গিয়ে আবার কোথাও হঠাৎ ফুটে ওঠে? নয়নতারা ভাবলো : শতরঞ্জ খেলার কথায় উদাস হ'য়ে গিয়েছিলো রাজু। তা কি ঘূর্ণিটাকে লক্ষ্য করতে গিয়ে? ঘূর্ণিটা তার মনের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় কোনটা বাইরে কোনটা বা ভিতরে তা কি বোঝা যাচ্ছিলো না। উদাস অলস পাকখাওয়া একটা নিরুত্তেজ গতি?

আর রাজুকে বিষণ্ণ দেখায়। বিষণ্ণ এবং সুন্দর। সুন্দর এবং বলিষ্ঠ। সময়ের কথাও উঠেছিলো আজ বারে বারে। আকবর বাদশাহের আমলের কথা উঠেছিলো কেন যেন। সময়ের স'রে যাওয়া বোঝাতেই।

পাল্কী তখন রাজবাড়ির সদর দরজার কাছে এসেছে। আলো আসছে পাল্কীর ঈষৎ খুলে রাখা দরজা দিয়ে। হ্যাঁ, সময়ের স'রে যাওয়ার কথা আজ অনেকবার উঠেছিলো। উল-বোনার কথাতেও। এক সময়ে ওটা খুব ঝোঁকের ব্যাপার ছিলো। পাল্কী যখন সদর দরজা দিয়ে ঢুকছে—নয়নতারার কোলের উপরে রাখা ডান হাতটার উপরে আলো এসে পড়লো। তাতেই যেন হাতটা মুঠ করলো সে। উলের ব্যাপারটা ধরলে, তিনবার হল ব্যাপারটা।

পাল্কীর জানলার ঝিলিমিলির ছায়া অনেকগুলো ফুটকির মতো নয়নতারার মুখে পড়ে তাকে যেন বিষণ্ণ ক'রে তুললো। বিষণ্ণর চাইতে বিষণ্ণ শব্দ আর কি আছে? আজ সে ভেবেছিলো রাজুর সঙ্গে দেখা হ'লে ভালো হয়। ভালোই হয় মন্দিরের ছায়ায় সময় কাটানো। এটা খুবই নীচতা হয় ভাবলে যে কেট কি ক'রে জড়িয়ে পড়েছিলো আজকের ব্যাপারে বিশেষ করে এইমাত্র যখন তাকে হাসিমুখে বিদায় দেয়া হয়েছে। কিন্তু কেউ জড়িয়ে পড়বে, শুধু সে আর রাজু নয়, এটা সে পরিকল্পনা ক'রে ঘটায়নি; অথচ হঠাৎ যেন মাঝপথে মত বদলে সেই কেটকে সঙ্গে নিয়েছিলো। আর সেদিনও সেই শীকারের দিনও মাঝখানে কেমন যেন পরি-

কল্পনা বদলে গিয়ে রাজুর সঙ্গে যাওয়াটাই অর্থহীন হ'য়ে উঠেছিলো। যেন রাজুর সঙ্গে নিভৃতে থাকতে চলতে যে আগ্রহ তা সাহস হারিয়ে ফেলছে।

সত্যি কি তা হয়, সময় কি নদীর স্রোতের মতো স'রে যায়? তা কি তড়াগের মতো কোন ব্যক্তিত্বের আধারে স্থির থাকে?

নয়নতারা বুদ্ধিমতীর মতো এই সিদ্ধান্ত করলো: আসলে সে যে সময়টা গ্রামের বাইরে কাটিয়ে এসেছে সেই সময়টাই একটা ফাঁকা জায়গা তার কাল আর রাজুর কালের মধ্যে। এটাই তো কারণ; নতুবা, বলো, আগ্রহ কি সত্যি তত ভীরু? আর এই ব্যবধান বলো, পার্থক্য বলো তা পার হ'য়ে দুজনের সময় মিলে মিশে এক স্রোত হচ্ছে না আর।

চিন্তাটাকে কিংবা চিন্তার উপমাগুলোকে সে এত সত্য ও বাস্তব মনে করলো যে কিছু যেন তার গলার নিচে ভার হ'য়ে উঠলো।

তার পাল্কীটা অন্দরের দিকে চলেছে। পাশ দিয়ে রাজুর ঘোড়া মৃদু মৃদু খুরের শব্দ ও মৃদু জিনের শব্দ তৈরি ক'রে প্রাসাদের হলের সিঁড়ির সামনে ঝাড়ের আলোর নিচে থামলো। কিন্তু রাজু নামছে তা দেখার আগেই পাল্কীর আধখোলা দরজা অন্দরের এক দেয়ালে ঢাকা পড়লো।

আমাদের চিন্তাগুলো কথার প্রবাহ কিংবা চিন্তার প্রবাহ; কথার আধার পেলে নিজেকে প্রকাশ করে এ নিয়ে তর্ক আছে কিন্তু আলাপে যে চিন্তা পরিচ্ছন্ন হয় সে বিষয়ে সন্দেহ কি? রানীকে সে মন্দিরের কাছে ফাটলের কথা বলতে রানী বললেন,—ব'লো কি, তাই? নদী যদি এদিকে স'রে আসে আবার খুবই মুস্কিল হবে না? নয়নতারার মনে পুরোহিতের বলা সেই রসিকতাটা এসেছিলো কিন্তু রানীমার সম্মুখে তা বলা যায় না।

একটু ভেবে রানী নিজেই বললেন,—তা, দেখো, নয়ন, নদী যে স'রে আসবেই এমন কথা নেই। তা ছাড়া সময়ের বন্যাও তো আছে।...সে যাই হ'ক আজ আর রাত ক'রে বাড়ি গিয়ে কি হবে। ব'সো বরং কথা বলি।...আর, যদি তোমার ভাবনা হ'য়ে থাকে, ফরাসীরা যদি নদীর পাড়টা একবার বাঁধাতে পেরে থাকে আমরাও কি আর একবার সেটাকে মজবুত করতে পারবো না?

কিন্তু সব বিষয়ে এমন আলাপ করার সুবিধা নেই। অনেক বিষয় আছে যা অন্য কাউকেই বলা চলে না। তখন চিন্তা করা ছাড়া উপায় কি?

রানী সে রাতে নতুন কিছু করলেন। অভাবিতভাবে, যেমন শুধু রাজুর বেলাতেই হ'য়ে থাকে, নয়নতারাকে পাশে নিয়ে রাত্রির আহার করলেন। ব্যাপারটা গল্প হ'য়ে ছড়াবে। গল্পের একটা উপদেশ এই হবে আহারাদির ব্যাপারে রানীর বাছবিচার সার্বভৌমপাড়ার নীতিকে হার মানাতে পারে। তিনি যখন নয়নতারাকে পাশে নিয়ে খাচ্ছেন তখন (বিশেষ ক'রে মনে রাখতে হবে কি অসাধারণ তীক্ষ্ন তাঁর চোখ) নয়নতারাকে কতটা পবিত্র মনে করেন তা বুঝে দেখো।

আহারের আগে ও পরে আলাপ হয়েছিলো। আহারের আগে রানী রাজুর আহারের খোঁজখবর নিলেন। সেই সূত্রে নয়নতারা জানতে পারলো বন্দা নামে পিয়েত্রোর এক বাবুর্চিকে বহাল করেছে রাজু। তার জন্য রাজবাড়ির ভিতরে একটা পৃথক রান্নাঘর ক'রে দেয়া হয়েছে রাজুর মহলে। কিন্তু আজ পর্যন্ত অন্তত সেখানে রান্না হয়নি। কেউ কেউ বলছে বন্দা পিলখানায় মাহুতদের পাড়াতে থাকে। রাজু আজকাল রোজ পিলখানায় যায় সকালে। সেখানে নাকি বন্দার সঙ্গে তরোয়াল খেলা হয়। ওতে নাকি সমস্ত শরীরের পেশী আরও ভালো হয়।

কথাটা বলতে রানী হাসলেন। এই আলাপটার কি কোন উদ্দেশ্য আছে? তরোয়াল একটা প্রাণঘাতী অস্ত্র। তার ক্ষুরের মতো ধার হওয়াই স্বাভাবিক। এই কথাটাই মনে হলো নয়নতারার। আর তরোয়াল খেলা মানে পরস্পরের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তরোয়াল চালানো। তরোয়াল চালানো তখনই আকর্ষণীয় হয় যখন অপরপক্ষকে আঘাত করা এবং অপরপক্ষের আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করাটায় সবটুকু কৌশল ও বুদ্ধি কাজে লাগে। সব খেলাই তাই, দাবা খেলার কথা মনে করো। রাজু একবার তার সঙ্গে খেলেছিলো। নয়নতারা বিমনা হ'লো।

আহারের পরে রানী আর একজন পরিচারিকাকে ডেকে খোঁজ নিলেন ছ'আনির ছেলের আহার-ব্যবস্থার কি হ'লো। হৈম নিজে ছিলো কিনা। ব্যবস্থাটায় নিশ্চয় রানীর নির্দেশ ছিলো। এখন নির্দেশমতো কাজ হয়েছে কিনা জেনে নিশ্চিত হলেন। সেই সূত্রে নয়নতারা জানলো কুতঘাট থেকে সাহেবি পোশাকে রূপচাঁদের সঙ্গে যাকে সে আসতে দেখেছিলো কলকেতার কোন হাকিম সাহেব নয়, সে প্রকৃতপক্ষে ছ'আনির কুমার।

ছ'আনির কুমার? ছ'আনি যখন বলা হয় তখন বুঝতে হবে তা একটা বড় কিছুর অংশ। এ অঞ্চলে তা এই রাজপরিবারেরই হ'তে পারে। রানী নিজে ও বাড়ি ব'লে উল্লেখ করেন, কখনও বলেন কায়েতবাড়ি। সেখানে যখন একটা প্রাসাদ আছে, কাছারী আছে, তখন একজন কুমার থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তার কথা এর আগে নয়নতারা কখনও কাউকে উল্লেখ করতে শোনেনি। একবার নয়নতারা মনে করলো রানী বলবেন কেন কায়েতবাড়ি বলা হয় ছ'আনির বাড়িটাকে। কিন্তু সেদিকে না গিয়ে তিনি বললেন,—ছ'আনির ছেলে বিলেতে যাবে। সিমলায় থেকে পড়তো তো। সাহেবদের সঙ্গে একই জাহাজে বিলেতে যাচ্ছে।

কৌতূহল কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় তা বিচার করে না। রানীর মহলের দূরবর্তী অংশে রাত্রিতে অলিন্দের একটা অংশ আলোকিত। অন্যান্য দিন এরকম থাকে না। নয়নতারা অনুমান করলো ওখানে একটা ঘরে ছ'আনির কুমারকে থাকতে দেয়া হয়েছে। তার ঘরের পর্দার আড়াল থেকে আলো এসে পড়ছে অলিন্দে।

রানীর পাশের ঘরেই নয়নতারার শোবার ব্যবস্থা। শুতে যাওয়ার আগে নয়নতারা অলিন্দে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। রাত্রির রাজবাড়ির অন্দর মহল তার চোখে পড়লো। এখনও একতলার প্রায় সর্বত্র আলো। চকের উঠোনে তাই আলো। দোতলার অলিন্দের দেয়াল-গিরিগুলো জ্বলছে, কিন্তু কোন কোন দরজা বন্ধ হ'য়ে যাওয়ায় ঘরের থেকে ছড়িয়ে পড়া আলো অলিন্দে পড়ছে না। বরং কোমল অন্ধকার এখানে ওখানে। ছ'আনির কুমারের ঘরের সামনে এখনও অনেকটা আলো। নয়নতারা এবার ডানদিকে চাইলো। বড় একটা থামের পাশ দিয়ে অলিন্দটা ঘুরে গিয়েছে কোণ তৈরি করে। থামের পাশেই একতলার সিঁড়ি উঠেছে। সেজন্যই ওখানে আলোর ঝাড়। ওপারে রাজুর মহল। এখন এখানে দাঁড়িয়ে কি বলা যাবে কোনটা রাজুর শোবার ঘর? আন্দাজ করা যায় যার কার্নিসে বসানো ঝরোকায় আলো আসছে সেটাই হবে। রানী শুয়ে পড়েছেন। দোতলার মহল নিঃশব্দ হ'য়ে আসছে। নিঃশব্দে অনায়াসে ঝাড়টার নিচে দিয়ে রাজুর ঘরে যাওয়া যায়। হঠাৎ তার বুকের ভিতরে কিছু কবোষ্ণ সবলতা দেখা দিলো যেন, যেন সে একটা সুগন্ধ পেয়েছে। সে উৎকর্ণ হ'লো যেন রাজুর ঘর থেকে পিআনোর ঝঙ্কার ভেসে এলে শুনতে পাবে।

নয়নতারা তার শোবার জন্য নির্দিষ্ট রানীমার পাশের ঘরে ফিরে এলো। বহুমূল্য শয্যা। রানীমার নির্দেশে এমন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কেন যে এমন করেন।

শয্যায় ব'সে নয়নতারার মনে হ'লো আলাপে আলাপে নদীর বাঁধে ফাটলের সমস্যা এবং

তার সমাধান, ছ'আনির রাজকুমার এবং বন্দা নামে বাবুর্চির তরোয়াল খেলার গল্প শোনা গেলো। দেখো কাণ্ড ব'লে ভাবলো নয়নতারা : জাঁ পিয়েত্রোর বাবুর্চি যার নাম বন্দা সে কিনা তরোয়ালবাজ। বুজরুক আলি যেমন ছিলো ফরাসডাঙ্গার মসলিনের ম্যানেজার। এটা কি কৌশল পিয়েত্রোর নাকি তার বিদেশী মনের খেয়াল। হয়তো খোঁজ করলে জানা যাবে বন্দা আসলে গুলাম কুদ্দুস আর পিয়েত্রোর দেহরক্ষীই।

তরোয়াল খেলাটার গল্প যেন হঠাৎ তার বুকের ভিতরে কিছুকে চেপে ধরলো। বন্দুকও নিশ্চয়ই প্রাণঘাতী। কিন্তু তরোয়াল খেলা, তা কি নকল তরোয়াল দিয়ে হয়? হ'লেও তার কতটুকু নকল? তার ধার একেবারেই থাকে না এমন হ'তে পারে না।

এটা রাজুর সম্বন্ধে আর একটা নতুন খবর। কেউ কেউ থাকে যাকে খুব ভালো ক'রে চিনেও যেন সবটুকু চেনা হয় না। এ খবরটা পাওয়ার পর তার মনে রাজুর ছবিটা কি একটু বদলায় না? এ বিষয় আলাপ করা দরকার রাজুর সঙ্গে? তরোয়ালকে কৃপাণ, খরবাল ইত্যাদিও বলে। তা হ'লে একদিন রাজুকে লক্ষ্য করতে হয় তরোয়াল খেলার সময়ে। সে কি, কথাটা হঠাৎ মনে এলো, পিয়েত্রোর সেই পুরনো মখমলের খাপে ঢাকা কিন্তু অদ্ভুত ধারালো মস্ত তরোয়ালটা ব্যবহার করে? সে কি লোহার জালির জামা গায়ে দিয়ে নেয়? দেখা দরকার। কিন্তু...তা ভালো নয়। সে কাছে থাকলে খেলার সময়ে রাজু যদি অন্যমনস্ক হয়? না, না, তাতে বিপদ হ'তে পারে।

নয়নতারা ভাবলো এখানে এখন আলাপ করার কেউ নেই। সেজন্যই যেন সে অনুভব করার চেষ্টা করলো। কাউকে বুকে জড়িয়ে ধরলে যেমন বুকটা ভ'রে ওঠে ব'লে মনে হয় তেমন একটা কোমল কবোষ্ণ মধুরতা সে অনুভব করলো যেমন কিছুক্ষণ আগেই অলিন্দে দাঁড়িয়ে করেছিলো। কিন্তু শুধু মধুর আর কোমল নয়, ঝক্‌ঝকেও যেন।

কিন্তু এভাবে অনুভব ক'রে ক'রে কি সমস্যার সমাধান হয়? কারো সঙ্গে আলাপ করতে পারলে হতো। ছিকল বুনে বুনে তৈরি জামার কথা যদি বলো (এটা নয়নতারার অজ্ঞাতে ইস্পাতের জামার ছায়া) তবে সেই সোয়েটারটাই আবার মনে আসছে। কি আগ্রহ নিয়েই না কলকেতা থেকে উল আনানো, কি আগ্রহ নিয়েই না বুনতে শেখা। রাজু পরবে ব'লেই তো। কিন্তু কোথায় গেলো সে আগ্রহ, তা নিয়ে কি কারো সঙ্গে আলাপ করা যায়। আলাপটা তুলেছিলো কেট, কিন্তু সে তো তা এড়িয়ে গেলো।

রাজুকে সে একবার নিজে হাতে সুতো কেটে ধুতিচাদর উপহার দিয়েছিলো বটে। তেমন সেই এক রাতে রাজু তার বাড়িতে গিয়ে তার বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সেটা বোধ হয় কোন উৎসবের রাত ছিলো। এখন কি রাজু তেমন কিশোর?

আলাপের কথাতে মনে পড়লো নয়নতারার যেন এ বিষয়ে একজনই মাত্র বেশ স্পষ্ট ক'রে আলাপ করেছে। ঘটকী সেই ব্রহ্মঠাকরুন। সেই যে অঙ্কের ধাঁধার মতো স্ত্রী ও পুরুষের বয়সের পাশাপাশি হিসাব। পুরুষের বয়স যে সময়ে পাঁচ বছর বাড়ে, স্ত্রীলোকের সাত-আট বছর বেড়ে যায় প্রকৃতির এক অদ্ভুত নিয়মে; অর্থাৎ এখন কুড়ি-একুশ বছরের পুরুষের চোখে পঁচিশ-ছাব্বিশের যে নারী আদরণীয়া, দশ বছর পরে ত্রিশ-একত্রিশ বছরের সেই পুরুষের চোখে সেই স্ত্রীলোক চল্লিশ পারের স্থবির বোঝা। বলো কোন হৃদয়বতী পারে কাউকে এমন ভারাক্রান্তা করতে?

ছি—ছি এসব কি আলাপে আনা যায়। রাজুর তো একুশ হ'লো। নয়নতারা স্থির করলো সে ঘুমাবে। দরজা বন্ধ ক'রে টিপয়ায় বসানো মোমের বড় ডোমদার সেজটাকে নিবিয়ে

দিয়ে বিছানায় এলো সে। দেয়ালে মৃদু লাল কাঁচকড়ার দেয়ালগিরি। সেদিকে শান্তভাবে চাইলো। এখন সে গায়ের কাপড় আলগা করেছে। সেই প্রবাদটা মনে করিয়ে দিচ্ছে যে তার গড়নে পাথরে খোঁদা পেলবতার কথা মনে হয়। পেলবতা কিন্তু তা কখনও কঠিনও বটে।

শুয়ে নয়নতারা ভাবলো রানীমা কিন্তু বিচলিত নন। বাঁধটাকে নতুন ক'রে শক্ত ক'রে তুলবেন। ফাটলগুলো থাকবে না। হ্যাঁ, বাঁধ ভালোই তো। অনেক কিছুকেই সংযত রাখতে। গঙ্গামাঈ বুড়াকে কোলে নিতে চাইলেও, যেমন পুরোহিত বলেছিলো, আমরা সকলে রাজি হ'তে পারি না। ক্ষতি কি যদি অগাধ শান্ত হয়ে নদীটা মন্দিরের কিছু দূরে প্রবাহিত হ'তে থাকে?

কিন্তু যখন চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে তখন সার্বভৌমপাড়ার মেয়ে নয়নতারার মনে হ'লো: তোমার কাছে আকবর বাদশার কাল আর রাজুর কালে কোন ব্যবধান নেই। রানীমার মন্দির কখন আকাশ স্পর্শ ক'রে আবার কখন মাটিতে মিশে যায়—দু-তিন শ' বছরের সে ব্যবধান তোমার কাছে কিছু নয়। কিন্তু তুমি তো সময়, মহাকাল। তুমি ব্যতীত কিছুই জন্মায় না তুমি স্থির। সেজন্যই তো পিতা। কিন্তু কেন তবে স্নেহ নেই। এই সময়ের ব্যবধানে আমাদের যা অতীত হ'য়ে যায় তা কি তুমি করুণায় পূর্ণ করো না?

সেদিন রাত্রিতে নয়নতারা স্বপ্ন দেখেছিলো। এবং সেজন্যই স্বপ্ন আমাদের বলার বিষয় হচ্ছে।

স্বপ্নটা এরকম: এক অগাধ স্থির জলাশয়ের পার বাঁধানো চলেছে কিংবা একটা গতিশীল জলরাশিকে বাঁধের সাহায্যে হ্রদে পরিণত করা হচ্ছে। যেমন রানীমা বলেছিলেন। এবং সেজন্যই সেই বাঁধের গহ্বরটাই শিবলিঙ্গের কাছে। সেখানে হরদয়াল আছে, নায়েব আছে; তারাই তত্ত্বাবধান করছে। কিন্তু এত সত্ত্বেও বাঁধে কোথাও যেন চিড় ধরলো। সেই জল ফুলে ফেঁপে, যেমন শুধু আকাশের কুণ্ডলী পাকানো মেঘই পারে, শিবলিঙ্গটাকে ঢেকে দিচ্ছে, স'রে যাচ্ছে, আবার আর একটি কুণ্ডলীতে এসে গিলে ফেলছে। স্বভাবতই সকলের মুখেই দুশ্চিন্তা। নয়নতারাও বিষণ্ণ কিন্তু হঠাৎ যেন সে গোপনে এক তীব্র আনন্দে দিশেহারা; যেন সে বাঁধ ধ্বসে পড়ার প্রবল আগ্রহে সুখী। হাততালি দিয়ে উঠবে যেন আনন্দে।

এক দারুণ লজ্জায় যেন ঘুম ভেঙে গেলো নয়নতারার। বিছানায় উঠে বসলো সে। দেয়ালগিরিতেই চোখ পড়লো তার। স্বপ্নটা যেন সত্যর মতো, যেন এখনই ঘটেছে।

নয়নতারা উঠলো। দাঁড়াতে গিয়ে পা দুটো কি একটু কাঁপলো? একটা জানলা খুলে দিলো সে। আর তখনই পেটাঘড়িতে একটা একটা ক'রে এগারোটা বাজলো। রাত হয়েছে, তবে তেমন বেশী নয়। জানলা ধ'রে দাঁড়ালো সে। বাতাসের ঝাপটাটা ঠাণ্ডা। বেশ ঠাণ্ডাই। সে কি বাজনা শুনতে পেলো এবার? মৃদু কিন্তু যেন ক্রমশ স্ফুরিত হচ্ছে। আগে ছিলো না। পিআনো বাজাতে বসার পক্ষে এখন কি অনেক রাত নয়?

নয়নতারা ভুল শোনেনি। বিছানা দেখেই মনে হচ্ছে রাজু এতক্ষণ ব'সেই ছিলো। অথচ কি করেছে সে আহারাদির পর দু' ঘণ্টা। স্থির হ'য়ে, প্রায় পাথরের মতো, বড় চেয়ারে চিবুকের নিচে ডান হাতে চেপে ধরার ভঙ্গিতে ছুঁয়ে ব'সে থাকাকে কিছু করা বলে না। এখন সে উঠে পিআনোর সামনে বসলো। মিউজিক শীট্‌টার গায়ে ইংরেজি অক্ষরে লেখা চঁপিন কিন্তু আসলে ভদ্রলোকের নাম শপ্যাঁ। এই উচ্চারণবিভ্রাট যেন তাকে ভাবাবে। তারপর সে পিআনোয় হাত দিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই সুরে এমন হ'লো যে কিছু যেন ভেঙে পড়ছে, কোথাও

বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছে, আক্রোশ আর বেদনা, হার না মানার প্রবল প্রতিজ্ঞা।

সে রাত্রিতে রাজু শ'প্যার সেই 'রিভলিউশ্যনারী স্টাডি' বারবার বাজিয়ে যেন মুখস্থ করার চেষ্টা করতে লাগলো। যেন সেটা রিহার্স্যাল এবং আগামীকাল তাকে কোন শ্রোতার সামনে উপস্থিত হ'তে হবে। অবশ্য এটা অস্বীকার করা যায় না যে কোন বিচক্ষণ শ্রোতার কানে ধরা পড়বে রাজুর এই বাজানোর ব্যাপারটা একেবারে প্রতিটি বারে শপ্যাঁর নির্দেশ মতো হচ্ছে না। যাকে ইম্প্রোভাইজ করা বলে হয়তো তেমন কিন্তু তীব্র কঠিন কঠোর ধ্বনিগুলি যেন দীর্ঘায়ত আর উচ্চরব হচ্ছে। যেন বাঁধনছেঁড়া যেন বাঁধভাঙা, তাকে প্রবলভাবে অস্বীকার করা যা তোমাকে স্বাধীন হ'তে দেয় না। আর ব্যর্থতা যখন ভাগ্যের মতো তখন বিষণ্ণতার ঘাটগুলো বেজে উঠছে।

[ক্রমশ]

রীতি বিষয়ক আলোচনা

(যুক্তিকে সুপরিচালিত করার জন্য এবং বিজ্ঞানের মধ্যে সত্যকে অনুসন্ধানের তাগিদে)

রনে দেকার্ত

সেখানে থাকাকালীন গোড়ার দিকে যেসব গভীর চিন্তা আমি করি[১], জানি না সে-সম্বন্ধে আপনাদের কিছু বলা উচিত হবে কিনা। কারণ সে-চিন্তাগুলি এতই আধিবিদ্যক[২] ও এত দুর্লভ যে তারা সর্বসাধারণের রুচিসম্মত নাও হতে পারে। তবু তাদের বিষয়ে বলতে আমি নিজেকে খানিকটা বাধ্য মনে করছি, যাতে তা শুনে লোকে বিচার করতে পারে আমার গৃহীত ভিত্তিগুলি যথেষ্ট দৃঢ় হয়েছে কিনা। বহুকাল ধরে লক্ষ্য করছি যে দেশাচারের ক্ষেত্রে কখনো-কখনো এমন মতামতও অবলম্বন করার দরকার হয় যাকে লোকে বেশ অনিশ্চিত বলেই জানে—তবু, যা আগেই বলেছি, সে-মতামতগুলি গ্রহণ করা হয় এমনভাবে যেন তারা সব সন্দেহের অতীত। কিন্তু যেহেতু আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সত্যের অনুসন্ধান, তাই মনে হল আমাকে ঠিক উল্টোটাই করতে হবে—যা-কিছু সম্বন্ধে তুচ্ছতম সন্দেহও আমার কল্পনায় জাগতে পারে, তাকে পুরোপুরি মিথ্যা বলে বর্জন করা ছাড়া আমার উপায় থাকবে না। এবং তা করব শুধু এটা দেখার জন্যই যে এত কান্ডের পরেও আমার প্রত্যয়ে এমন আরো কিছু অবশিষ্ট থাকে কিনা যা নিয়ে কোনো সন্দেহ একেবারেই করা চলে না। তাই যেহেতু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা আমরা কখনো-কখনো প্রতারিত হই, আমি এই ধারণা করতে প্রবৃত্ত হলাম যে এমন কোনো জিনিসই থাকতে পারে না যাকে দেখে যা মনে হয়, সেটা আসলে তা-ই। এবং যেহেতু এমন লোকও আছে যারা যুক্তি করতে করতেও ভুল পথে চালিত হয়, জ্যামিতির কোনো সরলতম বিষয় নিয়ে আলোচনার সময়ও ভ্রান্ত বিচার করে বসে, তদুপরি অন্য যে-কোনো ব্যক্তির মতো আমিও যেহেতু সমান ভুলই করতে পারি, এই সব ভেবে যত যুক্তি আমি আগে খাড়া করেছিলাম প্রমাণ হিসেবে দেখাবার জন্য, তার সবগুলিকেই মিথ্যা বলে বর্জন করলাম। এবং শেষে যখন ভাবলাম যে জাগরণের সময় আমাদের মনে যে-সব চিন্তা থাকে, তার সবগুলিই হুবহু আমাদের নিদ্রার সময়ও জাগতে পারে, এবং নিদ্রাকালীন উদিত সেই চিন্তাগুলির একটিও সত্য হতে কিছুতেই পারে না, তখন সিদ্ধান্ত নিলাম এমন ভান করার যাতে যত বস্তুই আমার মনের মধ্যে কোনো-না-কোনো কালে ঢুকে থাকুক না কেন, আমার স্বপ্নে দৃষ্ট মায়া হতে তাদের বেশি সত্য বলে গ্রহণ করব না। কিন্তু তখুনি এই সতর্কতাও আমায় অবলম্বন করতে হল যাতে সব কিছুকে যখন আমি এমন মিথ্যা বলে ভাবতে চাইছি, তখন অন্তত এ সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকতে পারি যে এই সব এমন ভাবছি যে-আমি, সেই আমি কিছু একটা জিনিস তো বটেই। এবং যখন দেখলাম যে 'আমি ভাবছি, তাই আমি আছি' এই সত্যটি এত সুদৃঢ় ও নিশ্চিত যে সন্দেহবাদীদের উদ্ভটতম কোনো অনুমানেরও সাধ্য নেই তাকে টলায়, তখন তাকে আমার অন্বিষ্ট দর্শনের প্রথম তত্ত্ব হিসেবে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারি বলে স্থির করলাম।

পরে যখন আমি মনোযোগ দিয়ে বিচার করতে বসলাম বস্তুটা কী এবং দেখলাম আমার পক্ষে এমন ভান করা যদিও সম্ভব যে আমার কোনো শরীর নেই, কোথাও কোনো পৃথিবী নেই, বা এমন স্থানও নেই যেখানে আমি রয়েছি, তখনো কিন্তু এটা ঠিকই দেখলাম যে আমি নিজেই যে নেই, তেমন ভান করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। উল্টে আমি বলে

কেউ রয়েছি বলেই অন্যান্য জিনিসের সত্যাসত্য নিয়ে সন্দেহ তুলতে পারছি আমার চিন্তায়। এর থেকে তাই অতি স্বতঃসিদ্ধভাবে ও অতি নিশ্চিতভাবে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে আমি আছি। সেটা না হয়ে যদি এমন হত যে ঐ ভাবাটাই আমি বন্ধ করে দিলাম, অথচ যা-কিছু আমি কল্পনা করে থাকতে পারি তার সবই সত্য ছিল বা আছে, তাহলে আমি নিজে যে রয়েছি, এমন বিশ্বাস করার কোনো কারণই আমার থাকবে না। এর দ্বারা জানতে পারলাম আমি হলাম গিয়ে এমন একটি পদার্থ যার সমস্ত সার বা প্রকৃতিই হল শুধু চিন্তা করার সামর্থ্য এবং নিজের অস্তিত্বের জন্য তার দরকার পড়ে না যেমন কোনো স্থানের, তাকে তেমনি নির্ভরও করে থাকতে হয় না কোনো বাস্তব জিনিসের উপর। ব্যাপারটা এমন যে এই আমি, অর্থাৎ সেই আত্মা যার দ্বারা আমি যা রয়েছি সেটা থাকতে পারছি, তা শরীর হতে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। এমন-কি শরীরের চেয়ে একে জানা আরো সহজ, এবং শরীর যদি নাও থাকে, আত্মা যা আছে তা সমানই থেকে চলবে।

এর পর আমি সাধারণভাবে বিচার করতে বসলাম কোনো প্রতিজ্ঞার পক্ষে সত্য ও নিশ্চিত হওয়ার জন্য কোন্ জিনিসটির দরকার। কারণ সে-রকম কোনো নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা যখন খুঁজে পাচ্ছি, তখন ঠিক কিসে তার নিশ্চয়তা নিহিত রয়েছে সেটাও আমায় জানতে হবে বলে মনে হল। এবং যখন দেখলাম 'আমি ভাবছি, তাই আমি আছি' বললেই যে আমি সত্য বলছি এমন আশ্বাস পাচ্ছি না—এক যা অতি পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি, সেটা হল ভাবতে পারার জন্য থাকার দরকার আগে—তখন ঠিক করলাম সাধারণ নিয়ম হিসেবে আমি যা গ্রহণ করতে পারি, তা হল যা-কিছুর ধারণা আমাদের কাছে অতি স্পষ্ট ও অতি পরিষ্কার, তার সবই সত্য। কিন্তু ঠিক কোন্-কোন্ জিনিসটার ধারণা আমাদের কাছে পরিষ্কার, শুধু তার নিরূপণেই কিছু সমস্যা রয়েছে।

অতঃপর যখন ভাবতে বসলাম কী নিয়ে সন্দেহ করছি এবং সন্দেহ করছি বলেই আমার সত্তা নিশ্চয় একেবারে সম্পূর্ণ নয়—কারণ পরিষ্কার দেখতে তো পাচ্ছি সন্দেহ করার চেয়ে জানতে পারা আরো বড় পূর্ণতার পরিচায়ক—আমি তখন ঠিক করলাম আমার চেয়ে পূর্ণতর কোনো জিনিস সম্বন্ধে ভাবতে আমি শিখলাম কোথা থেকে, সেটা আমায় খুঁজে দেখতে হবে। এবং তখন স্পষ্টই জানতে পারলাম, সেটাকে তবে হতেই হবে এমন একটা সত্তা যার স্বভাব বা প্রকৃতিটাই হল আসলে পূর্ণতর। অন্যান্য বহু জিনিস যা আমার বাইরে রয়েছে, তার সম্বন্ধে আমার ধারণার কথা যদি ধরি—এই যেমন আকাশ বা পৃথিবী বা আলো বা উত্তাপ বা আরো সহস্র বস্তু সম্বন্ধে আমি যা-কিছু ভেবেছি—তো কোথা থেকে সেই চিন্তাগুলি আসছে, তা জানার জন্য তেমন মাথা ঘামাইনি। কারণ সেইসব বস্তুর মধ্যে যেহেতু এমন কিছুই দেখিনি যাতে তাদের আমার চেয়ে বেশি শ্রেয় ঠেকে, আমি তাই বিশ্বাস করতে পারি যে যদি তাদের সম্বন্ধে আমার ধারণাগুলি সত্য হয় তো তা হবে আমারই স্বভাবের কারণে, অর্থাৎ তা সম্ভব হচ্ছে আমারই স্বভাবের কিছু সম্পূর্ণতার দরুন। এবং সেই ধারণাগুলি যদি সত্য না হয়, তবে শূন্য হতে আমিই তাদের তুলে ধরে আছি, অর্থাৎ তারা আছে একমাত্র আমারই ভিতরে, কারণ আমার স্বভাবে ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু যে-সত্তা আমার চেয়ে সম্পূর্ণতর, তার সম্বন্ধে ধারণার ব্যাপারে এই একই কথা খাটতে পারে না, কারণ তাকে শূন্য হতে তুলে ধরব, সেটা স্পষ্টতই অসম্ভব। এবং যেহেতু বেশি-পূর্ণ জিনিস কম-পূর্ণ জিনিসের অনুগামী বা মুখাপেক্ষী বলা যেমন অসঙ্গত ও একেবারে শূন্য হতে কোনো কিছুর বিস্তার ঘটছে বলাও হবে ঠিক তেমনই যুক্তিবিরুদ্ধ, তাই আমার চেয়ে পূর্ণতর এক সত্তার সম্বন্ধে আমার সেই

ধারণাটিকে যে একমাত্র আমি নিজেই জাগিয়ে তুলেছি মনে, এটাও হতে পারে না। অতএব বাকী যা রইল, তা হল ধারণাটি তবে আমার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যে ঢুকিয়েছে, সে এমন একটি প্রকৃতি যা বাস্তবিকই আমার চেয়ে পূর্ণতর, এমন-কি যাবতীয় যত সম্পূর্ণতার কিছু ধারণাও আমি করতে পারি, সেই সবই তার নিজের মধ্যে রয়েছে—অর্থাৎ, এক কথায় বোঝাতে গেলে, সেই সম্পূর্ণতা হলেন ঈশ্বর। সঙ্গে এটাও যোগ করব যে যেহেতু আমার অধিকারে নেই এমন কিছু সম্পূর্ণতার কথা আমি জানি, আমি তবে নিশ্চয় সেই একটি মাত্র প্রাণী নই যে একলাই শুধু রয়েছে (আপনাদের অনুমতি নিয়ে এখানে প্রচলিত চিন্তাধারার[৩] কিছু শব্দ ইচ্ছামতো ব্যবহার করছি), কিন্তু সম্পূর্ণতর এমন অন্য কেউও থাকতে বাধ্য যাঁর উপর আমি নির্ভরশীল, এবং যা-কিছু আমার আছে, তা পেয়েছিও যাঁর কাছ থেকে। কারণ তেমন একা ও একান্তভাবে আত্মনির্ভরশীলই যদি আমি হতাম, যাতে পূর্ণ সত্তার যেটুকু অংশ আমাতে রয়েছে সেটা একেবারে নিজেই অর্জন করতে পারতাম, তাহলে তো একই যুক্তি ধরে যে-ঘাটতিগুলো আমার আছে বলে জানি সেগুলোও নিজে-নিজেই ভরিয়ে তুলতে সমর্থ হতাম, এবং এভাবে নিজেই হতে পারতাম অসীম, শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান—এবং শেষে একমাত্র ঈশ্বরের মধ্যেই যে-সম্পূর্ণতাগুলি খুঁজে পেতে পারি বলে ভেবেছি, তার সবগুলিকে আমি একাই আয়ত্ত করতাম। এই যে যুক্তি পাড়লাম, তার অনুসরণে আমার সাধ্যমতো যদি ঈশ্বরের প্রকৃতিটি জানতে চাই তো একমাত্র যে-বিচারটি আমায় করতে হবে, তা হল যত কিছু জিনিস সম্বন্ধে আমার মনে কোনো ধারণা জন্মেছে, সেই জিনিসগুলির অধিকারী হওয়া মানে সম্পূর্ণতার অধিকারী হওয়া কি না। এবং সে-বিচার করতে গিয়ে নিশ্চিত দেখলাম, এমন একটি জিনিসও[৪] তাঁর মধ্যে নেই যা কোনোরকমের অসম্পূর্ণতায় চিহ্নিত, কিন্তু অন্য সব জিনিসগুলি তাঁতে রয়েছে। যেমন দেখলাম, সন্দেহ বা অস্থিরতা বা বিষাদ বা সে-ধরনের অন্য কোনো বস্তু তাঁর মধ্যে থাকতেই পারে না, কেন-না সেগুলি থেকে রেহাই পেলে আমি নিজেই তো আরাম পেতাম। এ ছাড়া বহু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দৈহিক জিনিসের ধারণাও আমার রয়েছে—কারণ যদি ধরেও নিই যে স্বপ্ন দেখছি ও তাই যা-কিছু চোখে জাগছে বা যা-কিছু কল্পনা করছি তার সবই মিথ্যা, তবু আমার চিন্তায় ধারণাগুলো যে সত্যিই রয়েছে, সেটা তো অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু যেহেতু নিজের মধ্যে আগেই অতি স্পষ্টভাবে জেনেছি যে বুদ্ধিময় প্রকৃতি দৈহিক প্রকৃতি হতে আলাদা এবং যেহেতু এটাও ভেবে দেখেছি যে সব মিশ্রণেই প্রমাণ নির্ভরশীলতার ও নির্ভরশীলতা মাত্রই দোষ নিশ্চয়, এর থেকে আমি তাই বিচার করলাম যে ঈশ্বরের পক্ষে এই দুই প্রকৃতির মিশ্রণে রচিত হওয়ায় কোনো সম্পূর্ণতা থাকতেই পারে না এবং কাজে-কাজেই এইরকম মিশ্রণে তিনি রচিত নন। শুধু তাই নয়, পৃথিবীতে যদি শরীর কিছু থাকে, বা কোনো বুদ্ধি কোথাও, বা অন্য কোনো প্রকৃতি—যারা সকলে সম্পূর্ণ নিশ্চয় নয়—এদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব নির্ভর করে থাকতে বাধ্য একমাত্র তাঁরই শক্তির উপর, এবং এটা এমন চরম-ভাবে যে তাঁকে বাদ দিয়ে এদের কেউই এক মুহূর্ত বাঁচতে পারবে না।

অন্যান্য সত্যের অনুসন্ধান করতে চাইলাম এর পর। জ্যামিতিজ্ঞদের বিষয়[৫] নিয়ে যখন ভাবতে চাইলাম এবং দেখলাম তার সম্বন্ধে আমার ধারণা হল যে সেটি একটি অবিচ্ছিন্ন দেহ[৬], অথবা এমন একটি স্থান যাকে অনির্দিষ্টভাবে[৭] দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় বা গভীরতায় প্রসারিত করা চলে, যা বিভাজ্য বহু[৮] অংশে, বহু রেখা-রূপ ও আকারও যার থাকা সম্ভব এবং যাকে নানা প্রকারে নড়ানো বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বসানো

চলে—কারণ জ্যামিতিজ্ঞরা তাঁদের বিষয়ের ব্যাপারে এই সবই মেনে নেন—আমি তখন তাঁদের সরলতম প্রমাণগুলির কয়েকটির উপর একবার চোখ বোলালাম। এবং যখন সাবধানে বিচার করলাম যে সকলে যে-বিরাট নিশ্চয়তা সেই প্রমাণগুলির উপর আরোপ করে থাকে, তার ভিত্তি শুধু এই যে তাদের সম্বন্ধে সেই ধারণাটি সকলের মনে জন্মেছে স্বতঃসিদ্ধভাবে—যে-নিয়মের কথা আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি, তারই মাধ্যমে—তখন এটা সম্বন্ধেও আমাকে সমান সতর্ক হতে হল যে সেই প্রমাণগুলির মধ্যে এমন কিছুই নেই যা তাদের বিষয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাকে নিশ্চিত করতে পারে। কারণ, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলছি, যদি ধরি কোনো ত্রিকোণের কথা তো স্পষ্ট দেখি তার তিনটি কোণের সমষ্টিকে দুই সমকোণের সমান হতেই হবে, কিন্তু তাই বলেই যে ত্রিকোণ বলে কিছুকে থাকতেই হবে পৃথিবীতে, সে-নিশ্চয়তা আমি কোথাও দেখছি না। এর পরিবর্তে এবার যদি এক পূর্ণ সত্তা সম্বন্ধে আমার সেই ধারণাটির আলোচনায় ফিরে আসি তো দেখি যে ঠিক যে-নিশ্চয়তার সঙ্গে বলি কোনো ত্রিকোণের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হবেই বা কোনো চক্রের যে-কোনো অংশবিশেষ তার কেন্দ্র হতে সমদূরবর্তী হবেই, একেবারে সেই একই নিশ্চিতভাবে কি তার চেয়ে আরো স্বতঃসিদ্ধভাবে পূর্ণ সত্তাটির অস্তিত্বের উপলব্ধি আমার ধারণাতে নিহিত বলে খুঁজে পাচ্ছি। অতএব এটা তবে অন্তত সমানই নিশ্চিত যে যে-ঈশ্বরই হলেন সেই পূর্ণ সত্তা; তিনি আছেন-ই বা অবস্থান করছেন-ই, সেটা জ্যামিতির যে-কোনো প্রমাণের পক্ষেই সাধ্যাতীত হবে।

অবশ্য এমন অনেকে আছে যারা এটা বলতেই প্ররোচিত যে সেই পূর্ণ সত্তাটিকে জানা নাকি কষ্টকর, এমন-কি তাদের নিজেদেরই আত্মা বস্তুটি যে কী, সেটা জানাও তাদের পক্ষে সমানই শক্ত। কিন্তু তার কারণ হল এই যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ঊর্ধ্বে তাদের চিত্তকে তারা কখনো তোলে না এবং যে-বিশেষ ধরনের চিন্তাটি খাটে জড় পদার্থের বেলায়, তার অনুসরণে কোনো কিছুকে একমাত্র কল্পনার মাধ্যমে ছাড়া অন্য উপায়ে বিচার না করতে তারা এত অভ্যস্ত যে যা-কিছু কল্পনাধীন নয়, তা তাদের কাছে ঠেকে অবোধগম্য। পরিষ্কার দেখছি তো, একাধিক চিন্তাধারার দার্শনিকরা পর্যন্ত এটিকে তাঁদের সূত্র হিসেবে ধরে বসে আছেন[৯] : বুদ্ধিতে এমন কিছুই থাকতে পারে না যা নাকি ইন্দ্রিয়ে আগেই থাকেনি। এবং সেই ইন্দ্রিয়ে ঈশ্বর বা আত্মা সম্পর্কিত কোনো ধারণা যে কখনো থাকেনি, সেটা তো নিশ্চিতই। আমার তো মনে হয় এগুলিকে[১০] বোঝবার জন্য কারুর পক্ষে কল্পনার আশ্রয় নিতে চাওয়া যা, শব্দ শোনার জন্য বা গন্ধের আঘ্রাণের জন্য চক্ষুর শরণাপন্ন হওয়াও তা। অবশ্য শুধু তফাত সেখানে এই যে চোখের ইন্দ্রিয় তার বিষয়গুলির সত্যতা সম্বন্ধে যেমন, ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা শ্রবণেন্দ্রিয়ও তেমন তাদের স্ব-স্ব বিষয়গুলির সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের সমানই নিশ্চিত করে। কিন্তু এখানেও, ইন্দ্রিয়ই বলি আর কল্পনাশক্তিই বলি, তাদের কারুরই ক্ষমতা নেই একবারের জন্যও কোনো জিনিস সম্বন্ধে আমাদের যথার্থভাবে নিশ্চিত করে, যদি-না সে-ক্ষেত্রে আমাদের বুদ্ধিশক্তিও মাঝে এসে হাজির হয়।

শেষে, এখনো যদি এমন কিছু লোক থাকে যারা যে-কারণগুলির উল্লেখ আমি করেছি, সেই হেতু ঈশ্বর ও তাদের নিজেদের আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যথেষ্টভাবে নিশ্চিত নয়, তবে আমি চাই তারা জানুক যে আর যা-কিছুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তারা নিজেদের মনে করছে আরো নিশ্চিত—এই যেমন, তাদের নিজেদের শরীর বলে একটা বস্তু আছে, বা একটা পৃথিবী আছে, বা গ্রহনক্ষত্র এবং অন্যান্য অনুরূপ বস্তু আছে—সেই জিনিসগুলি কিন্তু ঈশ্বর ও আত্মার

তুলনায় অতটা নিশ্চিত নয়। কারণ যদিও সেই জিনিসগুলি সম্বন্ধে মানুষের মনে এমন একটি নৈতিক নিশ্চয়তার[১১] ভাব থাকে যাতে একেবারে বুদ্ধিভ্রংশ না হলে তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে সন্দেহ তুলবে না, তবু, প্রশ্ন যখন কোনো আধিবিদ্যক নিশ্চয়তার, তখন নেহাত অবিবেচক না হলে এটাও তাকে মানতে হবে যে এই জিনিসগুলি এমন কিছু বিষয় নয় যার সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া চলে—বিশেষত যেহেতু একটু সতর্ক হয়ে বোঝবার চেষ্টা করলেই দেখা যায়, একইরূপে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও মানুষের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব যে তার অন্য একটা দেহ আছে বা সে দেখছে অন্যান্য কোনো গ্রহনক্ষত্র কি ভিন্ন কোনো পৃথিবী, যদিও আসলে তার কিছুই সত্য নয়। স্বপ্নে যে-চিন্তাগুলি আসে, সেগুলি তো অন্যান্য চিন্তা হতে কিছু কম জীবন্ত বা সুস্পষ্ট নয়, সুতরাং কী করে জানা যাবে যে তারা আসলে মিথ্যা এবং অন্য চিন্তাগুলি মিথ্যা নয়? এবং পৃথিবীর যাবতীয় মনীষীরা ব্যাপারটা নিয়ে যত খুশিই ভাবুন না কেন, আমার তো মনে হয় না এমন কোনো উচিত যুক্তি তাঁদের হাতে আছে যার দ্বারা এই সন্দেহভঞ্জন হতে পারে—একমাত্র যদি-না তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বটিকে আগে থেকে অনুমান করে নেন। কারণ, প্রথমত, যেটিকে আমার অন্যতম নিয়ম বলে কিছুক্ষণ আগে গ্রহণ করেছি ও যার দ্বারা বোঝাতে চেয়েছি যে সেই সব জিনিসই সত্য যেগুলি সম্বন্ধে আমাদের অতি স্বচ্ছ ও অতি পরিষ্কার ধারণা রয়েছে, সেই নিয়মটি সম্বন্ধেও নিশ্চিত হতে পারছি এই কারণেই যে ঈশ্বর আছেন ও অবস্থান করছেন, তিনি এক সম্পূর্ণ সত্তা, এবং যা-কিছু রয়েছে আমাদের মধ্যে তার সবই এসেছে একমাত্র তাঁরই কাছ হতে। এর থেকে এটাও প্রমাণিত হচ্ছে যে আমাদের ধ্যানধারণাও যেহেতু আসছে ঈশ্বরের কাছ হতে ও তারা সত্যকারের বস্তু, তাই তাদের মধ্যে যা-কিছু স্বচ্ছ ও পরিষ্কার তা-ও সত্য না হয়ে যায় না। তাই এমন ধারণাও যদি আমাদের মনে প্রায়ই জাগে যার মধ্যে মিথ্যা রয়েছে, তাতে তবে কিছু একটা আছেই যেটা অস্বচ্ছ ও গোলমেলে, এবং সেই অস্বচ্ছ অংশটুকু সে নিয়েছে শূন্যের কাছ থেকে—অর্থাৎ আমাদের ধ্যানধারণাগুলো যদি কখনো-কখনো এমন অস্বচ্ছ হয়ই তো তার কারণ হল আমরা কেউই একেবারে সম্পূর্ণ নই। এবং শূন্য থেকে সত্য বা পূর্ণতা যদি একেবারেই-না জানি যে আমাদের ভিতরে যা-কিছু আসল ও সত্য তার সবই এসেছে এক পূর্ণ ও অনন্ত সত্তা হতে, তবে যত স্বচ্ছ ও পরিষ্কারই হোক না আমাদের ধ্যানধারণা, তারা যে সত্য হওয়ার সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে, এই আশ্বাস নিজেদের দেওয়ার মতো কোনো যুক্তিই আমাদের থাকবে না।

এবারে, ঈশ্বর ও আত্মা বিষয়ক জ্ঞান যখন এভাবে এই নিয়মটি সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত করেছে, তখন সহজেই বোঝা যাবে যে তন্দ্রাবশে যে-সব দিবাস্বপ্নের কল্পনা আমরা করি, তাদের কারণে আমাদের জাগ্রত অবস্থার চিন্তাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে আমরা কেন কিছুতেই সন্দেহ পোষণ করব না। কারণ এমনও যদি হয় যে ঘুমোতে-ঘুমোতে কারুর মনে কোনো অতি-স্পষ্ট ধারণা এল—এই যেমন, কোনো জ্যামিতিজ্ঞ আবিষ্কার করে ফেললেন এক নতুন প্রমাণ—তাহলেও, তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন বলেই যে প্রমাণটা সত্য হবে না, সেটা হতে পারে না। এবং আমাদের স্বপ্নগুলোর সব থেকে সাধারণ ভুলটার কথা যদি ধরি—যে-ভুলটা হল এই যে আমাদের বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গুলি ঠিক যেমনটি করে, স্বপ্নও তেমনভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরে একের পর এক বিভিন্ন বস্তু—তাহলে বলব যে সেই ভুল যদি ঐ-ঐ দৃষ্ট বস্তুর সত্যতা না মানতেই আমাদের উদ্যত করে তো তাতে কিছু যায়-আসে না, যেহেতু যখন আমরা ঘুমোচ্ছি না, তখনও তো প্রায়ই ঐ-সব বস্তুর পক্ষে খুবই সম্ভব আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া। এই

যেমন, ন্যাবা হলে লোকে সব কিছুই হলদে দেখে, কিম্বা বহু দূরের গ্রহনক্ষত্র বা অন্য কোনো দেহ আসলে যেমন, তার চেয়ে তারা অনেক ছোট ঠেকে আমাদের চোখে। কারণ শেষ কথা হল এই যে জেগেই থাকি আর ঘুমিয়েই থাকি, একমাত্র আমাদের যুক্তির প্রমাণ ব্যতীত অন্য কিছুরই দ্বারা আমরা যেন কখনো নিশ্চিত না হই। এবং লক্ষ্য করতে হবে, আমি বলছি 'আমাদের যুক্তির প্রমাণ'—আমাদের কল্পনা বা ইন্দ্রিয়গুলির কথা বলছি না। ঠিক যেমন সূর্যকে যদিও আমরা অতি পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই, তাই বলে যে যে-আকারে তাকে দেখছি, সেইটেই তার যথার্থ আকার, এমন বিচার করা আমাদের চলে না। অথবা, চাইলে কল্পনায় যদিও আমরা স্পষ্টই দেখতে পারি কোনো ছাগলের শরীরে সিংহের মাথা বসানো রয়েছে, তবু তার থেকে এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত হবে না যে পৃথিবীতে এমন বিকটাকার জীবের অস্তিত্ব আছে। কারণ যুক্তি আমাদের এ-কথা বলে না যে যেটা আমরা দেখছি বা এইভাবে কল্পনা করছি সেটা সত্য—কিন্তু যুক্তি যা বলবেই, তা হচ্ছে আমাদের সকল ধ্যান-ধারণার পক্ষে সত্যের কিছু ভিত্তি থাকা দরকার[১২]। নতুবা যে-ঈশ্বর পূর্ণতা ও সত্য স্বয়ং, আমাদের ভিতরে সেই সকল ধ্যানধারণা তিনি কিছুতেই ঢোকাতে পারতেন না। এবং যেহেতু আমাদের যুক্তিশক্তি জাগরণের সময় যতটা সন্দেহাতীত ও সমগ্র রূপে থাকে, নিদ্রার সময় ততটা কখনো থাকে না— অবশ্য মানছি, মাঝে-মাঝে আমাদের কল্পনাও হতে পারে সমানই জীবন্ত ও সুস্পষ্ট, কি তার চেয়ে আরো বেশি—যুক্তি তাই এটাও বলে যে যদিও আমরা সকলে সম্পূর্ণ নই বলেই আমাদের চিন্তাগুলিও প্রত্যেকটি সত্য নিশ্চয় নয়, তবু যে-সত্য আছে তাদের মধ্যে, তার সাক্ষাৎ মিলতে পারে অব্যর্থভাবে একমাত্র সেই চিন্তাগুলিতে যেগুলি আমাদের মনে আসে স্বপ্নের সময় নয়, জাগরণের সময়ই।

পাদ-টীকা

[১] "রীতি বিষয়ক আলোচনা"-র এই চতুর্থ খণ্ডে দেকার্ত যা সংক্ষেপে বলছেন, তা-ই আরো বিস্তৃত-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর "আধিবিদ্যক ধ্যান ও চিন্তা" রচনায়। হল্যান্ড-বাসের প্রথম নয় মাস (১৬২৮-এর অক্টোবর হতে ১৬২৯-এর জুলাই পর্যন্ত) ধরে এই শেষোক্ত রচনাটি তিনি লেখেন লাতিনে, যদিও তা প্রকাশিত হয় বর্তমান গ্রন্থের চার বছর বাদে, অর্থাৎ ১৬৪১ সালে।

[২] 'আধিবিদ্যক' বলতে দেকার্ত বোঝাতে চাইছেন তা-ই যা ইন্দ্রিয়গোচর জ্ঞান নয়, যার ধারণা সম্ভব একমাত্র বুদ্ধিরই মাধ্যমে। অন্যত্র তিন রকমের ধারণার কথা তিনি বলেছেন : এক হল যা সোজাসুজি ইন্দ্রিয়-গোচর, যেমন শরীর ও মনের মিলন সম্বন্ধে ধারণা; দুই হল বুদ্ধি ও কল্পনার যুগপৎ মাধ্যমে যা আয়ত্ত করা যায়, যেমন গণিত বা রাশি বা গতি ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা; এবং তিন হল যা একমাত্র বুদ্ধিই পারে ধরতে, যেমন আত্মা সম্পর্কিত ধারণা। দেকার্তের মতে এই তৃতীয়টিই হল আধিবিদ্যক চিন্তার ক্ষেত্র।

[৩] অর্থাৎ মধ্যযুগের দার্শনিক চিন্তাধারা।

[৪] 'জিনিস' কথাটা দেকার্ত খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করছেন। তা কোথাও বোঝাচ্ছে কোনো বস্তু যার দেহ আছে, কোথাও বা তা বোঝাতে চাইছে কোনো গুণ, বা কোনো ধর্ম, বা কোনো ধারণা, ইত্যাদি।

[৫] অর্থাৎ, জ্যামিতিক বিস্তারের বিষয়।

[৬] শব্দান্তরে, দেকার্ত কোনো শূন্যস্থানের অস্তিত্ব মানছেন না।

[৭] 'অনন্ত' কথাটাকে কেবল ঈশ্বরের বেলাতেই দেকার্ত ব্যবহার করতে চান।

[৮] আসলে জড় যে বিভাজ্য অন্তহীনভাবে, সেটা দেকার্ত ইচ্ছা করেই সোজাসুজি বলতে চান না এখানে।

[৯] এখানেও কিছুক্ষণ আগের মতো সেই মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের চিন্তাধারারই উল্লেখ।

[১০] অর্থাৎ, ঈশ্বর ও আত্মা সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে।

[১১] অর্থাৎ, ব্যবহারিক জীবনে তাদের উপযোগিতার জন্যই। এখানে দেকার্ত ব্যবহারিক ও তত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য টানছেন। বাহ্যিক বস্তুর বিপুলতার মধ্যে আমাদের বাস করতেই হয়, তাদের অস্তিত্ব না মেনে উপায় নেই। দেকার্ত অন্যত্র বলেছেন, সেই অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ কোনো কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষই তুলবে না এবং যে-কারণে সেই অস্তিত্বের কোনো প্রমাণেরও দরকার পড়ে না। শুধু, নিছক কোনো

তত্ত্বীয় অনুসন্ধানের খাতিরেই আমরা হয়তো ভান করতে পারি যে যেহেতু ঐ বাহ্যিক বস্তুগুলির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি, তাই সে-অস্তিত্ব অলীকমাত্র। এই সন্দেহের অন্তত একটা যুক্তি রয়েছে : স্বপ্নে আমরা যে-সব জিনিস দেখি, সেগুলিকে জাগরণেও দেখতে পাই—অতএব স্বপ্নের সময় যে-ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের চোখে ধুলো দেয়, তারা যে আমাদের জাগ্রত অবস্থাতেও একইভাবে ঠকাচ্ছে না, সে-প্রমাণ কোথায় ?

[১২] অতএব যা নিছক ইন্দ্রিয়গোচর, তারও একটা ভিত্তি থাকে সত্যের। কারণ তার মাধ্যমে জানা যায় কোন্ বাহ্যিক বস্তুটি আমাদের কাজে লাগে এবং অন্য কোন্‌টি আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু ইন্দ্রিয় আমাদের ঠকায় তখনই যখন তাকে আমরা কাজে লাগাতে চাই কোনো বস্তুর প্রকৃতি জানার জন্য। দেকার্ত বলছেন, সে-কাজের জন্য (অর্থাৎ কোনো জিনিসের প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য) ইন্দ্রিয় তৈরী হয়নি।

শব্দপঞ্জী

এই খণ্ডে ব্যবহৃত কিছু বাংলা শব্দের বর্ণানুক্রমিক সূচী তলায় দেওয়া হল—সঙ্গে সমার্থক ফরাসী ও ইংরেজী শব্দ, আগে ফরাসী পরে ইংরেজী। সর্বত্র যে-অর্থ দেওয়া হয়েছে, তা মূল গ্রন্থ অনুযায়ী।

অধিবিদ্যা, métaphysique, metaphysics
আধিবিদ্যক, métaphysique, metaphysical
ইন্দ্রিয়গুলি, sens, senses
ইন্দ্রিয়গোচর, sensible, sensible
জড়, matière, matter
জ্যামিতিক বিস্তার, étendue géométrique, geometrical expanse
জ্যামিতিজ্ঞ, géomètre, geometrician
তত্ত্ব, principe, principle
তত্ত্বীয়, théorique, theoretical
দেশাচার, moeurs, morals
দেহ, corps, body
দৈহিক, corporel, corporeal
ধারণা, idée, idea
নিয়ম, règle, rule
পদার্থ, substance, substance
পূর্ণ, parfait, perfect
পূর্ণতা, perfection, perfection
প্রতিজ্ঞা, proposition, proposition
প্রমাণ, démonstration, proof
বুদ্ধি, entendement, understanding
বুদ্ধিময় প্রকৃতি, nature intelligente, intelligent nature
ব্যবহারিক, pratique, practical
যুক্তি, raison, reason
যুক্তিশক্তি, raisonnement, reasoning
শূন্য, néant, nothingness
শূন্যস্থান, vide, void
সত্তা, être, being
সন্দেহবাদী, sceptique, sceptic
সম্পূর্ণ, parfait, perfect
সম্পূর্ণতা, perfection, perfection
সার, essence, essence
স্থান, espace, space

মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য [ক্রমশ]

ঘুঙুর ঘুঙুর

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

প্রাণকেষ্ট জানে এই ফুলফুল জুতোর ছাপটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার ডানদিকের ঘরের নীলপর্দার কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। এটা বড় দিদিমণির বাবরিচুল গানের মাষ্টারের চটি। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। মাষ্টারবাবু জুতোয় কাদা মাখিয়ে ছাপ দিয়ে গ্যাছে। লাও, শালার ডবল খাটনী। মাষ্টারবাবুর একজোড়া চটির একপাটি খোলার সময় কেন যে উল্টে যায় কে জানে, প্রায়ই দ্যাখে প্রাণকেষ্ট, পাপোষের কাছে একপাটি চটি চিৎ, অপরটা উপুড়। পর্দার ফাঁক দিয়ে হারমনিয়ামের সাথে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পিরীতের গানের কলি ভেসে আসে। একবার হয়েছিল কি, 'মাইরী কাউকে বলবি না বল'—প্রাণকেষ্ট বলেছিল পাশের বাড়ির চাকর হরিহরকে—মাইরী, একটা ঐ পিরীতের গান গাইতে লেগেছে, তারপর হুট্ করে করছে কি দিদিমণির গালের দুপাসে হাতদুটি লাইগে মাষ্টার বলে কিনা, সখি ভালবাসা কারে কয়......।

একটা ভিরমিমারা গন্ধ আসছে বটে। গন্ধটা এখন কোত্থেকে আসছে প্রাণকেষ্ট জানে। কোনার ঘরের নীলপর্দার ফাঁক থেকে। ঐ ঘরে ছোট্‌দিদিমণি থাকেন। সাজ হচ্ছে এখন। সোনো পাউডার ঘসছিল অঙ্গে।

প্রাণকেষ্ট চক্‌চকে সিঁড়ির উপর থেকে সমস্ত কাদার চিহ্ন মুছে ফেলেছে নতুন কাদার চিহ্ন লাগবে বলে।

এমন সময় ঘুঙুরের ঝম্‌ঝম্। কি পাজী হয়েছে আকাশটা, ভাল্লাগেনা, কি পাজী হয়েছে গাড়ীটা, খালি খালি খারাপ হবে, ধুৎ ভাল্লাগেনা, কি রকম বিষ্টিরে বাবা ভাল্লাগেনা বলতে বলতে জলি, মানে ছোট দিদিমণি বারান্দায় ঘুরে ঘুরে মাথা ঝাঁকায়। পায়ের ঘুঙুর বাজে। পায়ের পাতায় মেঝেতে ফুলের নকসাগুলোকে যেন লণ্ডভণ্ড করে দেবে এমনভাবে হাঁটে। তারপর জলি তার মায়ের ঘরে চলে যায়। হেদোর সাদা পুল থেকে জলে ঝাঁপ দেবার মত স্পঞ্জের তোষকে হুড়ুম করে ঝাঁপ দেয়, এক আনা দামের বেলুনবাঁশির মত বলে—উ—উ—উ—কি করব আমি মা ম্ম নি ই ই। আহা, কচি খুকি, প্রাণকেষ্ট ভাবে,—যেন কিচ্ছু জানে না।

একটা হাঁক এলো—প্রাণকেষ্ট। কুকুরের লোমে মায়ের হাতের চেটো ডুবে ছিল। মা প্রাণকেষ্টকে ডেকেছিলেন।

ওয়াটারপ্রুফ পরে যেতে ভূতের মতো লাগে। জলি তাই ওটা পরবে না। তাই ছাতা করে ছোট দিদিমণিকে নাচের ইস্কুলে পেঁাছে দেবার ভার পড়ল প্রাণকেষ্টর উপর।

পাশের মিষ্টির দোকানের ব্রজদা প্রাণকেষ্টকে চোখ মারল। ভাগ্যিস দিদিমণি দেখে ফ্যালেনি, প্রাণকেষ্টর হাতে ছাতার ভার। ঝমঝম বৃষ্টি। প্রাণকেষ্টর কাঁধে ঝুলছে ছোট দিদি-মণির ফুলতোলা ব্যাগ, তাতে নাচের পোষাক, ঘুঙুর। ব্যাগের মধ্যে থেকে ঘুঙুরের শব্দ। ঘুঙুর বাজছে ঝুম্‌ঝুম্‌ঝুম্ চলার তালে, মঙ্গলার গলাতেও ঘুঙুর ছিল,—ময়নামতীর মেলা থেকে কিনে আনা জোড়া পেয়ারার মত একজোড়া ঘুঙুর, হাঁটার সময় ঘুঙুর বাজতো, মঙ্গলা পদ্মবিলে ঘাস খেয়ে ঘুঙুর বাজাতে বাজাতে প্রাণকেষ্টর কাছে এসে হাম্বা করে সোহাগ চাইত। প্রাণকেষ্টর প্রাণের গাই মঙ্গলা। প্রাণকেষ্টর বুকের মধ্যে ঘুঙুর বাজে ঝুম্‌ঝুম্...

পাড়াগাঁয়ের দিনগুলি বেজে ওঠে ঝুম্‌ঝুম্‌...। বৃষ্টি হলে কামিনী ফুলে সুবাস হয়...বৃষ্টি হলে সোঁদা গন্ধ মাটির গন্ধ, বাবলা গাছের পাতা বেয়ে, জল পড়ে গো, কচুপাতায় মুক্তোর মতো জল জমে গো...বৃষ্টি হলে পদ্মবিল ভরে যায়, মঙ্গলা তখন চরতে মাঠে যেতে চায় না, গোয়ালে থাকে। বৃষ্টি হলে মা চাল ভাজে, ব্যাং ডাকে, কৈ মাছ কানে হেঁটে উঠোনে লুটোপুটি খায়, প্রাণকেষ্টর বুকের মধ্যে ফেলে আসা পাড়াগাঁয়ের বৃষ্টি ঘুঙুর বাজায় ঝুম্‌ঝুম্‌। মঙ্গলার ঘুঙুর বাজে। বুকের মধ্যে।

দিদিমণির গায়ে সেই গন্ধ। সুরুৎ করে কতগুলো ইঁদুর যেন চালের বস্তায় ঢোকে। ছাঁট বাচাতে দিদিমণি প্রাণকেষ্টর গা ঘেঁসে আসে। একটা সাদা ধবধবে হাত প্রাণকেষ্টর চোখের নিচে নড়ে, খেলা করে। ফট্‌ করে বুকের দিকে তাকিয়ে ফ্যালে প্রাণকেষ্ট। লুকোন বইয়ের পাঁচ নম্বর ছবিটার কথা মনে পড়ে যায়। দিদিমণির গায়ে গা লাগে, অমনি মেঘ ডাকে আর সঙ্গে সঙ্গে বান এসে যায়, আর অমনি তিন প্রহরের শেয়ালেরা ডেকে ওঠে। তখন মঙ্গলার চোখ মনে আসে না, মায়ের মুখ মনে আসে না, ব্যাগের মধ্যে নাচের ঘুঙুরের ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ শোনে, শরীর পেঁচিয়ে ওঠে—তখন লুকোন বইয়ের পাঁচনম্বর ছবির মত ভাবে দিদিমণিকে, ছাতার ভার বেড়ে যায়, তখন রেলগাড়ী ধোঁয়া ছাড়ে। ব্রজদার সঙ্গে দ্যাখা সিনেমার রঙীন দৃশ্যের মধ্যে চলে যায় প্রাণকেষ্ট।...ছোট দিদিমণি যেন লাল ওড়না উড়িয়ে বৃষ্টির মধ্যে ফুলের বাগানে, পাৎলুন আর রঙীন কুর্তা পড়া প্রাণকৃষ্ণের সাথে ফুলফুল খেলছে, কখনো পাশাপাশি, কখনো সামনাসামনি। সেইসময় ফুলের বাগানে ফুলপ্যান্ট পরা প্রাণকৃষ্ণকে দেখে দেখে দত্ত বাড়ীর চাকর প্রাণকেষ্ট ক্রমশঃ হাল্কা হয়ে হয়ে, মাছির মত হয়ে যায়, এবং মাছির মতো উড়তে থাকে একটা বিরাট পর্দার কাছে, যেখানে ফুলপ্যান্ট পরা প্রাণকৃষ্ণ, রঙীন দিদিমণির সাথে, রঙীন ফুলের বাগানে রঙীন গান গাইছে। ইতিমধ্যে দিদিমণির নাচের ইস্কুল এসে গ্যাছে। অনেক শব্দের মধ্যে দিদিমণি ঢুকে যায়। প্রাণকেষ্ট এবার ফিরছে।

প্রাণকেষ্টর দিদির বিয়ের সম্বন্ধটা রাখাল খাটাউ এনেছিল। ছেলে লেদের মিস্ত্রী, মাস ফুরোলে আড়াইশো টাকা কাঁচা হাতে আসে, তার উপর পৌনে দুবিঘে নিজের ভাল জমি। এমন পাত্তর হাতছাড়া করলে চলবেনি। মা বলেছিল। একটা সাইকেল চেয়েছিল জামাইবাবু। ভরি পাঁচেক গয়নাও চেয়েছিল। মায়ের গলার সরু হারটা চলে যেতেই কণ্ঠার হাড়টা আরও ড়ুক্‌রে উঠেছিল। সরু চুড়ি দু'গাছা চলে যেতেই মায়ের কব্জির হাড় আরও ফুটে উঠল। মঙ্গলাকে বাঁধা দেয়া হল দেড়শো টাকায়—মজুমদারের কাছে। তারপর মঙ্গলা গোয়াল ফাঁকা করে গলার ঘুঙুরে একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি গানটা বাজাতে বাজাতে বকুলতলার পথ দিয়ে চলে গেল। বাবার হাতে দড়ি ছিল, প্রাণকেষ্ট মঙ্গলার কালো শরীরে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ভালবাসা লেপে দিচ্ছিল। মাটির রাস্তায় মঙ্গলার সারিবদ্ধ পায়ের ছাপের দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রাণকেষ্ট ভেবেছিল—ভাঁটার টানে এখন চল্‌লিরে মঙ্গলা গাই, এই পায়ের ছোপ আবার উল্টে দেবোই আমি জোয়ারের টানে, মঙ্গলা তুই মাটির রাস্তায় ছাপ দিয়ে ছাপ দিয়ে ইদিকপানেই আসবি, হ্যাঁ, আসতে হবে। প্রাণকেষ্ট মঙ্গলার শরীরে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করেছিল ফিরিয়ে আনবেই—তখন নখের দাগ বসে গিয়েছিল মঙ্গলার শরীরে।

ব্রজদুলাল ঘোষ, দেশে প্রাণকেষ্টর পাশের বাড়িতে থাকে।—ব্রজদা গো, একটা কাজটাজ দাও না গো। অনেকবার বলেছে প্রাণকেষ্ট। ব্রজদা কলকাতার একটা মিষ্টির দোকানের কারিগর। ব্রজদা তারপর একদিন জুটিয়ে দিল কাজটা।—ভারী বড়লোকের বাড়ি রে কেষ্ট, মেজেতে পা দিলে পেছ্‌লে পড়বি, দুটো খুকী আছে, আর কত্তা-গিন্নী। আমাদের মেঠাই-

দোকানের পাশেই মস্তো কোঠা দালান।

মা বলেছিল,—কেষ্ট কি পারবে একা একা থাক্‌তে? কাজ লেইকো কলকাতা গিয়ে।

—দেখে নিও মা, খুব পারবো। প্রাণকেষ্ট বলেছিল। ব্রজদার হাত ধরে আসার সময় পিছন ফিরে মায়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হয়েছিল চোখের মধ্যে আষাঢ়ে মেঘের মত দুঃখ জমে রয়েছে।

—ছুঁড়িটাকে পোঁছে দিয়ে এলি বুঝি! বারেব্বা, চালাও হাওড়া-আমতা এক্সপ্রেস্। ব্রজদা খয়েরী লুঙ্গী আর হাতকাটা গেঞ্জি পরে উরু চুলকোচ্ছিল, গেঞ্জিটা গুটিয়ে ভুঁড়ির উপর তোলা, প্রাণকেষ্টকে দেখে দুই ঠোঁট জোড়া করে একটা আওয়াজ করে বললে কথাগুলো।

প্রাণকেষ্ট কিছু বলার আগেই ব্রজদা প্রাণকেষ্টর গাল টিপে বলল,—কিরা্যা, এ্যাঁ—মুখে ব্রনো উঠ্‌চে যে বড়? বুইচি। চ,—এখন ভেত্‌রে চ। এখন বিকেল, কাজ কি?

ব্রজদা ছানার বিরাট একটা দলা দু-হাতে মাখতে মাখতে বললে,—মাইনে কবে হবে রে? এক মাস তো কাবার।

—মা আজ দেবেন বলেছেন।

—মাইনে পেলে ওখানে যাবি তো? ব্রজদা চোখ টেপে।

প্রাণকেষ্ট উনুনের দিকে চোখ রাখে। গনগনে আঁচ হাম্‌হাম্ করে জ্বলছে।

—যাবো। কিন্তু...কাউকে বলবে না তো?

—পাগোল। পাঁচটাকা কিন্তু। খাসা জিনিস।

একটা ছোট্ট ছানার দলা প্রাণকেষ্টর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে,—ছ্যানাটা খেয়ে ফ্যালরে কেষ্ট। তাগদ হবে গায়।

ব্রজদা লোমশ হাত দুটো দিয়ে ছানার দলাটা রগড়াতে রগড়াতে বললে,—মানব জনম বহু কষ্টের ফলরে কেষ্ট, বলি রগড় করে নে, মৌজ করে নে। বসন্ত চলিয়া গেলে আসিবে আবার, যৌবন চলিয়া গেলে ফিরিবে না আর, পড়েচিস্ না বইতে?

এই হচ্ছে ব্রজদা। এই ব্রজদার হাত ধরে কলকাতা এসেছিল প্রাণকেষ্ট। ভীড় ট্রাম বাস পুলিশ বোমা আর মেয়েমানুষের শহর কলকাতায়। ব্রজদা বলেছিল,—আমার পাল্লায় যখন এলিরে কেষ্ট, তোকে মানুষ করে ছাড়বো।

ব্রজদা ওকে হিন্দী সিনেমা দ্যাখাতে নিয়ে গ্যাছে, ব্রজদার বিছানার ভেতর থেকে একটা বই বার করে দেখিয়ে প্রাণকেষ্টর রক্ত গরম করে দিয়েছে। ব্রজদা প্রাণকেষ্টর হাতে বইটা দিয়ে সিঙ্গাড়ায় আলুর পুর ঢোকাতে ঢোকাতে বলেছে,—তুই পড়ে যা......

কাগজের মত পাতলা পাতলা এক একটা বেলা ময়দা গরম ঘি-এর মধ্যে ছেড়ে দিতে দিতে ব্রজদা এমন এক জায়গার নাম বলেছে, যেখানে ব্রজদা প্রতি রবিবার যায়—সেখানকার গল্প শুনিয়েছে। পাতলা কাগজের মত ময়দার জিনিসটা গরম ঘি-এর মধ্যে ফুলে ফুলে ভাসতে থাকে, ছুটোছুটি করতে থাকে, ব্রজদার কথাগুলো ফুলন্ত লুচি হয়ে যায় প্রাণকেষ্টর বুকের ভেতর, হুটোপুটি করতে থাকে। ব্রজদা এক একটা কথা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে থাকে প্রাণকেষ্টর বুকের মধ্যে। আর ইচ্ছেগুলো বেতাল ছুটে বেড়ায়। তারপর প্রাণকেষ্ট রান্নাঘরের উত্তাপ বুকে নিয়ে বাড়ি ফেরে।

বাড়ী ফিরে প্রাণকেষ্ট সন্ধ্যের চা করার সময় ইচ্ছেগুলোকে চাম্‌চে দিয়ে টুংটাং চায়ের কাপে নাড়ায়। প্রাণকেষ্ট যখন চায়ের ট্রে বাড়ির বারান্দায় লালপাতাওয়ালা গাছটার সামনে রাখে, তখনই দিদিমণিদের হাসিতে লাল পাতাগুলো দুলে উঠেছে। বড় দিদিমণি আর তার

পাখীর মত বান্ধবী গল্প করছেন। বড়দিদিমণির হাসিতে পায়রা ওড়ে। বড়দিদিমণি চুলে কিরিম মাখছেন।—চা এনেছিস্, গুড্বয়, বড়দিদিমণির সবসময় আদুরে আদুরে কথা, সর্বদা 'ওলো সখী' ভাব। সামনে একটা বাক্সের মতো যন্তর। বড়দিদিমণি তেনার বান্ধবীকে বললেন, —একটা মজা দেখবি? তারপর প্রাণকেষ্টকে বললে,—ওই যে আলমারীর মতোন, জল রাখলে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, ওটার নামটা কি বলতো? প্রাণকেষ্ট বলে রেফিজারেকার। তারপর দুজনার হাসি। প্রাণকেষ্টর মনে হোল ভুল বলেছে, তাই এত হাসি, দিদিমণি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ মাংস রান্না করার পাত্রটা? প্রাণকেষ্ট বলতে চায়নি। দিদিমণি ধমকের সুরে বললেন, বলতে বলছি বল। প্রাণকেষ্ট বললে,—পেস্কিকুজ? তারপর আবার হাসি, সে কি হাসি, তারপর নখ চক্চক্ আঙুল দিয়ে যন্তরটার একটা বোতাম টিপতেই—অবিকল নিজের গলা শোনে প্রাণকেষ্ট। যন্তরটা অবিকল বলে গেল...। প্রাণকেষ্ট অবাক হয়ে গেল, দিদিমণি একটা গান গাইল, যন্তরটা একটু পরে সেই গানটাও গেয়ে দিল। দিদিমণি প্রাণকেষ্টকে একটা কবিতা বলতে বলল। প্রাণকেষ্ট তারকনাথের মাহাত্ম্য বলেছিল...জয়বাবা তারকনাথ, লইলাম শরণ,... তোমাবিনা কেবা করে লজ্জা নিবারণ...। বোতামটা টিপতেই প্রাণকেষ্ট আবার অবিকল নিজের গলা শুনেছিল। এ এক আজব যন্তর, কথা বললে কথা গেঁথে থাকে, গান আটকে যায়... তাজ্জব...। তারপর প্রাণকেষ্টর মনে হয়েছিল ওর বুকের মধ্যেও এরকম একটা যন্তর আছে, যার মধ্যে ইচ্ছেগুলো আটকে থাকে, বোতাম টিপলেই বেরিয়ে আসে...মঙ্গলাকে চাই, চালায় খড় চাই, মায়ের ওষুধ চাই, চাই, চাই। মঙ্গলাকে চাই চাই, তখন কাশবনের সাদা ঢেউ প্রাণকেষ্টর চেতনায় তরঙ্গ ছড়ায়।

রাত্তির বেলা অন্যদিনের মত বাবুর জুতোটা পালিশ করে রাখছিল প্রাণকেষ্ট। ভোরবেলা বাবু বেরিয়ে যান। এই জোড়াটা নতুন। আগেরটার কিস্সু হয়নি, তবু বাবু ফেলে দিল। প্রাণকেষ্টর পায়ে বড় হয়। প্রাণকেষ্টর বাবার পায়ে ঠিক হতে পারে। জুতোজোড়াটা রেখে দিয়েছে সে, দেশে ফেরার সময় নিয়ে যাবে। আহা রে, এরা না ছিঁড়লেও ফেলে দেয়, সন্দেশ-রসগোল্লা বাসী হলেই ঝিকে দিয়ে দেয়, গানের মাষ্টার, পড়ার মাষ্টার, নাচের মাষ্টারকে এরা গোছা গোছা টাকা দিয়ে দেয়, কুকুরের জন্য ত্রিশ টাকার জামা...এরা সবাই দুহাতে লাল নীল সবুজ হলদে বেলুন আকাশে ওড়াচ্ছে ...টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করলে বেলুন ওড়ে, আলো জ্বালালে বেলুন ওড়ে, রেডিও চালালে বেলুন ওড়ে, গান গাইলে বেলুন ওড়ে। আমার মায়ের ছেঁড়া কাপড়ে গিঁট...আমার মায়ের জন্য রক্তের টনিক কেনা হয়নি—আমার মায়ের রং শাদা হয়ে যাচ্ছে, বিশ্বাস বাবুর কাছে আমাদের পেতলের হাঁড়ি, মজুমদারের কাছে আমার মঙ্গলা —বাবার টায়ারের চটিটা এতদিনে ছিঁড়ে গ্যাছে বোধ হয়। বাবুর চক্চকে জুতোয় নিজের মুখ দেখতে পায় প্রাণকেষ্ট।

রাত্তিরে মা এসে মাইনের টাকাগুলো দিয়ে গেল। কালিদাসের গল্পে ক্লাস থ্রির বইতে ছবি দেখেছে প্রাণকেষ্ট। মা সরস্বতী কালিদাসকে বর দিচ্ছেন, কালিদাস হাঁটুগেড়ে বসে আছে, সরস্বতী দাঁড়িয়ে এক হাত বাড়িয়েছেন কালিদাসের দিকে। মা যেন সাক্ষাৎ দেবী।

—একটা বাটি আর তিনটে প্লেট ভেঙেছিস্ তুই, অন্য কেউ হোলে মাইনে থেকে কেটে রাখতো, আমি কিছুই কাটিনি।

কড়কড়ে পঁচিশটা টাকা পকেটে পুরল প্রাণকেষ্ট, পুরতেই রেলগাড়ীর মত আনন্দ তীক্ষ্ম শীষ মারতে মারতে বুক ভেদ করে ভিতরকার ইষ্টিশনে গিয়ে থামে। প্রাণকেষ্টর ইচ্ছে হোল এই মুহূর্তে শাঁখ বাজান হোক। প্রাণকেষ্টর ইচ্ছে হোল মা মাসীমারা সমবেত

হয়ে উলু দিক্ দিদির বিয়েতে বর উঠোনে এলে যেমন সবাই দিয়েছিল। চোত্ মাসের সংক্রান্তি মেলার নাগরদোলার ঘোড়া, যাদুকরের ডুগডুগি, বাচ্চা ছেলের হাতফস্কা রঙীন বেলুনের গোছা মনে পড়ে যায়। "রাজদ্রোহী" পালার দু হাত উপরে তোলা রাজার মত প্রাণকেষ্টর বলতে ইচ্ছে হয়, চমৎকার! চমৎকার! রাজকোষ শূন্য করি সব উপহার সকলই আমার!

প্রাণকেষ্টর খুব মজা। হুঁ হুঁ বাবা, রোজগার করেছি। নিজের রোজগার। আমি তোমার রোজগেরে ছেলে মাগো, মা বলেছিল, ওকে নিও না ব্রজো, একরত্তি কাঁচ, ও আবার রোজগার করবে, কাজ নেই কো কলকাতা গিয়ে, ভাইবোন ছাড়া মোটে তিষ্টোবে না। এবার?

প্রাণকেষ্টর বুকের মধ্যে ঘুঙুর বাজে। আনন্দের ঘুঙুর। মাগো, আমি তোমার রোজগেরে ছেলে। প্রাণকেষ্টর বুকের মধ্যে ঝুম্‌ঝুম্ ঘুঙুর বাজে। মঙ্গলার ঘুঙুর। আর চিন্তা কিরে মঙ্গলা, তুই কি এখন আমার জন্য তাকিয়ে আছিস্! তুই কি মজুমদারের হাতের খড় খাচ্ছিস না বুঝিরে, এইতো, একমাসতো হয়েই গেল, আর পাঁচমাস সবুজ কর, ছয় পচিশং কত,—দেড়শো তো, তোকে ঠিক ছাড়িয়ে আনবো, তিন সত্যি। তখন কাশবনের সাদা ঢেউ প্রাণকেষ্টর চেতনায় তরঙ্গিত হয়। প্রাণকেষ্ট তার চিলেকোঠার ঘরে শুতে যায়। বাইরের রাস্তায় একটা লাল আলোর ছবি একবার জ্বলে, একবার নেভে।

প্রাণকেষ্টর ঘরে কড়িকাঠের খোপে দুটো লুকোন জিনিস পাশাপাশি। একটা মাটির ঘট্—যেখানে—মিষ্টির দোকানের কমিশনের পয়সা, বাবুর দেয়া বক্‌সিসের খুচরো পয়সা ঢোকানো, যেটা নাড়ালে পরে বাজে, আর তার পাশে ব্রজদার দেয়া একটা লুকোন বই। প্রাণকেষ্ট লুকোন ঘটটা নামিয়ে নেয়, আদর করে হাত বুলোয়, মঙ্গলার গায়ে যেমন করে হাত বুলোত প্রাণ। ঘটটা নাড়ায়। কিছু খুচরা পয়সা নাড়ালে পরে বাজে, কিছু স্বপ্ন নাড়ালে পরে বাজে, কিছু প্রত্যাশা নাড়ালে বাজে, কিছু ভবিষ্যত নাড়ালে বাজে। পকেট থেকে ভবিষ্যতের আশা মুঠো করে বের করে। একটা টাকা ফুটোর মধ্যে গলিয়ে দেয়—বিশ্বাসদের কাছ থেকে পেতলের হাঁড়িটা ছাড়িয়ে আনবোই...একটা টাকা ফেলে দেয়...মজুমদারের কাছে মঙ্গলা গাই...একটা টাকা ঢুকিয়ে দেয়...সোঁদাগন্ধ পুকুর পাড়ে বটগাছের নিচে এক চায়ের দোকান, গুলতানি বুড়োদের ভীড়, ভাঙ্গা টুলের পেরেকে জগাই নস্করের ধুতি ছিঁড়ে গেছল, গেলাসে বাবা চামচ নাড়াচ্ছে চায়ে...চামচে দিয়ে ভবিষ্যত নাড়াচ্ছে; ধোঁয়া! বাবার মুখে ঘামের ফোঁটা...একটা একটা করে টাকা মাটির ঘটে ঢোকায়...আর পাঁচ টাকা থাকে।

অমনি ঘুঙুর বেজে ওঠে। ব্রজদার সাথে সিনেমায় দেখা—সুন্দর মেয়েটার নগ্ন পায়ের দামাল ঘুঙুর। ব্রজদা বলেছিল পাঁচ টাকা দিলে একটা সুখের ঘরে নিয়ে যাবে। ব্রজদার ছুঁড়ে-ফেলা ইচ্ছেগুলো ফুলকো লুচির মত দাপাদাপি করে প্রাণকেষ্টর বুকে, আরশোলাগুলো মাতাল ডানা ঝাপটিয়ে প্রাণকেষ্টর রক্তের গভীরে ঢুকে যায়। রাস্তায় লাগানো সিনেমার বিরাট পোষ্টারের দু-পা ফাঁক করে দাঁড়ানো মেয়েটা হাতছানি দিয়ে ডাকে, ব্রজদা ডাকে, প্রাণকেষ্ট লুকোন বইটা টেনে নেয়।...একনম্বর দুনম্বর ছবির সমস্ত ছবিরা জ্যান্ত হয়ে বইয়ের থেকে বেরিয়ে আসে...পাঁচ টাকা দিলে ব্রজদা সুখের ঘরে নিয়ে যাবে...ছবিগুলো জীবন্ত হয়ে প্রাণকেষ্টর হাত ধরে টানে, ওদের উরুর সোনালী রোমের পাশে ঘামের বিন্দু দেখতে পায় প্রাণকেষ্ট...প্রাণকেষ্ট একটা পিংপং বল হয়ে যায়। দু-পাশের দুজন ক্রমাগত বলটাকে এধার-ওধার নাচায় কিন্তু প্রাণকেষ্ট অদৃশ্য খেলোয়াড়দের দেখতে পায় না। লুকোন বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে আগুনের হল্কা ছুটে আসে...হঠাৎ বইয়ের পাতার খাঁজে ওর মায়ের লেখা একটা বাসী চিঠি দেখতে পায়, 'প্রাণকেষ্ট তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে বড় কষ্ট হইতেছে প্রাণ...মজুমদার

বলিয়াছে—টাকা দিতে যত দেরী হইবে সুদ তত বাড়িবে, মঙ্গলাকে ছাড়াইতে তত বেশী টাকা লাগিবে। এক বৎসর হইয়া গেলে মঙ্গলাকে আর দিবে না। ভাল থাকিও। তোমার বাবা বর্তমানে আমতা হাসপাতালে নিয়মিত'—ঠক্ ঠকাঠক্ কামারশালে হাতুড়ী পড়ে—প্রাণকেষ্ট তখন কচুরীপানা ভর্তি পুকুরের পাশে গোটা কয় অ্যালুমিনিয়ামের বাসনের সামনে উবু হয়ে বসে থাকা মায়ের ছাইমাখানো হাতের শিরার সঞ্চারণ দেখতে পায়...প্রাণকেষ্ট তখন শূন্য গোয়ালে ঘুঘুপাখির ডাক শোনে, প্রাণকেষ্ট তখন মায়ের চোখে জল দেখে, প্রাণকেষ্ট তখন ঘটটাকে নাড়ায়। ঘটটাকে নাড়ালে ঘুঙুরের মত বেজে ওঠে। স্বপ্ন বেজে ওঠে, রূপকথার গল্পের সোনার কৌটোর মত মনে হয় ঘটটাকে, যার মধ্যে একটা সোনার ভ্রমর আছে, তার মধ্যে রাজ-কুমারীর প্রাণ।

প্রাণকেষ্ট একটা একটা করে তার বাকি পাঁচ টাকাই ঘটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, তারপর ওটাকে নাড়িয়ে দিলে প্রতিশ্রুতি বেজে ওঠে—। তারপর একসময় নিজেকেও তার মধ্যে গলিয়ে দিয়ে আনন্দগুলোর মধ্যে লুটোপুটি খায়, স্বপ্নগুলোর মধ্যে লুটোপুটি খায়। আবীরের মত ভবিষ্যতকে মাখে সারা গায়ে।

তারপর সারারাত ঘুঙুরের মতো বেজে বেজে ভীষণ সুখের মধ্যে ভোর হয়ে গেলে প্রাণকেষ্ট হরিণঘাটার দুধ আনতে রাস্তায় নামে।

বিষ্ণু দে-র অন্বেষণ

'ঘর খুঁজে ফেরে সত্তা'

অশ্রুকুমার সিকদার

কবিজীবনের প্রথম স্তরে বিষ্ণু দে নিঃসম্পর্কিতের উদাসীন নির্লিপ্ততা নিয়ে ক্ষয়, নৈরাজ্য আর নিষ্ফলতার মানচিত্র এঁকেছেন। তাঁর যাত্রা শুরু বিশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষে, যখন ভেঙে পড়ছিল মধ্যবিত্তের সভ্যতা, সমাজপরিবেশের শূন্যগর্ভতা হয়ে যাচ্ছিল প্রকট। বুর্জোয়া বিকাশের অন্তিম পর্যায় কলোনিতে নিয়েছিল অসুস্থ চেহারা, তাছাড়া ইংরেজি শিক্ষা আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে দেশজ ঐতিহ্য থেকে। 'লোকশিল্প ও বাবুসমাজ' প্রবন্ধে সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে বিষ্ণু দে লিখেছেন—'বিদেশী শাসনশোষণের শাহিদ, বিদেশীর অস্বাভাবিক প্রভাবে তাঁদের [অর্থাৎ ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের] চৈতন্যে এসেছিল আত্ম-বিচ্ছেদ, নিজবাসভূমে পরবাস।' উনিশ শতকী ইঙ্গ-জাগরণের বিভ্রান্তির মর্মান্তিক দায়ের বোঝা বয়ে চলতে হচ্ছে তাদের—যযাতির জরার বোঝার মতো। 'কোনো বিচিত্রবীর্য কি/পূর্বজ কোনো দশরথ/রাজযক্ষ্মার ক্ষয়ভার, জায়ুজ ব্রণের ক্ষয়পথ/দায়ভাগে নির্লজ্জ কি/রেখে গেছে পিছে উপহার?' (অপস্মার "চোরাবালি")। ফলে যে ত্রিশঙ্কু অবস্থা, যে অনিকেত মানসিকতা তাই প্রকাশ পেয়েছে এই সময়ের কবিতায়। এক আত্মকেন্দ্রিক কবি—'এ বিশ্ব আমারই মূর্তি', —দীর্ঘ ছায়া আমার মনের'—চারিদিকে তাঁর বন্ধ্যা আর নিষ্ফলা ভূমি। সব কিছুই সেখানে বিবর্ণ, জরাগ্রস্ত, পাণ্ডুর বা মৃত। বাইরের নেতি অন্তরে নির্বেদ জাগায়, অন্তরের বিষাদ চরাচরে ছড়িয়ে পড়ে। নিজেকে মনে হয় আউটসাইডার—

> মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি বিদেশী পথিক,
> মুখোমুখি কথা বলি—চোখে লাগে অটল প্রাচীর।
> বিদেশী পথিক আমি এসেছি কি বিধাতার ভুলে
> পৃথিবীর সভাগৃহে, বুঝি নাকো ভাষা যে এদের।
> (সোঽবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতি/"উর্বশী ও আর্টেমিস")

সিমুমরুক্ষ এই ক্ষেত্রে জন্মায় ফণিমনসা, 'নীলোৎপল হয়েছে আজ কাঠগোলাপ'। অনুভূতি-প্রবণ মানুষের মনে জাগে বিবিক্তি আর নির্বেদ। ক্লান্ত হতাশ্বাস দিনগুলো 'হেমন্তের কুষ্ঠ-রোগে গতপত্র অরণ্যের মতো'। 'নিঃসঙ্গতা মুখোমুখি অপলক!/দুপাশে ঘনায় ক্লান্তির মেঘাবেশ'—এই রকম মানসিকতায় শহুরে প্রেমের মন-দেওয়া-নেওয়ায় 'বেজায় ক্লান্ত, শ্রান্ত লাগে!...ক্লান্ত লাগে।'

জাতীয় জীবনের বিকাশের সঙ্গে তাল না রেখে, অপ্রকৃতিস্থভাবে, কলোনির অর্থ-নৈতিক শোষণের প্রয়োজনে যে শহর গড়ে উঠেছিল গ্রাম-জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে, সেই শহরই—নির্মম পাথুরে প্রাণহীন—বিষ্ণু দে-র "উর্বশী ও আর্টেমিস" ও "চোরাবালি"র পট-ভূমি। প্রকৃতির সানন্দ ও জায়মান জীবনের সঙ্গে কোনো যোগ নেই বিচ্ছিন্ন মানুষের, 'প্রকৃতির দুয়োরারে এসে পড়ি বিদেশী বর্বর'। আর নাগরিক লোকজন, স্বেদাক্ত ভিড় সম্বন্ধে এক প্রগাঢ় জুগুপ্সা—'পৃথিবীর জনতার গ্লানি' অসহ্য লাগে। ঘৃণ্য মনে হয় কোলাহল-কুৎসিত নগরের ভিড়ে জনতার দুষ্টশ্বাস—'বড়বাজারের উপল উপকূলে/জনগণের প্রবলস্রোত/উগারিছে ফেনা'—বিড়ি সিগারেট, উনুনের মিলের ধোঁয়া, পানের পিক, দীর্ঘশ্বাসের জঘন্য

সংসর্গে ক্লেদাক্ত হয়ে প্রার্থনা করেন 'মৈনাক ডুবিয়ে দিক পৃথিবীর জনতাকে আজ।' সব মিলিয়ে পরিবেশকে মনে হয় নিতান্ত নারকীয়—'রন্ধ্রহীন আর্তনাদে এ আঁধার হেডিমের মতো/হৃদয় ধরেছে চেপে'। হাওড়ার ব্রিজে জনস্রোতের গড্ডলপ্রবাহ দেখে বিষ্ণু দে-ও এলিয়টের মতো দান্তের নরকবর্ণনার প্রতিধ্বনি করেন—'জানি নি আগে, ভাবি নি কখনো/এত লোক জীবনের বলি,/মানি নি আগে/জীবিকার পথে পথে এত লোক,/এত লোককে গোপনসঞ্চারী /জীবন যে পথে বসিয়েছে জানি নি মানি নি আগে...। (টপ্পাঠুংরি/"চোরাবালি")। এই নারকীয় পরিবেশে, "উর্বশী ও আর্টেমিস" আর "চোরাবালি" পড়লে দেখা যাবে, বারবার একাকিত্ব আর নিঃসঙ্গতার কথা এসেছে। কিন্তু এই নিঃসঙ্গতায় কোনো ব্যক্তিগত বিলাপের ভাবালুতা বা আত্মকরুণা নেই। প্রথম থেকেই বিষ্ণু দে প্রমাণ করলেন তিনি ক্ষমতাবান কবি, ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতাকে নৈর্ব্যক্তিক একাকিত্বে রূপান্তরিত করে। যে বুদ্ধিজীবীদের কথা তিনি পরে বলেছিলেন 'মার্কস ও বাংলাদেশে সাহিত্য' প্রবন্ধে 'তারা মধ্য আকাশের বাসিন্দা, মাতৃভূমি থেকে সম্পর্কচ্যুত এবং মৌলিকভাবে ইংরেজ শাসকশ্রেণী থেকেও বিচ্ছিন্ন'—সেই বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্নতা, সর্বসাধারণের সঙ্গে সংলগ্ন হওয়ার অনীহা, তাদের নির্বেদ ও নির্বেদের গ্লানি, সবই বিম্বিত হয়েছে ব্যক্তিগত একাকিত্বের আয়নায়।

এই নারকীয় জগতের নৈতিকে দেখার ভঙ্গিটাও নঙর্থক। বিশেষত "চোরাবালি"-তে ব্যবহার করেছেন কবি ব্যঙ্গপ্রখর নেতির ভাষা—সব নাগরিক চপলতার তীক্ষ্ণাগ্রে ক্ষতবিক্ষত হয় পুরোনো বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ। 'তোমার ও কটা চোখ—যদিচ বাঙালী,/বুধবার থেকে কেন মনে পড়ে খালি!/লোকে যাকে প্রেম বলে—সে কি তুমি মানো?' (গার্হস্থ্যাশ্রম) যৌবনের স্বাভাবিক আবেগে কদাচিৎ যদি আপ্লুত হন—

> তোমার কথার পাখা নিল প্রিয়া আমাকে আকাশে,
> নক্ষত্র-কম্পিত লোকে আনন্দের লঘিষ্ঠ হাওয়ায়।
> নিয়ে গেল আন্দোলিত রজনীগন্ধার শুভ্রবনে,
> অন্ধকারে চোখে চোখে নির্ভরের মাধুরী ঘনায়।
>
> (গার্হস্থ্যাশ্রম)

কিন্তু সে উন্মাদনা বেশিক্ষণের নয়। কারণ এখন যুবক প্রেমিক নয়, প্রেমতত্ত্বের ছাত্র; বিহঙ্গের মুক্ত হর্ষ তার জন্যে নয়, তার 'শুধু কুণ্ঠিত বিচার'। আর সেই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রমাণ হয়ে যায় প্রেম আসলে কন্‌ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্স—'অভ্যাস, শুধু অভ্যাস'; ভালোবাসা ব্যাপারটা আসলে প্রাকৃতিক। ভিড় পছন্দ নয়, আবার ভিড় এড়িয়ে নীড়বাঁধার ইচ্ছেও পরিহাসের সামগ্রী—'শহরের বুকে পাঁচতলায়/নেব সখী এক ছোট্ট ফ্ল্যাট/ট্রাম বাস ভিড় নিত্য যায়—/উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে দোঁহায়/ভিড়েতে থেকেও কী নিরালায়!' ভিতর ফাঁপা হয়েছে গেছে, দুঃখ আনন্দ প্রেম কোনো কিছুই গভীরভাবে বিচলিত করে না। তাই আবার দান্তের নরক স্মরণ করেন কবি—'ফ্রানচেসকার আর্তনাদ—বিধাতাকে ধন্যবাদ! আজকাল হয়ে গেছে বাসি।'

রবীন্দ্রনাথের মতো সদর্থকতার বড় প্রতিনিধি তো হয় না। নেতির দেশকালকে অবয়ব দিতে গিয়ে বিষ্ণু দে এই সময় যা কিছু সদর্থক তাকেই ব্যঙ্গের ধারালো অস্ত্রে আঘাত করছিলেন। করছিলেন বলেই, রবীন্দ্রকবিতার অংশগুলোর এমন বিকৃত ব্যঙ্গাত্মক ব্যবহার, 'সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্র ঠাকুর'-কে তখন এমন আক্রমণ। বিষণ্ণ পরিবেশের বর্ণনায় লাবণ্যময় রবীন্দ্রপদাবলী পরিবেশের বিষাদকেই গাঢ় করেছে। (ক) 'ধোঁয়ার মলিন এই শব্দখর কুৎসিত নগরে/তন্দ্রালসা সন্ধ্যা নামে...।' ("উর্বশী ও আর্টেমিস"); (খ) 'হে মোনালিসা, শুধু হাসো

তুমি মধুরহাসিনী অপরিচিতা,/যখনই শুধাই, ওগো বিদেশিনী, হে মোনালিসা, দিনের চিতা/ক্লান্ত ঘরের নীরবতা দেখ তোমাকে ডাকে।' (কবিকিশোর/"চোরাবালি"; (গ) 'গরবে কেহ গিয়েছে নিজ ঘর,/কাঁদিয়া কেহ চেয়েছে ফিরে ফিরে।/কেহ বা কারে কহেনি কোনো কথা,/কেহ বা জিন্ খায় নি ধীরে ধীরে।' (কবিকিশোর/"চোরাবালি)"; (ঘ) 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী/বিশ্বময় চলেছে তার ভোজ!/মরমিয়া সুগন্ধ তার বাতাসে উঠে প্রশ্বাসি,/সুরেশ শুধু খায় দেখি গ্লুকোজ!' (শিখণ্ডীর গান/"চোরাবালি"); (ঙ) 'পাঁচ মিনিট, পাঁচ মিনিট মোটে।/কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও/উদ্দাম উধাও/ট্রেন এলো বলে হাওড়ায়। (টপ্পা ঠুংরি/"চোরাবালি")।

কেউ কেউ বলেছেন, অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকে একসূত্রে গাঁথার অভিপ্রায়ে বিষ্ণু দে স্বদেশীবিদেশী এত পুরাণপ্রসঙ্গ আনেন। হতে পারে তাঁর অভিপ্রায় তাই ছিল। কিন্তু যে কবি উত্তরকালে কম্যুনিকেশনের সমস্যা নিয়ে প্রত্যহ-ভাবিত, তাঁর প্রথম দিককার কবিতায়, অন্তত বিদেশী পুরাণ ও প্রসঙ্গের উল্লেখ—ড্যানায় নেয়াড ডায়ানা স্যর্সি হিপোলিটস প্রসার্পিনা ডিয়োটিমা সাইনারা অরফিউস ব্রুনহিল্ড্ সীগফ্রীড পিদাসিকাতো ইত্যাদি—ত্রিকালকে একসূত্রে গাঁথেনি, বরং সেই সব সচরাচর-অজানা প্রসঙ্গ বিচ্ছিন্নতার ভাবনাকেই পুষ্ট করেছে। 'ক্রেসিডা', বা 'ওফেলিয়া' কবিতার বিরুদ্ধে যে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ ওঠে, বুদ্ধদেব বসুর মতো পাঠকও যেখানে স্বস্তিবোধ না করে লেখেন 'ও-দুটি কবিতায় কেন যে এক স্তবকের পর আর-এক স্তবক আসছে, সেটা আমার কাছে সব সময় স্পষ্ট নয়'—সেই দুর্বোধ্যতাও একদিকে বিচ্ছিন্নতাবোধের পরিণাম, অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতাবোধকেই যেন সাকার করে তোলে।

উজ্জীবনের ইশারা ছিল 'ঘোড়সওয়ার' কবিতার গতিতীব্র অশ্বক্ষুরধ্বনির মধ্যে—'হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর,/আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর।/কোথায় পুরুষকার?/অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?' আর 'মহাশ্বেতা' কবিতায় 'ভাস্বর তব তনুতে অমৃত জ্যোতি,/প্রাণসূর্যের একান্ত সংহতি।/ক্লান্তিবলয়ে শিহরায় ক্রন্দসী।/উত্তর করে মুদ্রিত বরাভয়,/তামসীরে করো খণ্ডন, করো জয়।' সময়ের দিক থেকেও এই দুটো কবিতা বিষ্ণু দে-র প্রথম পর্যায়ের একেবারে শেষ প্রান্তে লেখা, ১৯৩৫ সালে। বেশ বোঝা যায়, একটা পালাবদলের সময় এসে গেছে।

এলো আত্মানুসন্ধানের সময়। 'আজও চেনা হল না নিজেকে' এই বাক্যাংশ 'সংবাদ মূলত কাব্যে'র অন্তর্গত হলেও নিজেকে সনাক্ত করার কাজ শুরু হয়েছিল অনেক আগে। "পূর্বলেখ" বই থেকে শুরু, যে-বই তিনি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন, আর এই বই থেকেই বিষ্ণু দে-র পুরগাতোরিও শুরু। রবীন্দ্রনাথ তো আগের পর্বেও ছিলেন—সেখানে তিনি ছিলেন ব্যঙ্গের বিষয়, সেই তমসায় বদ্ধমূল পরিবেশে যেহেতু তিনি বেমানান। নতুন পর্বে বিষ্ণু দে-র যাত্রা রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে। ভার্জিলকে দান্তে বলেছিলেন 'কবিসমূহের গৌরব ও আলো', বলেছিলেন তাঁর মহাগ্রন্থ সানুরাগ মনোযোগে তিনি যেন অধ্যয়ন করতে পারেন; ভার্জিলকে সম্বোধন করেছিলেন 'গুরু এবং স্রষ্টা' বলে। ভার্জিলের মহাকাব্য ঈনিডকে তিনি অন্যত্র বলেছেন মাতৃসমা, তাঁর কবিতার ধাত্রী। পুরগাতোরিও-তে গুরু অনুগামীর অশ্রুসিক্ত মুখ শিশিরজলে ধুয়ে শুচি করে দিয়েছিলেন। বিষ্ণু দে-র অনুসন্ধানে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সেই ভার্জিলের। উত্তরণের পথিক বিষ্ণু দে বুঝেছিলেন 'বিদেশী

গদ্যের ভাবধারা প্রগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াপন্থী যাই হোক না কেন, তাকে অনুসরণ করে বেশিদূর যাওয়া অসম্ভব।' তাই এলিয়ট ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ, 'বৈশ্বিক মানবতা ও দূরবিস্তৃত প্রতিভায় সমন্বিত সেই বিরাট মানুষটি'—তাঁকেই তিনি দায়িত্ব দিলেন নরক থেকে উদ্ধার করে, পুরগাতোরিও-তে পথ দেখানোর। উদ্ধৃতির অন্তর্গত 'সমন্বিত' শব্দটির তাৎপর্য লক্ষ্য করবার। বিষ্ণু দে-র অন্বেষণ বিচ্ছিন্নতা, অসংলগ্নতা থেকে সংলগ্নতার, বিসঙ্গতি থেকে সঙ্গতির, নঙর্থকতা আত্মচ্ছেদ থেকে সদর্থকতা বা সত্তার, আত্মবিরোধ থেকে সমন্বয়ের। দান্তে যেমন পারাদিজোয় বিশ্বের পত্ররাজিকে প্রেমের বাঁধনে একটি মহাগ্রন্থে আবদ্ধ দেখেছিলেন, তেমনি বিষ্ণু দে, অনেক পরে বলেছেন, তাঁর অভীষ্ট, 'দৈনিকে বা সাপ্তাহিকে কোথা উৎকর্ষের গরিমা ?/আমি চাহি তুমি দাও রচনাবলীর সমগ্রতা...। (আমরা/সংবাদ মূলত কাব্য)। এই সমগ্রতার সন্ধানে বেরিয়েছেন বলেই দরকার হয়েছে 'সমন্বিত সেই বিরাট মানুষটি'-র।

তাই রবীন্দ্রনাথের কথা এত বারেবারে আসে—'তোমার আকাশে দাও, কবি দাও/দীর্ঘ আশি বছরের/আমাদের ক্ষীয়মাণ মানসে ছড়াও/সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো...।' (তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ ?)। আবার প্রার্থনা 'শতাব্দীর সূর্যে এসো অভীপ্সার তীব্র মেঘে তুমি'—কারণ তিনিই তো সঙ্গতির শিক্ষা দিয়েছেন ধ্যান ও কর্মের মধ্যে, সৌন্দর্য ও মননের মধ্যে, সমষ্টি ও ব্যক্তির মধ্যে—

ধ্যান যার সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তে বিধুর যার গান,
সেই তো বিশ্রামহীন মধ্যাহ্নের কর্মিষ্ঠ রৌদ্রের
প্রাবল্যে চেয়েছে ফল ফুল আর আউষ আমন,
যেখানে সবার হতে অধম ও সর্বহারা দীন,
চেয়েছে যে প্রতিদিন দেশব্যাপী সর্বতোভদ্রের
সর্বত্র সকলে হোক সচেতন সচ্ছল ও সুখী।

(রবীন্দ্রনাথ/"স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত")

রবীন্দ্রনাথে যেই এল অসংশয়িত আস্থা, অমনি বদলে গেল নিজের কবিতায় রবীন্দ্রচরণাংশ ব্যবহারের চরিত্র। (ক) 'কানে কানে শুনি/তিমির দুয়ার খোলো হে জ্যোতির্ময়।' (আবির্ভাব/"পূর্বলেখ"); (খ) 'তোমার প্রয়াণে/যৌবনবেদনারসে উচ্ছল তোমার দিনগুলি/রেখে যাবে জীবনের আনন্দের উচ্ছিষ্ট আবেশ/আমার প্রাণের পাত্রে।' (জঙ্গী/"সাত ভাই চম্পা"); (গ) 'তবুও ভরে না চিত্ত, রথযাত্রা লোকারণ্য ঘুরে/মেলায় মেলায় ঈদমুবারকে জনসাধারণে...।' (রথযাত্রা ঈদমুবারকে/"নাম রেখেছি..."); (ঘ) 'এসেছি তোমারই পাশে, নূতন উষার স্বর্ণদ্বার/দেখেছি তোমারই চোখে, অমর মহিমা/তাই দেশে দেশে বর্ষে বর্ষে/সময়ের তীর ধুয়ে ধুয়ে/চূর্ণ করে নিজ মর্ত্যসীমা মুহূর্তের সংহত ফাল্গুনে।' (ঐ মহাসমুদ্রের/"আলেখ্য"); (ঙ) 'যেখানে পর্বত ওড়ে আশ্বিনের নিরুদ্দেশ মেঘ/সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের বাঁকা তলোয়ার,/নটীর নূপুরে বাজে নদীর জোয়ার/শিহরায় দেওদারবন।' (তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ);—এই রকম চরণ এখন অনর্গল আসে কবিতার সদর্থক তাৎপর্যের সমর্থনে। আগের মতো নঙর্থক ভাবের মধ্যে সেই সব সদর্থক চরণ আর পারস্পরিক বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়ে নেতির শূন্যতাকেই আরো মর্মান্তিক করে তোলে না। তাই 'তবু শূন্য শূন্য নয়, ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন'—এই চরণের প্রতিধ্বনি বারবার শেষের দিকে শোনা যায়—যেহেতু চলেছেন শূন্যতা থেকে পূর্ণতার দিকে।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আরো দু-তিনজন সমকালীন মানুষের মধ্যে বিষ্ণু দে দেখেছেন দেশ-কালের সঙ্গে সংলগ্ন ব্যক্তিত্বের সুষমা। যামিনী রায় যেহেতু জীবনকে গ্রহণ করেছেন 'এক মৌল মানবিকতায়, এক দেশজ অন্তরঙ্গতায়'—তাই সত্তা বা আত্মপরিচয়ের অন্বেষণে বিষ্ণু দে তাঁর শিল্পজীবনের সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নেন। 'সাবেক, দেশী বাংলার মনের/ঐতিহ্যের ছবি' যামিনী রায় এঁকেছেন, আর বাঙালী আর ভারতবর্ষীয়ের উত্তরাধিকার খুঁজতে ব্যস্ত এই কবি—সহধর্মী বলেই দুজনে সহযাত্রী। বিষ্ণু দে-র নন্দনজিজ্ঞাসা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একজন সমালোচক ঠিকই বলেছেন 'বিষ্ণু দে-র কাছে শেষ পর্যন্ত যামিনী রায় তাই প্রতীক হয়ে ওঠেন, রবীন্দ্রনাথেরই মতো।' মনীষার পৌরাণিক চরিত্র সত্যেন্দ্রনাথ বসুও সেই প্রতীকী প্রয়োজনে আসেন, কারণ 'মননের চূড়ান্ত শক্তিতে সংহত এক পরিপূর্ণ মানবিকতার চারিত্র্যে এক অর্গানিক সংলগ্নতায়' তিনি সদাজাগ্রত, কারণ তাঁর মধ্যে বিরাজমান আত্মভোলা নির্বিকার সাত্ত্বিক প্রসাদ—'সকল বিষয় আর সর্বজীবে নির্বিশেষ সন্ন্যস্ত সম্প্রীতি,/প্রথম বাঙালী এই বিশ্বমানবের বক্ষে কেউ নয় ব্রাত্য'। একই কারণে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের প্রশস্তি বা মার্কস ও লেনিনের বন্দনা। মার্কস—যেহেতু তিনি শুধু বিচ্ছিন্নতাবোধের রোগবিশ্লেষণ বা রোগের কারণ নির্ণয় করেন নি, সঙ্গে সঙ্গে 'স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই সমাজকে, যেখানে জীবনকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট কোনও কর্মক্ষেত্রে জীবিকায় বন্দী থাকতে হবে না কিন্তু প্রত্যেকেই মুক্তভাবে প্রতি কর্মক্ষেত্রে নৈপুণ্যসম্ভোগ করতে স্বেচ্ছাধীন।' আর 'প্রাজ্ঞ লেনিন', —কারণ তিনি সেই স্বপ্নকে বাস্তবিক করার কাজে হাত লাগিয়েছিলেন।

> এ জীবন বিচ্ছিন্নের সমুদ্রে সমুদ্রে একাকার;
> ঢেউগুলি নিরুদ্দেশ নির্বিশেষ, কোথায় সীমানা!
> কার কোথা তীর কোথা তল কোথা দ্বীপ নেই জানা—
> এলোমেলো সব ছবি মানুষের অসহায়তার।
>
> (বহুরূপী/"আলেখ্য")

বিচ্ছিন্নতাপ্রপীড়িত মানুষের এলোমেলো ছন্নছাড়া অসহায়তার কারণ কেন্দ্রচ্যুতি—ভর খুলে গেছে, সংযোগ-সংলগ্নতার সেতুবন্ধ নেই। প্রত্যেকে নিঃসঙ্গ একা।

> রবীন্দ্রনাথের গল্প, আশ্চর্য রূপক দিয়ে, এঁকেছেন কবি
> আমাদের সকলের জীবনের ছবি,
> মর্মভেদী ভীষণ অদ্ভুত
> বিবাহের সকলই প্রস্তুত,
> এমনকি বরযাত্রী এসে গেছে, শুধু বর নেই—
>
> ("স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত")

সেই বর, সংলগ্নতার সেই সেতু আছে মানবসমষ্টির সংযোগ-সহযোগিতার মধ্যে, জীবনের মধ্যে মূল গভীরভাবে চালিয়ে দিয়েছে যে সামাজিক মানুষ তার সানন্দ প্রাণময় সত্তার মধ্যে। তাই 'বর খুঁজে ফেরে সত্তা আত্মপরিচয়/মাঠে গঞ্জে শহরে বন্দরে খোঁজে সে আপন সত্তা, সনাক্তিকরণ/দশের দর্শনে...।' জীবনের প্রয়োজনে যেমন চাই দশের দর্শন, তেমনি শিল্পের প্রয়োজনে, কবিতার প্রয়োজনে; কেননা জীবনের উৎসমুখেই শিল্পের উচ্ছ্বসিত আবির্ভাব। সেই কারণে 'কবিতা চকমকি নয়, জ্বলে না চমকে,/কবিতা অঙ্গার, জ্বলে আমাদের মনের হাওয়ায়/দেশের ও দশের হাওয়ায়...।' (মন যেন নিভন্ত অঙ্গার/তুমি শুধু...)। তাই প্রথম পর্যায়ে জনস্রোত যাঁর মনে জাগিয়েছে জুগুপ্সা, তিনি উত্তরপর্যায়ে জনসংযোগের দাক্ষিণ্য

চেয়েছেন আপন উত্তরাধিকার ও সত্তার অন্বেষণে। এখন 'আমারও অন্বিষ্ট তাই/অণুর সংহতি', আর সংহতির শক্তি জানেন বলেই এখন 'খণ্ডিত অণুতে পাই সমগ্রের সচল মহিমা সমুদ্রের ঢেউ'। এই উপলব্ধির সার যুক্তির ভাষায় লিখে রাখেন 'ব্যক্তির কৈবল্যে সখা, বাহুল্য ব্যক্তিও,/জনসমষ্টিতে জীব্য তোমার ব্যষ্টিও।' অথবা 'বিকলবিরূপ/সর্বচ্যুত ব্যক্তিত্বের চর্চা বৃথা, সর্বদা, সর্বথা।' জাগ্রত জনস্রোত নবসম্ভাবনায় উদ্দীপিত করে, পায় কবির উত্তেজিত সমর্থন—

লুব্ধ যাযাবর! নির্ভীক আশ্বাসে আসে ঐশ্বর্য-লুণ্ঠনে,
দ্বারকার অঙ্গনে অঙ্গনে
তারা চায় রঙ্গিলাকে প্রিয়া ও জননী
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী,
চায় তারা ফসলের ক্ষেত, দীঘি ও খামার
চায় সোনাজ্বলা খনি। চায় স্থিতি, অবসর।

(পদধ্বনি/"পূর্বলেখ")

মার্কসবাদে দীক্ষিত হবার পর শ্রেণীসমাজের বিশ্বব্যাপী ভূমিকা বিষয়ে কবি সচেতন হয়েছেন, আর তখন থেকেই তিনি বেশি করে আস্থাশীল হয়েছেন মানুষের উপরে। কিন্তু এই মানুষ শহরের আত্মবিচ্ছেদ-পীড়িত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষ নয়, কেন না, 'মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, শিক্ষিতও অথচ মানুষই নয়।' কাদের প্রতি তাঁর পক্ষপাত তা দুটো উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায়—(ক) 'মহুয়ানির্ভর আর মেঘজীবী এ দেশের স্মৃতি,/শুধু ছিন্ন গ্রন্থি আজ, ভেদ তাই দপ্তরে প্রান্তরে; কৃষাণ-কৃষাণী ওরা, আর এরা ভব্য চাকুরিয়া।' (এরা ও ওরা/"স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত") (খ) 'ও যবে বক্তৃতা করে আধিগ্রস্ত কবন্ধ কৌশলে,/নীলাকাশে মুক্ত এর হাত চলে লাঙলে চাকায়।' (এ আর ও/"স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত")। এই এরা এবং ওরার মধ্যে তাদের উপরেই বিষ্ণু দে-র নির্ভর বেশি, যারা শ্রমজীবী গ্রামীণ মানুষ।

আমরা ভেনেছি ধান, আমরা ভেঙেছি গম
জোয়ার বাজরা আর শস্য অড়হর
আমরা তুলেছি পাট আমরা বুনেছি শাড়ি গড়েছি পাথর
আমরাই ধরি হাল
আমরাই করি গান...।

(১৪ই আগস্টে/"অন্বিষ্ট")

সত্তার সন্ধান, বিকল্পে বিবাহসভার অনুপস্থিত বরবধূর খোঁজও মিলবে এই কর্মজীবী গ্রামের মানুষের মধ্যে।

বাসায় ভিটায় কতো কতো রাজভবনে ভবনে
কত ভোজ উৎসবের শামিয়ানা দেখে দেখে শেষে
আজ মনে হয় আমাদের শ্মশান স্বদেশে
বাসর নরক হলো একাকার। ভাবি মনে মনে
এ যেন বিরাট এক বিবাহসভার আড়ম্বর—
শুধু নেই বধূ, নেই, সে গিয়েছে আউষের বিলে,
বর নেই, বর কোথা জগদ্দলে মুনিষ মিছিলে—...।

(রথযাত্রা ঈদমুবারকে/"তুমি শুধু...")

আর একটা পরিবর্তন দেখার মতো। এখন কবি জনস্রোতের অসম্পৃক্ত নির্লিপ্ত দর্শক নন, মানুষেরা এখন 'তারা' নয়। 'তুমি'-ও থাকে না বেশি দিন—'কাস্তে লাঙলে হাতুড়ি হাপরে তোমরা গড়েছ হাল/জীবনের বীজ তোমরা ছড়াও মৃত্যুঞ্জয় হাতে…।' সাযুজ্যের সন্ধানী এখন মানুষের দলের একজন, তাই মানুষের কথা বলতে গেলেই এখন ব্যবহৃত হয় উত্তম পুরুষের একবচন বা বহুবচন। (ক) 'আমরা জনতা, জনসাধারণ, সাধারণ লোক/চাষী ও মজুর কবি শিল্পী স্রষ্টা/রাত্রি আজ করে দিই দিন তুড়ি দিয়ে শনিকে রাহুকে…।' (১৪ই আগস্টে/"অম্বিষ্ট"); (খ) 'আমি তো গাঁয়ের লোক/দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধ খুঁজি প্রায় প্রতি বছরেই…।' (আমি তো গাঁয়ের লোক/"নাম রেখেছি…")

সহজের খোঁজে গ্রামের কর্মী মানুষের দাক্ষিণ্য শুধু চান না, যার কৃপায় তারা সহজ ও নিটোল, সেই প্রকৃতির সংসর্গও কামনা করেন কবি—'আমরা সরল তাই সরল জীবন চাই সচ্ছল সভ্যতা চাই/ঘরে ঘরে, ঘরে ও বাহিরে চাই ঘনিষ্ঠের আত্মহারা/যোগাযোগ মানুষে মানুষে আর প্রকৃতি মানুষে…।' (লুসিয়া, প্রকৃতি, আমরা/"স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত")। কারণ সত্তা শুধু মানুষের সংসর্গে, দশের দর্শনে নয়, 'সত্তা যার নিহিত মাটিতে রৌদ্রজলে শিকড়ে শাখায়।' কবিশিল্পীর সরল অথচ কঠিনের দাবি পূরণ হয় না শুধু দেশে ও সমাজে সমব্যথায়, সততা বিনয় বা প্রেমে, চাই শুধু 'জীবে প্রেম' নয়, সঙ্গে সঙ্গে 'প্রকৃতির প্রেম'—'তবে না বইবে হাওয়া, মনের অঙ্গার/জ্বলবে হীরার মতো'। তাই ফিরতে হয় আদিম মাতার কাছে, প্রাণের উৎসের কাছে। শহুরে মানুষের হপ্তা-শেষের শখের বেড়াতে যাওয়া নয়, এ যাওয়া অস্তিত্বের অর্থ খোঁজার তাগিদে।

> শহুরের মন যায় থেকে থেকে ছোট সেই গ্রামে,
> থেকে থেকে মনে আসে রূপ-রস-গন্ধে বসুন্ধরা,
> মনে পড়ে সেই মাঠ, তালদীঘি, টিলা সার সার
> যেখানে আকাশ মেলে সূর্যাস্তের আশ্চর্য পশরা…।
>
> (এ বিচ্ছিন্ন নয়নাভিরামে/"আলেখ্য")

মানুষ-প্রকৃতি মিলে যে সরল জীবন তার সানন্দ সতেজ সংস্পর্শেই দুরারোগ্য সত্তার ব্যারামের উপশম হতে পারে; ওষুধবিষুধ বৃথা, এ-রোগের অন্য চিকিৎসা নেই—

> এ রোগের বিধান আকাশে,
> পৃথিবীতে, বনস্পতি, ওষধিতে, ক্ষেত মাঠ ঘাসে,
> পাহাড়ে, নদীতে, বাঁধে, গোচরের অনন্ত প্রান্তরে,
> প্রকৃতিতে হৃদয়ের সুস্থ স্বচ্ছ স্বপ্নে রূপান্তরে;
> চিকিৎসা লোকের ভিড়ে, বস্তির কুঁড়ের জনতায়—
> জনতা বা প্রকৃতিতে, একই কথা, অন্যোন্য সত্তায়।
>
> (ব্লডপ্রেসর্/"স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত")

তাই বিষ্ণু দে লিখেছেন 'প্রকৃতিতে গড়ি সমাজের বরাভয়।' সেই বরাভয় কখনো দেখেন 'চৈত্রের আকাশে এক পরাক্রান্ত জীবন কৌশলে বিজয়ী' পলাশে অথবা উপরে অগণন হরিয়াল নিয়ে 'ছায়াকম্প্র শান্তির আশ্রয় প্রকাণ্ড' পিপুলে। ভিতরের তাগিদে কবি তাই বাসা বাঁধেন সাঁওতাল পরগনার রিখিয়ায়। এ শুধু বাসা বাঁধা নয়, নিজবাসভূমে পরবাসীর স্বভূমি, আপন নিকেতনের অন্বেষণে। দেখেন হিরনার টিলা, বাবুডির আকাবাঁকা লালপথ—যার বর্ণময়

সৌন্দর্য হার মানায় পিসারো বা উট্রিল্লোকে, আর সেই নিসর্গের পটে দেখেন 'পিকাসোর পেশীসচ্ছল সাঁওতাল' যুবাকে। 'মেদুর তন্বী টিলাগুলি নীলে মেলে অগম্য হিয়া/বিলায় হৃদয় দূর ত্রিকূটের সংহত সম্মানে/ত্রিকালের মতো কঠিন ত্রিকূটে চেয়ে থাকে দিঘারিয়া। (স্কেচ/"সন্দীপের চর")। জটিলতামুক্ত সপ্রাণ জীবনাসক্তিতে বিষ্ণু দে-র কবিতায় বারবার আসে সাঁওতাল পরগনার নানা স্থানচিত্র—তিনপাহাড় ননিহাট মহুয়াগড়ি হুর্লাজুড়ি বারমাসিয়া।

নিসর্গসবুজের মধ্যে যে উজ্জীবনের ইশারা, তারই নির্যাস জলের মধ্যে। বন্ধ্যা পাথরের মধ্যে সজল উর্বরতা, গ্রীষ্মের দাবদাহের পর বর্ষার আর্দ্রতা, বিচ্ছিন্নতায় ছন্নছাড়া সমাজের মধ্যে জলস্রোতের নিরবচ্ছিন্ন ধারা—তারই মধ্যে আছে প্রাণময়তার আভাস, সঙ্গতি ও সুষমার প্রতীক। বিষ্ণু দে 'জলের আবেগশাস্ত্রে'র কথা বলেছেন, বলেছেন 'জল হল পৃথিবীর আদি মহাদায়'। প্রাণাবেগ জলের মধ্যে পায় বস্তুরূপ, তাই যখন নির্মম গ্রীষ্মের নৈপুণ্য সয় না, তখন প্রার্থনা ওঠে—

কালিদাসী স্বর্ণযুগ জীয়াইয়া আতাম্র শহরে
কদম্বকাননে, আম্রে, মেঘদূতে বৃষ্টি যেন ঝরে,
সন্ধ্যাকাশ ঢাকি কালবৈশাখীর নবধারাজলে
গলির পিচের পথে, নীপবনে, ছায়াবীথিতলে।

(বৈকালী/"পূর্বলেখ")

নিরানন্দ মৃত ছিন্ন-শিকড় পরবাসী পরিবেশে বৃষ্টি 'বৃষ্টি তো নয়'. পাথুরে শহরে পিচের রাস্তা যে নিষ্প্রাণ নির্মমতার প্রতীক, তারও মধ্যে বৃষ্টি জীবনের মমতা ঘনায়। অসুস্থ দুস্থ কলকাতার স্তূপীকৃত দুর্গন্ধের রাস্তাতেও বৃষ্টি পড়ে—

দপ্তরে আড়তে ঘরে সকলেই ভোলে অবহেলে
বর্তমান গ্লানিজ্বালা, চলে যায় স্বভাবসরল
শৈশবেই, মহাখুশি জলপথে ইস্কুলের ছেলে
ইলিশের মতো মুক্ত। সারা দেশে জলের ফসল।

(তবুও আশ্চর্য বৃষ্টি/ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে)

যে অসম বিষম ব্যবস্থায় গ্রামে-শহরে ঘটেছে বিচ্ছেদ, বৃষ্টির অবিরল দিনে তা ঘুচে যায় 'নিরম্বু কলুষ ধুয়ে কলকাতাকে প্রাণ দিক গ্রাম'—জল যেমন ঝরে 'দগ্ধ পথে গলা পিচে ইঁটে', 'ছাতে ও ছাতায়', তেমনি ঝরে গ্রামের 'জলস্রোতে থানায় ডোবায়'। অন্য কারণেও তিনি 'সারা মনেপ্রাণে/মেঘের কাঙাল', অনুর্বর হৃদয়ে সত্তার ফসল যাতে ফলে। বৃষ্টি শুধু মাটিতে ঝরে না, ঝরে মনে, সত্তার গভীরে, অস্তিত্বের শিকড়ে—'মনে মনে আমিও সত্তার পোড়া ক্ষেত রুই, বুনি;/হয়ে যাই থরো থরো ফসলের শিষ।' (আমিও তো/স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত)। বৃষ্টি যুক্ত করে দেয় ঐতিহ্যের সঙ্গেও—আবহমানকালের ভারতীয় কবিতার গুঞ্জরণ শুনি এই কবির বর্ষাসজল চরণে-চরণে, কালিদাসী স্বর্ণযুগ থেকে রবীন্দ্রনাথ। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতিধ্বনি শোনা যায় 'বিগলিত চীর অঙ্গে রিমি ঝিমি শব্দে শব্দে', রাধার মরমে বাঁশির মতো 'বৃষ্টি মরমে পশে', বৃষ্টি ঝরে 'মনের হরিষে নিন্দ যাওয়ার ছন্দে', 'যমুনার চির ভারতীয় শ্যামতৃণে'। যেমন বৃষ্টিধারা, তেমনি নদী আমাদের যুক্ত করে দেয় প্রবহমান ঐতিহ্যের সঙ্গে—'বহুকাল ধরেই নিয়ত এই নদী আমার ঐতিহ্য পরম আত্মীয়...।' এই নদীর সঙ্গে আমাদের আরাধনা তীর্থ তর্পণ, স্নান যান পান, সমস্ত দেশজ জীবনযাপন জড়িত। তাই নদীমাতৃক দেশের

নদীমালার নাম কবির কাব্যে পাই বারবার—গঙ্গা সিন্ধু তিস্তা মাতলা মধুমতী মাথাভাঙা রূপনারায়ণ ইত্যাদি। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নদীর নিরবচ্ছিন্ন ধারা বহমান ঐতিহ্য, নিয়ে আসে অনেক সংকেত—মৈত্রীর, মুক্তির ছন্দ, দ্বৈতের একতার। তাই 'নদীতেই নিশ্চয় প্রতীক', তাই 'আমাদের উপমেয় নদী/স্রোতে স্রোতে চলে নিরবধি'। মানবসংসারে যা মিছিল, নিসর্গসংসারে নদী তারই চিত্রকল্প,

হৈমন্তী হরিণ নদী আজকে সে মরিয়া মহিষ
প্রচণ্ড বন্যায় বন্য, নেমে আসে মাথাভাঙা তোড়ে।...
ছুটির সে মরা নদী বর্ষা আজ, মাতে শত কৃষাণ-মুনিষ
কিংবা মজুরেরা যেন দলে দলে কারখানার মোড়ে।
(বর্ষার নদী/"স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত")

বিষ্ণু দে একটি কবিতায় বলেছেন, 'একাগ্রতাই সত্তা'। নদীর মধ্যে আছে সেই একাগ্রতা, যেমন আছে মিছিলে। এই নদীই দেয় তারুণ্য গতি সজীবতার সংকেত, তাই পঁচিশ বছর পেনশন-ভোগী পিতামহ-আইসায়া দেখে অসিবীরব্রত জাতির 'নয়নে ভাস্বর/তার নীল নদী বয়, দুই তট সবুজ উর্বর।'

যে শিল্পী আত্মপরিচয় খোঁজেন, তাঁকে খুঁজতে হয় শুধু শিল্পীর জাগ্রত জীবনে নয়, তাঁর নিজের ঘরের বংশের, দেশের আধভোলা-ভোলা চৈতন্যের রক্তের মধ্যে, জীবনযাপনের সব কিছুর সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে। দেশসমাজের পরিচয় সত্তার চৈতন্যে ধনী প্রজ্ঞাকে স্মৃতিতে সংহত করে দেশজ পুরাণের মধ্যে। চতুর্দিকে যখন বিসংগতি দেখেছিলেন বিষ্ণু দে তখন তিনি বারবার বিদেশী পুরাণ উল্লেখে বিচ্ছিন্নতার বোধকেই সাকার করেছিলেন, আবার যখন তিনি সঙ্গতি ও সাযুজ্যের সন্ধানী হলেন তখন কমে এলো বিদেশী পুরাণের ব্যবহার। অনেক গুণে বেড়ে গেল স্বদেশী পুরাণের উল্লেখ। এমন সব পুরাণের কথা যার তাৎপর্য লেখাপড়া-না-জানা সাধারণ মানুষ রামায়ণ-মহাভারত-কথকতা শুনে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। পাণ্ডব-কৌরবের কথা, বিভীষণ মেঘনাদ হিরণ্যকশিপু কংসের কথা, বাসুকী চাঁদসদাগর সুগ্রীব সুভদ্রা সত্যভামার কথা, দুর্বাসা কল্কি নৃসিংহ প্রহ্লাদ বিশ্বামিত্র অথবা উত্তরা-পরীক্ষিত কর্ণ-দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র বা শবরীর কথা। দাঙ্গার কলকাতার পর স্বাধীনতায় কলকাতার চরিত্রান্তর বর্ণন করতে গিয়ে বিষ্ণু দে লেখেন—'মুক্ত বর্ষভোগ্যশাপ, মুক্ত হলো কলকাতার বেড়ী,/ স্বর্ণলঙ্কাপুরে ছিল বন্দী সীতা মাটির দুহিতা/চার পাশে ঘিরে রাখে রাক্ষসের সৈন্য কিংবা চেড়ী...।' দগ্ধ কলকাতায় বৃষ্টির বর্ণনায় আসে অহল্যার অনুষঙ্গ—'এই ভালো; নবজলধর-শ্যাম আনুক আরাম/অহল্যার শুষ্ক ক্ষতে সহস্র মরুতে ধারাজলে।' বৈপ্লবিক নবজন্ম বোঝাতে কৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর প্রসঙ্গ আনেন তিনি এখন, রুশদেশের জাগরণ বর্ণিত হয় কুমার-সম্ভবের আর জারতন্ত্রের পতন বর্ণিত হয় কালীয়দমনের আখ্যান দিয়ে।

শুধু দেশীয় পুরাণের কাছে নয়, আত্মপরিচয়ের অন্বেষণে বিষ্ণু দে লোকজীবনের স্মৃতিসংস্কারে বিজড়িত লোকসাহিত্য, রূপকথা ও ছড়ার দ্বারস্থ হয়েছেন। যে মানুষের সঙ্গ থেকে আত্মপরিচয় লাভ করা যায় বলে তিনি বিশ্বাস করেন, সেই মানুষের থেকে তাঁর কবিতা বিচ্ছিন্ন থাকবে এ কেমন করে হয়! যিনি দুর্বোধ্য ছিলেন, তিনি সহজ হতে চেয়েছেন; এই কারণেও রূপকথার অনুষঙ্গ, ছড়ার লঘুচাল এনেছেন তাঁর কবিতায়। বারবার এসেছে সুয়োরানী দুয়োরানী কোটাল পক্ষীরাজ বেতালের কথা, এসেছে সাতভাই চম্পা রাক্ষস

কঙ্কালীপাহাড় দৈত্যদানো কড়ির পাহাড়ের প্রসঙ্গ। রূপকথা ধরনে লিখেছেন 'জয়মালা দেবে, লাল করবীর গুচ্ছে বেঁধে/চিকন কবরী দোলাবে কন্যা ক্লান্তিহরা'। সত্তার মৌলিক প্রশ্নেও এসে যায় রূপকথার অনুষঙ্গ—'তাই আত্মপরিচয় নেই, ব্যক্তি নেই, সত্তা নেই,/লালনীলকমলের দেশে আজ বর নেই,/বিধবার দেশে অরক্ষণীয়ার সুন্দরীর বর নেই, সত্তা নেই...। (স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত)। নিজবাসভূমে মূলহীন পরবাসী হওয়া আত্মবিচ্ছেদের অপ্রতিরোধ্য পরিণাম। তাই দেশের মানুষে নিসর্গে পুরাণে রূপকথায় সত্তাকে খুঁজে নিতে হয়। 'মরিয়া না মরে রাম নামহীন এই সব চাষী ও মজুর', দোলদুর্গোৎসব ঈদমুবারক নবান্নকে জানতে হয়, খেত মেলা আলপনা শীতলপাটিতে দেশীয় মেধাকে অনুভব করতে হয়, শুনতে হয় 'গ্রাম গ্রামান্তের খেত-খামারের ভাটিয়ালী রাখালি বাঁশি', অংশ নিতে হয় 'মহিমের পোড়ো বাসা, ছোট মুখ, ছোট আশা, ভালোবাসা'-র, 'ভুবনডাঙার হাটে/লাজুক দুটি উৎসুক সে চোখে' চোখ মেলাতে হয়। কায়মনোবাক্যে অনুভব করতে হয়—'এ দেশ আমার চেনা দেশ/আমারই আপন সত্তা...।' আর দেশের সেই স্বরূপ থাকে দেশজ ভাষায়। দেশকে খুঁজতে হয় দেশজ ভাষায়—'তাই পরিব্রজে খোঁজা অপভ্রংশে, দেশজ ভাষায়,/আঞ্চলিক মুখে মুখে স্থানীয়ের বিশিষ্ট বচনে,/কথ্যছন্দে, সুরময় প্রাত্যহিক প্রাকৃত ভাষণে...।' (মালার্মে : প্রগতি/"তুমি শুধু...")। অনেক কথ্যছন্দ ছড়া সংকলিত হয়েছে পরিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে তাই, "সাত ভাই চম্পা" এবং "সন্দীপের চর" বইতে। পরেও লিখেছেন মিলিত নবজীবনের ছড়া—'কে জানত পোড়া দেশে এত বুলবুলি!/ বানচাল দেশ ধানচালে ঘুলঘুলি/কোণঠাসা করে করেছ বোঝাই।' যাঁর কবিতার দুর্বোধ্য শব্দব্যবহার, ক্রতুক্রতম অপাপবিদ্ধমন্দাবির সোৎপ্রাসপাশ, এক সময় ঠাট্টার বিষয় ছিল, তিনি এখন খোরপোষ ছুতোরের পো বানচাল তুলোধোনা জুজু পুঁইছে হিম্মৎওয়ালা দানো-পাওয়া হুমকি সর্দারি গর্দান চরকি নিমকহালাল দালাল, এই সব শব্দ অসংকোচে ব্যবহার করেন।

'জীবনের চেয়ে শিল্পে বিরোধ কি তীব্র নয়?' বিষ্ণু দে একবার জিজ্ঞাসা করেছেন, অন্যবার জবাব দিয়েছেন, 'শিল্পী জানে, কবি জানে, যেহেতু প্রেমিক তারা, তাই জানে/স্বপ্নের যন্ত্রণা; জানে সমাধা দুরূহ, তবু আশাও দুর্মর...।' কিসের আশা?—শিল্পের অন্তর্গত দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে সমাধা অর্থাৎ সৌষম্যের ক্ষমায় পৌঁছুনোর আশা। কেউ কবিতা লেখে, কেউ গান গায়, আঁকে চিত্রপট, গ্রানিটে নির্মাণ করে ইমারত, 'নির্মাণই সত্য জানি।' তাই কোনার্ক মন্দির দেখে শিল্পীমজুরের কথা ভেবে কবি জিজ্ঞাসা করেন 'এরা কি সবাই বীর, প্রত্যহের অশ্বারোহী, কর্মী অনলস,/সবাই অপরাজেয়, জীবনে নির্মাণে এক সংহত তন্ময়?' নির্মাণের মধ্যেই শিল্পীর সত্তার, আস্তিক্যের প্রমাণ। শুধু আস্তিক্যের প্রমাণ বলেই নয়, শিল্পেই যেহেতু উপাদান আর রূপকল্প অপৃথক হয়ে যায়, তাই আত্মবিচ্ছেদহীনতার সুডৌল সঙ্গতি বোঝাতে বারে বারে কবি টেনে আনেন অনিবার্যভাবে শিল্পের প্রসঙ্গ। শিল্পের মধ্যে থাকে কোনার্ক মন্দিরের মতো সামগ্রিক স্থাপত্যের সমন্বয় ও সুষমা—'খণ্ডে খণ্ডে অখণ্ডিত নৃত্যের সমগ্র স্তব্ধ ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় সমাহিত,/যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ একেকটি তড়িৎস্তবক।' বিচ্ছিন্ন বিড়ম্বিত জীবনে দুর্লভ সংহতি মেলে শিল্পের মধ্যে 'তাই শিল্পে সত্তা শুদ্ধ'—

কোটি কোটি লোক বাঁচি, নাকি মরি, শাসনে শোষণে:
তাই, থেকে থেকে খুঁজি জীবনের তন্ময় ভাষণে,
প্রেমে, সখ্যে, প্রকৃতি বা সংগঠনে, মানুষের জয়ে
শিল্পের চিন্ময় কর্ম জীবনের ভঙ্গুর মৃন্ময়ে।

(তাই শিল্পে/"আলেখ্য")

শিল্পই দিতে পারে মৃন্ময়ে-চিন্ময়ে ছেদহীন সঙ্গতি, কেননা তারই মধ্যে জড়-চৈতন্যের একান্ত অভেদ। 'তাই তো শিল্পের মুখ চাওয়া, যদি দুস্তর বাস্তবে/এবং হৃদয়ে বাঁধে অবিচ্ছেদ্য মননের সেতু...। (তাই শিল্পে পাই/"স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত")।

সমস্ত শিল্পের মধ্যে আবার সঙ্গীতের দিকে তাকিয়েছেন তিনি সব চেয়ে বেশি। ধরনের জন্যে, অন্য কারণেও। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪০ সাল ধরে লেখা "বৈকালী" সাঙ্গীতিক দশটি চাল বা মুভমেন্টে বিন্যস্ত। দশটি মুভমেন্ট পরিণামে এক লক্ষ্যে লীন হয়ে যায়। বিখ্যাত 'জন্মাষ্টমী' কবিতাও দুটো বিপরীত সাঙ্গীতিক তরঙ্গের সম্পর্ক দিয়ে রচিত। 'অন্বিষ্ট' কবিতায় যেখানে তিনি সঙ্গতির প্রার্থনা করেন, 'হে বন্ধু মিলাও হাত কলমে কোদালে লাঙলে লেখায়/যেন মিলে যায় আমাদের আশা ও নৈরাশ'—সেখানেও ভিন্ন ভিন্ন সাঙ্গীতিক মুভমেন্ট একত্র হয়, সরে যায়, আবার মিলে যায় সমন্বিত সুষমায়। 'বারমাস্যা' কবিতার বারোটি মুভমেন্টের পরিণামেও আছে সাযুজ্যের কথা—

> ব্যক্তির স্বরূপে ডুবি, ডুবি গুরু সমষ্টির হাঁকে,
> সাযুজ্যের ডাক শুনি উন্মোচিত ঊর্মিল গাজনে
> বিকট ভবিষ্যে ফোটে মাথুর, কদম্বে হাহাকার;
> অকালবোধনে চণ্ডী সেতুবন্ধে আশ্বাস ছড়ায়।
>
> (বারমাস্যা/"নাম রেখেছি...")

'সেই একতার অর্কেস্ট্রার সমসমাজের/সঙ্গীতে ডোবে অন্যমনারও আত্মরতি'—তাই পরস্পরে আত্মীয়, মানুষে-মানুষে সহযোগী সমসমাজের কথা ভাবতে গেলেই যাঁর মনে পশ্চিমী অর্কেস্ট্রার সঙ্গীততরঙ্গ জেগে ওঠে—জেগে ওঠে 'বীটোফেনী সঙ্গীতের গন্ধর্ব বাতাস' বা গ্লুক্‌ বা বাখের কথা। জেগে ওঠে, যেহেতু সঙ্গীতেই সমস্ত বৈষম্য একটি সুষমার তোড়ায় বাঁধা হয়ে যায়—'হঠাৎ বেহালা বাজে/খুলে দেয় সুরের ফোয়ারা', মুছে যায় দিনের ঘৃণ্যতা, অনর্থক স্বার্থের দহন, সমস্ত বিচ্ছিন্ন শিল্পের চরম রসায়নে রূপান্তরিত হয় অবিচ্ছিন্নে। তাছাড়া, সঙ্গীতকে বলা হয়ে থাকে শুদ্ধতম শিল্প, কারণ সঙ্গীতের মধ্যেই মাত্র রূপকল্পই বিষয়, বিষয়ই রূপকল্প। বিষয়-রূপ সেখানে আদৌ অভিন্ন। আবার এলিয়টের 'music heard so deeply/That it is not heard at all, but you are the music/While the music lasts.' চরণগুলি স্মরণ করেই বিষ্ণু দে লেখেন 'ও রকম আমারও ঘটেছে,/ যখন গায়ক নিজে, অথবা গায়িকা হয়ে ওঠে গান কথা সুর/আর শ্রোতা হয়ে যায় অধরা সে গানের বিষয়/আধেয় আধার, একাকার শরীর ও অশরীরী প্রাণ...।' (গান/"তুমি শুধু...")। সঙ্গীতের ধ্যানের চূড়ান্ত মুহূর্তে সব ভেদ লুপ্ত হয়ে যায়, গায়ক-গানের, শ্রোতা ও গানের, গায়ক আর শ্রোতার। তাই সঙ্গতির কথা এলেই সঙ্গীতের কথা আসে। প্রকৃতিজগতে ঐকতান সমাহার দেখে যখন কবি ভাবেন কবে মানবসমাজে এই অবিচ্ছেদ আসবে, তখনই সঙ্গীতের উপলব্ধি জাগে—'এ আকাশ মহাসত্তা পৃথিবীর কতো না রঙের/শত শত বর্ণাভাসে এ যেন বা অর্কেস্ট্রা বিরাট।/একত্রে, সবাই এক সঙ্গীতের সঙ্ঘে বন্ধ,/তন্ময় মননে এক...। (হেমন্ত/ "আলেখ্য")। আবার যখন হতাশা উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ভবিষ্যতের স্বপ্নময় আশায় আস্থা রাখেন, তখন সেই আশাও সাঙ্গীতিক সুষমার রূপ নেয়।

> এ নৈরাশ সাজে নাকো। মনে প্রাণে ইন্দ্রিয়ে সঙ্গীত,
> তোমরাই অর্কেস্ট্রা সে যে বিশ্বময় বিরাট আসরে
> আশার উৎসবে জ্বালে আনন্দের অস্থির সম্বিৎ

যন্ত্রণার মীড়ে-মীড়ে মৃত্যু-লেখা প্রাণের আখরে...।
(এখনই বিদায় গান/"তুমি শুধু...")।

অভেদের মধ্য দিয়ে সঙ্গতি অর্জনের কথা বলতে গেলে চূড়ান্ত যে প্রতিমা বারবার বিষ্ণু দে-র মানসে ভেসে ওঠে সে দাম্পত্যসম্পর্কের। 'আমরা সবাই মানবজন্মে অমর মেলি প্রতীক-/কঠিনে কোমল বীরের বাহুতে স্বায়ত্ত বরনারী।' ভিন্ন নারী ভিন্ন নর দাম্পত্য-প্রেমে স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে এক সত্তায় অভিন্ন হয়ে যায়। তাই কর্মিষ্ঠ মানুষের স্বেদসিক্ত মুখের ছবি আঁকতে গেলেই তিনি কৃষাণের পাশে দেখেন ভূস্বর্গইন্দ্রাণী কৃষাণবধূকে। প্রেমিক-প্রেমিকা যখন একাগ্র প্রেমে আত্মস্থ তখন তারা দ্বৈততা হারিয়ে একের দ্বিজত্ব পায়। হয়তো সেই 'দিব্য আত্মস্থতা' ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ক্ষণকালের সেই অহংলোপী সঙ্গতি 'ঈশ্বরের কাছে মর-মানুষের আপাতত মৌল ঋণশোধ'। দাম্পত্যপ্রেমে আলাদা মানুষ চূড়ান্ত মুহূর্তে হয়ে যায় অভিন্ন, এক, অবিচ্ছিন্ন—

দুটি সত্তা, ভিন্ন রাজ্য দিনের আলোয়,
সীমান্ত হারায় রাত্রে, ঘনিষ্ঠ আঁধারে
একটি শয্যার প্রান্তে দুটি অসীমের
তখন কুলান হয়...
যদিও প্রত্যেকে এক এবং স্বাধীন
মানবিক অরণ্যের নির্বিশেষে লীন,
বিশেষের দিব্যজ্ঞানে তখনই উজ্জ্বল
হয়ে ওঠে চৈতন্যের তিমির সত্তায়,
অক্ষিস্থ ধূসরে যেন শাদায়-কালোয়...
যোগাযোগ রাত্রি হয় দিন।
(রাত্রি হয় দিন/"স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত")

এই দাম্পত্যের ছবি খোঁজেন তিনি পুরাণে, প্রাচীন সাহিত্যে। অথবা মূর্তিশিল্পে। নির্জলা অভাব, উপবাসী জ্বালা, পশ্চিমা মরুর দাহ হেঁটে পার হয়ে নিজস্ব সংবাদদাতা ছোট ভাঙা জনহীন মন্দিরে দেখে যন্ত্রণাগ্রস্ত দেশে যেন সত্তার প্রতীক হিসাবে 'নগ্ন যুগলবিগ্রহ/বেশ-ভূষাহীন, শুধু কষ্টিপাথরের দেশী রাধা আর ঘনশ্যাম...।' আত্মচ্ছেদহীন সত্তার চূড়ান্ত আদর্শ হিসাবে জগতঃপিতরৌ পার্বতীপরমেশ্বরের চূড়ান্ত প্রতীক বিষ্ণু দে বারবার ব্যবহার করেন। 'অর্ধনারীশ্বরের প্রতিমা'-র চেয়ে অভেদ সত্তার বড় প্রতীক আর কি হতে পারে? 'যাকে ভেবেছিলে পরমেশ্বর, সেই দেখ পার্বতী'। প্রান্তরে আত্মসংবৃত আত্মস্থ বিরাট অশ্বত্থকে দেখেও সেই ভারতীয় যুগলের কথা মনে পড়ে,—'কঠিন সংহত স্থির সারাটা প্রান্তরে প্রাণের গঠন,/অজেয় উৎসবে কোনও উমার সন্ধানে/যেন বা এসেছে দেশে সতীর গিরিশ।' তাই আশ্চর্য হই না যখন ডাস ক্যাপিটালের শতবার্ষিকী উপলক্ষে লেখা 'একশো বছর পরে' কবিতায় তিনি 'ধূর্জটির যুগ্ম-নৃত্যে'র প্রতীক ব্যবহার করেন, কারণ বিচ্ছিন্নতার রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র তো সেই মহাগ্রন্থেই মার্কস দিয়ে গিয়েছেন। সেই নিদান মেনে নিলে সমাজ-সংসারে আসবে সঙ্গতি, যে সঙ্গতি পার্বতীপরমেশ্বরে, অর্ধনারীশ্বরে।

দাম্পত্যের মধ্যে তিনি অন্তঃসঙ্গতির চূড়ান্ত প্রতীক পান, তাই শেষ পর্যন্ত বিষ্ণু দে-র প্রতীকী তীর্থযাত্রায় প্রেমই পরম পথপরিচালক। আর সেই প্রেম কোনো বিমূর্ত ভাব নয় বিষ্ণু

দে-র কবিতায়, যদিও বিয়াত্রিচের মতো প্রেমিকার কোনো নাম এই পদাবলীতে উচ্চারিত নয়—কিন্তু তবু সে মূর্ত, বিয়াত্রিচের মতোই। বিয়াত্রিচে সম্বন্ধে দান্তে যেমন বলেছেন, If that which up till here is said of her were all compressed into one act of praise 'twould be too slight to serve this present turn, The beauty I beheld transcendeth measure, not only past our reach, but surely I believe that only he who made it enjoyeth it complete.' (পারাদিজো, সর্গ ত্রিশ, Carlyle-Wicksteed অনুবাদ), তেমনি বিষ্ণু দে-র কাছে প্রেমের মহিমা, সৌন্দর্য, বিভূতি অপরিমাণ—'তুমিই সমুদ্র জানি, আমি অন্তরীপ,/খুঁজি না তোমার শেষ কোথা, কোথা তল,/তোমার রহস্য তাই করি না জরিপ,/আমার জীবনে শুধু তরঙ্গ উচ্ছল...। (তুমিই সমুদ্র/"তুমি শুধু...")। আপন পদাবলীতেও প্রেমই নিয়ন্তাশক্তি, তাই বিষ্ণু দে স্বাভাবিকভাবেই বিয়াত্রিচেকে স্মরণ করেছেন—

আমিও সৌভাগ্যবশে তোমাকে দেখেছি বেয়াত্রিচে,
নববাসন্তীর কুঞ্জে নিজে পরিয়েছি গুঞ্জামালা
তোমার অমরকণ্ঠে, তৃতীয় স্বর্গের আলো-জ্বালা
নভোময় এ হৃদয়ে; যদিও বেঁধেছি বাসা নিচে
বিপর্যস্ত পৃথিবীর তেপান্তরে চৌরঙ্গির পিচে
ছদ্মবেশী নরকের কোলাহলে বেসুর বেতালা,...
আমও শুনেছি দিব্য বিশ্বব্যাপী প্রেমের মহিমা,
দেখেছি নিজেরই স্নায়ুতন্ত্রে শুকতারার সঙ্গীতে
তোমার ভাস্বর প্রেম আসমুদ্র সমস্ত মর্ত্যের
সর্বজীবে মিলিয়াছে...।

(বেয়াত্রিচে/"সেই অন্ধকার চাই")

এমন প্রেমের মন্ত্র, এমন প্রেমিকার নামহীন অস্তিত্ব বিষ্ণু দে-র সমস্ত পদাবলীতে গুঞ্জরিত—'দেহমন ঘিরে তোমারই তো নামাবলী'। সেই প্রেমেই নারকীয় শূন্যতা থেকে আসল উদ্ধার। ভার্জিল-রবীন্দ্রনাথ পথ দেখিয়েছেন, বিয়াত্রিচে-প্রেমই সেখান থেকে নিয়ে যেতে পারে, সেই চূড়ান্তে। 'বিরাট শূন্য বাঁধবে কে/তুমি ছাড়া বলো?' তাই যুদ্ধের নারকীয় বীভৎতার দিনেও প্রেমেই আসল আশ্রয়—'মধ্যবয়সী, তবুও তনু তোমার/আশ্বিন-আলো ছড়ায় আমার মনে।/ফেলে দিই ভয় ফেরার পীত বোমার,/জীবন ঘনায় তোমার আলিঙ্গনে।' (মধ্যবয়সী/"সন্দীপের চর")। সমস্ত বিশ্বাস আস্থা আশ্বাসের প্রতীক যে প্রেয়সী, যার অস্তিত্বের মধ্যে শূন্য থেকে উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি, তাকেই আহ্বান করে কবি বলেন—

তোমাকেই দিই এই ক্লান্তির ভার
দীর্ঘ আয়ুতে উদ্বায়ু গত, ক্ষমা
তুমি ছাড়া কেবা করবে অঙ্গীকার?
পূর্ণিমা তুমি, তোমাতে মেলাই অমা,
ঘৃণার আঁধার তোমাতেই প্রিয়তমা
সহিষ্ণু আলো জ্বালুক পূর্ণিমার।

(সহিষ্ণুতা/"সন্দীপের চর")

যে সমাজতান্ত্রিক স্বর্গ বিষ্ণু দে কল্পনা করেন তারও আভাস দেখেন শুচিশান্ত প্রেয়সীর

মধ্যে—'বন্ধন নয়, বিশ্বব্যাপ্তি তোমার টানে,/ভাবী সমাজের অজেয় ইশারা তোমার গানে।'

এই ইহকালের প্রণয়িনীর মধ্যে তিনি আবার দেখেন যুগলপ্রেমের স্রোতে ভেসে আসা চিরন্তনী পরানপ্রিয়াকে—'প্রেমেই সমগ্র তুমি/হেরে যায় কালের নিষাদ।' ইতিহাসের দীর্ঘ নীলাকাশে সেই প্রেয়সী যেন তারকার মতো জ্বলে আপন অপরাজেয় গর্বে, 'উমার হৃদয়ে জ্বলে ত্রিনেত্র যেমন'।

তোমাকে কি দেব বলো? আমার রাত্রিতে
তুমিই আকাশ ঘুম, স্বপ্ন, তুমি পাশে জেগে থাকা।
সবই তো তোমাকে ছুঁয়ে, দিনগুলি যেমন সূর্যেই,
তোমাকে যা দেব তাই, তোমারই তো দান চেয়ে রাখা,
যেমন বাজাই সব প্রত্যহের জয়গান কালের তূর্যেই।

(রাগমালা/"আলেখ্য")

দান্তে তাঁর মহাকাব্যের শেষ স্তবকে বলেছিলেন 'যেমন চাকা সুষম গতিতে ঘোরে, তেমনি তাঁর কামনা ও ইচ্ছা সেই প্রেমের দ্বারা আবর্তিত হচ্ছে, যে প্রেম সূর্য এবং নক্ষত্রনিচয়কে নিয়ন্ত্রিত করে।' প্রেমের সেই সার্বভৌম দিব্য প্রভা সন্তান্বেষী এই কবির উপলব্ধির এলাকায় অজানা নয় 'সমস্ত নিসর্গে দেখি তাঁরই প্রতিধ্বনি', সেই প্রেম চরাচরব্যাপী বলেই প্রশ্ন জাগে —'তারই জয়যাত্রার আলপনা কি দিল সূর্যোদয়,/ভাসাল সূর্যাস্ত তার কপালের সিঁদুরে, সজনী?'

যখন সংশয় এই দুলে ওঠে ছ-টার ট্রাফিকে,
তখনই পথের লাল আলো পড়ে তোমার শরীরে
অনন্ত যৌবনে স্মিত, আমার সমস্ত দিন ঘিরে
পরিত্রাণ পায় সেই মুহূর্তেই সব অপচয়।

(সনেট/"সেই অন্ধকার চাই")

সব বিসঙ্গতি, 'সব অপচয়' অর্থাৎ 'accidenti', প্রেমেই ঐক্য, স্বস্তি ও সুষমা পায়। 'আকাশে দোলে শুচি তোমার ছায়াপথের চন্দ্রহার', তাই প্রেমিকা যখন সদ্যস্নান সেরে ঘরে ফেরে প্রেমের প্রসাদে, তখন দান্তের দিব্য চরণের প্রতিধ্বনিতে মনে হয় এ যেন সেই প্রেম 'যে-প্রেমে প্রত্যেক দিন সূর্য ফেরে, ফেরে সন্ধ্যাতারা।'

তবু বিষ্ণু দে-র কবিতায় স্বর্গে উত্তরণ নেই। প্রেমের ছায়াপথ দিয়ে তিনি সেই স্বর্গের আভাস দেখেন মাত্র, আর তার রূপরেখা ভাবেন। শূন্যতা হতাশা অতিক্রম করে উদ্ধারের প্রত্যাশায় সন্তপ্ত পারাদিজোর প্রান্ত থেকে তাঁর অনামা বিয়াত্রিচে তাঁকে স্বর্গের দিকে ইঙ্গিত করে। সেই ইঙ্গিত অনুসরণ করে স্বপ্নস্বর্গের ছবি কবি এঁকেছেন কোনো কোনো কবিতায়—

আমিও তো যেতে চাই জন্মাবধি, যেখানে নির্ঝর
স্ফটিক চঞ্চল আর ষড়ঋতুই মধুর-মুখর,
যেখানে রৌদ্র ও বৃষ্টি নিয়মিত মৈত্রীর আকর,
দুহাতে সঙ্গতে বাঁধে প্রত্যেকটি জীবনের প্রতিটি বৎসর।
পেতে চাই স্তব্ধ শান্ত পৃথিবীতে শুচি মহাকাশে,
দুদিকে মরাই ভরা, সুগঠিত শহর দুপাশে,
যেখানে মানুষ মুক্ত, প্রতি ব্যক্তি সংলগ্ন প্রত্যাশে,
শতায়ু বিনাই প্রতি মানুষ অমর। (আমি তো যেতে চাই/"ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে")

'যেতে চাই', 'পেতে চাই'—যাওয়া এখনো হয় নি, স্বর্গ এখনো পাওয়া যায় নি। তাই সমর সেনের অভিযোগ 'how does he manage to look so serene even in the short run when everything is so ruffled and messy?' ("বাংলা কবিতা", ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বিশেষ বিষ্ণু দে সংখ্যা), যথার্থ নয়, এখনো কবি 'still centre'-এ পেঁছুতে পারেন নি। অভিযোগ ভুল, তবু অভিযোগ ওঠে দুই কারণে। কখনো কবি বলেন আপন প্রত্যয়ে আস্থাবান কবির 'কৃত্য দায়/শুধু আলো জেবলে যাওয়া রাজপথে শুভ্র দীপাধারে।/ সে কেন দেখবে বলো চোরাকানা গলির আঁধারে। কোথা কোন্ কোণে ল্যাম্পপোস্টে কোন্ কুকুর কি নোংরা ছড়ায়?' (সে কেন/"সেই অন্ধকার চাই")। চরাচরের নোংরাকে অগ্রাহ্য করা, জীবনে যখন অহরহ দ্বন্দ্ব তখন ধ্রুবে তাঁর অবিচল আস্থা 'প্রতীক বার্তাবহ/হাওয়ায় হাওয়ায় বেঁধে আনে প্রত্যয়', মাঠে মাঠে অসাড় হিম সত্ত্বেও তাঁর অপরিসীম স্বপ্ন—এই সবের জন্যেই আপাতত মনে হয় কবিতায় বিষ্ণু দে 'looks so serene'। কিন্তু সে দৃষ্টিবিভ্রম—রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও যেমন হয়, প্রশান্তি গোপন করে রাখে অবিরাম প্রচ্ছন্ন সংগ্রাম। বিষ্ণু দে ভোলেন না 'যদিও মর্যাদা আজ দূরের আকাশে আসন্নসম্ভবা,/এখনও জীবনে ব্যাপ্ত দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, অপমৃত্যু/অসত্যের অন্যায়ের নানা বিভীষিকা,/একদিকে অকর্মণ্য নানা খেলা, মৃত্যুময় অহমিকা।' (শত মুখ নদী খাড়ি সমুদ্র পাহাড়/"তুমি শুধু...")। দ্বিতীয়ত, বিষ্ণু দে যে যন্ত্রণার দৃশ্য 'short run'-এ দেখেন, তাকেও দেখেন দূরের পটভূমিতে। 'যখন পাণ্ডব আর কৌরবকে চেনা হয় ভার,/যখন আশঙ্কা আশা সদসতে প্রায় বিশ্বরূপ' তখন 'ছড়ায় চোখ কাল অতিক্রান্ত দূরে'। এমন দূরের প্রেক্ষাপটে দেখেন বলে মনে হয় সদ্যবেদনা হারালো তার তাৎক্ষণিকতা।

"স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত"—'স্মৃতি' যেন অতীত ইনফের্নো, 'সত্তা' যেন বর্তমানের উদ্ধার-উৎসুক পুরাগাতোরিও, আর 'ভবিষ্যত' যেন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় উজ্জ্বল পারাদিজো। কিন্তু দান্তের মতো বিষ্ণু দে-র কবিতায় সুস্পষ্ট স্তরভেদ নেই। এখানে নরক ও শুদ্ধিলোক আর স্বর্গের সম্ভাবনা একসঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। দুই জগৎ ও তৃতীয় জগতের সম্ভাবনা এই কাব্যে যুগপৎ উপস্থিত। তাই যে পর্যায়ের কাব্য থেকে আরম্ভ হয়েছে উজ্জীবনের শুদ্ধিলোকের স্তর, সেখানেও বারবার নরকের কথা আছে। (ক) 'নীরন্ধ্র অবীচি আর দুর্গন্ধ রৌরব...।' (চতুর্দশপদী/"পূর্বলেখ"); (খ) 'নরকে আমারও যাত্রা অলকার গন্ধ গায়ে/আমিও শুঁকেছি শকুনের শিবার আহার...।' ("অন্বিষ্ট"); (গ) 'দান্তে নরকে এ জীবন লোলিহান অনেক চোখের/স্বপ্ন আজকে মধ্যদিনের আগুন।' (অবিচ্ছিন্ন কাব্য/ অন্বিষ্ট"); (ঘ) 'এ কোন্ নরকে এসেছি আমরা অলকার দম্পতি!' (স্মরক্লান্তি/"আলেখ্য"); (ঙ) 'এ নরকে/মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই...।...আমরা নরকে আছি, অথচ সে জ্ঞান নেই মনে/তাই বিবাহসভায় প্রচ্ছন্ন নরকে আজ বর নেই...।' ("স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত"); (চ) 'নরকে যে আমাদের নির্জলা ভূলোক।' (নির্জলা ভূলোক/"সংবাদ মূলত কাব্য")।

যেখানে নরকের সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই সেখানেও বহু চরণে তিনি নারকীয় পরিবেশ ফুটিয়েছেন বিকল্প প্রসঙ্গের কৌশলে, অনুষঙ্গের পরোক্ষতায়। সেই সব দৃশ্য এঁকেছেন যেখানে মরা ভাগাড়ে ঘুঁটের ধোঁয়া, শ্যাওড়া আগাছা নোংরায় ভাঙা পথ, জীর্ণ মঠ বিদীর্ণ মন্দির, শূন্য ক্ষেতে খামারে ইঁদুর, চতুর্দিকে মনসায় ধুতুরায় লোলুপ আগুন আর শ্বাপদ-সংকুল বনে শৃঙ্গী ও দন্তুর প্রাণীর সমারোহ। অন্যত্র

বিরাট মৃত্যুর ডাঙা, এক ফোঁটা জল নেই প্রাণ এক ছিটে;

মা জানি কী অন্ধকারে কঙ্কালী কোটরে করে গৃধ্নুর মন্ত্রণা
স্বর্গহীন লুসিফর, বীলজেবব ম্যামনেরা; মাটির মন্ত্রণা
থেকে থেকে ফেটে পড়ে বালিতে কাঁকরে অভ্রে লাইমে গ্রানিটে;
নিরন্ন নীরস লগ্ন, শুষে খায় তিলে তিলে নিসর্গ নিষাদ;
একটু সবুজ নেই, শুধু সোনা, পোড়া, নেই কীটেরও আভাস,
শ্যাওড়াও মরে যায়, তারও কাঁটা মৃত্যুঞ্জয় প্রাণের আশ্বাস।
(শুশুনিয়া/"অন্বিষ্ট")

কারাগারের মতো এলসিনোরে, ঘুণলাগা দানেমার্কের রাজাসন, যেখানে হাওয়ার কলুষ—সেও তো নরকেরই বিকল্প। সত্তার সন্ধানী খোঁজেন অবিকল আত্মস্থ মানস, কিন্তু চতুর্দিকে দেখেন এখনো 'পাপের মিলনে ভয়ংকর মত্ত অন্ধকার চলে জাঠা/অন্ধ নেকড়ের পাল', ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা টাইরেসিয়সের অন্ধ অন্তর্দৃষ্টি ধার নিয়ে তিনি দেখেন—

তুমি তো দেখনি দেশ অনাহার কাকে বলে
দেখনি তো সারাদিন ঘুরে ঘুরে
লঙরখানার পাশে সন্ধ্যায় নৈরাশে
নিজের শিশুর মুখ
অনাগত আহারে উন্মুখ
দেখনি সঙ্গিনী স্ত্রীর বিবস্ত্র ব্যর্থতা
অসহায় রোগের লড়াই...
আমার দুচোখ অন্ধ, আমি শুধু অন্ধকারে দেখি
অতীতের কাদা আর ভবিষ্যৎ রাবিশে কাদায়
বোজানো ডোবার জল
তোমাদের প্রাণের পল্বলে মানুষ বাঁধে না বাসা
স্রোতের বিস্তার নেই
মাছও নেই, কাদা, ধুলো, মরা ব্যাঙ
রৌদ্রে শুকোয়...।
(টাইরেসিয়স/"নাম রেখেছি...")

পোড়ো জমি, সুদে সুদে খেত দেউলে, হাল লাঙল ভঙ্গুর, সার নেই বীজধান নেই; কোনো বছরে অতিবৃষ্টি, কোনো বছরে অনাবৃষ্টি—মানুষ মৌন অসহায়, আকাশ বিবর্ণ। ওদিকে 'অস্থিসার কলকাতার শোথাতুর মরুভূমি'। চতুর্দিকে মতিচ্ছন্ন গৃধ্নুদের ধূর্ততা, স্বার্থান্ধের ক্ষমতার লোভ। এই বিচিত্রদেশে 'ভূতপত্নীর বালি, উড়ু-উড়ু ধূলিসার,/শুষ্ক, দগ্ধ, ছায়াশূন্য, ছিন্নমূল,/কোনোটি বা স্কন্ধকাটা, নিষ্পল্লব, যত খাল/কানা নদী পচা হাজা কত শব,/আর নদী নদীর কঙ্কাল;/ ক্যাকাসে হাওয়ার/অস্থিসার/এ মেঘমাপ্রিত সান্দ্র, অরণ্যক সমুদ্রও হেরে যায়...। (এ বড় বিচিত্র দেশ/ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে)। দেশের বাইরে বিশ্বে তাকালে দেখেন 'অনেক হিরোশিমায় যেন অনেক হাইফঙে/বাঁশুর শ্বেত নদীও কেন রাঙা? (পিতার মতো মাতার মতো/ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে)। থেকেছেন বুর্জোয়া বহু দেশে গ্রামে শহরে বস্তিতে, দেখেছেন বুর্জোয়া-বিকাশের মর্মান্তিক পরিণাম—'লালদীঘির লাল অন্ধকার'। অন্য কবিতায় (জন্মাষ্টমী ১৩৫৪/"আলেখ্য") বলেছেন 'লালদীঘি তো চিরকাল এ শহরে অভ্রে তোরণ' এবং সেই তোরণে লিখে দিয়েছেন দান্তের ইনফের্নোর

তোরণের লিখন অনুবাদ করে 'এখানে যে আসো এসো সর্বআশাহীন'। নরক-পরিবেষ্টিত কবির মনে বারবার প্রশ্ন জেগেছে, জ্ঞানে আর কাজে, স্বপ্নে-বাস্তবে, তত্ত্বে-তথ্যে অন্তহীন মল্লযুদ্ধ চিরটাকাল কি চলতে থাকবে, সভ্যতার অর্থ কি গৃহাহিত হৃদয়কে নিজেই হানায়, মনীষার তাৎপর্য কি শ্বাসরুদ্ধ মনের মরণ? বাংলার জীবনে যখন মরুভূমি ধেয়ে আসে, নিঃস্ব আর পাণ্ডুর আম-জাম-কাঁঠালের বন, যখন 'সত্তা হয়ে ওঠে স্বার্থ সিমুমের বালুকাবীজনে', তখন সংশয়াপন্ন কবির এক-একবার 'মনে হয় কী নির্বোধ! বৃথা গেছি আজীবন বকে!' তাই সমর সেনের অনুযোগ কী করে মানি, যে গলিত সীসার মতো তপ্ত অশ্রু অথবা অলাতচক্রে আবদ্ধ মানুষের যন্ত্রণার কথা অবহেলা করে বিষ্ণু দে প্রশান্তিতে আত্মস্থ!

পুরগাতোরিওতে উত্তরণের মুহূর্তে, ১৯৩৬ সালে যে কবিতা লিখেছিলেন বিষ্ণু দে—"জন্মাষ্টমী"—সেই অসামান্য কবিতায় একাকার হয়ে মিশে গেছে, সঙ্গতি ও সত্তার অন্বেষণে কবির শুদ্ধিলোকে যাত্রা, আর সেই প্রতীকী যাত্রার পথের দুধারে ইনফের্নোর পরিবেশ—শূন্যতা বিসঙ্গতি বিষাদ আর কান্না। দুই বিপরীত তরঙ্গ—একদিকে নির্বোধের মদগর্ব, স্বার্থপর লজ্জাহীনতা, অন্যদিকে 'আনন্দ, আনন্দ বুঝি! আনন্দনিষ্যন্দন আকাশ'; একদিকে সিনেমার অন্ধকারে 'ক্লোস্ অপ্ আলিঙ্গনে/মদালস গভীর চুম্বনে/বিদ্যাসুন্দরের যত নব্য হৈচৈ', অন্যদিকে রথচক্রে খণ্ডিত আবেগে সঞ্জীবনী প্রতিষেধ। চা তাস গ্লাস খিস্তি অট্টহাসি, লিলির টোনিকের জুড়ি খসরু বেগ, গণ্ডোরিরাম 'নিমকহালাল তুখোর দালাল', তার বিপরীতে 'আনন্দের যে ভৈরবী মীড়ে মীড়ে/সুষুম্নার শিরে শিরে' সেই সাযুজ্যসঙ্গীত। তখনই বুঝেছিলেন শেষ পর্যন্ত জিতবে দ্বিতীয় তরঙ্গ, প্লাবিত করে দেবে সর্ব চরাচর, 'সামান্য ঝিল্লিও মৌন, ক্রন্দনশর্বরী/শেষ হল, সেও বুঝি জানে।' পঁচিশ বছর পরে 'অয়রিভিকে' কবিতায় বলেছেন আবার, (ক) 'নরকের পথে গান করে চলি মৃত্যুঞ্জয় মাত্রায়', (খ) 'নরকে তোমার প্রেমের কলিতে মরণও যুক্তপাণি।' শেষ পর্যন্ত আলোয়-আলোয় স্নাত পারাদিজোয় উত্তরণ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু যে নারকীয় পথ বেয়ে সেই উত্তরণ তার যন্ত্রণা এখনো বিষ্ণু দে-র কাছে উপেক্ষিত নয়। সত্তা, সঙ্গতি অর্জিত হবেই এই বিশ্বাসে ধ্রুবতা সত্ত্বেও বিসঙ্গতি ও অবক্ষয়ের পারিপার্শ্বিক এখনো তিনি আঁকেন। এই চৈতন্য আছে বলেই তাঁর লক্ষ্য কোনো ঋষিকল্প সমাহিত প্রশান্তি নয়, তিনি চান 'চির-অস্থির উদাত্ত এক শান্তি/যেমন জেনেছে চণ্ডীদাস বা দান্তে', অথবা যেমন জেনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যাঁর হাত ধরে আত্মবিচ্ছেদের নরক থেকে সত্তার পুরগাতোরিওতে তাঁর যাত্রা। জীবনচর্চা ও কাব্যচর্চা দিয়ে তিনি বুঝেছেন বিচ্ছিন্নতায় নয়, মূলহীনতায় নয়, সত্তাকে পেতে হয় নিজের আবহমণ্ডলে, স্বদেশের মৃত্তিকায়, দেশজ জীবনে, মাতৃভাষায়। তাই, 'জল দাও আমার শিকড়ে'। বিয়াত্রিচে দান্তেকে বলেছিল, সত্যের মূলে যেতে হবে; বিষ্ণু দে উপলব্ধি করেছেন সত্তার শিকড়ে যেতে হবে। সেই শিকড়ে ফেরার পথ নির্দেশ করেছেন—নিজেকেও নির্দেশ করেছেন, অন্যকেও—বিনীত শান্ত পদাবলীতে—

> জেনো, হয়ে গেছে বহু দেরি।
> ফেরার সময় বহুকাল
> কেটে গেছে, সদাগরী ফেরি
> ঘুরে গেছে, এখন শৃগাল
> ভাবে তারা নেকড়ের পাল।
> জেনো হল ফেরার সময়,

মাটিতে ফেরার এল কাল—
শিকড়ে শিকড়ে বেঁধে যাওয়া,
মজ্জায় মাটিতে তাল তাল
নিজের সত্তাকে প্রাণদান।...
মেনে নাও উদ্বাস্তু স্বদেশ,
বুভুক্ষু, বিবিক্ত, অক্ষয়
অমর সে কোটি মুখে কান
দাও, শোনো, বলো : ভালোবাসি।...
তবে কোনো দিন শুভক্ষণে—
অবশ্য করেছো বহু দেরি,
বিশ্বকে মেলাতে পারো ঘরে
নবান্নের মতো আড়ম্বরে।

(স্বহস্তে বাজাবে/"স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত")

—বিনীত শান্ত পদাবলী, কিন্তু তারো মধ্যে অসহ যন্ত্রণা আছে, ত্বরার তাড়না আছে॥

স্মৃতি, শৈশব, কবিতা

অশোক মিত্র

ঠিক এই লগ্নে উত্তীর্ণ হয়ে, পূর্বাচলের দিকে ফিরে-তাকানো ছাড়া হয়তো উপায় নেই : বার্ধক্যের উপান্তে পৌঁছে একটু গুছিয়ে-দেখা, কী ছিলাম, কী হলাম, কেমন ক'রে হলাম, স্মৃতির উপর নির্ভর ক'রে যতদূর দেখা যায়, চেনা যায়, মেলানো যায়। এই স্মৃতি যে-কোনো-দিন শ্লথ হয়ে যেতে পারে, হাতে সময় বড়ো কম। নিজেকে আরেক বার চিনে নেওয়ার জন্যই যেন এই ফিরে-তাকানোর তাগিদ : বোধ, বুদ্ধি, চেতনা, সত্তা, এরা কীসের সম্ভারে পরিপূর্ণ হলো, কোন্ সংশ্লেষণের আবেগে-আঘাতে-স্পন্দে প্রবাহিণী হলো, কোন্ ক্রান্তিমুহূর্তে ফের নতুন-কোন্ সংশ্লেষণ মায়াতে জড়ালো, কী ক'রে রূপান্তরিত-দোলায়িত-গ্রহচ্যুত-প্রত্যাবৃত্ত হ'তে-হ'তে উপান্তে পৌঁছলো। এই ব্যাপ্ত কাহিনীতে আনন্দ আছে, বিষাদ আছে, শিহরণ আছে, আবিষ্কারের-অবমোচনের-আরোহণের বিস্ময় আছে, নিরসিত প্রজ্ঞার শান্ততা আছে। সুস্বচ্ছ হয়ে নিজের মুখোমুখি দাঁড়ানো, নিজেকে, কে জানে, হয়তো শেষবারের মতোই, চেনা, অন্তত চেনার চেষ্টা।

বুদ্ধদেব বসু নিজের ছেলেবেলার কথা নির্ভার ঋজুতার সঙ্গে বলেছেন, বাচনভঙ্গিতে কোনো দোমড়ানো-তোবড়ানো ভাব নেই। তাঁর ভাষা সর্বমুহূর্তেই উজ্জ্বল, কিন্তু এখানে, স্বভাবঋজুতার সঙ্গে এক শুদ্ধশীল প্রশান্তি জড়ো হয়েছে। ছেলেবেলার কাহিনী অপাপ-বিদ্ধতার কাহিনী, নিষ্কলঙ্ক পৃথিবীর কাহিনী, ভাষণে তাই এক সমান্তরাল সারল্যের বড়ো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এখানে সেই সরলতা বিশেষ ক'রেই আছে, সমস্তক্ষণ জুড়েই আছে। যে-কারো ছেলেবেলা অন্য যে-কারো ছেলেবেলা থেকে আলাদা হ'তে বাধ্য। বুদ্ধদেব বসুর যে-পরিচয় আমাদের কাছে, তাঁর শৈশবস্মৃতি তার পূর্বস্বাক্ষর। এই গ্রন্থে সে-পর্বের সঙ্গে মিলিত হ'তে গিয়ে আমরা আদৌ হোঁচট খাই না : যেন আমরা ধ'রেই নিয়েছিলাম বুদ্ধদেবের শৈশব এমন নিষ্পাপ-শিশিরসিক্ত না হয়ে যায় না। তাঁর অন্য-সমস্ত পরিচয় ছাপিয়ে বুদ্ধদেবের কবিসত্তা। গেলো পঞ্চাশ বছর ধ'রে তিনি অজস্র ধারায় নিজের প্রতিভাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, কখনো-কখনো অপব্যয়িত উৎসাহেও দিয়েছেন। কিন্তু যখন তাঁর কোনো ছোটো গল্প বা উপন্যাসপ্রতিম কোনো বিস্তৃত রচনা পড়েছি, উপলক্ষ ছেড়ে অচিরে আমরা আসল লক্ষে পৌঁছে গেছি : গল্পের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণতা বা উপন্যাসের এলায়িত সমস্যা শিকেয় তুলে রেখে আমরা ভাষার গহনে ডুবে গেছি, সে-ভাষা যে-কবিতাকে জড়িয়ে আছে, উপস্থিত পরিপার্শ্ব ভুলে তা লেহন করেছি। বুদ্ধদেব সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন, 'ব্যক্তিগত' প্রবন্ধ লিখেছেন, এমনকি যার সাধারণতম সূত্র পর্যন্ত তিনি কোনোদিন আয়ত্ত করতে পারেননি, সেই রাজ-নীতি-সমাজনীতি নিয়ে আপাতসারগর্ভ প্রবন্ধ ফেঁদেছেন, আমরা তিতিবিরক্ত হয়ে, ঝুট-ঝামেলা পাশে সরিয়ে ফেলে, সেই স্তূপের মধ্যে কবিতা হাতড়ে বেড়িয়েছি। ভাষাসৌকর্যই কবিতা, ভাষাকে ভালোবাসাই কবিতা : বুদ্ধদেব বহু বছর ধ'রে বার-বার ক'রে আমাদের শিখিয়েছেন, শুনিয়েছেন। তাঁর নিজেরই অন্যাচারী সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও, সেই ভাষাকে তিনি কোনোদিন চিন্তার বোঝা চাপিয়ে বিব্রত করতে পারেননি। ভাষাবিন্যাসের অন্তস্থিত কবিতা, অপরাজিতা নায়িকার মতো, ব্যূহ ঠেলে প্রতিবার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, ঝিকিমিকি রোদ্দুরে

আমাদের শারদাকাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। অতি সম্প্রতি 'মহাভারতের কথা'র অত্যাশ্চর্য অলিন্দে, বুদ্ধদেবের কবিতায় এক পারমিতাপুষ্ট দর্শনের প্রবেশ ঘটেছে। কিন্তু তা যদি না-ও ঘটতো, কবিতা তা থেকেই যেত। তিনি স্বীকার করুন না-করুন, মানুন না-মানুন, এই প্রবাদকণায় অসুখী হোন না-হোন, বুদ্ধদেব তাঁর সমস্ত সাহিত্যজীবন জুড়ে যা-ই লিখেছেন, কবিতাই লিখেছেন শুধু।

এই কবিতার উন্মোচনে তাঁর ছেলেবেলার দায়ভাগ মেনে নিতেই হয়। যিনি যতই তত্ত্ব আওড়ান, মেজে-ঘ'ষে আগু-পিছু চিন্তাভাবনা ক'রে কেউ কবি হন না, সে-প্রক্রিয়া হবার নয়। যান্ত্রিকতার অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গিয়ে বড়ো জোর কিছু-কিছু ঠমকে দক্ষ হওয়া যায়, কবিত্বে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। যে পারে সে আপনি পারে পারে সে ফুল ফোটাতে; ঠিক তেমনি, কবিতাও সংগোপন অভিসারের ব্যাপার, স্বতোৎসারিত চরণলীলায় তার আগমন-নির্গমন। এবং শৈশবের দৈবসূত্রে কবিতার সূচনা।

"আমার ছেলেবেলা"* তাই প্রধানত বুদ্ধদেব কী ক'রে কবিতায় উপনীত হলেন, তার কাহিনী, তাঁর কবি হবার কাহিনী। কল্পনা কী ক'রে প্রশাখা পায়, আবেগ কী ক'রে সংহত হয়, কথারা কী ক'রে গান হয়ে ওঠে, তা উপলব্ধি করতে হ'লে শৈশবের ইতিহাসে ফিরে যেতে হয়। জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে, কবিচেতনাও লালিত হয় শৈশবের পরিবেশের প্রদোষে। কার্যকারণ সম্পর্ক দেখিয়ে, মুখোমুখি সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল ক'রে এই পরম্পরা আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। যা ঘটে তা অনেক প্রণালীর রহস্যের মধ্য দিয়ে গিয়েই ঘটে; একটু-একটু ক'রে চেতনায় রঙ্ লাগে-ছোঁওয়া লাগে-দোলা লাগে, তীক্ষ্ণতা আসে, স্পষ্টতা আসে; একটু-একটু ক'রে চেতনা ধৃতি পায়, নিজের কাছেই প্রকটিত হয়। ঘুরে-ফিরে, নানা সঞ্চারে চেতনার শরীরে প্রকৃতির-পরিপার্শ্বের প্রভাব এসে পড়ে। ঘন অরণ্যাণী-ঘেরা এই প্রকরণ, আঁকাবাঁকা ঋজু-তির্যক স্নিগ্ধ-অম্ল অনেকগুলি বিভাগের পাশাপাশি ঠাসবুনুনি উপস্থিতি। নোয়াখালি-ঢাকা-বিক্রমপুর-বরিশালের নদী-খাল-বিল-জড়ানো শৈশব, পূর্ববঙ্গের আধো-শহর আধো-গ্রাম মন্থর মফস্বলমণ্ডিত শৈশব, অর্ধশতাব্দী আগেকার হিন্দু মধ্যবিত্ততা-প্রকট পরিবেশের শৈশব, স্বদেশী-খদ্দর-অসহযোগ আন্দোলন, তখনও মহামহিম সর্বপ্রতাপ-শালী ইংরেজ সরকার বাহাদুরের গমগম পৌরুষ, স্তিমিত উপনিবেশের স্তিমিততর এক নগণ্য ভূভাগে দাদু-দিদিমার পক্ষপুটে বেড়ে-ওঠা মাতৃহীন শৈশব। রামায়ণ, মহাভারত, ব্রত-কথা-ধর্মপালন, বর্ষীয়সী আত্মীয়াদের ঈর্ষা-স্নেহ-সংস্কার-বিকার, রান্না-খাওয়া-খেলা-ঘুরে বেড়ানো, সবশেষে, সব জুড়ে রবীন্দ্রনাথ, হয়তো শুধুই 'চয়নিকা', নয়তো 'শিশু'। সেই সঙ্গে একটু-আধটু বিদেশী কবিতা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, তা-ও ইংরেজি মারফত। আপাতবিচারে এই শতাব্দীর প্রথম চতুর্ভাগে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু পরিবারে বড়ো-হয়ে-ওঠা যে-কোনো ঈষৎরুগ্ন বালকের কাহিনী থেকে এ-কাহিনীর ভীষণরকম আলাদা হবার কারণ নেই। তাহ'লেও কিছু-কিছু স্বতন্ত্র আকস্মিকতা একজনের ছেলেবেলাকে অন্যান্যদের ছেলেবেলা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে। প্রথম স্তরের আকস্মিকতার গহনে দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্য-এক আকস্মিকতা কাজ ক'রে-ক'রে চলে। সেই অর্থে, আগে যা বলেছি, যে-কারো শৈশব অন্য যে-কারো শৈশব থেকে তফাত হ'তে বাধ্য। কতগুলি বিশেষ ঘটনার সংঘাতে চেতনা এক বিশেষ আদল পায়, আবেগ বিশেষ-এক মেরুতে গিয়ে স্থিত হয়। ঘটনাগুলি যদি অন্যরকম হতো, বুদ্ধদেব বসু আমাদের চেনা বুদ্ধদেব বসু তা-হ'লে হয়তো আর হতেন না, কবিকাহিনী পর্যবসিত হতো হয়তো করণিককাহিনীতে, নয়তো জনৈক শ্রেষ্ঠীর ইতিকথায়, নয়তো কোনো

শাদামাটা রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীর রোজনামচায়। সুতরাং 'আমার ছেলেবেলা', তার নিহিত কবিতার বাইরেও, পাঠকদের জন্য এক আলাদা উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত : বুদ্ধদেব বসু বলছেন তিনি কী ক'রে কবিতায় পৌঁছুলেন—প্রথম স্নেহের স্মৃতি, প্রথম-শোনা ছড়ার স্মৃতি, প্রথম দুঃখের-শোকের স্মৃতি, প্রকৃতির ভীষণত্বের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি, প্রথম চোখের সামনে বিকশিত-হ'তে-দেখা প্রেমকাহিনীর স্মৃতি, শৈশববন্ধুদের স্মৃতি, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্মৃতি, হারিয়ে-যাওয়া বহুবার-পড়া ছেলেবেলার বইয়ের স্মৃতি, যে-ঘটনাগুলি পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে গিয়ে তাঁর কল্পনাকে সুগঠিত করলো, তাঁকে পৌঁছে দিল কবিতার দ্বার-প্রান্তে, পৌঁছে দিল ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের উঁচু ক্লাসের পরিমণ্ডলে, পুরানা পল্টনের টিনের ছাদওলা-নির্জন প্রান্তবর্তী সেই অপরিসর বাড়িতে, যে-বাড়িতে তিনি কবিতার উথাল-পাথাল সম্মোহনে পুরোপুরি ডুবে গেলেন, পুঞ্জ-পুঞ্জ ক'রে লালন-করা এই সব-কিছুর সম্মিলিত স্মৃতি। সেই সঙ্গে, হঠাৎ, যে-মৃতা মা'কে কোনোদিন তিনি চোখে দেখেন নি, সেই মায়ের হারিয়ে-যাওয়া কিশোরী-কালে-তোলা এক প্রতিকৃতির ধূসর-হয়ে-আসা স্মৃতি।

পড়তে-পড়তে, তার মানে শুনতে-শুনতে, আমরাও আর্দ্র হয়ে আসি, বিশেষ-এক বিলুপ্ত পৃথিবীর আমেজ আমাদেরও ছেঁকে ধরে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে গিয়ে আমরা পৌঁছুই পূর্ববঙ্গের মফস্বলে, হিন্দু মধ্যবিত্তদের তখনও উত্থানের ঋতু, আশাতে সমাহিত হবার ঋতু। অথচ বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিচারণে বাইরের পৃথিবী গৌণ হয়েই আছে, সেই পৃথিবীকে স্বতঃসিদ্ধ ধ'রে নিয়ে, তার প্রসঙ্গ থেকে স'রে গিয়েই যেন তাঁর শৈশব প্রস্ফুটিত হয়েছে। তাঁর দাদামশাই-দিদিমাকে আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই, তাঁর সঙ্গে চ'লে যাই চট্টগ্রামের মেঘলা পাহাড়ে, ভেবে-ভেবে ফুটিয়ে তুলতে পারি তাঁর প্রৌঢ়া-বৃদ্ধা আত্মীয়াদের অবিকল দিনযাপন। আরেকবার তাঁর সঙ্গে আমরা ছায়া-ছায়া নোয়াখালি পরিভ্রমণ ক'রে আসি, "সাড়া" উপন্যাসের এই এতগুলি বছর পর, ফের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উঁচু-হয়ে তেড়ে-আসা 'শর' দেখে চকিত হই। মুন্সীগঞ্জের সাহিত্য সম্মেলনে তরুণ কবিযশঃপ্রার্থীর হাবুডুবু-খাওয়া ছবিটি মনে গেঁথে থাকে, যেমন গেঁথে থাকে ঢাকার উর্দু পাড়ার চক-মেলানো বাড়িতে জোড়া বিয়ের স্মৃতি, অথবা চিত্তরঞ্জন দাশের পরিবারের মহিলাদের সঙ্গে বুদ্ধদেবের এক অপরাহ্ণের আবৃত্তি-অধ্যয়নবিহারের কাহিনী।

এ-সমস্তই আমাদের ফাউ পাওনা, এই ছাড়া-ছাড়া স্মৃতিচিত্রগুলি। বুদ্ধদেব বসু কী ক'রে কবিত্বে উত্তীর্ণ হলেন তার পাশাপাশি আমরা পরাধীন দেশের মফস্বলমদির নিস্তরঙ্গতার একটি প্রতিবিম্বও মনে-মনে পেয়ে যাই : সীমিত পৃথিবীর টুকরো-টুকরো ছবি, যা কিন্তু আমাদের এক দমকে পঞ্চাশ-ষাট বছর পিছনে হটিয়ে নিয়ে যায়। প্রভুচরণ গুহঠাকুরতার ব্যক্তিত্ব নিয়ে যে-ভাস্কর্য, তা সেই যুগের বাঙালি বুদ্ধিজীবিতার এক অখণ্ড পরিমণ্ডলকে পেড়ে নামায়। ছানা-সত্যেন্দ্রর প্রণয়কাহিনী মধ্যবিত্ত, মফস্বল-ছাওয়া, এক নিটোল ঘরোয়া প্রেমকে আদর ক'রে কাছে নিয়ে আসে (এই কাহিনীর ইতিবৃত্ত, আমার কাছে অন্তত, অজিত দত্ত-র 'কুসুমের মাস'-এর সেই বিখ্যাত সনেট, 'গুরুজনদের মাঝে কথা কহিলার অছিলায়...', যে-পৃথিবীর স্মারক, তার পরিপূরক)। বুদ্ধদেবের প্রথম কবিতা মক্সো করার ইতিহাস, 'সন্দেশ' পত্রিকা সম্ভোগের ইতিহাস, আরো-অনেক সমকালীন ইতিহাসকে স্মৃতিতে জড়ো ক'রে আনে; আমাদের নিজেদের স্মৃতি-পিতাপিতৃব্যের স্মৃতি-আমাদের নিজেদের দিদিমা-দাদামশাইদের স্মৃতি একাকার হয়ে যায়।

তাহ'লেও, আমার প্রারম্ভিক উক্তিতে ফিরছি, স্বীকার ক'রে নেওয়া ভালো, বুদ্ধদেবের এই শৈশবকথা নেহাতই একান্তকাহিনী। জনৈকের ছেলেবেলার কথা, জনৈকের কবি হবার কথা, সেই-জনৈকের তখনকার পৃথিবী মাঝে-মাঝে কথাপ্রসঙ্গে এসে গিয়েছে এখানে, কিন্তু তা-ও জনৈকের ঐকান্তিক পৃথিবীই। বাইরের বাস্তব-রূঢ় পৃথিবীর আদৌ স্পর্শ নেই 'আমার ছেলেবেলা'য়, অসহযোগ আন্দোলনের ঈষৎ উল্লেখ সত্ত্বেও, রাজনৈতিক ঘনঘটার-সামাজিক উপপ্লবের কোনো ছায়া নেই এখানে, হিন্দু মধ্যবিত্তদের প্রজাপীড়নের প্রসঙ্গের উল্লেখ নেই, কুমিল্লা-নোয়াখালির সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় সে-সব আপাতস্বপ্নলীন বছরগুলি ধ'রে কী ভাবছিল-কী করছিল তার কোনো স্বাক্ষর নেই। বুদ্ধদেবের কবিচেতনার সংগঠনে সমাজ-প্রণালী-অর্থব্যবস্থা প্রক্ষিপ্ত, 'আমার ছেলেবেলা' প'ড়ে এমন মনে না হয়ে পারে না। অথচ তা আদৌ সম্ভব নয়, দিদিমা-দাদামশাই বাইরের কলুষ থেকে তাঁকে সরিয়ে রেখেও থাকেন যদি পুরো শৈশবসময় জুড়ে, তাহ'লেও সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। বরঞ্চ 'আমার ছেলেবেলা'র যা লাভের দিক, লোভের দিক, ছায়া-ছায়া, টুকরো-টুকরো, ইতস্তত-ছড়ানো নানা স্মৃতিচিত্র, তাতেই আমাদের মুগ্ধতার ঘোর। এবং সেজন্যই আরো বিশেষ ক'রে, একটা আর্জি জানাতেই হয়। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেব "বন্দীর বন্দনা"-"কঙ্কাবতী"-র প্রান্তরপ্রান্তে কী ক'রে পৌঁছুলেন, "সাড়া"-"রেখা-চিত্র", "এরা আর ওরা"-র অলিন্দে কী ক'রে নিজেকে আবিষ্কার করলেন, "প্রগতির"-র পর্বের কী ক'রে প্রথম আভাস পেলেন, তার কাহিনী। কিন্তু তারপর? আমাদের আগ্রহ চরমে পৌঁছেছে, পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য আমরা উৎকণ্ঠ-প্রতীক্ষমান, যে-অধ্যায়ে, ধ'রেই নেওয়া যায়, থাকবেন অজিত দত্ত-পরিমল রায়-অমলেন্দু বসু-সুধীশ ঘটক, থাকবেন নজরুল ইসলাম ও কুমারী রানু সোম, থাকবে পুরানা পল্টনের প্লাবিত প্রান্তরে, 'একটি মেয়ের জন্যে'-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-জগন্নাথ হলের ঝলমল রোমাঞ্চ, থাকবে কলকাতা মহানগরীর প্রথম আহ্বানের ইতিবৃত্ত, 'রজনী হলো উতলা' "কল্লোল-এর মোহিনী মায়া। বুদ্ধদেব, ধ'রেই নিচ্ছি, আমাদের হতাশ করবেন না।

* আমার ছেলেবেলা—বুদ্ধদেব বসু। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

স মা লো চ না

শুদ্ধতম কবি—আবদুল মান্নান সৈয়দ। নলেজ হোম। ঢাকা ৫। মূল্য সাত টাকা।

জীবনানন্দ দাশকে একদা 'নির্জনতম কবি' সংজ্ঞায় চিহ্নিত করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু; এ-অভিহিতিতে বহু সমালোচকই সেকালে ঐক্যমত ছিলেন না, যদিচ অন্য কোন সংজ্ঞাদানও ছিল তাঁদের সাধ্যাতীত। জীবনানন্দের নিজেরও সংশয় কিছু কম ছিল না, কিন্তু তিনি অন্ততঃ এ-সত্য বিষয়ে সন্দেহমুক্ত ছিলেন যে কোন বিশেষ সংজ্ঞায় তাঁর মতো কোন কবি-চরিত্রের চিহ্নিতকরণ প্রায় অসম্ভব। নিজের "শ্রেষ্ঠ কবিতা" সংকলনের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টতই বলেন, "আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে; কেউ বলেছেন, এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস বা সমাজ-চেতনার, অন্যমতে নিশ্চেতনার; কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুর-রিয়ালিস্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য—কোন কোন কবিতা বা কাব্যের কোন কোন অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।" অন্নদাশঙ্কর রায়-ব্যবহৃত 'শুদ্ধতম কবি' শব্দযুগল, যা বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থের লেখকের মনঃপূত, এবং প্রয়োগযোগ্য, কিছু ব্যাপ্তি সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত আংশিক সত্যেরই পরিচায়ক। কারণ উক্তপ্রকার অভিহিতিকরণে আমরা মুখ্যত মর্যাদা দিই কবির একটি বিশেষ বিশ্বাসকে, যা সর্বাংশে তাঁর জীবন ও কাব্যের মৌলিক সত্য; জীবনানন্দের ক্ষেত্রে এবম্প্রকার কেন্দ্রীয় সত্য খুঁজে পাওয়া দুরূহ। তুলনামূলকভাবে উল্লেখ্য তাঁর কালের অন্য দুই কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে-র নাম; প্রথমজন প্রবল নাস্তিক্য সত্ত্বেও মালার্মে-ভালেরিকে দিশারীজ্ঞানে মর্যাদা দিয়েছেন আর অন্যজন বিশ্বাস রেখেছেন সাম্যবাদী সমাজাদর্শে। কিন্তু জীবনানন্দের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত কোন বিশ্বাসের উচ্চারণ কার্যত অসম্ভবই প্রতিপন্ন হয়েছে; পক্ষান্তরে তাঁর পদযাত্রা চিহ্নিত হয়েছে এক সংশয় থেকে অন্য সংশয়ে। এবং প্রায় যুগের সমস্ত কুললক্ষণকে ধারণ করেই। তাঁর এই বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ ব্যাপ্ত করে যে-দ্বন্দ্বের প্রবাহ, তা সর্বাংশে ইয়েট্‌স-এর দ্বন্দ্বের সঙ্গে অবশ্যই তুলনীয় নয়, তত্রাচ কিছু অত্যুক্তি বিবেচনা না করেও বলা চলে, জীবনানন্দের কাব্য, a record of the struggles, creative and stimulating in themselves, of a scrupulously honest human mind engaged in an heroic endeavour to know reality, and of those other struggles suffered by a representative modern man who would establish 'Unity of Being' within himself in despite of the world. (*Emergence From chaos*—Stuart Holroyd)। স্বভাবতই এবম্প্রকার কবিচরিত্রের সংজ্ঞানির্ধারণের সমস্যা শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়।

জীবনানন্দের আত্ম-আবিষ্কারের সমগ্র প্রক্রিয়ার সূত্রানুসন্ধানে উক্ত বিষয় কিছুমাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ নয়; অন্যথায় তাঁর অন্তর্লোকের চিত্রায়ন অসম্পূর্ণই থেকে যায়। অবশ্য বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের দ্বন্দ্ব যে কোন কবির কাব্যালোচনার প্রাথমিক সূত্ররূপেই বিবেচিত এবং সাম্প্রতিক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যানেও এ-তত্ত্ব সপ্রমাণিত যে উক্ত দ্বন্দ্বের প্রতি অবহেলায় ব্যক্তিত্বের

জন্মের তাৎপর্য অনুধাবন প্রায় অসম্ভব। বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থের লেখক প্রথমাবধি উক্ত চিন্তায় ভাবিত এবং তাঁর বিবেচনায় 'অন্তর্বর্তি-বহির্বর্তির' সমস্যা সূচনাতেই মুখ্যরূপে উল্লেখিত। গুরুত্ব বিবেচনায়, কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও, আবদুল মান্নান সাহেবের বক্তব্যের উদ্ধৃতি এখানে অনিবার্য : 'অন্তর্বৃতিমুখো হয়েও জীবনানন্দের আধখানা বহির্বৃত। সেই মুখ্যের অনুসরণ করতে গিয়ে জীবনানন্দে লক্ষিতব্য ইএটস-কথিত 'প্রাতিস্বক উচ্চারণে'র প্রতি পাখা-বিস্তার। প্রথম প্রাতিস্বিকতায় জীবনানন্দের কবি বেরিয়ে আসেন কয়েকটি মুক্তিলিরিকে, "ধূসর পাণ্ডুলিপি" বস্তুত হৃদয়োত্থ ধূসর কিন্তু প্রাণগতিবান কবিতাগ্রন্থই ("ঝরাপালখ" নয়; কারণ : তা পূর্বজ কবিতাবলিরই অনুবর্তন, যদিচ সেই অনুবর্তিত ক্রমজমির ভিতরে কোথাও কোথাও যেন আলের সীমা ভেঙে ফসল ফলে উঠেছে)। অনন্তর সব কবির আকাঙ্ক্ষার মতোই জীবনানন্দ চাইলেন ভিতরপ্রসার,—যার চাপে "ধূসর পাণ্ডুলিপি" কাব্যের 'নির্জন স্বাক্ষর' বা 'বোধ' কবিতার আমি 'মৃত্যুর আগে' বা 'ক্যাম্পে' কবিতার বহুবাচনিক আমরা-য় স্ফারিত হয়ে গেলো।' এই 'আমি' থেকে 'আমরা'-য় রূপান্তরের সমগ্র প্রক্রিয়া জীবনানন্দের ব্যক্তি-চৈতন্যের জন্ম ও বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গেই সংযুক্ত। মনস্তত্ত্ববিদের ভাষ্যে সৃজনশীল ব্যক্তি-মাত্রেই পরস্পরবিরোধীপ্রবণতার সার্থক সামঞ্জস্য। একদিকে যেমন তিনি ব্যক্তিগতজীবনে মানব-জীবনের শরিক, অন্যদিকে তিনি নৈর্ব্যাক্তিক, সৃজনশীল প্রক্রিয়া। জৈবজীবনের শরিক হিসাবে মন, মানসিক গতি, ইচ্ছা এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্য সব কিছুই তাঁর থাকা সম্ভব, কিন্তু শিল্পী হিসাবে তিনি এক ভিন্ন অর্থে 'মানুষ'—বলা উচিত 'যৌথ মনের' (collective man)—বিশ্বমানবের অচেতন মনোজীবনের চালক ও রূপকার। স্বভাবতই জীবনানন্দের মতো একজন জীবনধর্মী কবিকেও একান্ত নির্জনতা কোনক্রমেই কোন সম্পূর্ণতা দিতে পারে না; এতদ্-ব্যতীত মনোজীবনেরও একটি নিজস্ব সমস্যা বিদ্যমান এবং নিউরসিসের মতই সাহিত্য সৃষ্টিও মানুষের মনোজীবনেরই ফসল। জীবনানন্দের মানসিকতায় ব্যক্তি ও পরিবেশের দ্বন্দ্ব, প্রায় প্রত্যেক সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের মতোই, প্রথমাবধি কার্যকর ছিল; কিন্তু তা কাব্যে দৃশ্যমান হতে সামান্য বেশী সময় ব্যয়িত হয়েছিল মাত্র। 'ঝরা পালকে'র রবীন্দ্র-প্রভাবিত জীবনানন্দের কাছে এ-সমস্যা গুরুতর বলে বিবেচিত না হলেও, যে-মুহূর্তে তাঁর আশ্রয়চ্যুতির বাসনা জাগলো, (তার নিজের ভাষায়, 'মানস পরিধি থেকে পূর্বজেরা তখন সরে গিয়েছেন খানিক দূরে—অনেক দূরে; রবীন্দ্র বঙ্কিম ও বাংলা সাহিত্যের প্রাক্তন ঐতিহ্যও ধূসরায়িত হয়ে গিয়েছিল বড় বড় বৈদেশিকদের উজ্জ্বল আলোয়।') তৎকালেই সমগ্র সমস্যার কার্যত উদ্ভব। সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুলকে অনুসরণে কেবল যে তিনি রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন তাই নয়, প্রায় একই সঙ্গে তিনি এড়াতে চেয়েছিলেন জাগতিক সমস্যার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিচেতনার দ্বন্দ্বও। কিন্তু কেবলমাত্র আত্মনিবেদনে যে কোন বিবেকী চৈতন্যের মুক্তিলাভ অসম্ভব, সে-সত্য অনুধাবন ভিন্ন জীবনানন্দের মুক্তি ঘটেনি। আবদুল মান্নান সাহেব যথার্থই লেখেন, 'জীবনানন্দের মানসকক্ষে এইভাবে বহিঃপৃথিবী জগচ্চিত্র টাঙিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু ততক্ষণে আমি ও বিরুদ্ধ-আমির সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে। অতিঅন্তর্বৃত জীবনানন্দ mask হিসাবে নিলেন ইতিহাসচেতনা; তাকেই ভরকেন্দ্র করে তিনি প্রাতিস্বিকতা থেকে নৈর্ব্যক্তি-তে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।' এবম্প্রকার আলোচনায় মান্নান সাহেব আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ 'শুদ্ধ'তম কবি'-তে জীবনানন্দের কবিচেতনার মূলসূত্রকে ধরতে চেয়েছেন; কিন্তু যথার্থ সূত্রে পৌঁছেও কেন যে তার ব্যাখ্যানে অগ্রসর না হয়ে বিষয়ান্তরে পৌঁছে মূলকেই শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করেন, তা স্বভাবতই আমার কাছে বিস্ময়ের।

দ্বিতীয়ত, এই গ্রন্থ পরিকল্পনায় তিনি বর্ণ, শব্দ, একটি অব্যয় নিয়ে, প্রভৃতি বারোটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ এখানে সংযুক্ত করেছেন এবং ভূমিকা থেকে জ্ঞাত হওয়া যায় যে প্রবন্ধগুলিও গ্রন্থের প্রয়োজনে নয়; ১৯৭১-৭২ সালের মধ্যবর্তী কালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় একক প্রবন্ধাকারে লিখিত। একক হিসাবে প্রাবন্ধিক মূল্য থাকলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় অধিক সচেতনতা ছিল অনিবার্য। তদুপরি কোন কবির কাব্যভাবনার আলোচনায় এবম্প্রকার বিচ্ছিন্ন আলোচনায় সর্বদা সেই বিশেষ কবির প্রতি যথেষ্ট মর্যাদাদান সম্ভব কিনা, এ-বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান। কারণ কাব্যভাবনা ও কাব্যভাষা কবিচেতনার অনুধাবনের ক্ষেত্রে কোনক্রমেই বিচ্ছিন্ন বিষয়রূপে গণ্য হয় না এবং এর কোন অংশের আলোচনা অন্যটি ব্যতিরেকে অসম্ভব। উদাহরণরূপে উল্লেখ্য, মান্নান সাহেব 'বর্ণ' অধ্যায়ে চ, জ, শ এই উজ্জ্বলতাজ্ঞাপক ও ন, ম, ল এই কোমলতাবোধক' বর্ণগুলির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন ও তার তালিকা প্রণয়নে আন্তরিক হন অথবা 'শব্দ' পরিচ্ছেদে "ক্রিয়াবাচক শব্দে ও বিশেষণ শব্দের নূতন ও বিস্ময়কর ব্যবহার" বিষয়ে ভাবিত হন; কিন্তু এই ব্যবহার যে জীবনানন্দের কাব্যভাবনা ও কাব্য-শরীর নির্মাণে বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়, সে-বিষয়ের উল্লেখ মেলে কদাচিৎ। 'চিত্ররূপময়' শব্দটি ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ একদা জীবনানন্দের কবিতার শব্দ ও বর্ণ উভয়কেই নির্দেশ করেছিলেন। প্রায় ইমপ্রেশনিস্ট ছবির মত কয়েকটি অসংলগ্ন, অবিন্যস্ত রেখার টানে জীবনানন্দও ছবি আঁকেন, যা পাঠান্তে হঠাৎ শরীরী হয়ে উঠে আসে আমাদের সমগ্র চেতনায়; খোলা আকাশ, প্রান্তর আর সমুদ্রের পটভূমি, যা ইম্‌প্রেসনিস্টদেরও, যেন তাঁরই একান্ত নিজস্ব। শব্দব্যবহারেও তিনি যে ইম্‌প্রেশনিস্ট তার প্রামাণিক দেশজ ও গদ্যগন্ধী শব্দ ব্যবহার। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে দৃঢ়বন্ধতার, যা ছিল তাঁর একান্ত দখলে, পরিবর্তে যে এলানো ছড়ানো ভাবের বিস্তার, তাও মুখ্যত ইম্‌প্রেশনিজমেরই ফললাভ। মান্নান সাহেব লেখেন, 'বিচ্ছিন্ন, অনেকসময় বিরোধী-বিপ্রতীপ, উদাহরণমালার একত্রসন্নিপাত,—এ সন্নিপাত প্রাগ্বর্তী কোনো কোনো কবিতাংশের সমার্থবোধকতা অতিক্রম করে গেছে। বিচিত্র বিরোধের এই সন্নিপাত, বস্তুত, "সাতটি তারার তিমির"-এর অন্তর্বিষয়-বহির্বিষয় ধারণার এক শারীর প্রক্রিয়া।' এ-মন্তব্যে আমার অনাস্থা কম; কিন্তু প্রশ্ন—কেন শারীর-প্রক্রিয়া বিস্তৃতি পেল না প্রত্যয়ের সঙ্গে সংযোগের সূত্রে।

অবশ্য আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়গুলি সর্বদাই যে উক্তপ্রকার ভাসা-ভাসা, এমত মন্তব্য অনুচিত। এবং তা হলে মান্নান সাহেবের এই গ্রন্থকে কেন্দ্র করে আলোচনার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিত না। কারণ একজন অনুরাগী পাঠকের যে সামান্য অনুযোগ প্রথম প্রবন্ধাবলী বিষয়ে উত্থাপিত হবেই, এ-তথ্য লেখকের অজানা ছিল না। 'কল্পনার তিন কণ্ঠ' নামীয় পরিচ্ছেদে এসে এ-কারণেই নিজেই তিনি উক্ত প্রশ্নাবলীর মুখোমুখী হন। কারণ আমার মতোই, জীবনা-নন্দের নিম্নোক্ত মন্তব্যে তাঁর আস্থা : 'কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ সাহায্য করেছে।' এবং 'কবিতা ও জীবন একই জিনিসের দুইরকম উৎসারণ।' জীবনানন্দ এ-সত্যকে জীবনে মর্যাদাবান করে তুলেছিলেন এবং বলা চলে কবিতা ও জীবনের ভেদ ঘোচাতেই তাঁর আজীবন সাধনা। আর এই একান্ত আকাঙ্ক্ষায় যে নিজস্ব জগৎ তিনি নির্মাণ করেছিলেন, সেখানে ইঁদুরের খুদ চরিতে জীবনের ক্ষুধা, সুন্দরীরা হাড়ের কঙ্কালের ওপর ঘোরখা পরে ঘোরে, শিকার খোঁজে মহাকাল-পেঁচা, বাই-হরিণীর ডাকে উন্দাম হয়ে ওঠে হরিণপুরুষ, আর

সেই সঙ্গে থাকে নচিকেতা, জরথুস্ত্র, লাওৎসে, লেনিন, হিটলার প্রমুখের নাম, যা তাৎপর্যে ইতিহাস, দর্শন ও রাজনীতির প্রেক্ষিতকেই উপস্থাপিত করে। ভাবতে আশ্চর্য বোধ হয়, একজন জীবনানন্দ কেমন করে এক দীর্ঘ স্বপ্নভ্রমণ শেষ করে অতীতের কল্পলোক থেকে নেমে আসেন সমকালীন প্রতিদিনের জীবনসংগ্রামের মাঝখানে। মান্নান সাহেব এর ব্যাখ্যানে যথার্থই বলেন, 'ঐ ইতিহাস-ভূগোল-বিহার জীবনানন্দকে আর-এক স্বপ্নে উত্তীর্ণ করেছিল, অথবা স্বপ্নপ্রয়াণই সাহায্য করেছিল সেই লোকে যেতে, যে-স্বপ্ন য়ুং-এর উচ্চারণে 'ব্যক্তি-মানুষের মীথ'। স্বপ্ন ও প্রকল্পনাভাবনায় আমরা সভ্যতার আদিমে নীত হই, য়ুং-এর এই সিদ্ধান্তের পটপরিসরে জীবনানন্দের একগুচ্ছ কবিতা চয়ন করা যায়, 'ঘোড়া ("সাতটি তারার তিমির") যার একটি সুন্দর উদাহরণ। যে-স্বপ্নকল্পনাবিহার জীবনানন্দে তাতে খুব স্বভাবীরকমেই য়ুং-কথিত 'সমবায়ী বিজ্ঞান' স্বাক্ষরিত।'

জীবনানন্দের জীবন ও কাব্যালোচনায় মান্নান সাহেবের উক্ত মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; এবং বিশ্বাস, এ-সূত্রের উৎস থেকেই পরবর্তীকালের গবেষকরা প্রাণিত হতে পারেন। জীবনানন্দ-বিষয়ে ইতিপূর্বে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় কিছু প্রবন্ধাদি লেখা হয়েছে, যার গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ; এতৎসত্ত্বেও আলোচ্য গ্রন্থটি বিশিষ্ট হিসাবেই বিবেচিত হবে।

সর্বোপরি কবির কয়েকটি অপ্রকাশিত কবিতার সংকলন পরিশিষ্টে থাকায় পাঠক ও গবেষকদের কাছে বইখানির মূল্য আরো বেড়েছে।

নির্মল ঘোষ

হাংরাস—সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। কলিকাতা ৯। মূল্য দশ টাকা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা তাঁকে জানেন কবি হিসেবে। বহু বছর আগে পদাতিক দিয়ে কবিতার আসরে তাঁর প্রথম উত্তরণ। তারপর তাঁর অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি রিপোর্তাজ। যাঁদের ধারণা, কবি-মানসিকতা গদ্য রচনার অন্তরায়—তাঁদের সমস্ত সংশয় মোচন করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন, কাব্য ও গদ্য রচনার মধ্যে কোনো অন্তর্বিরোধ নেই, তাঁর আন্তরিক ও সংবেদনশীল মানসিকতা তাঁকে দুভাগে ভেঙেছে। তাই মাধ্যম হিসেবে তিনি রচনার যে কোনো অবয়বই গ্রহণ করুন না কেন, সেখানেই তিনি আকর্ষণীয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস "হাংরাস"টিতে তিনি ঔপন্যাসিক হিসাবে চিহ্নিত হলেন।

এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি সকলেই জেলে আটক রাজবন্দী। এঁরা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কারণে কারারুদ্ধ হন। কিন্তু সকলেই একসময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অনশনের। সেই সিদ্ধান্তের সময় বিভিন্ন বন্দীর ভাবনা-চিন্তা, তাঁদের আলাপ-আলোচনা এবং সেই সঙ্গে প্রথম পুরুষে লেখকের কথা এক আশ্চর্য আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে সমগ্র উপন্যাসটি জুড়ে। এই বন্দীদের মধ্যে ছিলেন তরাইয়ের চা-শ্রমিক কাঞ্চন, প্রাক্তন ছাত্রনেতা বংশী, ছ নম্বরের বাচ্চা ছেলে কনক, হাওড়ার শ্রমিকনেতা বাদশা, কালিপদ, জামাল সাহেব আর অনেক ফালতু—যারা রাজবন্দীদের পরিচর্যা করে। এদের মধ্যেও নানা ধরনের মানুষ। চোর, ছিঁচকে

চোর, পকেটমার ইত্যাদি। এদের সকলের কথাই লেখক বলেছেন, এক আন্তরিক সহানুভূতির স্বরে। মনে হবে না—শেষোক্ত মানুষগুলো অপাংক্তেয়।

উপন্যাসটির হাংরাস নাম দেওয়া প্রসঙ্গে এখানে লেখকের উক্তি উল্লেখযোগ্য :

'হাংরাস। কথাটা প্রথম শুনেছিলাম সরডিহায়। এক পাকাচুল চাষীর মুখে। বিশ সালের আন্দোলনে ও-এলাকায় তিনি ছিলেন মাহাতোদের নেতা। বিরাট দলবল নিয়ে জেলে গিয়েছিলেন। জেলে তখন চলছিল হাংরাস। 'হাংরাস'? হ্যাঁ, হাংরাস। পাশে ছিলেন সুরজিৎ-বাবু। আমাকে টিপে দিয়ে কানের কাছে ফিসফিস করে বলেছিলেন, মানে হাঙ্গার-স্ট্রাইক।'

'হাংরাস শব্দটা সেই থেকে আমার মনে গেঁথে আছে।'

উপন্যাসের শুরুতেই বোঝা যায় এই অশ্রুতপূর্ব শব্দটি কোন বিশেষ তাৎপর্যে লেখকের মনকে ঘিরে রয়েছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় শুরু করেছেন এই বলে : 'পরশু গেছে এক বিভীষিকার রাত। তার ঘোর এখনও কাটেনি। ওয়ার্ডের দরজা কাল সকালে মাত্র একবার মিনিট পাঁচেকের জন্য খুলেছিল। মর্গে নিয়ে যাবার আগে শেষবারের মতো আমাদের বন্ধুদের লাশগুলো এনেছিল দেখাতে। তার আগে সারা সকাল আমরা দেয়ালে পিঠ দিয়ে বারান্দায় পা ছড়িয়ে গুম হয়ে ব'সেছিলাম।

'খাটিয়াগুলো একে একে নামলো। তারপর তুলে নিয়ে গেল। গলা অবধি চাদরে ঢাকা। কনকের মুখটা শিউলি ফুলের বোঁটার মতো হলুদ। বাতাসে টিয়ারগ্যাসের ভগ্নাবশেষ ছিল ব'লেই বোধহয় আমাদের চোখে জল এসে গিয়েছিল। তবু ভুলো মাৎ স্লোগানে সারা জেলখানা আমরা কাঁপিয়ে তুললাম।'

আর এই ঘটনার পটভূমিতে ১৯৪৯ সালে দমদম সেন্ট্রাল জেলের রাজবন্দীরা অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের এদেশ থেকে উৎখাত হোক।

"হাংরাস" উপন্যাসটির সব থেকে বড়ো কথা হল এমন এক জমকালো রাজনৈতিক পট-ভূমিকা সত্ত্বেও লেখক একে রাজনৈতিক যুক্তিতর্কের এক অনাস্থির চিত্রে রূপায়িত করেন নি। তিনি রাজনৈতিক কর্মীদেরও দেখেছেন অনুভূতিশীল মানুষ হিসেবে। দারোগা সতীশ কাকাবাবুও তাঁর কাছে শুধুমাত্র একজন অত্যাচারী পুলিশ অফিসার ছিলেন না। ছিলেন তার ওপরেও আরো কিছু।

কিন্তু এই উপন্যাসের সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল রাজনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ। এবং এই বিশ্লেষণে লেখক মোটামুটি বিষয়ী। মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা কারো পক্ষে পুরোপুরি রাজনৈতিক সচেতনতা এক বিরল দৃষ্টান্ত। তথ্য যদি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মনে না গেঁথে বসে, তাহলে যে মধ্যবিত্ত কর্মীর নানা বিচ্যুতি দেখা দিতে পারে তার অসংখ্য প্রমাণ রাজনৈতিক ইতিহাসে রয়েছে। দেখা গেছে, আন্দোলনের নেতৃত্ব যখনই মধ্যবিত্তের হাতে গেছে তখনই তার অন্তিমদশাপ্রাপ্তি ঘটেছে। কারণ মধ্যবিত্ত জীবনে কোনো দৃঢ় শ্রেণীচরিত্র গড়ে ওঠে না। যদিও লেখক তা স্বীকার করতে চাননি। আর আর সকলে যা করে থাকেন, তিনিও তাই করেছেন। তিনিও যুক্তি খাড়া করে বলতে চেয়েছেন, '...এঙ্গেলস্ ছিলেন রীতিমতো বড়লোকের ছেলে। লেনিনের জন্ম মধ্যবিত্তের ঘরে।

'মন জিনিসটা অনেক 'না'কে 'হ্যাঁ' করতে পারে, অনেক 'হ্যাঁ'কে 'না' করতে পারে। তাছাড়া অর্থনৈতিক যে টান, নানা দিক থেকে তারও নানা রকমের কাটান আছে। গোটা শ্রেণীর ভেতর দিয়ে না হলেও দলছুট ব্যক্তির ভেতর দিয়ে তা ফুটে উঠতে পারে।'

এটা লেখকের কিছু নতুন কথা নয়। যে-সব বিলাসী-মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতে ভালোবাসেন, সংবেদনশীলতা, মনুষ্যত্ব এই সকল বিশেষণ ব্যবহার করে নিজের চারিদিকে যে আবরণের সৃষ্টি করেন, সে খোলসটা ভেঙে বাইরে আসা মোটেও কোনো সহজ উদাহরণ নয়।

বাদশার কথাগুলি পরিষ্কার। এবং বাদশার কথা এই পর্যায়ে লেখক বাদশার আনু-পূর্বিক যে চরিত্র এঁকেছেন, তা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাজনৈতিক কর্মী কেমন করে গড়ে ওঠে। আন্দোলন কেমন করে তার কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠে।

রেলের গার্ডের ছেলে অথবা ইনকাম ট্যাক্সের কেরানীর নাতির পক্ষে এই উত্তরণ অসম্ভব নয়, কিন্তু অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

বাদশাদের যদি পরিবর্তন ঘটে, তবে তার জন্য দায়ী তাদের মধ্যবিত্ত সংসর্গ। তারা তখন ভদ্র ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে। সাজে-পোশাকে, আচারে-ব্যবহারে এই সংক্রামক ভদ্রলোকগুলি তাদের এমনভাবে আবিষ্ট করে যে তখন তারা মধ্যপথে থেমে যেতে বাধ্য হয়। দুটি শিবিরই তখন তাদের কাছে সমান দূরত্বে।

হাংরাস উপন্যাসের সার্থকতা এখানেই। এই সরল সত্য সুভাষ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাবে প্রকাশ করেছেন। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে-মানুষ গড়ে ওঠেন, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম দিয়ে যাঁর শুরু, তাঁর মনে দ্বন্দ্ব থাকবে না একথা ঠিক নয়, কিন্তু তাঁর মধ্যে দ্বিধা যে অবসিত সে প্রমাণ এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি। যা কিছু দ্বিধা, তা কিন্তু এই মধ্যবিত্ত জীবনেই, এবং তা তার অস্তিত্ব রক্ষারই তাগিদে।

এই উপন্যাসে সংক্ষেপে আরো একটি মৌল প্রশ্নের অবতারণা করেছেন লেখক। প্রশ্নটি হল মানুষের ওপর যন্ত্রের প্রভাব নিয়ে। এবং একদল আছেন যাঁরা এই যন্ত্রের আশ্চর্য উন্নতিকে নৈতিক অবক্ষয়ের শেষ ধাপ হিসেবে বর্ণনা করে আত্মমগ্ন হতে চান।

কিন্তু বাদশা বলছেন, 'আরেকটা কথা কমরেড। এই প্রথম আমি বুঝতে পারছিলাম যন্ত্র বলতে একমাত্র আমার ওয়েল্ডিং মেশিনটাই নয়।...যন্ত্র জিনিসটা দিয়ে ভালোও হয় আবার মন্দও হয়। নির্ভর করে কী কাজে লাগছে তার ওপর। এ কাজেও যথেষ্ট কারিকুরি দরকার হয়।' (২৪ পৃষ্ঠা)

বাদশা ছাড়া একথা আর কেউ কি এমনভাবে বলতে পারতেন?

উপন্যাসটি আঙ্গিকের দিক থেকেও স্বতন্ত্র। জার্নালের নিয়মে লেখা। তাই দিনানু-দৈনিক বৃত্তান্ত নেই। আশ্চর্য স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন রচনার গুণে উপন্যাসটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। অথচ আগাগোড়া কোথাও কোনো উষ্মা নেই, ক্ষোভ নেই। রাজনৈতিক মতামতের দিক থেকে আজ যাঁদের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এক অসেতু-সম্ভব অমিল, সেই সমস্ত ব্যক্তির চরিত্রের আভাষ যে এ গ্রন্থে নেই, তা নয়। কিন্তু এক অনুকরণীয় সংযমবোধ লেখককে তাঁর জেলজীবনের দুঃসহ স্মৃতিগুলির রোমন্থন থেকে নিবৃত্ত করেছে।

উপন্যাসটি শেষ করার মুখে করুণাদির প্রসঙ্গটি মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। অথচ উমা তেমন আঁচড় কাটতে পারে না।

নৃপেন্দ্র সান্যাল

নববর্ষে শুভ সূচনা

নতুন বছরের প্রথম
দিনেই সাঁওতালডিহি
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বিদ্যুৎ
উৎপাদন শুরু করেছে।
উৎপাদনের পরিমাণ এ মাসের
শেষাশেষি উল্লেখযোগ্যভাবে
বেড়ে যাবে।
এতদিন পুরুলিয়ায়
ডি. ভি. সি. যে বিদ্যুৎ
সরবরাহ করে আসছিল,
উৎপাদনের প্রথম পর্যায়েই
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ সেই সরবরাহ
থেকে তাদের অব্যাহতি দিতে
পারছেন। এই বিদ্যুৎ
ডি. ভি. সি. উপত্যকা অঞ্চলে
সরবরাহ করতে পারবে।
অনতিবিলম্বে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ
এবং কলকাতাতেও নির্দিষ্ট
পরিমাণ বিদ্যুৎ সাঁওতালডিহি
থেকে দেওয়া হবে। পরের
পর্যায়ে বর্ধমান, ২৪-পরগনা এবং
মালদা জেলাতেও আরও
বিদ্যুতের জোগান সম্ভব হবে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

কারিগরি বিদ্যা
ফলবতী করতে হলে চাই
অর্থের যোগান।
আপনার
শিল্প কৌশলের সঙ্গে
ইউবিআই-এর
অর্থ যোগান—
এ হবে রাজযোটক !
আমাদের যে কোন শাখা
অফিসে এসে খোঁজ করুন।
UNITED BANK OF INDIA
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)
UBF-S-8-69

Many faces of HM

HM appeared in the market with the first Indian Car. It soon became the most popular and dependable car in the country. Now, three out of every five cars on the road are from HM.

While HM continues to make the largest number of cars, its production range of motor vehicles now covers trucks, buses, driveaway chassis for various commercial uses. Further diversification has brought in excavators, earth-moving equipment and heavy duty cranes. Forgings and structural work have also been undertaken in its Heavy Engineering Division. HM products find ready acceptance amongst transport operators, contractors and builders both at home and abroad.

Through diversification, HM has accelerated the country's industrial growth and helped to provide direct and indirect employment to thousands of people.

Hindustan Motors Limited
Calcutta-1

CC/HM-1/73

পশ্চিমবঙ্গে সবুজ বিপ্লব কতটা সার্থক হয়েছে

১৯৪৭-৪৮ সালে আউস, আমন ও বোরো মিলিয়ে এ রাজ্যে ধান চাষ হয়েছিল মাত্র ৩৯·১ লক্ষ হেক্টর জমিতে, আর সে জায়গায় ১৯৭১-৭২ সালে চাষ হয়েছে ৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে; ফলে ফসলের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫·০৮ লক্ষ টন। সত্যি কথা বলতে কি ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭০-৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ভারতে সবচেয়ে বেশি ধান উৎপন্ন করার গৌরব অর্জন হয়েছে। এর মধ্যে বোরো ধানের উৎপাদন বেড়েছে লক্ষণীয়ভাবে। অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ সালে ১,০৮,৮০০ টনের জায়গায় ১৯৭১-৭২ সালে বোরো ধান হয়েছে ৯,৩৪,০০০ টন।

অধিক ফলনশীল বীজের প্রচলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ রাজ্যে গম চাষেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। পাঁচ বছর আগেও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে খুব একটা গম চাষ হোত না। ১৯৬৭-৬৮ সালে এ রাজ্যে মাত্র ৭৯,০০০ হেক্টর জমিতে উৎপন্ন গমের পরিমাণ ছিল ৭১,০০০ টন। গত বছর সে জায়গায় ৪,২২,০০০ হাজার হেক্টর জমিতে গম হয়েছে এবং উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯,২১,০০০ টন। দুর্মূল্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পাট চাষের ক্ষেত্রেও আমাদের অগ্রগতি রীতিমত বিস্ময়কর; ১৯৪৭-৪৮ সালে এ রাজ্যে মাত্র ৬·৫ লক্ষ গাঁট পাট উৎপন্ন হয়েছিল। আর সে জায়গায় ১৯৭১-৭২ সালে উৎপন্ন হয়েছে ৩৪·৪২ লক্ষ গাঁট।

একইভাবে আখ, আলু, তৈলবীজ, ডাল এবং সয়াবীনের চাষের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি অধিকার কর্তৃক প্রচারিত

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য

এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে একটি বৃহৎ দেশকালের রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস। বিধৃত হয়েছে খ্রীষ্টানির সঙ্গে হিন্দুয়ানির বিরোধ, তাৎকালিক সাময়িক পত্রপত্রিকা এবং গ্রন্থ প্রকাশের ইতিবৃত্ত, বাংলা গদ্যের ধীর অথচ সুনিশ্চিত পদক্ষেপের কাহিনী। রঙিন চিত্র ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদে ভূষিত। মূল্য ১২·০০, শোভন ১৫·০০ টাকা।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

আধুনিক শিল্পশিক্ষা

আধুনিক ভারতে শিল্পশিক্ষার ইতিহাস, তিনটি পর্যায়ে আলোচিত : (১) ইংরাজ-প্রবর্তিত আর্ট স্কুলের শিক্ষা, (২) ভারতীয় পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষা এবং (৩) আধুনিকতম শিল্পশিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য। এই রচনা শিল্পী ও শিল্প-অনুসন্ধিৎসু হিসাবে লেখকের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতি। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা সম্বলিত। মূল্য ৬·০০ টাকা।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী

রবীন্দ্রনাথের প্রথম-প্রকাশিত গ্রন্থ কবি-কাহিনী থেকে রাজা ও রানী পর্যন্ত ২৫ খানি গ্রন্থের প্রকাশ, বিভিন্ন সংস্করণে বিবর্তন ও পাঠভেদ, সম-সাময়িক সাহিত্য-সমাজে প্রতিক্রিয়া ও প্রাসঙ্গিক বিবরণ এই খণ্ডে সংকলিত। আলোচিত প্রত্যেক গ্রন্থের আখ্যাপত্রের বিশদ বিবরণ এবং কয়েকখানি গ্রন্থের প্রচ্ছদের প্রতিচিত্র গ্রন্থখানির মূল্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। এই জাতীয় গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে প্রথম। প্রথম খণ্ড : ১৪·০০ টাকা।

শ্রীমলিনা রায়

চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ড্রুজ

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একনিষ্ঠ সেবক, বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারে রবীন্দ্রনাথের একান্ত সহকারী বন্ধু, গান্ধীজী ও দ্বিজেন্দ্রনাথের সহোদরতুল্য চার্লস ফ্রিয়ার এনডরুজের বহুবিচিত্র জীবনের সরস ও সুখপাঠ্য আলেখ্য। বহুবর্ণ চিত্র, পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এবং সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে অলংকৃত। মূল্য ১০·০০ টাকা।

বিশ্বভারতী

১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ১৬

মীটারে ভাড়া অনেক উঠেছে না? কোনও কারচুপি
করেনি তো? কিন্তু কী করে? বোঝা যাচ্ছে না…
কোনও রকমে ঠকিয়েছে মনে হচ্ছে।
আপনি অসহায় বোধ ক'রে কখন কখনও মৃদু
প্রতিবাদও জানিয়েছেন। কিন্তু অসহায় বোধ করার
কারণ নেই। ট্যাক্সি ও স্কুটারের মীটার ওজন
ও মাপ সংক্রান্ত আইনের আওতায় পড়ে।
মীটারে কোনও কারচুপি করা আইনতঃ অপরাধ
এবং এর জন্য গুরু অর্থদণ্ড
দিতে হতে পারে।
এমন কি চালকের লাইসেন্স
বাতিলও হয়ে যেতে পারে।

দৃঢ় পদে হাসিখুশি জীবনের দিকে
বাটা জানে এযুগের ছেলেমেয়েদের মন
তাইতো ওদের জন্য এমন নিপুণতার অনুশীলন
করেছেন বাটার কারিগররা। আধুনিক, অতি-আধুনিক,
বনেদি—যে জুতোই ওরা চায়—বাটার দোকানে বিপুল সম্ভার,
অনেক পছন্দের স্বাধীনতা। পায়ের দিকে চোখ পড়ার মতো
অথচ নির্ভয় আরাম। একেই তো বলে দৃঢ় পদক্ষেপে
হাসিখুশি জীবনের দিকে এগিয়ে চলা।
পিণ্টু ৫৬
৮.৫০-১১.৯৫
প্লে টাইম্ ১৬
১০.৯৫-১৫.৯৫
জয় ডে ৬৮
১৭.৯৫-২২.৯৫
ওয়েফাইন্ডার্স ৬৭
১৯.৯৫-২৪.৯৫
সুপার স্টাং ৩৯
১৮.৯৫-২৩.৯৫
ওয়েফাইন্ডার্স ০৭
২০.৯৫-২৬.৯৫
জুনিয়র ০৩
১৬.৯৫-২৪.৯৫
Bata

বর্ষ ৩৫ শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮০

সূচিপত্র

সম্পাদক : দিলীপকুমার গুপ্ত

আতাউর রহমান কর্তৃক নালন্দা প্রেস, ১৫৯-১৬০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত
এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। বিজ্ঞাপন এবং কভার
রে এন্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ, ৫এ, ম্যাজ লেন, কলিকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত।

কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা, মুদ্রণের মূল্যবৃদ্ধি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিসের ব্যয়াধিক্যের চাপে প্রকাশনার ক্ষেত্রে যে সার্বিক সংকট দেখা দিয়েছে ত্রৈমাসিক পত্র হলেও, বলা বাহুল্য, **চতুরঙ্গ** তা থেকে অব্যাহতি পায়নি। আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও এই বিপর্যস্ত অবস্থায় পত্রিকার গঠন-পারিপাট্যের মানও যথেষ্ট উন্নত রাখা সম্ভব হল না। সময়সীমা লঙ্ঘনের অনিবার্য ফলস্বরূপ বর্তমান সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ও কার্তিক-পৌষ একত্রে যুগ্মসংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হল। **এই সংখ্যা থেকে মূল্য ১·৭৫ পয়সা ধার্য করা হয়েছে।**

আগামী সংখ্যা থেকে বিজ্ঞাপনের হারও আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি করা হল।
প্রতি পৃষ্ঠা : ৩০০ টাকা,
অর্ধ পৃষ্ঠা : ২০০ টাকা।

কার্যালয় : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেন্যু
কলিকাতা-১৩

বর্ষ ৩৫ শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮০

উনিশ শতকের 'কলিকাতা-সভ্যতা' এবং 'বাঙাল'

রমাকান্ত চক্রবর্তী

'বাঙাল' কথাটির আভিধানিক অর্থ দুটি : [১] পূর্ববঙ্গবাসী; [২] গ্রাম্য ও অমার্জিত লোক। দ্বিতীয় অর্থে স্কচ্-রা বৃটেনের বাঙাল; ইউক্রেনের অধিবাসিগণ রাশিয়ার বাঙাল; দক্ষিণ জার্মানীর লোকরা উত্তর জার্মানীর বাঙাল; তাঙ ও মিঙ যুগের চৈনিক উপন্যাসে দক্ষিণ চীনের সমুদ্রোপকূলবর্তী অধিবাসিগণ চীনের বাঙাল। এরিস্টোফেনিস্-এর নাটকে স্পার্টার লোকরা এথেন্স-এর বাঙাল, এবং আলিফ্ লায়লা-য় মরুবাসী বেদুইন, বাগদাদের

বাঙলাদেশে পূর্ববঙ্গের লোক দুটি বিশেষ অর্থে 'বাঙাল'। একটি অর্থ, উচ্চারণ-বৈষম্য-দ্যোতক। অপর অর্থ নির্বুদ্ধিতা-ব্যঞ্জক। 'বাঙাল' কথাটির বাঙলা অর্থে কিছু পরিমাণে প্রাদেশিকতা আছে। অভিধানের দু'টি অর্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি অর্থ হয়ে যায়। 'বাঙাল মনুষ্য নয়.........'—এই প্রবচন এখনও পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত। 'বাঙাল' উচ্চারণ যে কতগুলি ভাষা-তাত্ত্বিক নিয়মের ফলশ্রুতি—এই আবিষ্কার খুবই অর্বাচীন।

দুটি বিশেষ অর্থে 'বাঙাল'-এর অস্তিত্ব বৃন্দাবন দাস রচিত "চৈতন্য-ভাগবতে" প্রথম দেখা যায়। এই গ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত"র পূর্বেই রচিত হয়েছিল; তখন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বেঁচেছিলেন। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে, চৈতন্যদেব প্রথম যৌবনে অর্থ উপার্জনের জন্য পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে নবদ্বীপে ফিরে এসে তিনি 'বঙ্গদেশী বাক্য অনুসরণ করিয়া/বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া ॥' ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নদে-শান্তিপুরের লোকদের পূর্বদেশী 'বাঙ্গাল' সম্পর্কে এই নাসিকাকুঞ্চনের তথ্য নিশ্চয় কৌতূহলোদ্দীপক। (দ্রষ্টব্য : বৃন্দাবন দাস, "চৈতন্য-ভাগবত", আদি, ১২)। মহাপ্রভুর অপর সমসাময়িক জীবনী লেখক লোচন পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে লিখেছিলেন : 'পাণ্ডব-বর্জিত দেশ সর্বলোকে গায়। গঙ্গা হআ গঙ্গা নহ এই সাক্ষী তায় ॥" ("চৈতন্যমঙ্গল", পৃঃ ৪৭) অথচ, প্রায় চারশ' বছর আগের প্রাচীন পদকর্তা, এবং বাঙলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রথম প্রবর্তক, লোচন-দাস তাঁর পদাবলীতে বহু বাঙাল কথা ব্যবহার করেছিলেন৷ যথা : 'হাইস্যা হাইস্যা ঘর সান্ধাইল বিনোদনাগর কালা'; 'কিসের কতা কৈতেছিলি নন্দের পোয়ের সনে'; 'কিসের

লাইগ্যা ডর করিব বাপের ঘরের ঝি'; ইত্যাদি। (দ্রষ্টব্য হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "বৈষ্ণব পদাবলী") মুকুন্দরামও 'বাঙ্গাল' মাঝিদের সামুদ্রিক ঝড়ে ভয় পেয়ে 'বাফৈ বাফৈ' বলে কান্নার উল্লেখ করেছেন।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ালটার হ্যামিলটন কলিকাতার পরিবেশে বাঙালদের অস্তিত্ব টের পেয়েছিলেন; তিনি লিখেছিলেন :

The people of Calcutta who speak the Gour dialect of the Bengalese, although confounded by the natives of Western Hindostan with the Bengalese, take in their turn the trouble to ridicule the inhabitants of Dacca, who are the proper Bengalese; and Calcutta being now the capital, the men of rank at Dacca are becoming ashamed of their provincial accent, and endeavour to imitate the Baboos...of the modern metropolis. (*Description of Hindostan*, Vol. 1, p. 186)

লক্ষণীয়, হ্যামিলটন্ 'গৌড়'-ভাষাকে আসল বাঙলা ভাষা বলে বিবেচনা করেননি। তাঁর মতে, আসল বাঙলা ভাষা ছিল ঢাকাই ভাষা। ঢাকা-র লোকরা উচ্চারণে কলিকাতার ভঙ্গীর অনুকরণ করত,—এ-খবরও তিনি রেখেছিলেন।

ঊনিশশতকের প্রারম্ভে পূর্বদেশের কত লোক কলকাতায় এসেছিল, তা জানার কোন উপায় নেই। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে রামতনু লাহিড়ীর বাল্যকালে 'পূর্ববঙ্গনিবাসী চাউলের গোলাদার, আড়তদার ও বাঙ্গাল মাঝী প্রভৃতিতে চেতলা পরিপূর্ণ ছিল'। শাস্ত্রী মশাইয়ের মতে এ-সব লোকের নৈতিক জীবন ছিল অত্যন্ত কলুষিত। সে যাই হোক্, 'বাঙাল' কথার ব্যাকরণ সর্বপ্রথমে কিছুটা আলোচনা করেছিলেন বোধ হয় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (?) তাঁর "বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ" গ্রন্থে। গ্রন্থটির রচনাকাল আনুমানিক ১৮০৭-১১ খ্রীষ্টাব্দ। (ড· তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)। এখানে একটি জায়গায় 'কুকুর'-এর বহুবচনে 'কুকুরেরান', এবং 'বালকের সম্বোধনে 'টি' ও যুবতীর সম্বোধনে 'টে' শব্দ ব্যবহারের নজির দেখানো হয়েছে। তখন কী ছিল, জানি না; কিন্তু 'টে' শব্দটি রাজশাহী-মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত। একটি সুপ্রচলিত গম্ভীরা গানে আছে 'স্বামীর গুণ আর বুলব কত। সহবে কে আর আমার মত টে' ॥ আসলে বাঙাল 'টি' হয়ে যায় 'ডি', যেমন, 'ভাইডি,।

উইলিয়াম কেরি রচিত "কথোপকথন"-এ 'বাঙাল' কথোপকথন নেই; কিন্তু কেরি-র প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানত ভাওয়াল পরগনার আঞ্চলিক ভাষায় 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' লিখেছিলেন মানোএল দ্য অস্সুম্পসাঁও।

পূর্ববঙ্গীয় প্রাচীন লোকায়ত সাহিত্যে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখ প্রায় নেই বললেই চলে। "মৈমনসিংহ-গীতিকা"র অনেক পালাগানেই বাণিজ্যে যাওয়ার বর্ণনা আছে। কিন্তু তাতে 'গঙ্গা' শব্দটি বিরল। পূর্ববঙ্গের গানে, লোকসাহিত্যে চৈতন্যজন্মধন্য নদীয়ার উল্লেখও খুবই অর্বাচীন। উত্তরবঙ্গের লোকগীতে পশ্চিমবঙ্গ অনুল্লিখিত। আনুমানিক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত, জয়নারায়ণ সেন ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ীর "হরিলীলা" কাব্যেও কাশ্মীর, কর্ণাট ইত্যাদি দেশের উল্লেখ থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখ নেই। "হরিলীলা"র ভাষা অত্যন্ত বেশিরকমের বিদগ্ধ; শুধু এক জায়গায় টক্ তেঁতুলের অম্বল অর্থে বাঙাল 'চুকা' কথাটির প্রয়োগ দেখা যায়।

তার মানে এই নয় যে পদ্মা-মেঘনা-বিধৌত এবং গঙ্গা-বিধৌত এই দুই বাঙলার মধ্যে

যোগাযোগ ছিল না। 'কুলপঞ্জী' জাতীয় 'ঘটক'-দের লেখা পুঁথিগুলো পড়লেই দেখা যাবে, উভয় বঙ্গের উচ্চবর্ণ হিন্দুরা দলে দলে পরিবার-পরিজন নিয়ে এ-পার থেকে ও-পারে গেছেন। এই গতায়াত বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছিল। যাওয়া-আসার কারণও ছিল নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত "বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা" গ্রন্থে শুধু ন্যায় পড়ার জন্য বাঙালি, অবাঙালি ছাত্রদের উভয় বঙ্গের বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিতদের দ্বারস্থ হওয়ার বহু বিবরণ আছে। হান্টার-এর সুবিখ্যাত *Annals of Rural Bengal* বইতে বীরভূম অঞ্চলের আদিবাসীদের উত্তর ও পূর্ববঙ্গে যাওয়ার বর্ণনা আছে। পথঘাট বিপদসঙ্কুল; যাতায়াতের ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত; নিবিড় কোনো আত্মিক যোগাযোগও নেই; তার পরেও বাঙাল-রা ব্যবসার খাতিরে, কিম্বা চাকরির চেষ্টায় এদেশে এসেছে, এবং এখানে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করেছে। আনুমানিক ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রচিত 'কামিনীকুমার' কাব্যে একটি "বাঙ্গাল" স্বামীর বর্ণনা এ-ধরনের : "অন্ধকার বিনা কভু নাহি করে কাজ/কেম্বাই এম্বাই বলো হায় এ কি লাজ॥ সাধ করে পায়ে পরেছিনু গোল মল/তদবধি নটী বলে নাহি খায় জল॥ অথচ, এ-দেশে এসে বিয়ে করার জন্য স্বামীটিকে কিছু কম মেহনত্ করতে হয়নি। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে নৌকায় ঢাকা থেকে কলকাতায় যেতে ৩৭½ দিন লাগত। (*Calcutta Gazette, April* 21, 1785) কলকাতা থেকে নৌকায় ঢাকা যেতে বিশপ্ হেবার-কে খুব কষ্ট করতে হয়েছিল। এ-দেশী স্ত্রীলোকটি তাঁর 'বাঙাল' স্বামী সম্বন্ধে যে ধারণাই পোষণ করুক, অন্ততঃ বিশপ হেবার্-এর সাক্ষ্যে (*Narrative of a Journey etc.,* Vol. 1, p. 143) দেখা যায়, 'বাঙাল' মানেই ভূত ছিল না। তাঁর মতে ঢাকার সমকালীন নবাব সামস্-উদ্-দৌলা সেক্স্পীয়ার পড়েছিলেন, ভালো ইংরাজিও লিখতেন। রামমোহন রায় উত্তরবঙ্গের রঙপুর অঞ্চলে দীর্ঘকাল ছিলেন। ধর্মাচরণের ব্যাপারে উভয়বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান প্রায় একই রকমের ক্রিয়াকাণ্ড করেছেন। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলো সাধারণ ব্রত ছিল। অঞ্চল, পরিবেশ এবং আঞ্চলিক ঐতিহ্য অনুসারে ঐ-সব ব্রত অনুষ্ঠানের কিছু তারতম্য নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সে-বিষয়ে কোনো মৌলিক বিভিন্নতা ছিল কি না সন্দেহ। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, চতুর্দশ শতকে রচিত "শক্তিসঙ্গমতন্ত্র" অনুসারে উভয় বঙ্গের তান্ত্রিক বামাচার একরকমেরই ছিল। উভয়বঙ্গের আউল-বাউলদের রীতি-নীতি এবং ধ্যান-ধারণার মধ্যে কোনো প্রভেদ ছিল না। উভয় বঙ্গের মেহনতী মানুষদের জীবনাচরণের উনিশ-বিশ ছিল না। "বাঙাল" নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা উচ্চ-বর্ণের লোকদের সৃষ্টি।

অথচ, রামমোহন-দ্বারকানাথের যুগে নিদেনপক্ষে দুজন বাঙাল কলকাতার বিদগ্ধ-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। একজন, মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষের পিতা রামলোচন ঘোষ (১৭৯০-১৮৬৬)। অপর জন, ডাক্তার সূর্যকুমার গুডিভ্ চক্রবর্তী (১৮২৭-১৮৭৪)। রাড়িখালের ভগবানচন্দ্র বসু পরবর্তী কালে কলকাতার সমাজে-নাম করেন। সূর্যকুমার বিলেতে ডাক্তারি পড়তে গিয়ে মেম-সাহেব বিয়ে করেন। এ-সম্পর্কে প্রভাকর পত্রিকায় লেখা হয় : অজপূর্ব ব্রহ্মপুত্র নদের পারে (ভুল) পাণ্ডববর্জিত দেশে ঐ সূর্য্যকুমার জন্মগ্রহণ করেন... এখানে যতদিন ছিলেন কিছুই মানিতেন না, সম্পূর্ণ নাস্তিক ছিলেন...ধন্য বিবিলোভ, হে খৃষ্টধর্ম, চমৎকার তোমার গুণ, তুমি বিবি পর্যন্ত দিয়া লোককে স্বমতে আকর্ষণ করহ।

"প্রভাকর"-এ পূর্ববঙ্গ প্রসঙ্গ বিশেষ নেই; কিন্তু কবি ঈশ্বর গুপ্ত 'বাঙ্গাল' দেশ সম্পর্কে কোনো কারণে উৎসাহিত হয়েছিলেন; তিনি একবার ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রামে বেড়াতে যান। 'ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র' তাঁর একটি নতুন ধরনের রচনা। রঙ্গব্যঙ্গ-প্রিয় গুপ্ত-কবি

চাটগাঁ-বরিশালের ভাষার দুর্জ্ঞেয়তা সম্পর্কে রসাল কিছু মন্তব্য করেছেন, কিন্তু তাতে হাস্য-রসই প্রধান, বক্রোক্তি নয়। সংবাদ প্রভাকর-এ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল 'গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন' ছাপা হয়। তাতে কলকাতা থেকে জমুনা নামক স্টীমার-এর লাখিয়া নামক গাধাবোট-সহ ঢাকা যাওয়ার পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবতঃ এ-সময় থেকেই ঢাকা-কলকাতার মধ্যে 'বাষ্পীয় পোত' চলাচল করতে থাকে, এবং সম্ভবতঃ ওই জমুনার একটি কেবিনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাকা গিয়েছিলেন। ("আত্মচরিত", পৃঃ ১৪৭)

তুলনামূলক বিচারে পূর্ববঙ্গের অনুন্নত অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো সাংবাদিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কলিকাতা ও তার আশেপাশের অঞ্চলের খবর সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাতে ছড়িয়ে আছে। 'ও-পার' বাঙলার খবর থাকত খুবই কম। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে "হিন্দু প্যাট্রিয়ট" পত্রিকায় বিখ্যাত সাংবাদিক গিরীশচন্দ্র ঘোষ একবার মন্তব্য করেছিলেন :

"The ridicule and scorn with which the Gunga-dwelling Ryot looks upon his Dacca and Jessore brethren are much like [those] with which the Northumbrian boor is treated by the peasant of Middlesex. The so-called elite who by their supreme good luck are washed into civilisation by the waters of the holy stream sneeringly point at the huge donkeyishness of the chillieaters who are swelled into jug-bellied beauties by perpetual enlargement of the spleen and who talk a loathsome jargon of *OYS and AYEEBOs*. Nor is this egotistical leer utterly unfounded... it arises partly also from *the rather outlandish rudeness, the grosser superstition and the deeper ignorance that still brood over Eastern Bengal. That superstition is mainly attributable to non-intercommunication between one tract and the more enlightened parts.* The non-conducting medium of bad roads and no roads insulates western civilisation to a few miles around Calcutta. (italics is mine) *Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose,* ed., M. N. Ghose, p. 240.)

পূর্ববঙ্গের অনুন্নত অবস্থার জন্য গিরীশচন্দ্র ঘোষ যোগাযোগব্যবস্থার অপকর্ষের উপরে সমস্ত দোষ দিয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন, যে-সব বড় বড় পশ্চিমবঙ্গীয় জমিদার পূর্ববঙ্গে বিরাট বিরাট জমিদারি চালাতেন, তাঁরা তাঁদের 'সভ্যতা'র বাহাদুরি সত্ত্বেও তাঁদের 'বাঙাল' প্রজাদের উন্নতির জন্য কি করেছিলেন? ১২৬৭ সালে একটি বিপুল-কলেবর বই কলিকাতায় ছাপা হয়েছিল। বইটির নাম "সংশোধিত নিয়ম-পত্র"। তার বিষয়-বস্তু, 'রঙ্গপুরাদি প্রদেশান্তর্গত পরগণে পাতিলাদহ প্রভৃতি অধিকৃত ভূম্যাদির রাজস্বাদিকর্ম-নির্ব্বাহক সাময়িক বিধি।' বইটি ছাপিয়েছিলেন কলিকাতার একজন জমিদার, পি. কে. ঠাকুর। হাজার পাতার এই বইতে অনেক খোঁজ করে 'ডাক্তারখানার বিষয়' শীর্ষক একটি অধ্যায় দেখা গেল; কিন্তু জমিদারের তরফ থেকে স্কুল বা পাঠশালা পরিচালনার কোনই উল্লেখ নেই। ১২৬৭ সালের 'সংশোধিত' জমিদারি আইনে যদিও-বা জমিদারদের 'ডাক্তারখানা' রাখার নিয়ম হয়েছিল, শিক্ষা-প্রসারের জন্য কোনো ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ তাতে ছিল না। গরীবের রক্ত 'বিধিবদ্ধভাবে' শোষণ করার নানা নির্দেশ এই 'নিয়ম-পত্রে' ছিল।

পূর্ববঙ্গে সে-সময় উচ্চশিক্ষা লাভের বিশেষ কোনো উপায় ছিল না। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দেও সমগ্র পূর্ব এবং উত্তরবঙ্গে ১৫টির বেশি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল কিনা, সন্দেহ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ক্যালেন্ডার অনুসারে ঐ সময়ে সমগ্র পূর্ব এবং উত্তরবঙ্গে প্রথম শ্রেণীর কলেজ ছিল মাত্র ৩টি; এফ্.এ. কলেজ ছিল মাত্র ৬টি; এবং আইন পড়াবার ব্যবস্থা ছিল মাত্র ৪টি কলেজে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দেও সেখানে একটিও ডাক্তারী এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল না। এখনো পর্যন্ত যাঁরা বাঙালি রেনেসাঁসের জিগির তুলে তার সঙ্গে বৃটিশ শাসনের সংযোগ দেখাতে ব্যস্ত, তাঁদের নিশ্চয় পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের শিক্ষা-ব্যবস্থার এই দুঃসহ দৈন্যের বিবরণ জানা আছে!

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পরে পূর্ব এবং উত্তর বঙ্গে উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি হিশাব অনুসারে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে উচ্চ-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৭০ (*The Bengal Educational Directory* 1919) অথচ, সে-অনুপাতে কলেজের সংখ্যা ছিল খুবই কম। তাই, স্যাডলার কমিশনের প্রতিবেদন অনুসারে, পূর্ব এবং উত্তরবঙ্গের ছাত্ররাই কলকাতার বড় বড় বেসরকারি কলেজ-গুলোতে ভিড় জমিয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গিরীশচন্দ্র বসু যখন কলকাতায় বড় বড় কলেজ স্থাপন করেছিলেন, তখনও বিস্তর 'বাঙাল' ছাত্র সে-সব কলেজে ভিড় করেছিল। আর পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে স্কুল স্থাপনের কথাই যদি ধরা যায়, তাহ'লেও দেখা যাবে, স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান জমিদার, কিংবা বর্ধিষ্ণু হিন্দু-মুসলমান 'ভদ্রলোক'-রাই সে-সব স্কুল স্থাপন করেছিলেন, এদেশী লাহা, ঠাকুর, দেব, ঘোষ আথবা মিত্র-রা নয়।

শিক্ষার দুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত 'বাঙাল'রা শিক্ষার জন্য কলিকাতায় এসেছিল; কিছু 'হিন্দু'-বাঙাল এখানে এসেছিল দৈনিক গঙ্গাস্নানের পুণ্যলোভাতুর হয়ে। অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, তাঁর ছেলেবেলায় বড়বাজারের দু' শ্রেণীর বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথমটি ছিল 'পূর্ববঙ্গ থেকে আগত গঙ্গাতীরে বাস করে নিত্য গঙ্গাস্নান করবার জন্য স্থানীয় বাসিন্দা...বড়-বাজারের দ্বিতীয় শ্রেণীর বাসিন্দা ছিলেন শেঠ ও বসাক মহাশয়রা।' ['ভারতের শিল্প ও আমার কথা', পৃঃ ২-৪] কলিকাতার হিন্দু-পরিবারে পুজো-আর্চার ব্যাপারে 'বাঙাল' পুরোহিতদের প্রায় একচেটিয়া আধিপত্যের সূত্রপাত হয় উনিশ শতকের শেষের দিকে। বাগবাজর, শোভাবাজার, শ্যামপুকুর ও কালীঘাটে ঐ-সব পুরোহিতপল্লী এখনও দেখা যায়।

এরা ছাড়াও কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গে উনিশ শতকের মধ্যভাগেই এসেছিল অসংখ্য পেশাদার 'ভদ্রলোক' বাঙাল। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কেরানি, বেশকিছু ছিল শিক্ষক এবং উকিল। পূর্ববঙ্গের মহকুমা, কিংবা জেলা সহরে যদিও-বা শিক্ষক ও উকিলদের কিছু কিছু চাকরি জুটত, তবুও তা সংখ্যার অনুপাতে ছিল খুবই কম। স্বাভাবিক কারণেই এদের 'মক্কা' ছিল কলিকাতা। উনিশ শতকের শেষভাগে 'বাঙাল'দের উত্তর ভারতের বিভিন্ন সহরে কেরানি, উকিল, এবং অধ্যাপকরূপে আবির্ভাব হতে থাকে।

এই সব মধ্যবিত্ত 'বাঙাল' ছাড়াও কলিকাতায় এবং তার উপকণ্ঠে রুজি-রোজগারের চেষ্টায় এসেছিল অসংখ্য 'বাঙাল' মাঝি, মজুর, কুলী। খিদিরপুর, গার্ডেনরিচ, মেটিয়াবুরুজ এখনো পর্যন্ত পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান মাঝি-মাল্লাদের বাসস্থান। উনিশ শতকের মধ্যভাগেই ছোটখাটো 'বাঙাল' মুসলমান ব্যবসায়ী, কারিগর, দোকানদার ইত্যাদি মধ্য কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করতে থাকে। হুতোমের 'নকশা'য় এবং পরবর্তী কালে গিরীশচন্দ্র ঘোষের বহু

নাটকে কলকাতার কুলী রূপে 'বাঙাল' চরিত্র দেখানো হয়েছে। স্পষ্টভাবে 'হিন্দুস্থানী' কুলীর উল্লেখ উনিশ-শতকের শেষার্ধে রচিত বাঙলা-সাহিত্যে খুব বেশি দেখা যায় না।

নিম্নবিত্ত, দরিদ্র 'বাঙাল'রা উনিশ শতকের শেষার্ধে রচিত "গোপাল ভাঁড়ের অদ্ভুত গল্প"-জাতীয় বইতে কমিক চরিত্রে পরিণত হয়েছিল। এ-সব বইয়ের লেখকরা 'বাঙাল' চরিত্র নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির উৎসাহ কোথা থেকে পেল, তা বলা যায় না; তবে নিচের দু-একটি নমুনা থেকেই বোঝা যাবে, এ-জাতীয় প্রয়াস নিছক স্থূলতায় পরিণত হয়। নমুনা :

১· "পাড়াগেঁয়ে বাঙ্গাল দাঁড়িমাঝি কলিকাতায় আসিয়া এক পয়সার জিলিপি খাইয়া সর্দার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিল : চাচা! এই যে গুরান, ইয়ার গোয়ার মদ্দি রস, ইয়ারে কি কয়? তাহার চাচা দম্ভ করিয়া কহিল : হা পুঙ্গির পুত! ইহারে জিলাপিক কয়।"

২· "এক বাঙ্গাল মুসলমান কচুরী খাইয়া তাহার মাতুলকে কহিল : ফজলে মামু! এই যে কচুরী খালাম, ইয়ার গোয়ার মদ্দি কেলাই আলো ক্যামনে? মাতুল কহিল, আরে পুঙ্গির পুতু! তা-ও সমঝাবার পারস্‌ নাই! গম আর কলাই এক লগে বুনছিল্‌" ('গোপাল ভাঁড়ের অদ্ভুত গল্প' ১০৫-১০৬)

এ-ধরনের বিদ্রূপ দাশরথি রায়ের পাঁচালীতেও দেখা যায়। সেখানে 'বাঙাল'-এর একটি অভিধা হ'ল দুশ্চরিত্র এবং বেশ্যাসক্ত। একজন 'ডাকসাইটে' বেশ্যার বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন : 'ঢাকাপটীর ঢাক-বাজানি ঢাকাই বাবুর চেম্নী।' পূর্ববঙ্গের পল্লী-সঙ্গীতের জঘন্য 'প্যারোডি' করে তিনি লিখেছিলেন :

বাহার-যৎ।

বঁধু! যেহানে কোকিলা, সেহানে না যায়।
ঐ কোকিলা পুঙ্গির বাই ডাকে হে তোমায়॥ ইত্যাদি

এই ধরনের স্থূল রসিকতার বিস্তর নিদর্শন পাওয়া যাবে জে· চৌধুরি রচিত, এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত, "কান্তলালের কলিকাতা দর্শন" নামক উপন্যাসে। নায়ক কান্তলাল, বলা বাহুল্য, 'বাঙাল'। এমন-যে প্রতিভাবান শিল্পী 'পরশুরাম' তিনিও 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে এক বাঙাল, এবং মুসলমান মুহুরির মুখ দিয়ে 'হালার পো, হালা' গালিটি বলিয়ে ছেড়েছেন।

'বাঙাল' সম্পর্কে গোপালভাঁড় ও দাশু রায়ের রীতি হুতোম-এর "নকশা", "আলালের ঘরের দুলাল", এবং ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত "সমাজ-কুচিত্র" জাতীয় গ্রন্থে দেখা যায়। "মাহেশের স্নানযাত্রা" নকশায় নৌকার মাঝি 'বাঙাল। তার খাদ্য ভাত, কড়াইয়ের ডাল, শুঁটকী মাছ আর লঙ্কা। একটি নকশায় হাফ্‌-আখড়াই গানের দোহার 'ঢাকাই কামার'। নকশায় বর্ণিত একটি মুটে বাঙাল, এবং বিশ্রী রকমের স্পষ্টভাষী। সে প্রেমানন্দ-জ্ঞানানন্দের কীর্তন গান শুনে মন্তব্য করেছিল : 'পুঙ্গির বাই গাড়ীর মদ্দি ক্যালাওতি লাগাইছেন।' একটি নকশায় অন্যতম প্রধান চরিত্র 'বীরকৃষ্ণ দাঁ' ঢাকার লোক, এবং আড়তদার। মাহেশের স্নানযাত্রা প্রসঙ্গে হুতোম তীর্থযাত্রী জনৈক পূর্ববঙ্গীয় জমিদারের বর্ণনা করেছেন এ-ভাবে : ঢাকাই জালার মত, পেল্লাদে পুতুলের মত, ও তেলের কুপোর মত শরীর; দাঁতে মিশি, হাতে ইষ্টিকবচ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তাতে ঢোলের মত গুটি দশ মাদুলি......মৈমনসিংহ ও ঢাকা অঞ্চলের জমিদার সরকারী দাদা ও পাতান কাকাদের সঙ্গে খোকা সেজে ন্যাকামি করেন; বয়েস ষাট পেরিয়েচে, অথচ 'রাম'-কে "আম" ও 'দাদা' ও 'কাকা'তে 'দাঁদা' 'কাঁকা' বলেন—এ'রাই কেউ কেউ রঙ্গপুর অঞ্চলে 'বিদ্যোৎসাহী' কবলান, কিন্তু চক্র করে তান্ত্রিক মতে মদ খান ও ব্যাঙ্গা চায়টে অবধি পুজো করেন।'

"আলালের ঘরের দুলাল"-এ একটি মোসাহেব চরিত্র আসামী, এবং তার নাম 'ঢেঁকি-য়াল ফকন।' তিনি 'কর্তার নিকট বসিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে বলিতেছেন;—এ-বছর একটু লেরাং ভেরাং আছে, কিন্তু একটি যাগ করলে সব.........বশীবুত অবে।

সরস্বতী পূজা বর্ণনা করে ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় 'দুজন বিক্রমপুরী বাবু'-র বর্ণনা করে লিখেছেন :

দুজন বিক্রমপুরী বাবু আজ নূতন কলকেতা দেখতে এসেছিলেন। মেছোবাজারের শোভাদর্শন তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। মস্ত একটা তেতালা বাড়ীতে আলো জ্বলচে ও গান-বাজনা হচ্চে দেখে, গড়্‌গড়্‌ শব্দে উপরে উঠতে লাগলেন। ব্রাহ্ম যাচ্চেন মনে করে প্রহরীরা বারণ কল্লেনা। তাঁরা সমাজঘরে ঢুকেই হতাশ হলেন। একজন বল্লেন এহানে তা নয়, আমরা যাহার লাগ্যে আইছি। দ্বিতীয় বাবু—'অয় বাগ্য' বলেই নেমে গেলেন। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অবশ্য স্বীকার করেছেন যে 'ঢাকা আজকাল অপেক্ষাকৃত সভ্যতম স্থান হয়ে উঠেচে।' ("সমাজ-কুচিত্র", পৃঃ ১৭২)।

এক সময়ে অসমিয়া ভাষাকে বাঙলা ভাষা থেকে আলাদা ভাবে বিচার করা হয়েছিল। এই বিচারের প্রতিবাদ করে একজন লেখক "সোমপ্রকাশ" পত্রিকায় লিখেছিলেন যদি বিক্রমপুর অঞ্চলের ভাষা বাঙলা ভাষা হয়, তবে নিশ্চয় অসমিয়া ভাষাও বাঙলা ভাষা।লেখকের বক্তব্য : 'এক বাঙ্গালায় প্রদেশভেদে বিভক্তির এই প্রকার যথেষ্ট বিভিন্নতা লক্ষিত হয়,......যথা 'কোথা হইতে', 'কোত্থেকে', 'কোনখান থন', 'কৈত্থনে', 'কৈত্থইজা', কৈ গণে ইত্যাদি... ..বিক্রমপুর প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলের ভাষাকে সকলেই বাঙ্গালা বলেন। যদি কোথা হইতে, আর কোনখান থনে ...প্রভৃতি বৈলক্ষণ্য, ভাষা এক থাকিল, তবে কোথা হইতে, আর কোরপরা (অসমিয়া), এই প্রভেদের জন্য জন্য ভাষা পৃথক বলিতে হইতে কেন পাঠকগণই বিবেচনা করুন।" (বিনয় ঘোষ, "সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র", ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৯৪-৫৯৫) "সোমপ্রকাশ"এ, ভুলুয়া অঞ্চলের হিন্দু-বিধবাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ আইন চালু হলে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তার সম্পর্কে একটি প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন ছাপা হয়। তিনি লিখেছিলেন; 'যে স্থানে যাই সে স্থানেই ঐ কথা শুনিতে পাই, কেহ বলে, 'রামমাণিক্য বাই, হুনুচনি, রাঁড়ির হাঙ্গা আইব'......রামমালা নাম্নী অত্যল্প বয়স্কা এক বিধবা গৃহমধ্যে শয়নে ছিল, মাণিক্য-মালা তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল : 'রামমাল্য কণ্ডাইলো......ও পোড়াকওয়ালি, তুই আর হোতনের দিন পাচ্‌নানি......তরা হগ্‌গলে হুনুচনি, রাঁড়ির হাঙ্গার আইনু আইচে......' তচ্ছ্রবণে তাহারা কহিল, 'তর এই কতা কনে কইচে, কণডাই হুনুচশ্‌......' মাণিক্যমালা কহিল, 'হাঁচা, হাঁচা; আমাগো বাড়ীর বুড়াতে পানপাড়া কাচারিৎ গেছিল্‌ হেইতে হমাচারের কাগজ হুনি আই কইচে।' [তদেব, পৃঃ ৭৭৬-৭৭]

সিসিল বিডন্‌-এর শাসনকালে কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত রেলপথ প্রসারিত হয়। রিচার্ড টেম্পল-এর আমলে (১৮৭৪-৭৭) প্রায় সমগ্র উত্তর ও পূর্ববঙ্গে রেলপথ বিস্তৃত হয়। তার ফলে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসার কোনো অসুবিধা রইল না। "সোম-প্রকাশ"-এ উদ্ধৃত একটি পত্রে দেখা যায়, ১২৭৯ বঙ্গাব্দে আসামের গোলদারী ও 'মুদি' ব্যবসা 'বাঙাল'-দের নিয়ন্ত্রণে ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'হরিদ্রাগ্রামের' পোস্ট-মাস্টারকে একজন 'বিক্রমপুরের লোক'রূপে চিত্রিত করেছেন। ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথের সঙ্গে তাঁর কথোপ-কথন দ্রষ্টব্য। এ-সময়ে কলকাতায় লেখাপড়া শিখতে এসে বাঙাল যুবকের 'নিমচাঁদ' হয়ে যাওয়ার সত্যি ঘটনা জানা ছিল বলেই দীনবন্ধু মিত্র "সধবার একাদশী"তে রামমাণিক্যকে টেনে

এনেছেন। এ-সম্পর্কে দীনবন্ধুর পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন : 'কলিকাতা-সমাজের অভিজ্ঞতা-শূন্য পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ["দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী", বসুমতী সং, ১ম খণ্ড, ৪১ পৃষ্ঠা]

রামমাণিক্যের একটি কথায় জানা যায়, 'বিক্রমপুর-কলকত্তা অল্প দিনের ব্যবধান।' রাম-মাণিক্যের দুঃখ, নানারকম চেষ্টা করেও সে ক'লকাতার বাবু হয়ে উঠতে পারেনি; 'কলকাত্তার মত না করচি কি। মাগীবাড়ী গেছি......গোরার বারীর বিস্‌কাট্‌ বক্কোন কর্‌চি, বাণ্ডিল্‌ (ব্রাণ্ডি) খাইচি—এতো কর্যাও কলকাত্তার মত হবার পারলাম না......'

দীনবন্ধু অবশ্য "নবীন তপস্বিনী" নাটকে একটি 'রাজ-ঘটক'-এর বাঙাল দেশে মেয়ে দেখতে নাস্তানাবুদ হবার বিবরণ দিয়েছেন; মেয়েটির বিচিত্র বেশভূষা দেখে ঘটক-মশাই হেসে ফেলেছিলেন, তখন 'মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হ'ল, আমাকে মারবার উদ্‌যোগ কল্লে। কেহ বলে : 'হাস্‌ দিলে ক্যান্‌', 'মাগীবাড়ী আইচো নাহি', কেহ বলে, 'হালার পো হালারে আড্‌ডা চরে বৈকুন্টে পাটায়ে দেই।' মহারাজ, সাবধানের বিনাশ নেই, সেখান হইতে পলায়ন করলেম'। এই বিবরণ শুনে রাজার ভাঁড় মাধব বলল : 'বাঙ্গালেরা কি মান্তে জানে?' এখানে উল্লেখযোগ্য, কলকাতায় যাওয়ার ফলে এক উত্তরবঙ্গীয় মুসলমান এবং মহিলা-জমিদারের চরিত্রহানির বিবরণ দিয়েছেন মীর মশাররফ্‌ হোসেন, তাঁর "গাজী মিয়ার বস্তানী"তে। মহিলার নাম, 'বেগমঠাকরুণ।'

ঊনিশ শতকের শেষের দিকে বাঙলার সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে বেশ কিছু 'বাঙাল' বিশেষ তৎপর হ'য়ে ওঠেন। এ'রা হলেন, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪); হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬), দুর্গামোহন দাস (১৮৪১-১৮৯৭), মনো-মোহন ঘোষ (১৮৪৪-১৮৯৮), দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৮৯৮), নবকান্ত চট্টো-পাধ্যায় (১৮৪৫-১৯০৪), আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬), মতিলাল ঘোষ (১৮৪৭-১৯২২), শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১), লালমোহন ঘোষ (১৮৪৯-১৯০৯) আনন্দচন্দ্র মিত্র (১৮৫৪-১৯০৩), গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮), অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৮-১৯২৩), বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২)।

সম্ভবত শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে পূর্ববঙ্গবাসীদের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার কথা মনে রেখেই উল্লেখযোগ্য 'বাঙাল' চরিত্রের নিদর্শন ১৮৭০ খৃীষ্টাব্দের পরে আর বিশেষভাবে দেওয়া হয়নি। কিন্তু 'বাঙাল মনুষ্য নয়' ভাবটি তখনও ছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের মেট্রোপলিটান্‌ স্কুল-এ শিক্ষকতার কাজ না-পাওয়ার একটি বড় কারণ ছিল এই যে, বিদ্যাসাগর তাঁকে 'বাঙাল' ভেবেছিলেন, এবং বলেছিলেন : 'তাই তো তুই যে বাঙ্গাল......এখানকার ছাত্র তোর টিপ্রা জেলার ভিক্টোরিয়া ইস্কুলের ছাত্র নয় যে তুই অনার্‌স্‌ পাশ শুনিয়া চমকিয়া উঠিবে......তোকে তো একদিন পাগল করিয়া ছাড়িবে।' পরে অবশ্য বিদ্যাসাগর তাঁর যোগ্যতা স্বীকার করেন। (দীনেশচন্দ্র সেন, 'ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য', পৃঃ ১৩০-৩২)

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৪ ও ১৮৮৭ খৃীষ্টাব্দে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের পটভূমিকায় যথাক্রমে "দেবী চৌধুরাণী" ও "সীতারাম" উপন্যাস দুটি রচনা করেন। তাঁর বহু পূর্বেই অবশ্য যশো-হরের পটভূমিতে দীনবন্ধু "নীলদর্পণ" লিখেছিলেন। ১৮৭৩ খৃীষ্টাব্দের পাবনা ও সিরাজ-গঞ্জের প্রজাবিদ্রোহ নিয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত 'Arcyde' ছদ্মনামে লালবিহারী দে সম্পাদিত *Bengal Magazine*-এ বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রমেশচন্দ্র মৈমনসিংহের নেত্রকোণায়

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দত্ত হায়ার ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। 'বাঙাল' হলেও নবীনচন্দ্র সেন ও গোবিন্দচন্দ্র দাস এবং মীর মশাররফ্ হোসেন এ-পার বাঙলায় সহজেই স্বীকৃতি লাভ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'বাবু' নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ করেছেন, 'বাঙাল' নিয়ে নয়; এমন কি "বঙ্গবাসী" পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙাল' নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেন নি।

উনিশ শতকের শেষ দশকে "ছিন্নপত্রাবলী"তে রবীন্দ্রনাথ রূপসী বাঙলার যে সুন্দর ছবি এঁকেছিলেন, তা পদ্মা-বিধৌত পূর্ববঙ্গের ছবি। বাঙাল মাঝির গান শুনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'গান তার পূর্বে তেমন মিষ্টি কখনো শুনিনি।' তিনি অবশ্য 'যোবতি! ক্যান্ বা কর মন ভারী। পাবনা থ্যাহে এনে দেব ট্যাহা দামের মোটরী॥', এই গান শুনে প্রচুর কৌতুক উপভোগ করেছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সৃষ্ট 'বাঙাল' নিধিরামের কথাবার্তা আদৌ 'বাঙাল' নয়, এবং তার অন্তর্জলি-যাত্রার বিবরণও শোকাবহ। কিন্তু 'রসরাজ' অমৃতলাল বসু 'ব্রাহ্ম' বাঙালদের খুব একহাত নিয়েছেন তাঁর 'বাবু' নাটকে। সেখানে একটি চরিত্র কন্দর্পকান্ত। সে 'ব্রাহ্ম', 'বাবু' এবং বাঙাল। বৃদ্ধা ঠাকুরমার 'বিধবা বিবাহ' দেবার জন্য সে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে; তার বক্তব্য :

'কও তো আজিমা! বসন্তকালে যহন দাহিনা বাতাস ফুর্‌ফুর্ করবার লাগে, আমের ডাইলে বইসে কালা কোহিলা যহন কুহু কুহু ফুক্‌রাইবার লাগে, ফুলবাগিচায় ভোমরা-গুলাইন যহন গুন্ গুন্ করবার লাগে, তখন তোমার প্রাণডা নি ক্যামন করে? তার 'আজিমা' অবশ্য তাঁর 'গুপাল' (গোপাল)-এর মস্তকে মাসেককাল মধ্যনারায়ণ তেল মালিসের ব্যবস্থা করেছিলেন।

খাঁটি 'ঢাকাইয়া' ভাষায় একটি উপভোগ্য কবিতা লিখেছিলেন 'কান্তকবি' রজনীকান্ত সেন। কবিতার বিষয়বস্তু, বৃদ্ধ স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে তোয়াজ করা। তার কয়েকটি চরণ :

'বাজার হুদ্দা কিন্যা আইন্যা ঢাইল্যা দিচি পায়।
তোমার লগে কেম্‌তে পারুম, হইয়া উঠচে দায়॥
আর্‌সি দিচি, কাঙ্কই দিচি
গাও মাজনের হাপান দিচি
চুল বান্দনের ফিত্যা দিচি, আর কি দেওন যায়?
উলের হুতা দিচি আইন্যা
কিসের লইগ্যা মন্‌ডা পাই না?
বুড়া বুড়া কইরা কেবল,
খ্যাপাইয়া ক্যান করছ পাগল?
যহন বিয়া করচ, ফ্যালবা ক্যাম্‌তে কইয়া দেও আমার॥
(বাঙালের বৈরাগ্য, "বাণী")

এই সুন্দর কবিতাটি সম্পর্কে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : এই কবিতায় 'নিছক হাস্য-রসই আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে বিদ্রূপ নাই।' খুবই খাঁটি কথা।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় এ-পার-ওপার বাঙলার মাঝখানে সীমারেখা মুছে গিয়েছিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা-ভাষাভাষী সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তখন কোনো প্রতিবাদ হয়নি। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামকে

আসামের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার সরকারি অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু এ-কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দুর্বলতা এবং সে-সম্পর্কে কলিকাতার নেতাদের দীর্ঘকালের অবজ্ঞা, বোধ হয় লর্ড কার্জন ও তাঁর পরামর্শদাতাদের বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে খানিকটা উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু এই আন্দোলনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বাঙলাদেশের কবি, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দ। 'বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন' সে-দিন সত্যি সত্যি এক হয়ে গিয়েছিল। এজ্‌রা পাউন্ড বলেছিলেন 'Tagore has suny Bengal into a nation'।

অথচ দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্যিক ও সামাজিক নেতাদের পূর্ববঙ্গকে অবজ্ঞা করার একটি কু-ফল ফলেছিল। পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান সমাজ সম্পর্কে তাঁদের সীমাহীন অজ্ঞতা এবং অবজ্ঞা, তাঁদের সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানদের উল্লেখ পর্যন্ত না-থাকা, বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক ও আত্মিক একতার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত করে তুলেছিল। এখনো পর্যন্ত 'বাঙালী' কথাটির অর্থ অনেকেই শুধু 'হিন্দু' মনে করেন; 'মুসলমান' শব্দের যে একটি 'বাঙালী' অর্থ হ'তে পারে তা তারা স্বীকার করেন না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ভূত-প্রেত নিয়ে গল্প লিখেছেন; কিন্তু বাঙালী মুসলমানের সুখদুঃখ নিয়ে একটি কবিতা, একটি গল্প, একটি নাটক, একটি গান লেখেননি। অথচ তাঁর মুসলমান অনুরাগীর সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। রবীন্দ্র-সাহিত্য মানবিক আবেদনে পূর্ণ, জাতি-ধর্মের উর্ধ্বে। কিন্তু তারপরেও কেন যে তিনি অখন্ড বাঙলার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমানদের বিষয়ে তেমন কিছু সাহিত্যিক উৎসাহ দেখাননি,—এ-প্রশ্ন থেকেই যায়। পূর্ববাঙলা ছিল মুসলমান-অধ্যুষিত; সেই পূর্ববাঙলাই ছিল বঙ্গসাহিত্যের অবহেলিত নায়িকা। এবং সে-কারণেই বাঙাল সাহিত্যে তাদের প্রবেশ ছিল প্রায় নিষিদ্ধ। এ-জন্য পরে বহু মূল্য দিতে হয়েছে।

মুঠো

লোকনাথ ভট্টাচার্য

কনুই-এর গুঁড়ি থেকে গাছ, শেষে চাঁপার কলির মতো আঙুলের ডগা। একটি মই। যার উপরে উঠলে আকাশ, অথবা উঠতে-উঠতে একবার সুড়ুৎ করে বাইরে পিছলে যেতে পারলেই

চেয়ারের হাতলের পরের শূন্যতা, তারো পরে ঘরের তরঙ্গে-তরঙ্গে নাচা, অবশেষে খোলা দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া

পথে, পরে বনে, পরে হু-হু হাওয়ার দিগন্তে।

তাই পৌঁছোতে যে হবেই শেষ ধাপে, এমন কথা নেই, কারণ মূর্তিমান অনন্ত সর্বত্র, কারণ দ্বিতীয় ধাপ থেকে লাফ মারলেও মুক্তি, সহসা গোধূলি,

এসে ধাক্কা খাওয়া গ্রামের দুঃখের কিনারে।

কিম্বা তৃতীয় ধাপ, ঐ যেখানে কাঁকন সুরু হয়, পিছলে যাওয়া চলে সেখান হতেও, পরেই যাত্রার দামামা শোনা, আগুন-জ্বলা রাত্রির বৃহত্তর ব্যাপ্তি।

কিন্তু কোন্-কোন্ ধাপে কত সম্ভাবনা, তার ফিরিস্তিতে লাভ নেই, যেহেতু অমৃতের কাঙাল আমার চোখ কব্জি পেরিয়ে যেই পৌঁচেছে হাতের চেটোর,

অমনি তুমি সুনিপুণ শিকারীর মতো মুঠোটা বন্ধ করলে।

এক ধরনের অহংকার

শামসুর রাহমান

এখনো দাঁড়িয়ে আছি, এ আমার এক ধরনের অহংকার।
বেজায় টলছে মাথা, পায়ের তলার মাটি সারা দিনমান
পলায়নপর,
সেই কবে থেকে তবু রয়েছি দাঁড়িয়ে।
অত্যন্ত জরুরী কোনো আবহাওয়া ঘোষণার মতো
দশদিক রটাচ্ছে কেবলি : হাড়ে ঘাস
গজাতে গজাতে
বুকে হিম নিয়ে তুমি বড়ো নির্বান্ধব, বড়ো একা হয়ে যাচ্ছো।

আমার ভূভাগ থেকে আমাকে উৎখাত করবার জন্যে কতো
পাইক পেয়াদা
আসছে চৌদিক থেকে, ওরা তড়িঘড়ি
আমার স্বপ্নের
বেবাক স্থাবর অস্থাবর
সম্পত্তি করবে ক্রোক, কেউ কেউ ডাকছে নীলাম
তারস্বরে, কিন্তু আমি উপদ্রুত কৃষকের মতো
এখনো দাঁড়িয়ে আছি চালে,
ছাড়ছিনে জলমগ্ন ভিটে।

আমার বিরুদ্ধে সুখ সারাক্ষণ লাগায় পোস্টার
দেয়ালে দেয়ালে,
আমার বিরুদ্ধে আশা ইস্তাহার বিলি করে অলিতে গলিতে,
আমার বিরুদ্ধে শান্তি করে সত্যাগ্রহ,
আমার ভেতর ক্ষয় দিয়েছে উড়িয়ে হাড় আর
করোটি-চিহ্নিত তার অসিত পতাকা।

আমার জনক এতো ব্যর্থতার শব আজীবন বয়েছেন
কাঁধে, বঞ্চনার মায়াবী হরিণ তাঁকে এতো বেশী
ঘুরিয়েছে পথে ও বিপথে, আত্মহত্যা করবার
কথা ছিলো তাঁর, কিন্তু তিনি যেন সেই অশ্বারোহী,
জিনচ্যুত হয়েও যে ঘোড়ার কেশর ধ'রে ঝুলে থাকে
দাঁতে দাঁত ঘষে।

আমার জননী এতো বেশী দুঃখ সয়েছেন, এতো বেশী
ছেঁড়াখোঁড়া স্বপ্নের প্রাচীন কাঁথা করেছেন সেলাই নিভৃতে,
দেখেছেন এতো বেশী লাল ঘোড়া পাড়ায় পাড়ায়,
　　　　　　　　　　এতবার স্বপ্নে, জাগরণে

ভূমিকম্পে উঠেছেন কেঁপে, তাঁর ভয়ানক মাথার অসুখ
হওয়া ছিলো স্বাভাবিক; কিন্তু ঘোর উন্মত্ততা তাঁর
পাশাপাশি থেকেও কখনো তাঁকে স্বাভাবিকতার
ভাস্বর রেহেল থেকে পারেনি সরাতে এক চুলও।

বুঝি তাই দুঃসময়ে আমার আপন শিরা উপশিরা জেদী
অশ্বক্ষুরে প্রতিধ্বনিময়।
　　　　　　　　যেদিকেই বাড়াই না কেন পদযুগ,
　　　　　　কোনোদিন কোনো
গন্তব্যে পৌঁছুতে পারবো না; আমি সেই অভিযান—
প্রিয় লোক, যার পদচ্ছাপ মরুভূমি ধ'রে রাখে
ক্ষণকাল, যার আর্ত উদাস কঙ্কাল থাকে প'ড়ে
বালির ওপর অসহায়, অথচ কাছেই হৃদ্য মরূদ্যান!

কী-যে হয়, একবার রক্তস্রোতে একবার পূর্ণাঙ্গ জ্যোৎস্নায়
ভেসে যায় হৃদয় আমার। যেদিকে বাড়াই হাত
সেদিকেই নামে ধস্, প্রসারিত হাতগুলো গহ্বরে হারায়
আর আমি নিজে যেন পৌরাণিক জন্তুর বিশাল
পিঠের ওপর একা রয়েছি দাঁড়িয়ে; চতুষ্পার্শে
অবিরল যাচ্ছে ব'য়ে লাভাস্রোত। কম্পমান ভূমি;
　　　　　　　　　　প্রলয়ে হইনি পলাতক,
　　　　　　　　　　　　নিজস্ব ভূভাগে একরোখা
এখনো দাঁড়িয়ে আছি, এ আমার এক ধরনের অহংকার।

দ্বিতীয় প্রকৃতি

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

শেষ নীলিমার সুদূর খিলানে তারা
একে একে ফোটে সন্ধ্যার সম্মোহে,
বিশাল মঞ্চে জাগে খরশান সাড়া
সমবেত গীত-বাদ্যের সমারোহে।

এক হাতে ধরে চাঁদের বাঁকানো ফলা
পাপড়ি খোলে সে নৃত্যের সংলাপে,
বুকের উপরে বাসনার ছলাকলা,
কটী ঘিরে তার নারিকেল-বীথি কাঁপে।

স্বচ্ছ বাতাসে জড়ানো অঙ্গমালা,
ভিতরে গোপন গভীর সম্ভাবনা:
কখনো জাগায় আমন্ত্রণের জ্বালা
আবার কখনো তোলে নিষেধের ফণা।

কটাক্ষে ঘোরে দিগন্ত আয়োজন,
চুলে নদী বয় প্রবল সর্বনাশে,
বাহুর মোচড়ে তীব্র পর্যটন,
পদপাতে দ্যুতি রাত্রির ঘাসেঘাসে।

আবার কখনো নাভির অন্ধকারে
দূরের তুমুল জোনাকিরা ওঠে জ্বলে:
আদি প্রকৃতির সাবলীল সম্ভারে
মনে হয় তাকে দ্বিতীয় প্রকৃতি বলে।

ক্ষয়ে যাচ্ছে গৃহস্থ উদ্ভিদ

ফণিভূষণ আচার্য

মানুষের ব্যথার ভেতর ফুটবে আতর গোলাপ   তুমি
কথা দিয়েছিলে   ভীষণ অস্পষ্ট কথা দিয়েছিলে
এভাবে কি ঠিক সকল বঙ্গজনকে কথা দেওয়া
কিছু কিছু ঠিক থাকে সব ঠিক থাকে না   কখনো
বিষণ্ণ রাইয়ের ক্ষেতে শীতের বিকেল চলে যেতে যেতে
ফিরে চায় মায়াময় দুলে যায় দীর্ঘনিশ্বাসের বালিকারা
ফুরায় যবের বেলা ব্যথার ভেতর ব্যথা বাড়ে
সারাদিন তুমি ঘরে চন্দন বাটছো একলা   দ্যাখো
শব্দের কিনার দিয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে গৃহস্থ উদ্ভিদ
ঘরের দরজা খুলে চলে যায় চালতাবনের রোদ
পথ চিনে চিনে গুলঞ্চলতার দিকে
গায়ের কাপড়ে পড়ে ভালোমন্দ টান
শীতের বিকেল চলে যেতে যেতে ফিরে চায়
শুকনো খড়ে রোদ
আকাশ-পেরোনো দীর্ঘ রেললাইন
জ্যামিতিতে বেঁকে গেছে চোখের কিনারে
এ সময়ে একা-একা রেললাইনের দিকে চেয়ে থাকতে
ভয় হয়   একা-একা
বিলোল দাঁড়িয়ে থাকে নদীর পারের দুঃখী উদাসীন আলো
তুমি কথা দিয়েছিলে ভীষণ অস্পষ্ট কথা দিয়েছিলে কেন
কোনদিন আতর গোলাপ চূর্ণ ব্যথার ভেতর
ফোটে না   এভাবে তুমি কেন কথা দাও   রোজ আকাশের
কাপড় বদলানো চেয়ে দ্যাখা ভালো নয়   তুমি সব জানো
বিকেলের এই আলো বড়ো মায়াময় নয়নজলির জলে
মেছো বক ছায়া ফেলে হৃদয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে ডানা ঝাড়ে
কখন রাতের দিকে উড়ে যাবে   আতর গোলাপ
জরদ্গব ব্যথার ভেতর ফোটে না   এভাবে অস্পষ্ট কথা
কখনো দিয়ো না তুমি গৌড়ীয় জ্যোৎস্নায়

মুখোমুখি

সুনীথ মজুমদার

যাব ব'লে কতোবার ভেবেও যাইনি। ভেবেছি
কী ভাবে যাব? দেখা হ'লে
আগের মতোই আবেগী উচ্ছ্বাস নিয়ে কথা হবে কিনা
এ-রকম ভাবতে-ভাবতে
যখন এই মাঠের মধ্যে এলেবেলে মুহূর্তকে
ছিঁড়ে-ছিঁড়ে নষ্ট করছি, তখন আচমকা তোমার প্রতীক্ষিত মুখ
নীরব হাস্যস্বননে দেখা দিয়ে
আমাকে লণ্ডভণ্ড ক'রে দেয়। সঠিক চিনেছি
তবু স্বভাবী দৃঢ়তায় আমি স্থির।

যাব ভেবেও ঠিক সে-মুহূর্তে কাছে যাওয়া অসম্ভব হ'লো
তোমার আঁখি-পদ্মে গোপন নিবেদন
আগের মতোই আকৃতিময় কিনা, তোমার দ্বিধাবিভক্ত জীবন
পুনর্বার ফিরে আসবে কিনা, এ-রকম ভাবতে-ভাবতে
আমার নিজস্ব আঙ্গিকে ভাবনা সংহতি নেয় অক্ষরবৃত্তের।
আমার শুধু দূরে দাঁড়ানো, নিঃশব্দের ডানা মেলে দেয়া!

আর নিস্তব্ধ রাত্রি এসে
আমাকে নতুন বর্ণমালা লিখে নেবার প্ররোচনা দেয়।

আবহমান কাল

আবহমান কাল আমরা তুলেছি সোনালী ধান...........বুনেছি বীজ

অসীম রায়

[লেখকের নিবেদন : তিরিশ বছর ব্যাপী একটি পারিবারিক উত্থানপতনের কাহিনী যখন ধারাবাহিক-ভাবে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হবার কিছু পরেই অকস্মাৎ বন্ধ হয় তখন লেখকের বিহ্বলতা স্বাভা-বিক। আটটি পর্বে সমাপ্ত উপন্যাসটির প্রথম পর্ব বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ উপন্যাসটি প্রকাশিত হবে। এক একটি সংখ্যা এক একটি পর্বে সমাপ্ত।]

জল ফুঁসছে, জল ফুলছে, বাদামি জল আছড়াচ্ছে দুই পাড়ে, ১৯৩৫ সালের এক রৌদ্র-করোজ্জ্বল সকাল। কখনও জল আদিগন্ত রুপোলী ইলিশ, আবার ঘন মেঘের ছায়ায় তার থমথমে সমাহিত বিস্তার। স্টিমার যখন চলে তখন ইঞ্জিনের ধক-ধকিতে পারের আওয়াজ কানে পৌঁছয় না, কিন্তু গঞ্জে পৌঁছনোর আগে যখন ইঞ্জিন বন্ধ করে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন ঝুপ ঝুপ করে পাড় ভাঙ্গার শব্দ আসে। আর বাদামি জলে কমলালেবু রংয়ের পাল তুলে বড় বড় নৌকো আসে, বাতাসে বাতাসে মট্ মট্ করে মাস্তুলের জোড়। স্টিমারে পাক খাওয়া ঢেউ নাচায় নৌকোগুলো, জলের ওপর কখনও কখনও সাদা ফাটা তালিমারা আবার কখনও অক্ষত রোদ-বৃষ্টি লাগা ফ্যাকাসে গৈরিক পালগুলো ওঠে নামে।

—জলের একটা গন্ধ আছে, নারে ? দোতলার ডেকে রেলিংএর ওপর ঝুঁকে চোঙা বলে।

টুটুল অবাক হয়ে চেয়ে থাকে স্টীমারের বিশাল প্যাডেলের দিকে। কয়েক ফোঁটা জল ছিটিয়ে পড়ে দু'ভাইয়ের মুখে চোখে।

—নানা যেন দুধ জ্বাল দিচ্ছে, হাতায় করে দুধ উঠছে আর নামছে, উঠছে আর নামছে ! বুড়ী বললে।

—দ্যাখ্ দ্যাখ্, ডুবে গেল। চোঙা চেঁচিয়ে উঠল। এপার ওপার দেখা যায় না নদীর মাঝখান দিয়ে ডিঙ্গি বাইছে দশবারো বছরের ছেলেটা। স্টিমার কাছে আসতেই ঢেউয়ের উথালিপাথালিতে মনে হচ্ছে এই ডুবে গেল। বিশাল ঢেউয়ের নীচে ডিঙ্গি সমেত ছেলেটা এই অদৃশ্য হচ্ছে, এই ভেসে উঠছে চোখের সামনে। দোতলার ওপর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ছেলেটাকে। কালো ভেজা গা ঝলকাচ্ছে রোদ্দুরে, ঠিক যন্ত্রের মতো ক্ষিপ্র গতিতে বৈঠা উঠছে নামছে। কোন দিকে দৃষ্টি নেই, সামনের অতিকায় গর্জমান ঢেউয়ের যমদূতগুলো ভ্রূক্ষেপ না করে সে বৈঠা বেয়ে চলেছে। স্টিমার অনেক দূরে চলে গেলেও বিশাল জলরাশির ওপর কালো বিন্দুর মতো সে নড়ে।

এবার একটা গঞ্জ আসছে। ইঞ্জিন বন্ধ হতেই পাড় থেকে ঝুপঝুপ শব্দ বেশ স্পষ্ট। ভাসমান ফ্ল্যাটের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে পাটের গাঁট, গুড়ের নাগরীর পাহাড়। সবুজ নীল চকরাবকরা লুঙ্গির উপর জালিকাটা গেঞ্জি পরে দু-তিনটে লোক কাছি হাতে দাঁড়িয়ে, জাহাজ আসতেই কাছি ছুঁড়ে বাঁশের লম্বা পোল দিয়ে ফ্ল্যাটের গা ঠেকা দিয়ে দাঁড়ায়। ফ্ল্যাটের এক পাশে চুল-কাটার সেলুন। সাদা বোর্ডের ওপর বড় বড় লাল হরপে লেখা : প্রফেসর রমণীমোহন কর্মকার। দুটো সরু লম্বা পাটাতন ফেলে দিতেই দুড়দাড় করে নীচতলার লোক ওঠে। ডগডগে লাল, সবুজ আর নীল শাড়ির প্রাধান্য বেশী। বেশীর ভাগেরই কাঁখে ছেলে, হাতে ছেলের হাত। সরু তক্তার ওপর দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে পরস্পরের সঙ্গে চীৎকার করে গল্প করতে করতে সামনের লোককে ডাক দিতে দিতে তারা নীচ তলায় ওঠে। অনেকের হাতে লাউ। কয়েকটা ছেলে আখ্ চিবোতে চিবোতে স্টিমারে ওঠে। পাকা কলা আর গুড়ের চাপা গন্ধে সমস্ত গঞ্জ এলাকা ভুর ভুর করে।

এতক্ষণ পরম নিশ্চিন্তে যে লোকটা তার গলা প্রচুর সাবানের ফেনায় সাদা করে বসেছিল

তার দাড়ি কাটা হয়। স্টিমারের ঘণ্টা দেয়। লোকটা চেয়ার থেকে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে হঠাৎ দৌড় মারে। তারপর শূন্যে লাফ মেরে অপসৃয়মান পাটাতনে উঠে প্রচুর গালাগাল দিতে দিতে ও খেতে খেতে জাহাজে ওঠে।

—আমাদের জাহাজের নাম কি বল তো? চোঙা জিজ্ঞেস করে ধাঁধার প্রশ্নের মতো।

রেলিংয়ের ওপরে একটু ঝুঁকে টুটুল পড়ে পাশ থেকে,—কে-আই-ডবলিউ-আই।

—পারলি না, কিউই, কিউই। মানে কি বল তো?

—একটা পাখি, আমি দেখেছি, বাবার জুতোর কালির ঢাকনিতে। কিউই ব্র্যান্ড কালি।

—আমি চিড়িয়াখানায় দেখেছি।

টুটুল যদিও বাবার জুতোর কালির ঢাকনায় পাখিটার ছবি দেখেছে কিন্তু সেই পাখির সঙ্গে এই সুন্দর ভাসমান অবলীলাক্রমে জল কেটে যাওয়া জাহাজটার সাদৃশ্য খুঁজে পায় না। বরং 'সোয়ান' রাখলে পারত। 'সোয়ান' মানে রাজহাঁস, সম্প্রতি সে, জেনেছে।

এস. ডি. ও. ভবনাথ চৌধুরীর ছোট ছেলে তার দিদি-দাদার থেকে একটু আলাদা। ফেলে-আসা রাণাঘাটের জীবনটার আকর্ষণ এখনও তার কাছে প্রবল। আবহমানকাল আমরা তুলেছি সোনালী ধান বুনেছি বীজ।

বুড়ী ও চোঙা সশব্দে হেসে ওঠে।—চূর্ণী নদীতো একটা নালা রে, বুড়ী বললে।

বিশাল ঢেউ আর ফেনা সমুত্থিত প্যাডেলস্টিমারের অগ্রভাগের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে টুটুল বলে,—আমার ছোট নদীই ভাল লাগে। বলার সঙ্গে সঙ্গেই স্টীমার ভোঁ দেয়। আর আদিগন্ত বিস্তৃত নদীর মাঝখানে সেই গম্ভীর আওয়াজ প্রতিধ্বনি তোলে তার ছোট্ট হৃদয়ে। এ আর এক জগত, জলের জগত, মাঝ নদীতে ডিঙ্গি বাওয়া শক্তির জগত, গঞ্জে গঞ্জে প্রাণ-চাঞ্চল্যের জগত, নৌকোর হালে সাদা-দাড়ি মাল্লার স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকার জগত—এ জগত রাণাঘাটের ছোট্ট ছায়ায় ঘেরা এস. ডি. ও. কোয়াটারের দ্বীপ থেকে আলাদা। টুটুল বুক ভরে বাতাসে জলের গন্ধের সঙ্গে এই নবীন জগতের আঘ্রাণ নেয়। নেজের মনেই বলে,—এত জল, আমার ভয় করে।'

তোর ভয় করে, আমার ভাল লাগে। আমার বিপদ ভাল লাগে। চোঙা বললে।

এবার যে গঞ্জটা আসছে তা আগের চেয়েও বড়। কাদায় বাঁশপোতা ভিতের ওপর নদীর দিকে পেছন করে সার সার টিনের ঘর। তাদের একটায় মস্ত বড় করে সাইন বোর্ড 'গ্র্যান্ড হোটেল'। কাছেই ফ্ল্যাট, তার গায়েই আর এক হোটেল। মাংসের ঝোলের গন্ধ মিশে থাকে নদীর তীরে পলিমাটির গন্ধে।

ডেক চেয়ারে বসে আছেন ভবনাথ। চাঁদিতে টাক কিছুদিন হল বিস্তার লাভ করেছে, কিন্তু কানের পাশ দিয়ে কোঁকড়া চুলের গুছি হাওয়ায় দোলে। এতক্ষণ রৌদ্রঝলকিত নদীবক্ষে গুনগুন করছিলেন। রাণাঘাটের গোপাল মাষ্টার সম্প্রতি তাঁর বেহালায় শ্যামাসঙ্গীতের অব্যবহিত পরেই যে রবীন্দ্রসঙ্গীত তুলছিলেন বুড়ীর দিদি গৌরীর জন্যে সেই গানটা : অয়ি ভুবন মন-মোহিনী, অয়ি নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী......রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর ভাল লাগে না। কিন্তু কোন কোন গানের ভাষায় যদি যুক্তাক্ষর সন্ধি সমাসের বাহুল্য থাকে তবে সে গানগুলো তাঁর কাছে উৎকৃষ্ট ঠেকে। স্বর্ণসুন্দরী পাশে বসে চোঙার পুল-ওভার বোনেন। একবার স্বামীর প্রশান্ত মুখের দিকে চেয়ে বলেন,—প্রতাপটার চিঠি পেতে এবার এত দেরী হচ্ছে কেন বল তো। তুমি গিয়েই টেলিগ্রাম করে দাও। আবার ঠাণ্ডাটাণ্ডা বেশী লাগলে......

ভবনাথ সেদিকে কান দেন না। বলেন,—ভোলার কথা মনে আছে?

—কোন কথা?

—সেই রাতগুলোর কথা? হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কথা। উঃ কি মুস্কিলেই ব্যাটারা ফেলেছিল। সতীন সেনের দল খঞ্জনী বাজিয়ে যাবেই সেই রাস্তা দিয়ে, আর ওদিকে সড়কি আর লাঠির একেবারে জঙ্গল। মিউজিক বিফোর মস্ক! উঃ কি সব দিন গিয়েছে।

—সেইরকম দেশেই তো আবার যাচ্ছো।

—তা যাচ্ছি। ভবনাথ বলেন লোকজনে টাপ্‌রে টুপ্‌রে জেটিটার দিকে চেয়ে চেয়ে। পাশেই দুটো মস্ত গহনা নৌকায় গাদি করে লোক উঠছে। জানলা দিয়ে বোধহয় নববিবাহিত এক কিশোরী তাকিয়ে আছে জলের দিকে। 'গ্র্যান্ড হোটেল' থেকে লোকে বেরোচ্ছে পান চিবুতে চিবুতে, কোঁচার খুঁটে মুখ মুছছে কেউ।

স্বর্ণসুন্দরী হঠাৎ চোখ তুলে বললেন,—এই যে সব কাগজে কাগজে লিখছে, ছেলেরা জেল খাটছে। তুমি ভাবতে পারো, ইংরেজরা নেই আমাদের দেশে? আমি ভাবতে পারি না।

—আমিও পারি না স্বর্ণ। আমাদের মধ্যে এতরকম দল, এত মত। ইংরেজ চলে গেলে আমাদের কি অবস্থা হবে জানো? ইংরেজদের আসার আগে অযোধ্যার রাজা যেমন দেশ শাসন করত ঠিক তেমনি। নিজেদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি, অরাজকতা।

অদূরে সাদা কালো স্টিমার খানা গল গল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আসছে। সেদিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্বর্ণসুন্দরী বলেন,—আমরা তো বলতে গেলে পার করে দিলাম আমাদের জীবন। ভাবছি ছেলেমেয়েদের কথা। তাদের সময়ে পাল্টে যাবে অনেক কিছু। বলাই বলত—

—ও বাবা! তুমি এখনও বলাইকে ভুলতে পারো নি।

—নাঃ বলাইটা বেশ ছিল। একটু থেমে বললেন,—বলাই বলত মা, গাঁয়ের লোকে ইংরেজও বোঝে না, কংগ্রেসও বোঝে না, তারা দুবেলা পেট ভরে খেতে চায়।

ভবনাথ উৎসাহিত হয়ে বললেন,—আমিও তাই বলি স্বর্ণ, আমিও তাই বলি। গাঁয়ে রাস্তা নেই, স্কুল নেই, শহরে চাকরীর ব্যবস্থা নেই, আগে তার একটা হিল্লে করো। বড়দা আমাকে খোঁটা দিতেন ইংরেজের গোলাম বলে, কিন্তু গোলাম না হয়ে যদি পাবনার বাড়িতে পড়ে থাকতাম, তাহলে কি এমন দেশের উপকারটা করতাম! যেখানেই গিয়েছি মেয়েদের স্কুল বসিয়েছি, রাস্তা বানিয়েছি, দু-চারটে লোকের চাকরীর ব্যবস্থা করেছি। আর ইংরেজ লোকগুলো তো খারাপ না। এই ব্র্যান্ডি বলো, ফকাস বলো, চমৎকার এড্‌মিনিস্ট্রেটার। কোন ব্যাপারে মাথা গরম করেনা। সব ব্যাপার বুঝতে চেষ্টা করে। ওদের কাছ থেকে আমাদের অনেক শেখার আছে।

—আমার বাবা একটু ভয় ভয় করছে, তোমার এ নতুন জায়গা। যেরকম সব শুনছি টেররিস্টদের ব্যাপার।

'আমার তো আইন আছে স্বর্ণ। আমি আইনমাফিক চলব। আমায় কাউকে ভয় নেই।'

—মা, ইলিশ মাছ! ইলিশ মাছ! চোগুা দৌড়তে দৌড়তে আসে। স্বর্ণসুন্দরী নীচের দিকে চেয়ে দেখলেন, আর একটা গজ আসছে। কয়েকটা পানসী এগিয়ে আসছে মন্থরগতিতে।

স্বর্ণসুন্দরী উঠে আসেন ক্যাবিনে। ক্যাবিনের ভেতর স্টোভ ফোঁস ফোঁস করছে। এক কোণে লুচি বেলছে গোপীনাথ। কিছুক্ষণ পর বড় বড় চাকা চাকা করে বেগুন ভাজা আর একথালা ভর্তি লুচি নিয়ে আসে গোপীনাথ। জলের হাওয়ায় প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেছে ছেলে-মেয়েদের। কাড়াকাড়ি করে ছেলেমেয়েরা খায়। আর সেদিকে চেয়ে চেয়ে স্নেহে ও প্রশান্তিতে ভবনাথ আনমনা হয়ে পড়েন। বন্দেমাতরম টেররিস্ট, ইংরেজ, চাকরীর জগতে উচ্চাশা তার মন থেকে সরে যায়। জন্তুর মতো বড়ো বড়ো মায়াবী দৃষ্টি দিয়ে তিনি চেয়ে থাকেন। বুঝতে পারেন তিনি ঈশান চৌধুরী নন, নতুন নতুন দিকে কর্মৈষণায় উদ্যোগী পুরুষ নন, তিনি একজন শান্তিপ্রিয় আত্মমুখীন মানুষ। বাইরের জগতের উত্থান পতন আলোড়ন তাঁকে স্পর্শ করে কিন্তু তাঁকে প্রচন্ডভাবে আলোড়িত করে না। ইংরেজের চাকরী তাই কোনদিন তাঁর পক্ষে ঠিক একটা মিশান নয়। আর মিশান নয় বলেই যে ঝপাঝপ উন্নতি তাঁদের অফিসারদের ঘটে তা তাঁর ক্ষেত্রে ঘটেনি। ব্র্যান্ডি ফকাস সত্যিই ভাল এড্‌মিনিস্ট্রেটার, তারা বাজে ঘোড়া ধরেন না। ইংরেজের চাকরী যাঁদের কাছে মিশান না, যাঁরা আইনের বইয়ের বাঁধা রাস্তায় যতটুকু বলা আছে ততটুকুই করবেন, অথবা আরও পরিষ্কার করে বলতে পারা যায় যতটুকু না করলে নয় ততটুকুই করবেন এরকম লোক তারা পছন্দ করেন না। তাঁরা নিজেরাই রুটিন বেঁধে দিয়েছেন, কিন্তু রুটিনের চৌহদ্দীতে কাজ সীমাবদ্ধ থাকলে মুস্কিল, আরও কিছু উপরি আছে, ক্লাব আছে, মেলামেশা করার ব্যাপার আছে, ভারতবর্ষে ইংরেজদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত হবার ব্যাপার আছে, এ সবের

মধ্যে যাঁরা নেই সে সব অফিসার কখনই আদর্শ অফিসার নন।

খাওয়া পর্ব মিটলে স্বর্ণসুন্দরী ধীরে ধীরে বললেন,—তোমার এই সাতে নেই পাঁচে নেই ভাবখানা আমি বুঝি না একদম। বাবা বলতেন, কাজ করতে গেলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, সব সময় তাই নিয়ে ভাবতে হয়। শুধু ছাড়াছাড়াভাবে থাকলে চলে না।

ভবনাথ হাসেন।—তুমি যে কি বল স্বর্ণ! এমন চাকরি করছি, লোককে জেলে পাঠাচ্ছি, কলকাতায় বাড়ি বানাচ্ছি, ছেলেকে বিলেত পাঠাচ্ছি, তবু তুমি বলবে ছাড়াছাড়াভাবে থাকি?

আর ভবনাথের সেই শান্ত চোখভরা কোমল দৃষ্টির দিকে চেয়ে চেয়ে পাবনা বাড়ির বৈঠকখানার দেয়ালে ভবনাথের প্রপিতামহ রুদ্রনাথের ছবিখানা ভেসে ওঠে স্বর্ণর মনে। এমনি শান্ত কোমল মায়াবী চাহনি। এর ঠিক উল্টো ঈশান চৌধুরীর চোখ দুটো, তীক্ষ্ন তীব্র, সব কিছু খুঁটিয়ে বিচার করে দেখবার চাহনি। তার নিজের বাপের চোখও ছিল বেশ আয়ত ভাবগম্ভীর কিন্তু তা ভবনাথের মতো কোমল মায়াবী নয়। বেশ আত্মবিশ্বাসের ছায়া ছিল সে দৃষ্টিতে।

—এটা কি নদী?

—ধলেশ্বরী।

—সেই একইরকম তো দেখতে।

—একই রকম।

ভবনাথ ও স্বর্ণ দুজনেই সেই বিস্তীর্ণ বাদামি জলে রোদ্দুরের খেলা দেখতে থাকেন।

—আর দুবছর পর থেকেই আমার বৃহস্পতি খুব তুঙ্গী, বুঝলে স্বর্ণ।

—ওসব আমি বুঝি না। সাহেবদের সঙ্গে দহরম-মহরম করবে না! উন্নতি কি হেঁটে হেঁটে তোমার দোর গোড়ায় আসবে?

—প্রতাপটা ফার্স্ট চান্সে বোধ হয় পারবে না। কিন্তু সেকেন্ড চান্সে যদি পারে, তাহলে মার দিয়া। শিশুর মতো ঝলমল করে ভবনাথের মুখখানা।

—তোমার নিজের জামাকাপড়গুলো একটু ভাল করো। একটা ভাল সুট নেই তোমার। সেই কবে গোলাম মহম্মদ থেকে একটা সার্জের স্যুট করিয়েছিলে।

—চেনা বামুনের পৈতে লাগে না।

—ওসব কথা আমায় বোল না। ওরকম গেঁয়ো কথা ভাব বলেই এই দুর্দশা। স্বর্ণসুন্দরীর গলায় ঝাঁঝ।

ছেলেমেয়েরা এতক্ষণ ক্যাবিনের সামনেই ডেকের এককোনে চাক বেঁধে আছে।

—এরকম জল তুমি কখনো দেখেছো নানা? টুটুল প্রশ্ন করে।

—নানা সব দেখেছে, নানা সব দেখেছে। তুমি হিমালয় পাহাড়ে উঠেছো? বল উঠেছি! চোঙা বললে।

—দার্জিলিং-এ হিমালয় পাহাড় নেই? কত বরফ পাহাড়ের মাথায়!

—তুমি বিলেত গিয়েছো নানা, বিলেত? চোঙা মুখ ভেঙ্গায়।

—এই যাঃ। বলে টুটুল তাকে ধাক্কা দিয়ে সরাবার চেষ্টা করতেই কুরুক্ষেত্র বাঁধে। দুজনে জড়াজড়ি করে ডেকে গড়াতে থাকে। চোঙা টুটুলের চুল পড়পড় করে টানতে থাকে। থামাবার বৃথা চেষ্টায় ক্ষান্তি দিয়ে বুড়ী দৌড়য় মায়ের সন্ধানে। কিন্তু স্বর্ণসুন্দরী যখন এলেন তখন ব্যাপারটা মিটে গেছে। দুজনেই সামনের রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

এবার অনেক লোক নামে, অনেক লোক ওঠে। লোকজনের ওঠানামায় তাড়া নেই। জাহাজ বেশ খানিকক্ষণ থাকে। গুড়ের নাগরীতে ঢাকা কয়েকটা নৌকো জাহাজের গায়ে এসে লাগে। ঝাঁকাভর্তি লাউ-শশা কুমড়ো নামে জাহাজ থেকে। ধুতি লুঙ্গি পাঞ্জাবী গেঞ্জি, হাফশার্ট, খালি গা কম। ক্বচিৎ প্যান্টপরা একটা দুটো লোক, শোলার টুপি মাথায় একটা সাহেবও দেখা গেল। দুতিনটে সম্পন্ন হিন্দু পরিবার উঠলেন জাহাজে। চওড়া লাল পেড়ে সাদা শাড়ি, কপালে গোল

সিঁদুরের টিপ, কারুর হাতে পানের বাটা।

—কিসের জন্যে নারায়ণগঞ্জ বিখ্যাত বলতো? বুড়ী হঠাৎ ফস্ করে প্রশ্ন করলে।

দু ভাইকেই বিব্রত দেখায়, বিশেষ করে চোঙাকে।

বুড়ী উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে, "ঢাকেশ্বরী কটন মিল।"

—মুন্সীগঞ্জ বলতো কিসের জন্যে বিখ্যাত ?

—মুন্সীগঞ্জ মুন্সীগঞ্জ? পাটের জন্যে বুড়ীর গলায় মরিয়া ভাব।

ঠাঁই করে একটা বুড়ীর গালে চড় কষিয়ে চোঙা চেঁচায়—পারলি না, পারলি না।

বুড়ীর চোখ ফেটে জল আসে। কিন্তু সে চেপে ধরে, বল, বল, তুই বল।

এক মুহূর্ত বিপন্ন দেখায় চোঙাকে। তারপর তার দিদিকে রেলিং-এর দিকে ধাক্কা দিয়ে বললে,—এই জন্যে! বলেই সে দোতলায় ডেক দিয়ে পড়ি কি মরি করে দৌড়ায়।

সামনেই সিঁড়ি, তার পাশে একদল বৌ ছোট ছেলে মেয়ে। ডেকের পেছন দিকে এক বৃদ্ধ নামাজ পড়ছে। চোঙা থমকে দাঁড়ায়। তারপর তড়বড় করে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। ওপরের দিকে চার পাশটা খোলা, আরও হাওয়া, চোঙার মুখে কানে হাওয়া ঝাপটায়। দুপাশে খালি রেলিং তারপর স্টিমারের দীর্ঘ ছাতে দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে যায়। সিঁড়ির মুখে কাঁচ দিয়ে ঢাকা একটা ঘর। হুইলে বসে, সাদা ধবধবে দাড়িওয়ালা একটা লোক, পরনে পাটভাঙ্গা বেগনে লুঙ্গি।

বুড়ো কোন দিকে তাকায় না। ফুরফুরে হাওয়া তার দাড়ি সামনের দিকে ওড়ায় আরও ছুঁচলো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখায় তার মুখ। সামনে খোলা কাচের জানলা দিয়ে আরও প্রসারিত লাগে নদীর বুক।

—এবার আমরা কোথায় আসছি ?

—মুন্সীগঞ্জ।

পেছনে তাকাতেই চোঙার মেজাজ খারাপ হয়। বুড়ী ও টুলটুলও ওপরে উঠে এসেছে।

এবার সারেঙ আঙুল দিয়ে সামনের দিকে দেখায়। দিগন্তবিস্তীর্ণ পাটক্ষেতের মাঝখানে ছোট একটা ফ্ল্যাট জলে ভাসছে। তিনজনই উদগ্রীব হয়ে সামনের দিকে চেয়ে থাকে। এই বিস্তীর্ণ বাদামি জলের গায়ে আকাশ পর্যন্ত ঘন সবুজের মাঝখানে তাদের জীবনযাত্রা আবার কিভাবে শুরু হবে ভেবে তারা অবাক হয়। সিঁড়ির নীচ থেকে গোপীনাথের হাঁক আসে। তারা উৎসাহে নামতে থাকে। মালপত্তর ইতিমধ্যেই নীচে নামানো হয়েছে। মুন্সীগঞ্জ মানে সেই ভাসন্ত ফ্ল্যাটখানা ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে। চোঙা আর সহ্য না করতে পেরে কট করে একটা চিমটি দিল বুড়ীকে। আবার একটা গোলমাল পাকাচ্ছিল কিন্তু ইতিমধ্যে জাহাজ ভোঁ দিতে সুরু করেছে। নদীর মাঝখান থেকে অর্ধবৃত্তাকারে পাক নিতে থাকে জাহাজখানা। জেটিতে পাটাতন লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে একজন ছিপছিপে দাড়িওয়ালা লোক এক লাফে জাহাজে ওঠে। বেঁটে রোগা শক্ত চেহারার ওপর তার নীল উর্দিটা একটু বেমানান রকম বড় কিন্তু তার কাঁচা পাকা দাড়ি ভর্তি মুখ হাসিতে আধবোজা তীক্ষ্ন চোখ, আর মাথায় পাগড়ির ওপর সদ্য পালিশ করা ইংরেজ রাজার তকমা—সবটা মিলিয়ে জাঁকাল চেহারা।

ভবনাথকে সেলাম করে স্বর্ণসুন্দরীর দিকে তার হাসিভরা মুখখানা তুলে বললে,—আমার নাম সামেদ। তারপর সামেদ আর্দালি টুটুলের হাত ধরে। টুটুল অবাক হয়ে শোনে, বাজ-খাঁই গলায় সামেদের চীৎকার, খবর্দার, হট্ যাও, হট্ যাও। যাত্রীরা সবাই অপেক্ষা করে। ভবনাথ, স্বর্ণসুন্দরী, ছেলেমেয়েরা, কুলির মাথায় মাল এবং সবার শেষে সামেদ তক্তা পার হয়ে জেটিতে নেমে জেটি ছাড়ার পর যাত্রীরা একে একে নামে। উঁচু বাঁধের ওপর পায়ে চলার রাস্তা। মস্ত এক বাদাম গাছের চেটাল পাতাগুলো যেন এইমাত্র কেউ গলা তামায় চুবিয়ে তুলেছে। তার নীচেই খালে অপেক্ষমাণ নৌকো। সমস্ত ব্যাপারটাই আশ্চর্য লাগে ছেলেমেয়েদের। টুটুলকে হঠাৎ আঙুল দেখিয়ে ফিসফিস করে কি বললে চোঙা। বোধহয় নৌকোর পেছনে খাটো ত্রিপলে

ঘেরা পায়খানার ব্যবস্থাও তাদের অবাক করে।

নীল উর্দিপরা সামেদ নৌকোর গলুইয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ঠিক পতাকার মতো। খালের জল থেকে মৃদু কলকল আওয়াজ আসে, টুটুল হাত জলে ডুবিয়ে খানিকটা শেওলা দাম তুলে আবার ছুড়ে ফেলে দেয়। দুপাশে পড়ন্ত বাঁশ ঝোপ, জলের ওপর শুকনো পাতা একরাশ ছড়িয়ে আছে নুয়েপড়া কাঁঠাল। এক এক জায়গায় খালের দুপাশ দিয়ে নোয়ানো গাছ, বাঁশ ঝাড় নৌকোর ঠিক মাথার ওপর এসে পড়ে। দেখতে দেখতে খাল চওড়া হয়। এক জায়গায় আর একটা খালের সংযোগে নদীর মতো দেখায়। জলে আরও বড় বড় ঢেউ দেয়। সামেদ জানিয়ে দেয়, এ জায়গার নাম কাটাখালি। নদীর সংগে সরাসরি যোগ। বড় একটা নৌকো থেকে পালের মতো চেটাল জাল একবার জলে ডোবে. আবার ওঠে। যতবার ওপরে ওঠে চাঁদা, পুঁটি, আর রুপোলী ছোট ছোট মাছ ঝকমক করে রোদে। এবার বাঁক নেয় নৌকো। গাছের মাথার ওপর দিয়ে দেখা যায়, তাদের গন্তব্যস্থল। সামেদ তার সরু লম্বা আঙুল তুলে দেখায় খাপরায় ছাওয়া সাদা ধপধপে একতলা বাড়ি। টুটুল চোঙা বুড়ী আগে থেকেই ইদ্রাকপুরে ফোর্টের নাম শুনেছিল। একটা অদ্ভুত কেল্লা, যার সামনে দুটো কালো কামান মুখ উঁচিয়ে আছে এরকম কল্পনা তাদের তিনজনেরই মাথায় চেপে বসেছিল। কিন্তু কাছে আসতে সেরকম ভয়ঙ্কর কিছু মনে হোল না। তবে চারপাশের উঁচু পুরু পাঁচিলের গায়ে গায়ে কামান দাগবার জন্যে বড় বড় ফোকরগুলো দেখে তাদের বিস্ময় জাগে। কোয়ার্টারের ঠিক নীচেই পুকুর, তার আগে সারি সারি কামিনী জবা আর ফুলন্ত ঝুমকো লতার গাছ। মগেদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তিন-চারশো বছর আগেকার এই কেল্লা মানে এখন মাটি ভর্তি তেতলা সমান উঁচু গোলাকার পুরু ইঁটের পাঁচিলের ওপর বিশাল বাঁধানো চত্বর, আর তার ওপর একতলা খাপরায় ছাওয়া সাদা ধবধবে সাব ডিভিসনাল অফিসারের কোয়ার্টার। ছেলেদের সবচেয়ে ভাল লাগে ওপরে ওঠবার বিস্তৃত সিঁড়ি, যেন বিশাল ঘাটের সিঁড়ি নেমেছে অনেক উঁচু থেকে। ছেলেরা রেস দেয় বুড়ীর এসব ছেলেমানুষী ভাল লাগে না।

দুই

মাস তিনেক পর মর্নিং স্কুল সেরে টুটুল দৌড়ে বাড়ি ফিরছে। দু' চোখে জল ঝরছে আর সেই জল মুছবার চেষ্টায় হাতের কালি মুখে লেবড়ে একাকার। স্কুলের প্রায় গায়েই বিশাল জলের আয়তক্ষেত্র যেখানে সে আর দাদা পুঁটি মাছ ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে ইতিমধ্যেই। বাড়ির ফটকের সামনেই হাওয়ায় দোল্গা, বিশাল তিন-চারটে শিরিষ, তার একটার নিচে কয়েক দিন আগে চোখফোটা অনির্বচনীয় শোভায় ঝলমল চারটে বাদামি সাদা কুকুরের বাচ্চার খেলা, জলের ধারে শ্যাওলা দামের ওপর কখনও স্পন্দিত কখনও স্থির নীলচে লম্বাটে দুটো ফড়িং, প্রকাণ্ড চওড়া ফাটা পুরনো ফটকের গায়ে স্পর্ধিত পঞ্চজবার ছড়া, তাদের বাড়ির নীচেই টলটলে জলেভরা ঘাট বাঁধানো পুকুর, সিঁড়িতে রিভলভার খুলে সাফ করতে ব্যস্ত ভবনাথের দুই বডিগার্ড, প্রাণপ্রসাদ আর রাম-স্বরূপ, এগুলোর কোনটাই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

ওপরেই তাদের পড়ার ঘরের সামনে গৃহশিক্ষক মধুবাবু দাঁড়িয়ে। দুই ছেলেকে ও মেয়েকে পড়ানোর বেতন দশ টাকার নোটখানা নীল শার্টের বুকপকেটে গুঁজতে গুঁজতে শীর্ণ বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি থমকে দাঁড়ান।

—কি হল? পরীক্ষা কেমন হল?

টুটুল ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে,—আমি স্যার রাইনোসেরাস...স্যার...পারিনি।

—কি বানান লিখেছো?

—আর এইচ আই এন ও সি ই আর ও ইউ এস এতক্ষণ মন্ত্রের মতো যে অক্ষরগুলো জপ করতে করতে আসছিল সেগুলো টুটুল উগরে দেয়।

মধুবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন,—কেন, ঠিকই তো আছে। বিরক্ত হলেই শীর্ণ মুখখানা আরও কুঁচকো দেখায় মধুবাবুর।

শার্টের হাতায় মুখ মুছতে মুছতে টুটুল হেসে ফেলে।

—ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে? তাহলে ভাল করেছি।

দুদিন পর রেজাল্ট বেরোল। টুটুল বেয়াড়ারকম ভাল করেছে প্রায় সব বিষয়ে। দু' ক্লাস ওপরে চোঙা সপ্তম, বুড়ী পঞ্চম। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষায় ডিপার্টমেন্ট স্বর্ণময়ীর। ভবনাথের এদিকে তাকাবার সময় নেই। সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপে ইতিমধ্যেই প্রাণ অস্থির। বজ্রযোগিনী গ্রামে কিছু বোমা ও তাজা কার্তুজ পাওয়া গেছে। ঘন ঘন ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট আসছে, তার সবগুলোই নির্ভরযোগ্য নয়, কিন্তু সাবধানের মার নেই।

সেদিন দুপুরবেলায় চাতালের কোণে দুই ভাইয়ের তর্ক বাধে পরীক্ষার ফল নিয়ে। পরীক্ষায় কারা ভাল করে জানিস? জানিস টুটুল? কারা ভাল করে?

যারা ভালভাবে পড়াশোনা করে, টুটুল সাবধানে জবাব দেয়।

ঠিক বলেছিস, যারা আর কিছু জানে না, একেবারে বইয়ের পোকা।

টুটুল চুপ করে থাকে। সম্প্রতি তার পরীক্ষার ফলাফল নিজের কাছে ভাল লাগলেও একটু অস্বস্তিরও কারণ ঘটিয়েছে। চোঙা যদি তৃতীয় স্থানের ভেতরে পড়ত তাহলে তার সাফল্যের সার্থকতা ছিল। কিন্তু যা ঘটেছে তাতে দু ভাইয়ের মধ্যে একটা সরু অথচ ধারাল বিভেদের রেখা মাথা তুলছে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো পড়াশোনাই করে নি। খালি গান করত আর নাচত।

টুটুলকে এবার বিহ্বল দেখায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্কুলপালানো ব্যাপারটা অস্পষ্টভাবে শুনলেও ঠিক এভাবে শোনেনি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে,—হয়তো অ্যানুয়েলে আর ভাল করব না।

—তুই আবার করবি না! যেরকম গবেট হয়ে যাচ্ছিস!

এরপর কথা চলে না। কিন্তু পরীক্ষায় সার্থকতা ও জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে দুই ভাইয়ের আলোচনায় হঠাৎ ছেদ পড়ে।

হঠাৎ নীচ থেকে পাঁড়ের গলা আসে,—ও দাদাবাবু, দাদাবাবু পুকুর ঘাটে তাদের সাঁতারশিক্ষক, জেলখানার হেড জমাদার ছাপরা জেলার অধিবাসী পাঁড়ে। ঘাটে পাতাকাটা কলাগাছ। উত্তেজনায় ধক ধক করতে থাকে টুটুলের বুক। চোঙা চেঁচাতে থাকে,—আমি অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান হব কিন্তু কলা গাছটা জলে নামানো মাত্রই কোথা থেকে বুড়ী এসে ঝাঁপিয়ে পাঁড়ের গায়ে হেঁচড়েমেচড়ে উঠে কলাগাছটার ওপরে চেপে বসে, তারপর তাদের চোখের সামনে দিয়ে বুড়ী সারা পুকুর ঘুরে বড়ায়। পাঁড়ে সাঁতরে সাঁতরে তার সংগে ভেসে চলে। একবার পুকুরটা ঘুরে আসার যে বিলম্ব তা দুজনের কাছেই ক্রমশ অসহ্য লাগে। চোঙা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, —আমাদের আর শেখা হবে না।

তারপর চোঙার পুকুর পরিক্রমায় টুটুল স্তব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। বুড়ী সমানে ফোড়ন কাটে,—জল টান, হাত দিয়ে জল টান, একদম হচ্ছে না। কত যুগ পরে এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে পাঁড়ে ডাকে,—টুটুলবাবু, এসো। টুটুল আড়ষ্টভাবে বসে থাকে কলাগাছের ওপর। গোল পুকুরটার ওপরে নুয়ে আসা বটের নীচে জলটা ঠান্ডা আর কালো, টুটুলের একটু ভয় ভয়ও করে। মুখ দিয়ে কুলকুচি করতে করতে পাঁড়ে পাশে পাশে এগোতে থাকে। টুটুল প্রাণপণে দুহাত দিয়ে জল টানে। হঠাৎ হড়কে কলাগাছ থেকে সড়াৎ করে জলে পড়েই দুর্দান্ত চীৎকার শুরু করে,—আমাকে উদ্ধার করো, আমাকে উদ্ধার করো। চোঙা ফুর্তিতে হাততালি দেয়। —ইস্, কি রকম থিয়েটার করতে পারে টুটুলটা! বুড়ী চেঁচিয়ে বলে। পাঁড়ে সংগে সংগেই টুটুলকে তুলে দিয়েছে কলাগাছে, কিন্তু তার মুখচোখে তখনও আতঙ্কের ভাব কাটে নি।

যেদিন সাঁতার শেখা নেই সেদিন, বিশেষ করে ছুটির সকালে, জেলখানায় কনস্টেবলদের কোয়ার্টারে ব্যায়ামের ক্লাসে যোগ দেয় ছেলেরা। ছ ফুট লম্বা নেংটিপরা পাঁড়ে পাঁচশো ডন, পাঁচশো বৈঠকি দেয়। তার ফর্সা তেলে ঘামে ভেজা চকচকে শরীরখানা ওঠে আর নামে, আর

যত পরিশ্রম্ বাড়ো নিশ্বাস সশব্দে ওঠে পড়ে। পাঁড়েকে দেখে টুটুলের মনে হয় সে যেন যুদ্ধের জন্যে তৈরী হচ্ছে। কাদের সঙ্গে এই যুদ্ধ? সেই সব ছেলেরা যারা 'বন্দেমাতরম' বলে চেঁচায়, জেলে যায়, যাদের সম্পর্কে মাঝে মাঝে বাবা-মা মাঝে মাঝে উদ্বিগ্নভাবে কথাবার্তা বলে, তারা ?

পাঁড়ে আধঘণ্টা ধরে জিরোয়, বারান্দার সিঁড়িতে বসে হাওয়া খায়, আর এক কনস্টেবল পেস্তা আর ভাঙ ঘোঁটে কালো পাথরের বড় গেলাসে। এক গেলাস সরবত এক চুমুকে শেষ করে' ভারি মদালস চোখে ছেলেদের কাপড় ছাড়তে বলে।

পাশের ঘর থেকে লেংটি পরে দুটো ক্ষুদে তালপাতার সেপাই বেরিয়ে আসে। এ অবস্থায় দুজনকে দেখে দুজনেই হেসে গড়িয়ে পড়ে। চোঙার নাম সার্থক, পশ্চাদ্দেশ বলে কিছুই নেই। তার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে টুটুলের চোখে জল আসে। দুটো ইঁটে হাতে ভর দিয়ে বুকটা নামতেই পাঁড়ে বাঁ হাত দিয়ে চেয়ে মেঝের সঙ্গে ঘসে দেয়। কয়েকবার ডন দেওয়ার পরই হাত ছিঁড়ে পড়ে। পাঁড়ে বিষণ্ণভাবে তাদের দিকে চেয়ে থাকে। তার দেশে এই বয়সের ছেলেদের স্বাস্থ্য মনে করে ঘাড় নাড়ে।

ছেলেদের সম্প্রতি হাসিতে পেয়েছে। বিশেষ করে শরীরের কোন কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম প্রায়ই তাদের অকারণ হর্ষের কারণ ঘটায়। কয়েকদিন পর সেলাইয়ের কলে কমলালেবু রঙের পর্দা সেলাই করছিলেন স্বর্ণসুন্দরী। হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে শুনলেন, চাতালে চোঙা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল,—পোঁদ, পোঁদ ! বলবার সঙ্গে সঙ্গেই দুভাই হেসে গড়িয়ে পড়ছে। স্বর্ণসুন্দরী গলা ভারী করে হাঁকলেন, চোঙা ! দুই ভাই-ই এগিয়ে আসে পুলকিত উৎফুল্ল মুখে। স্বর্ণ-সুন্দরী ধমক দিলেন, কিন্তু খুব সুবিধে হল না।

হাসির তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে সন্ধেবেলা। চাতালে সতরঞ্চি পেতে লণ্ঠনের আলোয় দুভাই পড়ে মধুবাবুর সামনে। হঠাৎ চোঙার নজর পড়ে মধুবাবুর নাকের ওপর। নাকের ফুটো দিয়ে কাঁচাপাকা নস্যিমাখা কয়েকগাছা চুল বেরিয়ে আছে। লসাগু করতে করতে খাটো গলায় যেই চোঙা বলে,—নাকে চুল, অমনি ভয়ে কাঠ হয়ে যায় টুটুল। ব্যাপারটা আগেও খেয়াল করেছে কিন্তু এমন বিপজ্জনকভাবে হাসির দমক উঠে আসে যে, চাপতে গিয়ে চোঙার দিকে চেয়ে সে একেবারে স্তম্ভিত। চোঙা মাথা নীচু করে খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে হাসছে। এর পর সহ্য করা যায় না, হা হা হা হা করে দিক্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য টুটুল হাসতে থাকে।—ও স্যার হাসছে স্যার, ও স্যার হাসছে বলে চোঙাও সে হাসিতে যোগ দেয়। মধুবাবু এমনিতেই তিরিক্ষে, তার ওপর অর্শের প্রাতঃ-কালীন আক্রমণে সম্প্রতি বিপর্যস্ত। চেঁচিয়ে উঠলেন,—কী হয়েছে তোমাদের, মদ খেয়েছো ?

এরপর বাঁধ বাঁধার কোন ব্যাপার থাকে না। মদ খাওয়ার সম্ভাবনায় দুভাই হাসিতে আবার গড়িয়ে পড়ে। মধুবাবু তাঁর শীর্ণ আঙুলে কট কট করে কান মলে দিলেন চোঙাকে। তাতে সাময়িক কাজ হল। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাসির ফোঁপানি চলল। মধুবাবু সংস্কৃত শ্লোক লিখে দেন দুই ছেলেকে, মুখস্থ করবার জন্যে। রোজ সকালে উঠে বলবে, বুঝেছো ?

পাপহং পাপকর্মাহং
পাপাত্মা পাপসম্ভবম্।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ
সর্বপাপ হর ভব ॥

মধুবাবু চলে গেলে চোঙা বললে,—আমরা পাপী, আমরা মদ খাই, কি মজা !

কয়েকদিন পর থেকেই সাঁতারের ধুম পড়ে যায়। ছুটি হলেই দশটা না বাজতে ছেলেমেয়েরা জলে পড়ে। উঠতে উঠতে কোন কোনদিন শোনে জেলখানার পেটা ঘণ্টায় বারোটা বাজার ধ্বনি। —ছেলে-মেয়েগুলো লোহা হয়ে গেল। তুমি তো একটা কথাও ওদের বলবে না। সবই যেন আমার গরজ, প্রায়ই স্বর্ণসুন্দরী অনুযোগ করেন স্বামীকে কিন্তু ভবনাথের কোন দিকে আর তাকাবার সময় নাই। টেরারিস্ট গ্যাং ধরা পড়েছে। তাদের চালান দেওয়া হয়েছে মুন্সীগঞ্জের জেলে। তার মানে তাঁদের বাড়িও এবার সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য হয়ে পড়তে পারে।

ভবনাথের এ দুর্ভাবনায় শরিক তাঁর ছেলে-মেয়েরা নয়, এমন কি স্বর্ণসুন্দরীও নন।

কলকাতার নতুন বাড়ির ভাড়া বাবদ একশো কুড়ি টাকা আসছে গত মাস থেকে, যদিও মরগেজ, ধার মিটাতে অনেক বছরের ধাক্কা তবু এই নতুন প্রাপ্তিযোগ স্বর্ণসুন্দরীকে আরও স্বপ্রতিষ্ঠ করেছে তাঁর স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাসে।

চোঙা সাঁতরায় মাছের মতো। নিখুঁত হাতের পায়ের কাজ মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই সে আয়ত্ত করে ফেলে। টুটুল আর বুড়ী ততো এগোয় নি। দুজনেই পায়ের কাজে বেমানান, প্রায় ব্যাংয়ের মতো দুপা চেদরিয়ে জল কাটে, গতিও অনেক মন্দ।

কিন্তু ব্যাং কিংবা মাছ যাই তার তুলনা হোক, এই জলে দাপাদাপি টুটুলের শৈশবের সবচেয়ে বড় ঘটনা। যেদিন হাওয়া দেয় সেদিন রোদ্দুরে জল ছল ছল করে, জল ডাকে। যাকে ভালবাসা যায় আদর করা যায় এমনি একটা সত্তা পুকুরের। আবার যেদিন সাঁতরে সাঁতরে ওপারে বটের ছায়ায় আরও ঠাণ্ডা জল কেটে এগোয় তখন ভয় করে, ভয়ে আরও হাঁফ ধরে, কোন রকমে জল ঠেলে ঘাটে উঠতে ইচ্ছে করে। আর তাদের ছোট ছোট শরীরগুলোয় রক্ত চনমন করে। তিনজনেরই মুখে বেশ কালো ছোপ পড়েছে। কিন্তু চোখগুলো আরও জ্বলজ্বলে। সারা দিন ব্যাপী তাদের তিড়িংমিড়িং প্রবণতায় স্বর্ণসুন্দরীর প্রাণ আরও অস্থির।

একদিন আর থাকতে পারলেন না। সকাল সাড়ে এগারোটা বাজে। ভবনাথ বৈঠকখানায় অফিসের ফাইলপত্তর দেখছিলেন। তাঁর বেড়ানোর ছড়িখানা আলনার কোণ থেকে তুলে নিয়ে এসে স্বর্ণসুন্দরী তাঁর হাতে গুঁজে দিলেন।—আজ তোমাকে শাসন করতেই হবে। এর পর যদি নিউমোনিয়া হয় তখন তো আমাকেই দুর্ভোগ পোয়াতে হবে।

নীচে তখন সাঁতারের রেস চলেছে। একবার ও ঘাট ছুঁয়ে ফিরে আসা। চোঙা প্রায় দশ-পনেরো হাত সামনে সাঁতরে আসছে। ভবনাথ ও স্বর্ণসুন্দরী শাসনের প্রতিমূর্তি রূপে ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকলেও চোঙার পারদর্শিতায় তাঁরা মুগ্ধ না হয়ে পারেন না।—একেবারে নিউমোনিয়ায় না পড়ে ছাড়বে না, স্বর্ণসুন্দরী বিড় বিড় করেন। তিনজনেই হুড়মুড় করে ঘাটে উঠে ছড়ি হাতে ভবনাথকে দেখে মুহূর্তের জন্যে ভড়কে দাঁড়ায়। তার পর তিড়িং তিড়িং করে তিনজনেই পাশ কাটিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চওড়া সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ওপরে উঠে যায়। বুড়ী উঠেই ভেজা গায়ে ফ্রক পরে নেয়, দুভাই ভেজা প্যান্টে খাটের নীচে এক কোণে দেয়াল ঘেঁষে গুটিসুটি মেরে হাঁপায়। কিন্তু স্বর্ণসুন্দরী স্বামীকে সে ঘরে নিয়ে আসেন। হেঁট হয়ে খাটের নীচ দেখিয়ে বলেন,—বাঁদরগুলো ঐখানে আছে, মারো, মারো!

ছড়ি হাতে ভবনাথ যখন গুঁড়ি মেরে তাদের দিকে এগিয়ে আসেন তখন সেই দৃশ্যের অভাবনীয়তায় দুই ছেলেই স্তম্ভিত হয়ে থাকে। খুব আস্তে একবার করে ছড়ির আঘাত করে ভবনাথ বলে ওঠেন,—স্টুপিড! ভেজা গায়ে সে আঘাত জ্বলে।

সেবার বর্ষা শেষ হতে না হতেই ভবনাথের জলপথে যাতায়াত খুব বেড়ে যায়। গত মাসে একশো সাঁইত্রিশ টাকা টি. এ. বিল হয়েছিল। প্রতাপের পরীক্ষার ফি, শীতের জামা বাবদ চাহিদা যত বাড়ে ভবনাথের জলপথে ভ্রমণ তত বেড়ে যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে পদ্মা পার হতে হতে নৌকোর ক্রমাগত দোলানিতে, বিশেষ করে রাত্তিরে, একলা লাগে। একটু একঘেয়েও যে ঠেকে না তা নয়। এবার তাই সপরিবারে জলপথে যাত্রা।

ভবনাথের নৌকো যখন লোহজঙের পথে তখন ভোর হয়। সারা রাত্তির নৌকোর দুলুনি, গলুইয়ে জলের ছলছল আওয়াজ এখন শান্ত। ভোরের হাওয়ায় চরে বেঁধেছে নৌকো। হাওয়ায় যখন নৌকো কাত হয় তখন কাঠে কাঠে মৃদু মট মট শব্দ। টুটুলের মাথার কাছেই এক বিঘত চৌকো ফোকর। সেখান দিয়ে এক ঝলক রোদ তার মুখে পড়ে। চরে দেড় মানুষ উঁচু ঠাসা আখবন। গোপীনাথ মাল্লারা নেমে গেছে সেই বনের ধার দিয়ে প্রাতঃকৃত্যের জন্যে। খড়ি দিয়ে দাঁত মাজছেন স্বর্ণসুন্দরী। সামনে বিরাট চর ধু-ধু করছে। আখের সবুজ আয়তক্ষেত্র বাদ দিলে সামনে বহুদূর ব্যাপ্ত বালিতে ভোরের সোনালী রং। স্বর্ণসুন্দরী দাঁত মেজে তোলা জলে কুলকুচো করেন নদীতে। পাটাতনের ওপর ডেক চেয়ারে ভবনাথ স্তব্ধ হয়ে বসে। স্বর্ণসুন্দরী মুখ মুছে পাশের মোড়াটায় বসে বলেন,—কি ভাবছো?

—তোমায় বলি নি একটা কথা। কাল প্রতাপের চিঠি পেয়েছি। প্রথম চান্সে অবশ্য আই. সি. এস. পাশ করা খুব মুস্কিল।......

—প্রতাপ পাশ করে নি ? আরও তো দুটো চান্স পাবে।

—হ্যাঁ, তাই ভাবছি।

আখক্ষেতের পাশ দিয়ে ঘটি হাতে গোপীনাথ আসছে। কিছুক্ষণ পরই গোপীনাথ স্টোভ ধরায়। আর স্পিরিটের গন্ধে টুটুলের ঘুম ভাঙে। এই স্টোভের গন্ধের সঙ্গে বাইরে যাওয়া যেন জড়িয়ে আছে তার। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতেই চোঙা উঠে পড়ে ধড়মড় করে, তারপর ভোরের আলোয় রাঙা বিস্তীর্ণ চরের দিকে চেয়ে সে চিৎকার দেয়,—জাঁহাপনা, বন্দী আমার প্রাণেশ্বর। টুটুলের ঘাড়ে ঝাঁকি দিয়ে বলে,—চল চল, আমরা নামি।

চরে নেমে দুই ভাই ছোটে এত দূরে পর্যন্ত, যে প্রায় দুটো কালো বিন্দুর মতো লাগে। সেই বিস্তীর্ণ বালির মাঝখানে আবার একটু জল চিকচিক করে। তার পাশে কতগুলো কাঠি, আখের শুকনো পাতা। মাথার ওপরে কালো, সাদা, পেটের কাছটায় খয়েরি দুটো লম্বাটে পাখি ক্রমাগত তাদের মাথার ওপর পাক খায় আর ডাকতে থাকে—'টি-টি-টি-টি-টি, টি টি টি।' একবার তারা মাথার পাশ দিয়ে গালের কাছ দিয়ে পাক খেয়ে গেল। সেদিকে চেয়ে এক মুহূর্ত ভাবলে চোঙা, তারপর টপ করে বালির ওপর পাতা আড়কাটির ঢাকনাটা সরিয়ে দেয়। সরিয়ে দিয়ে দুজনেই অবাক। পাঁচটা তুঁতে নীল ছোট ডিম। এমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তারা চেয়ে থাকে যে তাদের গাঁ ঘেঁসা হয়ে সশব্দ পাখি দুটোর পাক-খাওয়া তাদের নজরে পড়ে না। খেয়াল হয় গোপীনাথের ডাকে,—চল চল, নৌকা ছাড়ছে।' ডিমগুলো নেওয়ার প্রস্তাবে গোপীনাথ বললে যে, ওগুলো সাপের ডিম, আসবার সময়ে একটা গোখরো দেখেছে, এবং চর ভর্তি সাপ।

হাঁসাড়ায় এক জমিদারবাড়িতে দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা। এ অঞ্চল বেশ বর্ধিষ্ণু, মধ্যবিত্তের বাস। নৌকো থেকেই খালের পাশ দিয়ে নারকেল সুপুরিতে ছাওয়া টিনের চাল, মাঝে মাঝে কোঠাবাড়ী নজরে আসে। মেয়েরা বাসন মাজছে, ছেলেরা পুকুরের জলে দাপাদাপি করছে। অনেক বছর পর যখন টুটুলরা কলকাতার পাকাপাকি বাসিন্দে, এবং জলের দেশ থেকে একেবারে নির্বাসিত, তখন বাংলা কবিতায় জল নদীর বর্ণনা পড়ামাত্রই তাদের এই জলপথে সফরের ছবিগুলো ভেসে উঠত মনে। যেমন সত্যেন দত্তের 'কার বহুড়ী বাসন মাজে' হাঁসাড়ার খালপাড়ে বাসনের পাঁজা নিয়ে ব্যস্ত লালপেড়ে শাড়ি-পরা, বউটার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। এমন কি 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে' আসলে সেই ভ্রমর বেটা ঘাটে নৌকো ভিড়িয়ে গলা-জলে তাদের চান করবার সময় পাড়ে শ্যাওলার ওপর একই জায়গায় ভোঁ-ভোঁ করে উড়ছিল হেলিকপ্টারের মতো।

হাঁসাড়ায় দুপুরের খাওয়াটা এক ভয়াবহ ব্যাপার। এত বড় ভাজা গলদা চিংড়ির মুড়ো তারা কখনও দেখে নি। ভয়ে-ভয়ে একটু ফুটো করতেই গল-গল করে লাল ঘিলুতে থালার এক পাশ ভরে যায়। টুটুল ভয়ে-ভয়ে খেতে পারে না। তাছাড়া সবই এত বড়-বড় যে ছেলেদের কাছে বড় অপরিচিত লাগে। এক জোড়া করে কই মাছ প্রায় থালা জুড়ে। ফেলেছেড়ে খেয়ে তারা কোন রকমে ওঠে। তবে মনে মনে মুগ্ধ স্বর্ণসুন্দরী। তিনি কাঁটা চিবোবার যম। এত রকমারি সুন্দর মাছ আগে কখনও খান নি।

খাওয়ার চেয়েও জমিদারবাড়ীর এক মেয়ে, বোধহয় নাতনীর সঙ্গে দুই ছেলের অসম্ভব ভাব হয়ে গেল। সারা দুপুর গাছে, খালের পাড়ে মেয়েটা বুড়ী, চোঙা আর টুটুলকে চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। লাল ফ্রক পরা মেয়েটার ওপর প্রভুত্ব জেগে যায় চোঙার। বিকেলে নৌকো ছাড়বার আগে ঘাটের ধারে একটা ছড়ি জোগাড় করে চোঙা।—তুই কাকে ভালবাসিস ? আমি, টুটুল, না বুড়ী ? ছড়ি হাতে চোঙা জিজ্ঞাসা করে।

মেয়েটার মুখটা ছুঁচলো, কটাশে রঙ, মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল। ছোট-ছোট চোখ দুষ্টুমিতে চকচক করে। বোধহয় চোঙারই বয়েস, বললে,—বাঃ, আমি তো বুড়ীদিকে...

—হাত পাত, হাত পাত। মেয়েটা বোকার মতো হাত পাততেই সপাং করে ছড়ি বসিয়ে দেয় চোঙা। মেয়েটার চোখে জল আসে।—আমি বাবাকে বলে দিচ্ছি, বলতে-বলতে গলায় উজবজ কান্না

নিয়ে সে বাড়ীর দিকে দৌড়য়। বুড়ীও চেঁচিয়ে উঠল,—আমিও মা-কে বলে দিচ্ছি। বলে সেও মেয়েটিকে অনুসরণ করে।

বিদায়ের সময় যখন জমিদারমশাইয়ের ছেলে বউ মেয়ে নিয়ে তাদের সঙ্গে ঘাটে আসেন তখন সব মিটমাট। চোঙা গলা নীচু করে জলের দিকে চেয়ে বলল—আমাকে কেউ না ভালবাসলে আমার বয়ে গেল। মেয়েটিও তেমনি খাটো গলায় বললে,—দূর, আমি তখন মিছিমিছি বলেছিলাম। ছইয়ের ওপর উঠে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা হাত নাড়ায়, খালের বাঁক পর্যন্ত লাল ফ্রকপরা মেয়েটাকে দেখা যায় হাত নাড়াতে।

পর দিন দুপুরে মীরকাদিম। সেদিন হাট। দূরে থেকে চাপা গুঞ্জন ভেসে আসে। কাছে আসতেই কলা আর গুড়ের গন্ধে বাতাস ভারী লাগে। অন্তত পাঁচ-ছশো নৌকো গঞ্জের পাড়ে বাঁধা। ঢুকতেই জলের ওপরে মাচার মতো লম্বা পাটাতন। নীল উর্দি-পরা সামেদ হাঁকে—খবরদার, খবরদার, পাশের নৌকো সরে যায়। স্বর্ণসুন্দরী নৌকোয় বসে-বসেই বিশাল এক গুড়ের নাগরী আর প্রকাণ্ড এক কাঁদি পাকা কলা কিনলেন। সামেদের সঙ্গে ছেলে-মেয়েরা গঞ্জে নামে। প্রচুর কাপড়ের দোকান, নারকেলের আড়ত, পাকা, আধ-পাকা কলার পাহাড়, কাঁচের চুড়ি, কেরাসিন, চাল-ডাল। অনেক খুঁজে-খুঁজে দরদাম করে দুটো রবারের বল, আর বুড়ীর জন্যে লাল ফুল তোলা মাথার ক্লিপ আর রিবন কিনলে সামেদ।

পরদিন ভাগ্যকুল। পদ্মার পাড়ে তাদের বজরা এসে লাগে সকালে। এখানে নদী খুব চওড়া, ওপার দেখা যায় না। ছেলে-মেয়েরা সাঁতার শিখেছে ভালই। কিন্তু জলের অসম্ভব টান। দুটো বজরা তেরছা করে লাগিয়ে মাঝখানে ছেলেমেয়েরা চানে নামে, টুটুল কোরা একখানা ধুতি পরে জলে নেমেছিল। তারপর স্রোতের টানে তা পায়ে জড়িয়ে যায়। তাছাড়া পদ্মায় নেমেছি এই বোধটাই এমন অভাবনীয় লাগছিল তার কাছে যে, পা জড়িয়ে যাবার পরই সে এত বেশী হাত-পা ছোঁড়ে যে ক্রমশ তলিয়ে যেতে থাকে। কিছু বুঝবার আগেই ব্যাপারটা ঘটে যায়। চোঙার চিৎকারে ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে। তারপর পাগড়ি ফেলে দিয়ে উর্দি-পরা অবস্থাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে। নদীর স্রোতে তখন দুই বজরার মুখে যে তিন-চার হাত ফাঁক দিয়ে টুটুল জল খেতে খেতে বেরিয়ে যাচ্ছে। উর্দিপরা সামেদ জলে পড়েই এক থাবলায় টুটুলকে ধরে ভেতরের দিকে ঠেলে দেয়। তারপর মাথা দিয়ে ঠেলতে-ঠেলতে নৌকোর ভেতরে ঘেরা জায়গায় নিয়ে গিয়ে দম নেয়। ইতিমধ্যে স্বর্ণসুন্দরী চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিলেন। ভবনাথও জলে নেমে পড়েছিলেন। স্বর্ণসুন্দরী বললেন,—সামেদ ছিল বলে, ছেলেটা বেঁচে গেল। সামেদ আস্তে-আস্তে জল ছেড়ে নৌকোয় উঠল। খালি মাথায় তার ছোট খুলির ওপর লেপ্টে-থাকা চুলে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। সামেদ আস্তে-আস্তে বললে,—সব আল্লার দয়া মা, আমরা কে ?

দুপুরে ভারে ভারে খাবার আসে। তিনটে না চারটে থালায় প্রায় দশজনের মতো খাবার আনে। আবার সেই পেল্লাই গলদা চিংড়ির মুড়ো, ফুটো করতেই গলগল করে রক্তের মতো ঘিলু, সম্মানিত অতিথিদের জন্যে ছাগলের মাথার মুড়ো, ইলিশ, রুই, রকমারী সন্দেশ, রাজভোগ, দই। এত খাওয়া দেখলেই ছেলে-মেয়েদের অক্ষিদে বেড়ে যায়। সবচেয়ে তাদের ভাল লাগল আলুবখরার চাটনি। ভবনাথ ও স্বর্ণসুন্দরীও খাওয়ার ব্যাপারে খুব দড় নয়। তবে গোপীনাথ, সামেদ আর তিন মাঝিমাল্লা খুব উৎসব করে খাওয়া-দাওয়া করলে।

সকালবেলার দুর্ঘটনার রেশ খুব তাড়াতাড়ি কেটে যায়। সন্ধেবেলা জমিদার বাড়ি নেমন্তন্ন। অনেকখানি জায়গা জুড়ে অনেকগুলো দালান, ইলেক্‌ট্রিক আলো। প্রায় শখানেক লোকের সঙ্গে খাওয়া শেষ হতে রাত প্রায় দশটা। ছেলেরা তাদের বজরায় ফেরবার মতলব করছিল, কিন্তু শোনা গেল গানের জলসার আয়োজন হয়েছে। জলসা মানে কলকাতা থেকে দুটি মহিলা প্রথমে ঠুংরি গাইলেন, তারপর খেমটা নাচলেন। শেষের দিকে ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল প্রচণ্ড তবলায় চাঁটি সত্ত্বেও। ফর্সা চোখ কুতকুতে আঁটসাঁট করে হলদে জর্জেটপরা ঢ্যাঙা মহিলাটি ভবনাথদের সামনে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলেন, দ্বিতীয়টির পরনেও জরির বুটিক তোলা চকোলেট জর্জেট, কাজল দেওয়া তার ঢলঢল চোখ দুটি ছেলেদের মন্দ লাগে না। তিনি মাথার মদের গেলাস রেখে নাচলেন, চারদিকে চটা-

পট হাততালি পড়ল। বড়দের সংগে সংগে টুটুল চোঙাও হাততালিতে যোগ দিল। এরপর আবার দুজনে হাত ধরাধরি করে নাচতে লাগলো। সংগে ক্লারিওনেট ও তবলা। চিকের অন্তরালে মহিলা-বর্গের মধ্যে স্বর্ণসুন্দরী ও বুড়ীকেও দেখা যাচ্ছিল। তাঁরই নির্দেশে দুই পাইক ঘুমন্ত দুই ছেলেকে বজরায় তুলে দিল। পরদিনও প্রায় একই প্রোগ্রাম। টুটুল তোলা জলে স্নান করলে। ভবনাথ সাঁতরালেন পদ্মায়, পেছনে সামেদ। ভবনাথের সাঁতার দেখে ছেলেরা অবাক হল। বাবা কাছারি যায়, বৈঠকখানায় টেবিল ল্যাম্প জেবলে রায় লেখে, ভোরে চাতালে পায়চারি করে, বিকেলে কপির ক্ষেতে মালিকে নির্দেশ দেয়।—বাবা আবার সাঁতরায় রে! চোঙার গলায় প্রবল বিস্ময়!

সন্ধেবেলা নৌকো ছাড়ে। চাঁদ ওঠে। চাঁদনি রাতে ছইয়ের ওপর সামেদের কোল ঘেঁষে বসে ছেলেরা। আলো ফেলতে ফেলতে স্টিমার চলে যায়। বজরা দুলতে থাকে মাঝনদীতে। আর এমন হু হু করে মুখে কানে হাওয়া দেয় যে, ছই থেকে প্রায় পড়ে যাওয়ার জোগাড়। ভবনাথ হাঁক দেন, —ওপর থেকে নেমে এসো, তোমরা। স্বর্ণসুন্দরী অনেকগুলো দেবতার নাম করে যান,—বাবা বদ্যিনাথ, বিশ্বনাথ, মা কালী, মা জগদ্ধাত্রী।

সামেদ ধীরে ধীরে ছেলেমেয়েদের নামিয়ে আনে ছই থেকে। সামনে হাওয়ায় লুটোপুটি খাওয়া বিশাল রুপোলী পদ্মার দিকে চেয়ে চেয়ে নিজের মনে বলে, সব খোদার ইচ্ছে আমরা কে?

তিন

গরমের ছুটির বিকেল। এতক্ষণ বাড়ির সামনেই পুকুরটা ঝলকাচ্ছিল রোদ্দুরে। কিন্তু জেলখানার দিকটা বেশ ঠাণ্ডা, ছায়ায় ঢাকা। পুকুর পাড়ে ঝাঁকড়া বটের ছায়া সেপাইদের কোয়ার্টারের মাথাগুলো ঢেকে রেখেছে পশ্চিমের রোদ থেকে। পাঁড়ে পুকুরে ঘটি মেজে খড়ম পায়ে খট খট করে আসছে। বাঁধানো রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে ভাঙা বেসুরো গলায় গান করে,—ইয়ে ভবসংসার হ্যায় রামো কি মায়া! কঁহি ধুম হ্যায় কঁহি ছায়া।

পাঁড়ে সম্প্রতি দেশ থেকে ফিরেছে। দু মাস ছিল ছাপরার গ্রামে। এক বিঘে মতো জল শুদ্ধ আমের বাগান কিনেছে। তার গল্প করে হিন্দি বাংলা মিশিয়ে ছেলেদের সংগে,—যব ফুল আসে আমের পেড়ের পর তব কত প'খ আসে। জলে নামে জলে ওঠে, ফিন্ উড়ে যায়। হামি আর ভাই ঝোপড়ি বেঁধে পাহারা দিই। সারা রাত কি বাস। ফুল কি বাস ফল কি বাস। হাম সমঝে কি বৈকুণ্ঠ মে হ্যায়। বলবার সময়ে পাঁচশো ডন পাঁচশো বৈঠক দেওয়া শরীরখানার ওপর ছোট মুখখানায় এক বেমানান স্নিগ্ধতা নামে।

তারা জেলের গেটের দিকে এগোতেই পাঁড়ে তাদের সাবধান করে দেয়, তারা যেন এখন জেলখানার ভেতরে না যায়। গত রাত্তিরে একদল 'ভারি বড়া ডাকু' এ জেলে স্থানান্তরিত হয়েছে ঢাকা থেকে। সে জন্যই এই সাবধানবাণী।

টুটুল আর চোঙা বাড়ির দিকে না গিয়ে স্থানীয় সাঁতার চ্যাম্পিয়ান, ক্লাস সিক্সের ছাত্র গোপালের সংগে লাট্টু খেলে। গোপাল ছবির মতো সাঁতরায়, এক ঘাট থেকে ডুব সাঁতার দিয়ে আর এক ঘাটে ওঠে। তিনটে কাপ পেয়েছে সাঁতারে। তবে সম্প্রতি সে দু'ভাইকে দেহতাত্ত্বিক কিছু জ্ঞান দিতে শুরু করেছে। তাতে চোঙার উৎসাহ জোরাল। কিন্তু টুটুল ব্যাপারটা হদিস করতে পারে না। পুকুরপাড়ে বসে বসে গোপাল মানুষের জন্মরহস্য অংগভংগী সহযোগে বর্ণনা করে। টুটুলের কাছে গোপালের আলাপ একেবারেই দুর্বোধ্য লাগে আর চোঙা কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে। গোপাল শুধু চমৎকার সাঁতারই কাটে না, কি করে ছেলে জন্মায় সে খবরও রাখে। চোঙা উত্তেজনা বোধ করে। আগে সে যা যা শুনেছে সবই স্বর্ণসুন্দরীকে বলেছে, কিন্তু এবার তার ভয় হয়, তার মা এসব শুনলে ঝড় তুলবে। আর টুটুলের সংগে আলাপ করলে মন একটু হাল্কা হয়, 'কিন্তু ও একটা গবেট' এই চিন্তা করে সে বাড়ির দিকে এগোয়।

মাঝপথে জেল গেট। গেটের গরাদ ধরে তাদের কে ডাকল,—খোকা শোনো।

টুটুল চমকে তাকায়। ধুতির ওপর সাদাকালো ডোরাকাটা ফুলহাতা শার্ট পরা এক যুবক।

কালো চশমার ভেতর থেকে কোমল চোখ দুটো মেলে চেয়ে আছে।

টুটুল এগিয়ে যায় গেটের দিকে।—এস. ডি. ও. সাহেব তোমাদের বাবা? যুবকটি জিজ্ঞেস করে।

টুটুল কিছু বলবার আগেই তার পেছনে চোঙা কটাস করে চিমটি কাটল। টুটুল থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। চোঙা পেছন থেকে তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে ডাকে,—আয় না।

গেট থেকে সরে আসতেই চোঙা ফিসফিস করে বললে,—ওরা ডাকাত। বাবাকে মেরে ফেলতে চায়।

—কিন্তু

—কিন্তু কি? ওরা বোমা মারে, পিস্তল মারে। ওরা সব করতে পারে।

টুটুলের এতক্ষণে খেয়াল হয় পাঁড়ের সাবধানবাণী। কিন্তু লোকটাকে দেখে মোটেই তো ডাকাত বলে মনে হয় না। প্রতাপের মতো ফর্সা নয়, কিন্তু হাসিতে ভরা মুখখানা, বিশেষ করে ঠোঁটের ভাঁজ আর থুতনি অনেকটা বড়দার মতো। এদের সংগে বোমা-পিস্তল নিয়ে ডাকাতির সম্পর্ক বড্ড খাপছাড়া লাগে তার কাছে।

ফুটবল খেলে সন্ধের পর বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে তারা থমকে দাঁড়ায়। সাত হাত অন্তর অন্তর সমস্ত চাতাল জুড়ে সশস্ত্র শান্ত্রী। বেলুচ রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সন্ধের পর সহরে এসেছে পুলিশ লণ্চে। গত রাত্তিরে জেলখানার দেয়ালের ওপাশ থেকে আওয়াজ এসেছিল। ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট অনুযায়ী আজ রাতে সন্ত্রাসবাদীরা জেলখানা ও ইদ্রাকপুর কোর্ট আক্রমণ করবে। ভবনাথ বৈঠকখানায় পুলিশ কর্তাদের সংগে কনফারেন্স করছেন। তাঁর নিজের আপত্তি সত্ত্বেও স্থানীয় ছোকরা ডি-এস-পি এবং জেলা সদর কর্তৃপক্ষের চাপাচাপিতে সামরিক বাহিনী তলব করতে হয়েছে।

টুটুল এক চাপা উত্তেজনা নিয়ে ঘুমোতে যায়। সাড়ে ছ' ফুট লম্বা সংগীন-আঁটা নিস্তব্ধ উত্তরভারতীয় শান্ত্রী না চশমারা ভেতর থেকে হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ বাঙালী তরুণ—এ দুজনার কোনজন বন্ধু, কোনজন শত্রু তা তার কাছে ঘুলিয়ে যায়। লড়াই হলে এদের দুজনের মধ্যে কার জেতা উচিত সে সম্পর্কে সে মনস্থির করতে পারে না।

চোঙা বললে সে আজ রাত্তিরে ঘুমোবে না। রাত্তিরে লড়াই বাধবে। শান্ত্রীরা ওপর থেকে রাইফেল ছুঁড়বে। তুমুল একটা হট্টগোল বাধবে। বুড়ী বললে,—যাই বল ইংরেজের সংগে কেউ পারবে না। চোঙা আর এক ধাপ এগিয়ে যায়। তার মতে রাত্তিরে কামান আসবে। কারণ কামান না হলে কখনও কেল্লা রক্ষা করা যায় না।

—তুই সবটাতে বাড়াবাড়ি করিস চোঙা। বুড়ী আপত্তি করলে।

—তুই কি জানিস রে? তুই তো মেয়ে। আমি সব শুনেছি। আজ রাত্তিরে কামান আসবে। বাবা কামান চালাবে।

টুটুলের সংগে সংগে বুড়ীও স্তম্ভিত। ভবনাথের ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর ছেলেমেয়েরা সচেতন থাকলেও তাঁকে গোলন্দাজ রূপে কল্পনায় হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে বুড়ী।—তোর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে চোঙা, সে চট করে কথাটা ঘুরিয়ে নেয়।

শেষ রাত্রে জানলা দিয়ে টুটুল অবাক হয়ে দেখলে ভোরের তারার নীচে খাড়া নিস্পন্দ ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রহরী। শিশিরে সংগীনগুলো আরও চকচক করে।

সে বছর বর্ষা শেষ না হতে হতেই তেড়ে শীত পড়ল। দুটো সবুজ আলোয়ান কিনে দিলেন দুই ছেলের জন্যে স্বর্ণসুন্দরী। তারা আলোয়ান মুড়ি দিয়ে বসে মধুবাবুর সামনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে চাণক্য শ্লোক আওড়ায়:

বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে ॥

অঙ্ক হোক, ইংরেজী হোক, চাণক্য শ্লোক একবার আওড়াতে হবেই। একদিকে সংস্কৃত শ্লোক আর ইংরেজী ব্যাকরণ অন্যদিকে অঙ্ক—এর মাঝখান দিয়ে মধুবাবু প্রতি সন্ধেবেলা তাঁর নৌকো বেয়ে চলেন। নৌকোর আরোহীরা এবং তাঁদের অভিভাবকও নিশ্চিন্ত।

বড়দিনের ছুটি এগিয়ে আসছে। ম্যাপে কক্সবাজার দেখানোতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়া ছাড়া টুটুলের সব পরীক্ষাই ভাল হয়েছে। চোণ্ডা অঙ্কতে ফুলমার্কস, তবে ইতিহাস ভূগোলে ধেড়িয়েছে। বুড়ীর যে এবার কি হল, বোঝা গেল না, কোনরকমে হেঁচড়ে মেচড়ে বেরিয়েছে।

কিন্তু শৈশবে বিষাদ তালপাতার ছায়া। কয়েকদিন যেতে না যেতেই রৌদ্রঝলকিত কৈশোরের আনন্দে ঝলমল করে বুড়ী। গত কয়েক মাসে অনেকটা লম্বা হয়েছে সে। কাঁধও চওড়া হচ্ছে। গাল ভাঙছে। মাথাভর্তি কোঁকড়া চুলে লম্বা শ্যামলা মেয়েটা দিন-রাত্তির এদিক-ওদিক লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।

বড়দিনের ছুটির আগে বাদলা দিচ্ছিল। চারদিকে ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছিল ঠাণ্ডায়। তারপর আবার মিঠে রোদ্দুরে ভরে যায়। এদিকে সচরাচর দুষ্প্রাপ্য একটা কমলা লেবু বুড়ী আর টুটুল দুই ভাইবোনে ভাগাভাগি করে খাচ্ছিল আর গোপীনাথ কাঠ চিড়ছিল কুড়োল দিয়ে। জেলখানার পাশে দুটো মোটা আমের ডাল ঝড়ে পড়েছিল। সে দুটো শুকিয়ে নিয়ে চেলা করা হচ্ছে।

এমন সময় উত্তেজিত চোণ্ডার আবির্ভাব।—দেখে যা দেখে যা, কত জিনিস আসছে।

তিনজনেই দৌড়ে আসে। প্রায় জনা পনেরো লোক ভারে ভারে রকমারি খাবার আনছে।

চোণ্ডা উত্তেজিত হয়ে চেঁচাতে থাকে,—ভীম নাগ, ভীম নাগ, আমি খেয়েছি কলকাতায়।

সামনের থালায় ভীম নাগের সন্দেশ। সন্দেশের বাকসগুলো একটা পিরামিডের মতো উঁচু করে সাজানো, পরের থালাটা ভর্তি আপেল,, দুটো বিশাল বড়দিনের কেক—জরিতে মোড়া চিত্র-বিচিত্র করা, এক পরাত ভর্তি মোটা মোটা কালো আঙুর আর পিন খেজুরের মোড়ক। থরে থরে দইয়ের ভাঁড় সাজানো দুটো থালা, এক থালা ভর্তি কিসমিস বাদাম, প্যাস্তা, শেষে পেল্লাই পাকা মর্তমান কলা।

স্বর্ণসুন্দরী প্রথমে অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু খাবারের এই অতুলনীয় বৈভবে মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। রাজকীয় গাম্ভীর্যে হাঁক দেন,—গোপীনাথ। গোপীনাথও বোঝে এটা এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। তাড়াতাড়ি হাঁটুর নীচে কাপড় নামিয়ে, বারান্দায় কোনায় টাঙানো সাদা ফতুয়াটা চাপিয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর পথ দেখিয়ে ভারীদের ভাঁড়ারঘরের দিকে নিয়ে যায়। দেখতে দেখতে ভাঁড়ারঘর ভরে ওঠে। ফলের মিষ্টির গন্ধে ছেলেমেয়েদের উত্তেজনা আরও বাড়ে।

ইতিমধ্যে হন্তদন্ত হয়ে সামেদের আবির্ভাব। হাতে ভবনাথের চিরকুট। তাড়াতাড়িতে ভবনাথের বাংলা হরফগুলো তাদের স্বাভাবিক ক্ষুদ্রাকার হারিয়ে ফেলেছে। ভবনাথ লিখেছেন : দুই ভাই দুই বড় জমিদার। চরের জমি নিয়ে দুজনে দুজনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা লড়ছে। আমার কোর্টে মামলা। শুনলাম ঘাটে নৌকো ভিড়েছে উপহার আসছে আমাদের বাড়ি। পত্রপাঠ সব বিদায় দেবে।

স্বর্ণসুন্দরী হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কিতভাবে লক্ষ্য করলেন পেছনে দাসী পরিবৃতা দুই মাঝ বয়সী মহিলা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছেন। কাছে আসতে চেহারাগুলো আরও স্পষ্ট হয়। জমিদারবাড়ির বউ এক নজরে বলে দেওয়া যায়। নাকে হীরের ফুল, পরনে চাওড়া কালো-পেড়ে ফরাসডাঙার শাড়ি, আলতাপরা খালি পা, পেছনে দুই দাসীর হাতে দুজোড়া চটি, সিঁড়ির মাঝখান থেকেই সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছে দুই বৌ।

সন্দেশ আর আপেলের থালার পাশে পাক খাওয়া ছেলেমেয়েগুলোর মুখ এক মুহূর্তে ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় এক শারীরিক ব্যথা নড়ে ওঠে স্বর্ণসুন্দরীর বুকের মধ্যে। তারচেয়েও মুস্কিল সামনেই উদিত দুখানি হাসিভরা মুখ। মুহূর্তে নিজেকে শক্ত করেন। স্বামীকে চেনেন স্বর্ণসুন্দরী। অনেক ব্যাপারে ভবনাথ খুব গেঁতো, কিন্তু নীতিগর্ত কোন কোন ব্যাপারে তাঁর বাবার চেয়েও ভবনাথ কড়া। ভবনাথের চিঠিও এই জাতের কড়া হুকুম। গেটের থামের পাশে সরে গিয়ে বললেন,—সামেদ, পেছনের জমাদারের সিঁড়ি দিয়ে সব খাবার ওদের লোকজনদের দিয়ে নৌকোয় তুলে দাও। কোন চেঁচামেচি হবে না। গোপীনাথ লুচি ভাজো।

তারপর সামনে এসে ছোট্ট করে নমস্কার করলেন।

ছেলেমেয়েদের কাছে সমস্ত ঘটনাটাই ভেল্কির মতো লাগে। কেনই বা ভাঁড়ারঘর ভর্তি করে

রকমারি খাবার উঠল আবার কেনই বা সায়েদের আদেশে বিস্মিত ভারীরা প্রথমে একটু ওজর-আপত্তি করে শেষে নিমরাজি হয়ে পেছনের ছোট নোংরা সিঁড়ি দিয়ে খাবারের থালাগুলো নিয়ে যাচ্ছে তার হদিস করতে পারে না তারা। চোঙা তো মরিয়া হয়ে একটা সন্দেশের বাক্স তুলে নিল। কিন্তু বুড়ী সেটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আবার রেখে দেয়, শেষ পর্যন্ত একছড়া কালো আঙুর তুলে নেয় চোঙা। টুটুল দুটো প্যাসট্রি সরাল।

ইতিমধ্যে গোপীনাথ লুচি আলু ভাজছে। চায়ের সঙ্গে সঙ্গে লুচি খেতে খেতে জমিদার বাড়ির বড় আর ছোট বউ গল্প করতে থাকেন। কলকাতায় গিয়ে তাঁরা "চণ্ডীদাস" ও "ভাগ্য চক্র" বলে দুখানা বাংলা ফিলম্ দেখেছেন।—বিশেষ করে উমাশশীর যা পার্ট, বুঝলেন মাসীমা। ছোট বউয়ের কাননবালা পছন্দ। শরৎচন্দ্রের "দেবদাস" বইতে পার্বতীর পার্ট—অমন হয় না। স্বর্ণসুন্দরী 'চণ্ডীদাস' ছাড়া কোনটাই দেখেন নি। তবে উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বুকটা যে দুরদুর করে না একেবারে তা নয়। ঘরের কোনের জানলাটা দিয়ে তিনি যে দিকটায় বসেছিলেন সেখান থেকে নীল উর্দিপরা সায়েদের চেহারা আর মাঝে মাঝে কেকের কিংবা দইয়ের পরাত ভেসে ওঠে। উমাশশী যাতে কেলেঙ্কারী আটকাতে পারে এজন্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাংলা চিত্রজগতের নায়িকাদের চেহারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

লুচি আলুভাজা চা খেয়ে বড় বৌ ছোট বউ উঠলেন। সামনের পুজোয় আসতে বললেন তাঁদের বাড়ি। বাড়ির সামনের মাঠে মস্ত মেলা বসে, চমৎকার পুতুল খেলাব দল আসে, ছোট সার্কাসেরও তাঁবু পড়ে। টুটুলের গাল টিপে আদর করে ছোট বউ বললেন,—ছেলেমেয়েদেরও নিয়ে আসবেন কিন্তু। খুব মজা পাবে।

স্বর্ণসুন্দরী সায়েদের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পাঠালেন অতিথিদের ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে। দুভাই একটা ভাল কাজ পেয়েছে ভেবে সারা রাস্তা গল্প করতে করতে চলল। খালি বুড়ী মুখ ভার করে সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল। তার মায়ের উদ্বিগ্নতার কারণ সঠিক বুঝতে না পারলেও কিছু অঘটন ঘটেছে এরকম ব্যাপার সে আঁচ করতে পারে। আর ঘটলও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। ঘাটে একখানা গ্রীণবোট। পেছনে আর একটা নৌকো। বুড়ী লক্ষ করলে দুজন ভারী এগিয়ে এসে বড় বৌকে কি যেন বললে। সঙ্গে সঙ্গে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটল। বড় বৌ ফুঁসে উঠলেন বুড়ীর দিকে চেয়ে,—কি! আমাদের এরকম আপমান! আমরা নিজেরা এলাম বাড়িতে! ছোট বউও চীৎকার করতে থাকেন,—অসভ্য, ইতর! ইত্যাদি কথাগুলো কানে যেতে বুড়ীর কান ঝাঁ ঝাঁ করে। প্রায় কেঁদে ফেলে বুড়ী। কাঁদো কাঁদো গলায় বলে,—আমি কি জানি!

বড় বউ বোটে উঠতে উঠতে বললেন,—তোমার মা-কে বলে দিও, আমরা অনেক হাকিম দেখেছি।. কেউ আমাদের এমন অপমান করে নি।

বুড়ীর চোখ ফেটে জল আসে। এতগুলো জিহ্বাআকর্ষক খাবার বরবাদ যাওয়ায় তারও অন্তরের সায় ছিল না। প্রায় কেঁদেই ফেলে বুড়ী,—আমাকে বকবেন না।

চোঙা চেঁচিয়ে বলে,—আমরা কি জানি? আমরা কি জানি?

টিংটিং-এ দাদাবাবুর রণমূর্তি দেখে সায়েদও এগিয়ে আসে।—না, তোমাদের আমরা কিছু বলছি না, বলে ছোট বউ নৌকোয় উঠলেন, বাটা থেকে বার করা পান তখনও তাঁর হাতেই ধরা আছে।

চার

নীচু কামিনী গাছটার দোলনা বেঁধে দোল খাচ্ছিল বুড়ী বাড়ির নীচেই। হঠাৎ এক সাহেব আসছে দেখে দোল খাওয়া বন্ধ করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একবার ভাবলে পালিয়ে যাবে জেলখানার দিকে কিন্তু এত কাছে সাহেবটা এসে গেছে যে পালানো বিসদৃশ। বাদামি রংয়ের সুট আর চকোলেট ফেল্টের টুপি পরা সাহেবটি বুড়ীর কাছে এসে পরিষ্কার বাংলায় বললে —চল, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে চল।

স্বর্ণসুন্দরী আগেই খবর পেয়েছিলেন কিন্তু এরকম না জানিয়ে নব-র সহসা আবির্ভাবে তিনি একেবারে আনন্দে থই পান না কি করবেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁর হাঁকডাকে বাড়ি গরম। নব যে তার যৌবনের আটদশটা বছর দায়হীন আরামের ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে এসেছে সেদিকে তাঁর স্বামীর মতো দৃষ্টি দিলেন না স্বর্ণসুন্দরী। নব-র সাহেবের মতো চেহারা, তার উচ্চকণ্ঠ হাসি, কোটের ভাঁজে বিলিতি সেন্টের গন্ধ, অসংখ্য বিলেতের গল্প—আমরা কতদিন বাটারে প্রন্ ফ্রাই করে খেতাম দিদি। যোগেন চাটুজ্জের ছেলে রামু, সে বেটা আমার সঙ্গে পাল্লা দিত। বেটা তোর বাপ ছিল তো ইস্কুল মাস্টার! ইত্যাদি নানা ধরনের গল্পগুজবে কথাবার্তায় স্বর্ণসুন্দরী মুগ্ধ। এই ভাইকেই তিনি আরায় বটল পামের ছায়ায় ঢাকা মোরামের রাস্তায় পিঠে ফেলে ফেলে ঘুম পাড়িয়েছেন ভেবে গর্বিত বোধ করেন।

যে দুদিন নব ছিল সে দুদিন ছেলেরা চাতালে চান করত কারণ প্রায় দু ঘণ্টা স্নানের পর্ব চলত। স্নান শেষ হবার পর অবশ্য স্নানঘরে ঢুকতে ছেলেদের খুব ভাল লাগত। বিলিতি ওডিকোলনের গন্ধে ভুরভুর করত চারদিক। ভবনাথ বিকেলবেলায় শ্যালককে ধুতি-পরা শেখাতে গলদঘর্ম।—দাদাবাবু, হাউ ডু ইউ ম্যানেজ এ ধোতি, আই ওয়াণ্ডার। ঘন ঘন নব বললে। শেষে আপোষ স্থির হল। দুভাঁজ করে লুঙ্গির মতো ধুতি পরলে নব।

ছেলেদের একটা নতুন কাজ গজাল। দুপুরবেলা সাহেব মামা-র গা টেপা, ঘণ্টায় এক আনা। এ ব্যাপারে চোঙার উৎসাহই বেশী। দুদিনে চার আনা কামালে। টুটুলের বিশেষ পছন্দ নয় একেবারে অপরিচিত ঠ্যাং মেলে দেওয়া মানুষটার গায়ে পায়ে হাত বুলানো। অবশ্য স্বর্ণসুন্দরীর দিবানিদ্রার সময় আগে মাঝে মাঝে তাঁর গায়ে পাউডার বেশ উৎসাহের সঙ্গেই লাগিয়েছে টুটুল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ ছেলেরা কিরকম চলে ফেরে, তাদের ভদ্রতা আয়ও করার রিহার্সালও চলে।

—এ একটা আপদ জুটল কোথা থেকে রে? টুটুল বুড়ীকে ফিস ফিস করে বলে।

স্বর্ণসুন্দরীর এনার্জির ব্যাটারী প্রায় ডাউন মেরে গিয়েছিল। কোন ব্যাপারে উদ্দীপনা উত্তেজনায় নিজেকে ছুঁড়ে না দিলে তাঁর নিজের কাছে জীবনটা শুকিয়ে ওঠে। আগে জামাই ছিল, খানিকটা ছিল প্রতাপ, সকলের ওপরে ছিলেন তাঁর বাবা এই গম্‌গমে সরগরম করা জীবনের প্রতীক। ভবনাথ তাঁর এ চাহিদা মেটাতে পারেন না। তিনি কতগুলো ব্যাপারে, বিশেষ করে নীতির ক্ষেত্রে অভ্রান্ত।

নব যখন তাই পিতৃস্মরণে রুমালে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে কেঁদে ফেললে তখন স্বর্ণসুন্দরীও অভিভূত না হয়ে পারেন না। চোখ মুখ লাল করে নব বললে,—তোমরা তো ভাব আমি হার্টলেস্। দাদাবাবুও নিশ্চয় আমাকে তাই ভাবেন। কিন্তু তোমরা তো জান না হোয়াট এমাউন্ট অফ্ মিজারি আই সাফার্ড। আবার প্রবল বিক্রমে নাক ঝাড়তে থাকে নব।

টুটুল দাদাকে ফিস ফিস করে বললে,—সাহেবরা এরকমভাবে কাঁদে না রে?

—আমাকে তোর কিছু বলতে হবে না নব। আমার কাছে তুই যেরকম ছিলি তেমনিই আছিস। স্বর্ণসুন্দরীও কাঁদতে থাকেন।

—মধুবাবু এসেছিলেন? চোঙার দিকে মুখ ফিরিয়ে ভবনাথ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন।

—মধুবাবুর মা মারা গেছেন, বুড়ী বললে।

ও, তোমরা তাহলে নিজেরা পড়তে বোস।

উত্তেজনা যেমন সহজে আসে, কান্নাও তেমনি সহজে আসে স্বর্ণসুন্দরীর। ভালবাসা মানেই উত্তাপ, চেঁচামেচি কান্না; হৈহৈশূন্য ভালবাসার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অন্তত বিষাদে ভরা গরুর মতো বড় বড় চোখ মেলে থাকা ভবনাথের যে ভালবাসা ও মমত্ববোধ তা থেকে এ ভালবাসার জাত আলাদা। ভবনাথ কষ্ট পান কিন্তু কষ্টের প্রকাশ নেই, আনন্দিত হলে উছলে ওঠেন না কখনও। এ জন্যেই বোধ হয় কোনো কোনো মহলে রাশভারি আখ্যা পেয়েছেন তিনি।

বাইরে চাতালে চেয়ার পাতা, মাথার ওপর ঘন নীল মখমলে অজস্র ঝলকানো হীরকখণ্ড। সে দিকে চেয়ে চেয়ে ভবনাথ সামনের টুর প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলেন মনে মনে। স্বর্ণসুন্দরী হঠাৎ ভাইয়ের হাত ধরে বললেন,—সবই তো হোল নব। আবার শুনছি বিলেত যাবি, আবার

কেন? অতো বড় প্রাসাদের মতো বাড়ি। সবই তো তোর। এবারে একটা...

নব কথাটা লুফে নিলে,—কিসের জন্যে এলাম বড়দি তোমার কাছে? সেই কথাটাই তো বলতে! বিয়ে ঠিকঠাক করেই এসেছি।

উদ্বেগে গলা আটকে যায় স্বর্ণসুন্দরীর,—মানে, আমাদের...

—হ্যাঁ হ্যাঁ বড়দি। আমি কি সাহেব হয়ে গেছি নাকি? তাছাড়া অনেক ঘাঁটাঘাঁটি তো করলাম। ওরা অন্যরকম, আমরা অন্যরকম। মানে আমি চাই আপ-টু-ডেট মেয়ে—ঐ তোমাদের চচ্চড়ি পড়পড়ি রাঁধলেই চলবে না। কিন্তু তার সোল-টা হবে ইণ্ডিয়ান।

—ঠিক বলেছিস নব, ঠিক বলেছিস। ঠিক বোস বাড়ির ছেলের মতো কথা।

—গোপীনাথ, বড়ির টিনটা চাতালে পড়ে আছে, ভেতরে নিয়ে যাও, ভবনাথ রান্নাঘরের দিকে চেয়ে বললেন।

—হাইকোর্টের জজের একমাত্র মেয়ে। বেশ আপ-টু-ডেট, ঘরোয়াও আছে।

—দেনাপাওনার কথা কিছু?

—তুমি বড়দি সেই রকমই আছো। ওসব যৌতুক-ফৌতুক নেওয়া আজকাল উঠে গেছে। আর আমিই বা কি তাতে রাজী হব? তবে...

—তবে কি?

—আমি ওসব জানি না বড়দি। তবে মা বলছিলেন, বাবা নেই, বিয়ের খরচা বাবদ হাজার ছ-সাতেক টাকা...

—কি এমন অন্যায় বলেছেন?

—আমি ও সবের মধ্যে নেই বড়দি।

—তারিখ ঠিক হয়েছে?

—সাতই অঘ্রান। দাদাবাবু আপনাকে কিন্তু ছুটি নিতে হবে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাবেন, সেই জন্যেই তো এলাম।

ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে ভবনাথ এক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন কালপুরুষের দিকে। কোমরে বেল্টপরা যোদ্ধা আশ্চর্য ঝকমক করছে আজ রাতে। সম্প্রতি ঠিকুজি মিলিয়ে দেখেছেন বৃহস্পতি তাঁর তুঙ্গে। এ বছরটা বরাবর ভাল সময়। অঘ্রানের আগে কিছু হবে না? বললেন,—নিশ্চয় যাব নব, এতদিন পর বিয়ে করবে, যাব না?

স্বামীর কথায় স্বর্ণসুন্দরী কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হলেন। খেলোয়াড়ি চেহারায় মেদবৃদ্ধির আধিক্য এবং ঘনায়মান টাক সত্ত্বেও নব হাবেভাবে যথেষ্ট তরুণ। বললেন,—আমাদের সময় কি আর আছে এখন? তাছাড়া, পুরুষমানুষের আবার বয়স কি?

—প্রতাপের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত হয়?

ভবনাথের প্রশ্নে নব হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ে। গাঢ় চকোলেটের ওপর মোটা সোনালী ডোরাকাটা ড্রেসিং গাউনে দড়ির ঝুন্টি শূন্যে নাচাতে থাকে।

—কি, দেখা হয় না?

—নাঃ! দড়ির ঝুন্টি নাচানো আরও বেড়ে যায় নবর।

ভবনাথ বললেন,—সে কি! একই জায়গায় থাকো! তার গলায় চাপা উদ্বেগ।

—আচ্ছা দাদাবাবু, প্রতাপ কি রাজনীতি-টাজনীতি করত?

—কেন? কি হয়েছে? এমন কাতর বিস্ময়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসেন যে নব প্রায় অপ্রস্তুত।

—না, না, সেরকম কিছু না, সেরকম কিছু হয়নি। হি ইজ এ সেনসিবল বয়। কিন্তু হি ইজ ইন্ ব্যাড কম্পানি, আই মাস্ট সে।

খুব ঘটা করে নব বললে, গম্ভীরভাবে। এতক্ষণ তাদের আলাপে ভবনাথের ঔদাসিন্যের ভাল জবাব দিতে পেরেছে ভেবে চাপা আনন্দে মুখটা আরও লালচে ফর্সা দেখায়।

ভবনাথ দুতিনবার কেশে গলা সাফ করেন। কি একটা বলতে গিয়ে চুপ করে যান। স্বর্ণসুন্দরী বললেন,—মেমসাহেবদের ফাঁদে পড়ে নি তো?

—বড়দি যে কি বলো। ওখানকার মেয়েরা তো...কি যে বলে...তোমাদের অসূর্যম্পশ্যা নয়। মেয়েরা সব জায়গায়, কলেজে বাড়িতে, রাস্তাঘাটে। ওদের সমাজটা অনেক জীবন্ত বড়দি।

একটু থেমে বলে,—ঐ যে রজনীপাম ডাট বলে একটা কমিউনিস্ট উঠেছে আজকাল, খুব ক্রেজ হয়েছে। ওর মিটিংএ প্রতাপকে দেখা গিয়েছিল। তাছাড়া ওর কথাবার্তাগুলো একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। ফ্যামিলি ফিলিংগুলো ঠিক...

ভবনাথ গুম মেরে বসে থাকেন। বারো চোদ্দ বছর বিলেতে যৌবন উড়িয়ে যে ছোকরা পারিবারিক কর্তব্য করে এসেছে তার মুখে পরিবারপ্রীতির কথা শোভা পায় না। অনেক সময়ই হয়ে থাকে নানা কারণে নিজেদের মধ্যে অমিল। সেটা আলাদা কথা। কিন্তু প্রতাপ বিলেতে গিয়ে একেবারে বিপথে চলে যাবে তাঁর সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পা দিয়ে মাড়িয়ে একথাটা ভেবে ভবনাথ বিচলিত হন। অন্ধকারে আবার জ্বলজ্বলে কালপুরুষের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেন। তাঁর বাবার কথাটা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, 'সার্ভিস ইন এনি ফর্ম ইজ এ সার্ভিচিউড অ্যান্ড কেনট্ বি এনিবডিজ এমবিশান।' প্রতাপ কি তাই ভাবছে? তাহলে সিভিল সার্ভিস ছেড়ে ব্যারিস্টারি পড়ুক, চার্টার একাউন্টেন্ট হোক। কিন্তু যে কথা নব বলেছে সে তো আত্ম-হত্যার সামিল। সে পথে প্রতাপ পা বাড়াবে কেন?

পরের দিনই তেড়ে ছেলেকে চিঠি লিখলেন ভবনাথ।

তারপর সকাল-বিকেল বিলেতের গল্প করে নব বিদায় নিল।

বিদায় নেবার মুখে সে একটা কান্ড ঘটালে যে কথা ছেলেমেয়েরা বহুদিন ভুলতে পারেনি। সকালে উঠে তারা তাদের বাবাকে চিনতে পারে না। তাঁর মুখে জাঁদরেল বাহারে গোঁফের চিহ্ন নেই। নব খুব ভোরে তার ছোট কাঁচি দিয়ে ক্যাঁচ করে গোঁফ উড়িয়ে দিয়েছে।

—বাবাকে কেমন অদ্ভুত লাগছে রে! বুড়ী বললে।

—হ্যাঁ, কেমন বোকা বোকা। চোঙা ফোড়ন কাটে।

গরমের ছুটির সঙ্গে সঙ্গে সাঁতারের ধুম পড়ে। এ বছর হাত আর পায়ের কাজে বুড়ী আর টুটুল কিছুটা রপ্ত হয়েছে। চোঙার সঙ্গে পাল্লা না দিলেও জলটানা আরও সাবলীল। টুটুল আবার ডুব সাঁতারও দিচ্ছে। আর চোঙা ছবির মতো সাঁতার কাটে। পাঁড়েকে আর জলে নামতে হয় না। একবার ঘটি মলতে মলতে অথবা দাঁতন করতে করতে ঘুরে যায়।

তবে প্রথম প্রেমের মতো জলের প্রথম আকর্ষণও কমে গেছে। এখন আর ভয়ডর নেই, ভাবনা নেই, কল্পনাও নেই। এখন অনেকটা রুটিন ব্যাপার। চোঙা পাঁচ-ছবার পারাপার করে, টুটুল বুড়ী তিনবার, অবশ্য জিরিয়ে জিরিয়ে। বুড়ী ফ্রকের ওপর তোয়ালে জড়িয়ে ঘাটে বসে থাকে, কখনও কখনও জলে নিজের ছায়া দেখে। আর টুটুল ঘাট ধরে পায়ের কাজ করে, মাঝে মাঝে অতিরিক্ত জল ছিটোলে বুড়ী চেঁচায়।

ছেলেমেয়েদের কিছুদিন হল মন খারাপ। পাঁড়ে দেশে যাচ্ছে ছ মাসের জন্যে। তিনচার বছর ছুটি জমিয়েছে। ছোট ভাইয়ের বিয়ে দেবে, চোঙার মতো বয়স। আর হয়ত দেখা নাও হতে পারে। চোঙা ঘাটে উঠে বললে,—কি হয়েছে পাঁড়ে যাচ্ছে? পাঁড়ে আমাদের আত্মীয়?

—আত্মীয়রাই সব সময় আপনার হয় না, টুটুল গা মুছতে মুছতে বলে।

—ঠিক বলেছিস টুটুল, বুড়ী সায় দেয়।

ক্রমে ক্রমে পাঁড়ের যাবার দিন ঘনিয়ে এল। তার আগের দিন বিকেলে ঠিক হল, পাঁড়ের সঙ্গে নৌকোয় ঘুরে আসবে। ছইতোলা ছোট নৌকো পাঁড়ে ঠিক করেছে, বোধহয় বিনে পয়সায়। পাঁড়ের সঙ্গে যাবে বলে স্বর্ণসুন্দরী আপত্তি করলেন না।

সেদিন বোধহয় পূর্ণিমা। যখন নৌকো কাটাখালিতে পড়েছে তখন দূরে মেঠো রাস্তায় ধানক্ষেতের ওপরে জেগে থাকা কালভার্টের পেছনে থালার মতো গোল হলুদ চাঁদ উঠছে। ফুর ফুর করে হাওয়া দেয়। বুড়ী গান ধরলে, নিজে নিজেই, আমার সোনার বালুচর, তোর কিনারে বেঁধেছিলেম আমার পাতার ঘর।'

ভাটিয়ালি সুরে বুড়ী গাইলে, নৌকো বেয়ে মাঝ দরিয়ায় গিয়াছিলাম ভেসে আমি সেই যে গেলাম আর না তারে দেখতে পেলাম এসে।

তখন চারদিক থেকে ছুটে আসা হাওয়ায়, ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আর জলের ওপর কাঁচ চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় দুই ভাই স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে পাঁড়ের বিশাল কাঁধের দিকে চেয়ে। দুজনের মনেই বিদ্যুতের মতো খেলে যায় তেলে ঘামে চকচকে পাঁড়ের ডন-দেওয়া বিশাল বুকের ওঠা পড়া, খড়মের শব্দে মুখরিত তুলসীদাসের কলি :

'ইয়ে ভবসংসার হ্যায় রামো কি ময়া,
কহি ধূপ হ্যায় কহি ছায়া ॥

ফিরতি পথে অবশ্য এই চন্দ্রালোকিত ইন্দ্রজাল কেটে যায়। চোঙা সেদিনের খবরের কাগজের প্রথম পাতায় একটা মোটর বোটের ছবি দেখেছে। স্টিমার আগে যায় না মোটর বোট আগে যায় এ নিয়ে দুইভাইয়ের মধ্যে তর্ক বাধে। ঘাটে যখন নৌকো ভিড়ল তখন বেশ সন্ধে।

পরদিন ভোরে এক কান্ড। টুটুল চোঙা তখনও ঘুমোচ্ছে। বাথরুম থেকে বুড়ীর আতঙ্ক-তীক্ষ্ণ গলা ভেসে আসে, —মা, মা......দেখে যাও কি হয়েছে ?

স্বর্ণসুন্দরী তাড়াতাড়ি সেদিকে যেতেই বুড়ীর আবার সেইরকম গলা ভেসে আসে, —মা, আমার কি হবে ? আমার টি-বি হয়েছে।

পাঁচ

সে বছর অঘ্রান মাসের মাঝামাঝি মস্ত লনে ম্যারাপ বেঁধে এলগিন রোডে রাধা মিত্তিরের সঙ্গে বিয়ে হল ভবনাথের শ্যালক নবেন্দু বোসের। সন্ধেটা ছেলেমেয়েদের মনে অনেক দিন পর্যন্ত গেঁথে ছিল। বিশেষ করে কলকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের বরকে একদিনকা সুলতান বানাবার যে পদ্ধতি তা সবচেয়ে ভাল লাগল তাদের। লনের মাঝখানে দেবদারু পাতায় মোড়া কুঞ্জ, তার গায়ে থোকা থোকা নীল বালব জ্বলছে আর নিভছে। সামনেটা খোলা। সেখানে প্রায় সিংহাসনসদৃশ মেহগিনী রঙের বাহারে পুরু গদি আঁটা চেয়ারে ঘনায়মান টাকে হাত বুলোতে বুলোতে নবেন্দু বোস তাঁর দুই ভাগ্নের দিকে চেয়ে তাঁর বা চোখ মারলেন। আগে থেকেই ভাগ্নেদের সঙ্গে কথা ছিল— যদি খুশি লাগে তাহলে বাঁ চোখ এবং নার্ভাস বোধ হলে ডান চোখ মারবেন।

—মামার খুব স্ফূর্তি লেগেছে রে, চোঙা চাপা উত্তেজনায় বললে।

তাছাড়া উৎসাহবোধ করবার আরও কারণ ছিল। মুন্সীগঞ্জের জলকাদা লণ্ঠন থেকে এই আলোয় ঝলমল চাঁদোয়ায় ঢাকা লন, পামের টবে টবে লাল নীল হলুদ বালব, বৈদ্যুতিক আলো-খচিত বেলোয়ারি ঝাড়, আর লম্বা সার দেওয়া সাদা আলোর ডোম, হাতে রজনীগন্ধার মালা জড়ানো ধুতি আর গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি পরা সমবয়সী ছেলেদের স্বচ্ছন্দ বিচরণ, গাড়ি থেকে নামার মুখে গালে গোলা রং বোলানো জড়োয়া হীরে পরা ঝকমকে বেনারসীর পুঁটলি, পোলাউ আর চিংড়িমাছের মালাই কারির গন্ধ—এই সমস্ত ব্যাপারটার মানে যে বিয়ে একথা ভেবে দুভাই-ই আনন্দে টগবগ করে। এতদিন পর্যন্ত বিয়ের কোন প্রত্যক্ষ বাস্তব রূপ তাদের সামনে ছিল না। এখন এই আলো, চাঁদোয়া, শাড়ি গয়নার বর্ণাঢ্য, হাঁকডাক আর রকমারি খাবারের গন্ধে তা এক রূপ পায়।

তারপর সায়েদের মতো সাদা পাগড়িপরা বেয়ারাগুলো হাতে ট্রে নিয়ে যখন কোল্ড ড্রিঙ্ক দেবার জন্যে ঘুরে বেড়ায়, আর কাঠি দিয়ে চুষে চুষে সেই কনকনে ঠাণ্ডা সরবত খায় তখন তারা প্রায় স্বর্গে। চোঙা পরে জানালে সে তিনটে কাঠি হাতসাফাই করেছে। এইরকম আর এক স্বর্গ উপস্থিত খাওয়ার শেষে আইসক্রিম সন্দেশে। এরকম জিনিষ তারা জীবনে খায় নি। টুটুল-কে চাপা গলায় চোঙা ধমকায়।—ওরকম ইস্ ইস্ করিস নে। লোকে ভাববে গেঁয়ো। কোনদিন কিছু খায় নি।

অনেক রাতে তারা ফিরল। বোধহয় শেষ ব্যাচ তখন বসেছে। গরদের পাঞ্জাবিপরা টকটকে ফর্সা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক তখনও চেঁচাচ্ছেন: পোলোয়া, পোলোয়া !

পানের পিকে টুটুলের পাঞ্জাবি রঞ্জিত।—টুটুল-টা একেবারে গেঁয়ো। ট্যাকসিতে উঠতে উঠতে চোঙা বললে।

পরের দুদিনও স্বপ্নের মতো কাটল। তবে সাজগোজ যথেষ্ট হলেও ঠিক হাইকোর্টের জজ-বাড়ির মতো হয়নি অক্ষয় বোসের বাড়ি। অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এখানেও বউয়ের জন্যে সিংহাসন। জ্বলছে নিভছে বালব, সানাই, ফিশফ্রাই মাংস দই। তবে কোল্ড ড্রিঙ্ক ছিল না, আর ওরকম খোলা বাগানও নেই। সব ছাতে ব্যবস্থা।

এখানেও সেই রংমাখা বেনারসীর পুঁটলি, বাড়ির সামনে গাড়ির সার। চোঙা তো উত্তেজিত হয়ে পরিবেশনের পার্টিতে প্রায় যোগ দিয়ে ফেলেছিল। তারপর ঠোঁটে চেটাল লিপস্টিকমাখা জ্বল-জ্বলে চোখ এক মহিলা ফাঁপানো চুলে মৃদুস্বরে দ্বিতীয়বার ফিস ফ্রাই-এ অভিরুচি জানাতেই উত্তেজনায় ঠাকুরদের কাছ থেকে ছোঁ মেরে বিরাট ফ্রাইভর্তি থালা নিয়ে দৌড় দিতে গিয়ে ধুতিতে পা জড়িয়ে উলটিয়ে পড়ে যায় চোঙা। লুঙ্গিপরা এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক, মামার সহপাঠী ছিলেন ভাঁড়ারের ইনচার্জ। তিনি চট করে থালাটা টেনে নিয়ে ক্ষিপ্র আঙুলে টকাটক করে প্রায় সব কটা ফ্রাই তুলে নিলেন। অপরিচিত আড়ষ্ট ছেলেটির সামনে তর্জনী তুলে বললেন,—এক একটা ফ্রাই এক এক ফোঁটা রক্ত, জানোহে ছোকরা! যাও, তোমার আর পরিবেশন করতে হবে না।

চোঙা আশেপাশে চেয়ে দেখলে টুটুল কিংবা বুড়ী আছে কিনা। কিন্তু টুটুল পানের থালা নিয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। আর বুড়ী ভেতরের ছোট উঠোনে, আলোকিত সিংহাসনে উপবিষ্টা মামীর সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে কথা বলছে।

চোঙা এসে টুটুলের হাত থেকে পানের থালা টেনে নেয়। ফিস ফিস করে বলে,—মামা-বাড়িটা একেবারে বাজে। কোন কিছুর ব্যবস্থা নেই।

সবচেয়ে টগবগ করেন স্বর্ণসুন্দরী। বোসবাড়ির ঐতিহ্য যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে তাঁর ভাইয়ের এ বিয়ে মারফত। তাছাড়া রাধা মিত্তিরের বাপের বাড়ির গৌরবে যে এখন তাঁদের বাড়ির গৌরব আরও বাড়ল এ ভাবনায় তিনি অনেকখানি গুরুত্ব দেন। নব যে শেষ পর্যন্ত এক হেঁজি পেঁজি মেম নিয়ে আসে নি, সম্ভ্রান্ত ঘরে বিয়ে করে নিজের সম্ভ্রম বাড়িয়েছে এ জন্যে তিনি গর্ববোধ করেন। বস্তুত তাঁর স্বামীর দেশের বাড়ির পড়ন্ত গৌরবের পাশে তাঁদের পরিবারের মর্যাদা আরও উন্নত বোধ হয়। গৌরী ও প্রতাপকেও যদি দুতিন বছরের মধ্যে এরকম এক সম্ভ্রান্ত ঘরে বিয়ে দিতে পারেন তাহলে তাঁর জীবনে মুল কর্তব্যগুলো সম্পন্ন হয়েছে ভাবতে পারবেন।

গৌরী কদিন হল হস্টেল থেকে মামাবাড়িতেই আছে। তার চেহারা চমৎকার খুলেছে আজ-কাল। তাঁর এই ফর্সা লাফানো-ঝাঁপানো মেয়েটি বয়সের দাক্ষিণ্যে কিঞ্চিৎ মন্থর হয়েছে লক্ষ করলেন স্বর্ণসুন্দরী। বেগনি হাতকাটা জর্জেট ব্লাউজে এমন মানিয়েছিল বৌভাতের রাত্তিরে তাকে যে স্বর্ণসুন্দরী ফিরে ফিরে মেয়েকে লক্ষ করছিলেন।

কেবল একটু পথহারা দেখাচ্ছিল ভবনাথকে। বিয়ের কেনাকাটি, মাছ মাংসের জোগানদারদের সঙ্গে ব্যবস্থা এই দুটি প্রধান ব্যাপারের দায়িত্বই ছিল তাঁর ওপর। কিন্তু তিনি থেকেও ঠিক নেই। বিয়েবাড়ির ফাঁকে ফোকে বয়স্কলোকজনদের যে জমাট পারিবারিক আড্ডা তাতে তিনি ধাতস্থ নন। তাঁর মন কেমন করে ইন্দ্রাকপুর ফোর্টের নীচেই সবে লাগানো কপির ক্ষেতের জন্যে। চারাগুলো ঠিকমত লাগল কিনা এক একবার ভাবেন। প্রতাপের দরুন মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তা হয়। তাঁর শ্বশুর মশাই নব-র জন্যে যে সাম্রাজ্য রেখে গেছেন তার তুলনায় প্রতাপ খুব একটা কিছু পাবে না, তাঁর বাড়িও খুব বড় নয়, তার তিন ভাগের এক ভাগে মাথা গুঁজবার জায়গা হবে মাত্র। পাঁচ দিন যেতে না যেতেই ভবনাথ তাড়া দিতে থাকেন স্বর্ণসুন্দরীকে।

—তোমার কপির চারা মরবে না, আমি বলছি। গোপীনাথ আছে। ওর সব দিকে খেয়াল আছে। তোমার কোন ভাবনা নেই। স্বর্ণসুন্দরী বললেন।

কলকাতা ছাড়ার আগের দিন বিকেলে বাড়ির ঠিক সামনেই বিভৎস এক ব্যাপার ঘটে। ধূপ-কাঠি কিনতে গিয়েছিল রাস্তার ওপারে টুটুলের সমবয়সী একটা ছেলে। তার বাপের ডেকরেটারের দোকান এ ফুটে। পেছন থেকে লরিতে চাপা পড়ল ছেলেটা। লোকজনদের হল্লা, পলায়মান লরীর

পেছনে জনতার নিস্ফল আক্রোশ, পুলিশের ভ্যান, এক মুহূর্তে নীল চাঁদোয়ায় ঢাকা স্বপ্নের শহরকে রূপ দেয় শত্রুপুরীতে। ভবনাথের নিষেধ সত্ত্বেও টুটুল চোঙা বুড়ী ব্যালকনি থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে।

স্বর্ণসুন্দরী চীৎকার করে ডাকেন,—চলে এসো, চলে এসো তোমরা ওখান থেকে।

পরদিন যখন তারা ইন্দ্রাকপুর ফোর্টের চওড়া সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছিল তখন এই গাছপালা পুকুর জেলখানা সুপুরিগাছে ঢাকা বাড়িটাই তাদের নিজেদের বাড়ি মনে হচ্ছিল। কলকাতায় একদিন বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে সম্প্রতি ভাড়া দেওয়া তাদের নতুন ঝকমকে বাড়িতে নিয়ে গেছিলেন ভবনাথ। সেখানে গ্যারাজ থেকে ভাড়াটের নতুন নীল মরিস গাড়ি বেরোচ্ছে, ওপরের বারান্দা থেকে কুকুরের ডাক আসছে, সে বাড়ি ঠিক তাদের নয়। তার সঙ্গে তারা কোনো আত্মীয়তাও বোধ করেনি।

আসবার সময় গৌরী দুখানা বই তার ভাইদের উপহার দিলে, বুড়ীকে চুলের রিবন আর তিনজনের জন্যে তিনটে চকলেট। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "যকের ধন" আর "আবার যকের ধন" পড়তে পড়তে তাদের শৈশবে বিপ্লব এল। বিশেষ করে টুটুলের রূপকথা আর কল্পনার রাজত্ব এল গুপ্তধন, বিভীষিকা। তারপর তিনখানা চিঠি গেল কলকাতায়।' গৌরীর পার্সেলে এল রবার্ট ব্লেকের বই। "সাঙ্কো পাঞ্জার প্রতিহিংসা", "মরণের ভয়ঙ্কর" আরও কয়েকটা মরণ-আতঙ্ক বিভীষিকা।

কিছুদিন হল টুটুলকে দেখা যায় সন্ধেবেলাতেও বইয়ের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে চাতালের এক কোনে।

—টুটুল এবার নির্ঘাত ফেল করবে, বুড়ী অনুযোগ করলে মা-র কাছে। স্বর্ণসুন্দরীর ভর্ৎসনায় ত্রুটি নেই। কিন্তু কাজ হয় না। দুই ভাই পেছনের সিঁড়ি দিয়ে সারা দুপুর গুপ্তধনের সন্ধানে জেলখানার পাঁচিলের পাশ দিয়ে টই টই করে ঘুরে বেড়ায়, কামান বসাবার ফোকরে পর্দার পোল গুঁজে বোম্বেটেদের আক্রমণের জন্যে অপেক্ষা করে, এক একবার সত্যি সত্যি বোধ হয় খালের পার ধরে যদি মাইলখানেক হাঁটা যায় তাহলে মাঠের ধারে বিশাল নেড়া ঝাউগাছটার গোড়ায় হীরের খনি আবিষ্কার হতেও পারে। কিন্তু পথে বিপদের জন্যে রিভলভার প্রয়োজন। বাবার বডিগার্ড রামস্বরূপের রিভলভার চুরি করবার সাধও জাগে চোঙার। কিন্তু তা করতে গেলে, গল্পে যে রকম থাকে অর্থাৎ ক্লোরোফোর্ম মাখানো রুমাল দরকার। ক্লোরোফোর্ম পাবে কোথায়? মাত্র এক শিশি ক্লোরোফোর্মের অভাবে এত বড় সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে ভেবে চোঙার ক্ষোভ জাগে।

কিন্তু বুড়ীর ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ করে টুটুল এবারও প্রথম হল বাৎসরিক পরীক্ষায়। চোঙা হল তাদের ক্লাসে দ্বিতীয়। টুটুলের পরীক্ষায় প্রথম হওয়া এখন একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আর এ অভ্যাস এমন জোরাল যে সামান্য ব্যতিক্রম হলে, অর্থাৎ দ্বিতীয় তৃতীয় হলেই টুটুল কেঁদে ভাসায়, নিজেকে ভাবে একেবারে অপদার্থ। টুটুল বড় হয়েও ভেবেছে ব্যাপারটা কেন এরকম হত বারেবারে। আর একটা উত্তরই সে খুঁজে পেয়েছে। আসলে ইতিহাস ভূগোল বাংলা ইংরেজী অঙ্ক সমস্ত বাড়ির কাজের ফাঁকে আদ্যোপান্ত মুখস্থ হয়ে যেত। আর মুখস্থ প্রশ্নের যেখানে মুখস্থ উত্তরই আশা করা হয় সেখানে সে ভাল করবে না কেন?

গত বছর ব্রাইটন থেকে প্রতাপ যে ছবিটা পাঠিয়েছিল সেটা ভবনাথ মনের মধ্যে বাঁধিয়ে রেখেছেন। পেছনে ব্রাইটনের সমুদ্র আর বালির ওপরে স্নানের জাঙিয়া পরে প্রতাপ একহাত কোমরে—প্রতাপ যেন যৌবনের, আশাবাদের মূর্ত প্রতীক। সঙ্গে সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে বিদায় নেবার মুহূর্তে ট্রেনের কামরার হাতলে আলগোছে হাত লাগানো গোলাপের মালা গলায় প্রতাপের চেহারাটা মনে আসে। এইরকম ছেলেরাই তো আই. সি. এস. হবে, ভবনাথ ভাবেন। তাঁর বড় ছেলে তাঁর মতো মেজাজ এটা তিনি টের পান। তুখোড় অথচ অকারণ বাচাল নয়, সকলের সঙ্গে মিশতে পারে অথচ স্বতন্ত্র এরকম ছেলের কদর নিশ্চয় বুঝতে পারবে সাহেবরা। গতবার 'ভাইবা'তে খারাপ হয়েছিল। কিন্তু প্রতাপ লিখেছে এবার সে এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিচ্ছে। আর নব যা বলেছে, তা তিনি মানেন না।

পারিবারিক কল্যাণের আশায় স্বর্ণসুন্দরী কিছুকাল যাবৎ প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুজো করছেন। মেঘভাঙা পূর্ণিমায় চাতালের এক কোণে কাটাফলের থালা, নারকেলি কুল, নারকেলের নাড়ু সাজিয়ে সেই চক্ষু আর কুবেরের উপাখ্যান সমান উৎসাহেই বলেন। কিন্তু মালিনীর মালঞ্চ ধবলময় হল কি হল না তাতে কিংবা জঙ্গলের মধ্যে চক্ষুকে বেঙ্গমা বেঙ্গমী কি উপায় বাতলেছিল নদী পার হতে সে সম্পর্কে ছেলেদের কৌতূহল কিঞ্চিৎ ফিকে। এমনকি টুটুলও ব্রতকথা শোনার চেয়ে নারকেলের নাড়ু কটা সাঁটাবে সেদিকেই বেশী মন দেয়। চক্ষু আর কুবেরের উপাখ্যানের চেয়ে ছুটির দিনে দুপুরে গুপ্তধনের সন্ধানে অভিযান অনেক কৌতূহলোদ্দীপক।

সেবার সন্ধ্যায় পুজো শেষ হবার আগেই চাঁদ ঢেকে যায় মেঘে। ফুঁই ফুঁই করে বৃষ্টি নামে। বুড়ী, চোঙা, টুটুল সোরগোল করে ফলফলারির ডালা ঘরের মধ্যে টেনে তোলে। সারা রাত বৃষ্টি চলে। ভোররাত্তির থেকে বৃষ্টির জোর বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার দাপট হাওয়া আর বৃষ্টির শব্দ এত বাড়ে যে ভয় হয়, বাংলোর চাল উড়ে যাবে, সমস্ত পূর্ব বাংলা জুড়েই সে রাত্তির ঘূর্ণিবার্তা আর ঝড় চলেছিল। অনেক চাল ওড়ে, গাছ ওপড়ায়, গরু মোষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এই অসময়ে বৃষ্টি ঝঞ্ঝায় ছেলেমেয়েরা বিছানার চাদরে মুড়িসুড়ি দিয়ে অকাতরে ঘুমোয়। স্বর্ণসুন্দরীর সারাদিন উপোসের পর ভালমন্দ খেয়ে গভীর নিদ্রা যান, ঝড় বর্ষায় বিশেষ বিঘ্ন হয় না। কিন্তু ভবনাথের ভাল ঘুম আসে না। এপাশ ওপাশ করেন। একবার স্বপ্নে দেখলেন তাঁদের পাবনার বাড়ি জলে ভেসে যাচ্ছে। ইন্দ্রাকপুর ফোর্টের চারদিকেও জল। লণ্ঠনের পলতে উঠিয়ে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে ভাবলেন নিশ্চয় অনেক চাল উড়েছে, ক্ষতি-টতির একটা হিসেব কালই নিতে হবে। এক চিলতে খোলা বারান্দার পরেই বাথরুম। হঠাৎ সমস্ত আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ ঝিলিক মারে, ভবনাথের মনে হল বাড়ির ওপরেই বাজ পড়ল। সকালে উঠেই দেখলেন ফটকের সামনে সবচেয়ে সতেজ সরস সুপুরী গাছটার ওপরেই বাজ পড়েছে। কয়েকদিন পরই পোড়া পাতাগুলো ঝরে গিয়ে গাছটার ন্যাড়া মাথা আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

দ্বিতীয় পর্ব

মাস ছয়েক পরে গরমের সন্ধে। বাগানের মাঝখানে লাল টিনের চালওয়ালা দোতলা লাল বাংলোর বারান্দায় ইলেকট্রিক আলো। সেকালের জলপাইগুড়ি শহরটা ফিটফাট নির্জন, ছাড়া-ছাড়া। গেটের গায়েই সেন্ট্রিবক্সের মাথায় ফুলন্ত চাঁপা গাছটা থেকে মৃদু গন্ধ আসে। টেবিলের ওপাশে মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকা যুবকটিকে বুড়ী প্রশ্ন করে,—স্যার, এটার মানে কি?

—মানে, মানে একটা কবিতা...একটা একটা...গান, রবীন্দ্রনাথের।

যুবকটি তোতলায়। বুড়ী ভুরু কুঁচকায়। গত কয়েক মাসে অনেকটা বেড়ে উঠেছে সে। গোলাপী ফুলতোলা খাটো স্কার্টের ওপর সাদা অর্গাণ্ডির ব্লাউসে ক্লাস নাইনের মেয়েটিকে লাগে অপরূপ যুবকটির কাছে। ওপরের দিকে টেনে তোলা চুলের ওপর আলতোভাবে হাত বুলিয়ে ঠোঁটটা দুবার চেটে নেয় বুড়ী। অস্পষ্ট হাসির রেখা তার ঠোঁটের দু' পাশে ফুটেই মিলিয়ে যায়। আবার ভুরু কুঁচকিয়ে বলে,—তা অঙ্কের খাতায় কেন? বুড়ী আলোর নীচে খাতাটা মেলে দেয়। ছোকরাটির হাতের লেখা নিঃসন্দেহে ভাল। খুব যত্নে চাইনিজ ইঙ্কে বাড়ির অঙ্কের খাতার শেষে লেখা।

আমি শ্রাবণ আকাশে ঐ দিয়েছি পাতি
মম জল ছলোছলো আঁখি মেঘে মেঘে...

তারপর সশব্দে হেসে ফেলে বুড়ী। হাসি চাপবার চেষ্টা করে বলে,—এটা কি মাস স্যার?

—মে মাস, ছোকরাটির ফর্সা কান লালচে দেখায়।

—শ্রাবণ মাস আসতে স্যার আরও দু' মাস।

পরদিন বিকেলে মমতা আসে। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের মেয়ে মমতা বুড়ীর চেয়ে আরও দু' বছরের বড়। বেশ ঝলমলে দামালে ফর্সা চেহারা মমতার। সব সময়ই হাসছে। আর হাসলে

গালে চমৎকার টোল পড়ে। বুড়ীর সে সহপাঠী কিন্তু জগত সংসার সম্পর্কে অনেক বেশী খবর রাখে। বুড়ী তখন দোল খাচ্ছে বাগানের কোণে ঢ্যাঙা আমগাছটার ডালে ঝোলানো দোলনায়। মমতা বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে পায়ের মৃদু ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে ক্রমাগত বুড়ী ওপরে উঠতে থাকে। শূন্য থেকে করলা নদীর ওপরে ব্রিজটার মাথা চকিতে চোখে পড়েই মিলায়।

—বু...ড়ী গানের সুর করে মমতা ডাকে।

বুড়ী কাত হয়ে ওপর থেকে তাকায়। ময়লা মেয়ে বলে স্বর্ণসুন্দরী এ মেয়েকে একটু নেকনজরে দেখতেন। তবে বছরখানেক হল এই শ্যামলা মেয়ের মুখশ্রী যে যথেষ্ট সুন্দর হয়ে উঠছে সেবিষয়ে তাঁরও চোখ খুলেছে। দোলনা থেকে প্রায় ঝাঁপিয়ে নেমেই তার বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বুড়ী।

—এনেছিস, আমার জন্যে এনেছিস বইটা? তারপর উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই নীল শাড়ির আঁচলে লুকানো বইটা টেনে নেয়। মলাটের ওপর চোখ রাখতেই তার উত্তেজিত মুখ-চোখে স্নিগ্ধতা নামে। বইটার নাম "প্রথম প্রেম", লেখক অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত।

দিন দুই আগে বইটার গল্প করেছে মমতা। আলগোছে কোলের ওপর বইখানা রেখে বুড়ী মমতার কাঁধে হাত রেখে দুলতে থাকে। বরফের মতো কুচি কুচি সাদা ফুলে ভর্তি ফুরুশ-গাছটার দিকে চেয়ে আস্তে পা মাটিতে ঠেকিয়ে থামে।—আচ্ছা, পানুদা অমন করে কেন বলত?

—পানুদা? তাই নাকি? ওকে তো একদম ভিজে বেড়াল ভাবতাম! মমতার বিশেষ কৌতূহলেই বুড়ী একটু অপ্রস্তুত বোধ করে।

—না না, সেরকম কিছু না, সেরকম কিছু না।

—ঠিক আছে। তুমি চেপে যাচ্ছো। আমিও কিছু বলব না তোমাকে।

বুড়ী ঘাড় নাড়ায়,—সত্যি বলছি সেরকম কিছু নয়।

—কি রকম কিছু? মমতার চোখ জ্বলে কৌতূহলে।

—এই যেমন দিদির বেলায় হয়েছিল, বুড়ী বললে অন্যমনস্কভাবে।

—গৌরীদির বেলায়? দেখেছো আমাকে তুমি কিছুই বল না আর আমি সব কথা আদ্যো-প্রান্ত তোমাকে বলি। বেশ, ঠিক আছে। মমতা দোলনার তক্তা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে।

—বোস বোস। হাত ধরে টেনে বসায় বুড়ী মমতাকে। তারপর অসহিষ্ণু গলায় বললে, —সেরকম কিছু না, একটা মাঝবয়সী লোক, হীরালালবাবু পড়াতে পড়াতে দিদির হাত চেপে ধরেছিল একবার। দিদি মাকে বলে দিলে। সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। সেরকম কিছু না।

বুড়ীর শেষ কথায় মমতার মুখে চোখে কৌতুক ঝিলিক মারে। '—পানুদা খুব ভাল লোক না-রে? ঐরকমই মনে হয় প্রথম প্রথম।'

বুড়ী জবাব দেয় না। মমতা তার চেয়ে জগতসংসার সম্পর্কে হয়ত অনেক কিছু জানে কিন্তু পানুদার ব্যাপারেও জ্ঞানদান বুড়ীর পছন্দ হয় না। পানুদাকে সে অনেক ভাল করে জানে। তিনমাস আগে জলপাইগুড়িতে ভবনাথের বদলি হবার দিন সাতেক পর থেকেই স্কুলের ভাল ছাত্র ইণ্টারমিডিয়েট-পাশ সুদর্শন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কেরাণী পানু মিত্র বুড়ীর গৃহশিক্ষক। তিন ভাই বোনে জাঁকড়ে পড়লে পড়াশোনার অসুবিধে হতে পারে বলেই এ ব্যবস্থা। আর একটি তরুণ সেনপাড়ার ক্ষ্যাপা-দা দুই ভাইকে পড়ায় একসঙ্গে নীচের বারান্দায়। ক্ষ্যাপা-দা স্থানীয় স্কুলের নীচু ক্লাসে অঙ্ক এবং ব্রতচারীর মাস্টার।

দুই বন্ধু আবার পাশাপাশি বসে দোল খায়। বুড়ী কোলের বইখানা আলতোভাবে নাড়া-চাড়া করে। দুটো শালিখ পাশের ঝোপ থেকে ঝগড়া করতে করতে ঘাসে পড়েই উড়ে পালায়। গেট খোলার শব্দ আসে। ভবনাথ তাঁর বহুদিনের ব্যবহৃত সাইকেলখানা ঠেলতে ঠেলতে বাগান ঢোকেন। তাঁর সাম্প্রতিক পদোন্নতিতে বিশেষ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। সাদা প্যাণ্টের ওপর কাঁধকাটা ঘিয়ে তসরের কোট। বুড়ীর মনে পড়ল ঠিক এইভাবেই ভবনাথ কোর্ট থেকে ফিরতেন রাণাঘাটে, মুন্সীগঞ্জে।

—কথা বলছিস না যে! পানু-দার ব্যাপারে আমি মোটেই জেলাস নই, মমতা বললে।

বুড়ী অবাক হয়ে তাকায়। মমতা বুড়ীর কানের কাছে মুখ রেখে বললে,—ছেলেরা মেয়েদের কাছে কি চায় জানিস?

—কি আবার! আমি যা তোর কাছ থেকে চাই।

—দূর, তুই কিছু জানিস না, একেবারে ছেলেমানুষ।

—আমি জানতে চাই না, বুড়ী মাথা ঝাঁকিয়ে বললে।

মমতা গুন গুন করে সুর ভাঁজে। তারপর খুব মিহি চাপা চাপা কাঁপা কাঁপা গলায় গায়:

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ঐ ছায়া
ভোলালরে ভোলাল মোর প্রাণ,
ওপারেতে সোনার কূলে আঁধার মূলে কোন মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভোলানো গান।

গান থামিয়েই বললে,—তুই দেখিস নি?

—কী?

—সে কি? "মুক্তি!" আমরা কাল দেখেছি। গ্র্যান্ড। দেখে আয় দেখে আয়! ওঃ কি মারভেলাস! প্রমথেশ বড়ুয়ার কি অ্যাকটিং মাইরি!

বুড়ী সেই উচ্ছ্বসিত মুখখানা মুগ্ধ হয়ে দেখে। তার এই দামাল বন্ধুটির প্রতি আকর্ষণ আরও বাড়ে।

—আমরা শনিবার যাব, বুড়ী আস্তে আস্তে বলে।

—এবার নাম, আমি একটু দুলি।

মমতার পায়ের চাপে দোলনা কেঁপে কেঁপে অনেক ওপরে উঠে। তার থোপা থোপা চুল হাওয়ার ওঠে নামে। লাল মুশলো বেরোন ঝকঝকে দাঁতের হাসি ভরা মুখে এক-একবার বুড়ীর দিকে তাকায়। আর এক এক ঝলক মিষ্টি হাওয়ার মতো মমতার সান্নিধ্য তাকে স্পর্শ করে। সে যেরকমভাবে মমতাকে কাছে পেতে চায় পানুদাকেও চায় তেমনিভাবে কাছে পেতে। ঠিক এমনিভাবে বিকেলের আলোয় দোল খেতে খেতে বা সিনেমার গল্প করে। ছেলেরা মেয়েদের কাছে আবার কি চায়?

কিন্তু দুদিন পর "মুক্তি" ছবিটা বুড়ীর মনে যেরকম আলোড়ন আনে সেকথা অনেক দিন সে ভুলতে পারবে না। পুরুষ বন্ধুর যে চিত্রকল্প জন্মেছিল পানু-দার সান্নিধ্যে "মুক্তি" ছবির নায়ক প্রমথেশ বড়ুয়া তাকে এক মুহূর্তে ভেঙে দিল। ঠিক সে গুছিয়ে ভাবতে পারছিল না ব্যাপারটা। কিন্তু ছেলেরা চাইবে, জোর করবে, মোটা গলায় কথা বলবে, মেয়েদের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাবে না, তাকাবে আদায়ের ভঙ্গীতে, দাবীর ভঙ্গীতে। আর মেয়েরা সেই আদায়ের ভঙ্গীই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবে, বরং তা না থাকলেই সে হবে অতৃপ্ত। এইরকম কতগুলো আবছা ধারণা অস্পষ্টভাবে বুড়ীর মাথায় খেলতে থাকে। এক কথায় পানুদার যে ছবিটা তার মনের মধ্যে ফুটে উঠেছিল রুপোলীপর্দার নায়ক সে স্থান অধিকার করে নিলে। শয়নে স্বপনে এখন প্রমথেশ বড়ুয়া বুড়ীর সঙ্গী।

—আপনি "মুক্তি" দেখেছেন স্যার?

পরদিন বুড়ীর প্রশ্নে পানু চমকায়। ভুরু কুঁচকিয়ে বলে,—না দেখি নি, দেখব না।

—দেখবেন না, কেন? বুড়ীর চোখেমুখে কৌতুক খেলা করে।

—ওসব তুমি বুঝবে না। সিনেমা দেখা ভাল না।

বুড়ী তার গৃহশিক্ষকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললে,—আমার খুব ভাল লাগে; আপনারও ভাল লাগবে।

পানু ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। মেয়েটিকে তার বরাবরই ভাল লাগে। তার চেহারা, ছটফটে মেজাজ তাকে আকর্ষণ করে। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'দু' ছত্র জ্যামিতির খাতায় যে লেখে নি তা নয়। কিন্তু তাই বলে সিনেমা নিয়ে তার ছাত্রী তার সঙ্গে খোসগল্প করবে

এতে তার আত্মসম্মানে লাগে। তারপর সে নিজেই মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে তার ছাত্রীকে দেখতে অভ্যস্ত কিন্তু তার ছাত্রীও যে তাকে মুগ্ধ চোখে দেখছে, সে যখন মাথা নীচু করে অঙ্ক দেখছে তখন তার খাতার ওপর না পড়ে এক জোড়া চোখ তার মুখের দিকে চেয়ে আছে এই নতুন পরিস্থিতিতে সে বিচলিত বোধ করে। মাস গেলে পনেরোটা টাকা আসত অস্বচ্ছল সংসারে সে পথ বন্ধ হয়ে যাবে বলে ভয় হয়।

—আপনার অফিস কখন ছুটি হয়?

—কেন? পাঁচটায়। কেন?

—পাঁচটা হলে হবে না। পাঁচটা হলে দেরী হয়ে যাবে। চারটে হয় না?

সেই কৌতূহলী উৎসুক মুখখানার দিকে চেয়ে পানুর অসোয়াস্তি হয়, আবার প্রবল আকর্ষণ বোধ করে।

—কেন, কোথাও যাবে?

—চলুন না, সেই একবার মোটে নদীর ধারে গিয়েছি। কাল যাবেন?

—মাসীমাকে বলে নিও। আমি চারটেতে আসব একটু সকাল সকাল ছুটি করে।

—মা-কে? কেন? বুড়ীর মুখে বিরক্তি। একটু হাসেও। গলায় ঠাট্টা স্পষ্ট।—কেন, ভয় করছে বুঝি?

আবার কান লাল হয় পানু মাস্টারের। এরকম ব্যাপার গল্পেটল্পে পড়েছে, বাঙলা কোর্ট কেসের রিপোর্টের লাইনটা চোখের সামনে ভাসতে থাকে, 'তাহাকে ফুসলাইবার অভিযোগে'। আস্তে আস্তে বললে,—না ভয় কেন, মাসীমা ভাববেন তাই বলছি।

—মা-কে বলব মমতার বাড়ি যাচ্ছি।

—আচ্ছা।

পড়ার শেষে উঠবার মুখে বুড়ী বললে,—আপনি রাস্তার মোড়ে থাকবেন। ওখান থেকে আমি ধরে নেব।

পরদিন দুপুর চারটেতে তার একমাত্র সিল্কের পাঞ্জাবি চড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিল পানু নির্জন রাস্তার মোড়ে মেহগিনী গাছের নীচে। কিছুক্ষণ পরই বুড়ীকে আসতে দেখা যায়। খাটো ধূসর স্কার্ট আর সাদা ব্লাউসের সঙ্গে সাদা হিলতোলা জুতোয় অনেকটা লম্বা দেখায় তাকে। মাথার নীল রিবন প্রথমেই চোখে পড়ে। নির্জন পিচঢালা রাস্তা ধরে গাছের তলা দিয়ে দিয়ে তারা এগোতে থাকে।

—আগে আমরা যেখানে থাকতাম সেখানে কি বিশাল নদী! বুড়ী মাথা ঝাঁকিয়ে বলে।

পানু সামনেই বিকেলের রোদে পাণ্ডুর বিস্তৃত বালির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললে, —তিস্তাও বিশাল।

—ও তো খালি বালি। আর এইটুকুন জল। পদ্মা দিয়ে যখন স্টিমারে যেতাম তখন যে কিরকম মনে হত। আপনার দেশ কোথায় পানু-দা?

—আমার? মেটেলি।

—মেটেলি? কি অদ্ভুত নাম।

—সেখানে নদী নেই, খালি পাহাড় আর আশেপাশে চায়ের বাগান।

—চায়ের বাগান?

—তোমরা যদি ডুয়ার্সে যাও কিংবা দার্জিলিং-এ, অনেক চায়ের বাগান দেখবে। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে বললে, 'আমার মেটেলিই ভাল লাগে। বাবা ছিলেন চা বাগানের ডাক্তার।'

নার্ভাস ভাবখানা পানুর কেটে যায়। চা বাগানের গল্প করে। একবার চিতা এসেছিল একেবারে তাদের কোয়ার্টারের কাছে। চারপাশ থেকে বেড়া দিয়ে সড়কি দিয়ে মারা হল বাঘ। পানুর নার্ভাস ভাবখানা একেবারে কেটে যায় ছেলেবেলার গল্প বলতে বলতে, অনেক স্বাভাবিক দেখায় তার ছুঁচলো ফর্সা মুখখানা। কিন্তু বুড়ী ভেতরে ভেতরে অসোয়াস্তি বোধ করে। তার এ ধরনের আলাপ যে ভাল লাগে না, তা নয়, কিন্তু এ ধরনের আলাপ ছাড়াও সে আরেক ধরনের

কথাবার্তা শুনতে চায়। অন্তত কয়েক মাস হল এইরকম একটা স্বপ্নের কথাই সে ভেবে এসেছে আর এই পড়ন্ত রোদে বালির চড়ায় বসে বসে সেই স্বপ্নটার মাঝখানে সে তলিয়ে যেতে থাকে। একঝাঁক পানকৌড়ি মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়।—দেখুন দেখুন। বলে বুড়ী তার হাতখানা ওপরের দিকে তুলে পানুর কোলে আলগোছে রাখে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কতগুলো গরুর গাড়ি আসে পাশের গ্রাম থেকে।

সন্ধে নামছে কিন্তু পানুর খেয়াল নেই। তার সঙ্গিনীর হাত ধরে বসে থাকে। তার আর ভয় নেই, অসোয়াস্তি নেই, এক নবীন বন্ধুত্বের আত্মবিশ্বাসে তাকে সমাহিত দেখায়। একটু দূরে এক বেঁটে যুগল খেজুর গাছের গোড়া থেকে বোধহয় একটা ছাগল কাশে।

—পানুদা, তুমি একটা বোকা! বুড়ী হঠাৎ বললে।

—বোকা! কেন?

বলেই বুঝতে পারে পানু। আর সেই অস্পষ্ট অসোয়াস্তি তার চিন্তাশক্তি আবৃত করে। বুড়ী তার দিকে মাথা হেলিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মুখে চাপা কৌতুক। সেদিকে চেয়ে পানু গাঢ় গলায় বললে, 'গায়ত্রী।' তারপর তার ছোট মাথাটা নিজের কাছে টেনে এনে গভীর চুম্বন করে।

ঠিক এই সময় অনতিদূরে খেজুর গাছের গোড়া থেকে ছাগলটার কাশির মাত্রা বেড়ে যায়। তারপর খিঁক খিঁক করে হাসির আওয়াজ ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ বুড়ী-পানুর খুব কাছেই মাটির ঢেলা পড়ে। তারা চমকে দাঁড়িয়ে উঠতেই স্পষ্ট চোঙার গলা পাওয়া যায়,—কি মশা! বাবা রে! আর সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট অন্ধকারে টুটুল চোঙা ছিটকে বেরিয়ে যায়। টুটুলের হাসি জলতরঙ্গের মতো বাজতে থাকে।

দুই

সম্প্রতি চোঙার জন্যে ক্রিকেট ব্যাট আসার পর থেকে খুব জমিয়ে ক্যাম্বিস বলে খেলা চলছে। তখনও তিস্তার বাঁধ হয়নি এবং যেখানে সেখানে মাঠের মধ্যে পাকা বাড়ির করুণ বিসদৃশ সমারোহ দৃষ্টিকে পীড়া দেয় না। দেশভাগের চাপও উত্তরবঙ্গে আছড়ে পড়ে নি। শহরটা তখন নির্জন, ছিমছাম। তাই ছেলেদের নড়বার চড়বার জায়গা প্রচুর। বিকেল গড়িয়ে এলে ভোম্বল, ভুপেন দস্তিদার, দেবী, জয়ন্ত, ঢেঁকী বা বনবিহারী সাহা চোঙা টুটুলের জমজমাট ক্রিকেট টিমকে প্রায়ই ক্রীড়ামত্ত দেখা যায় আম-বাগানের ধারে মাঠে। ঢেকী তাদের মধ্যে বয়সে বড়। দুর্দান্ত সাইকেল চালায়, মারাত্মক বল করে। টুটুলের সহপাঠী ভুপেন দস্তিদারের গায়ের জোর সবচেয়ে বেশী। খুব হাঁকাড়িয়ে ব্যাট করতে যায় এবং প্রায়ই আউট হয়। বল সবচেয়ে ভাল লোফে চোঙা। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে সে বল লোফে যেখানে সেখানে যে সে প্রায়শ আতঙ্কের কারণ। সবচেয়ে ভাল ব্যাট ভোম্বল। তাকে আউট করতে বোলারের হাত টন-টন করে। আর ভাল ব্যাট করে টুটুল। টুটুলের এই আকস্মিক পারদর্শিতা চোঙার ঈর্ষার কারণ ঘটায়। টুটুলকে সে খেলাধুলোর ব্যাপারে বরাবরই এলেবেলে ভেবে এসেছে। কিন্তু তার ছোট-ছোট হাত-পা নিয়ে সে অবলীলাক্রমে ব্যাট ঘুরিয়ে বেশ তাক লাগিয়ে দেয় সবাইকে।

ভুপেন-কে যেন তার পদবী-ছাড়া ভাবা যায় না। বয়সে টুটুলের চেয়ে একটু বড় হবে কিন্তু হাব-ভাবে সে বিশেষ ভাবগম্ভীর। টুটুলকে সে তিনখানা নাইজিরিয়ার স্ট্যাম্প দিয়েছে, গিনির দুটো দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু টুটুলের পছন্দ নয় ভুপেন-কে। তার এই ভাব-গম্ভীর ভক্তের মেজাজটা তার অপছন্দ। তার থেকে সে চোঙার সহপাঠী ভোম্বলকে ভালবাসে। ভোম্বলের চোখ দুটো চমৎকার, ভুরু নাচিয়ে কথা বলে। তার দুটো ফাউন্টেন পেন আছে। তার ওপর দু চাকার সাইকেল। টুটুল আর চোঙার সাইকেলও আয়ত্ত হয়েছে। তবে টুটুলের হাফ প্যাডেল।

ভোম্বলের সঙ্গে চোঙারই সবচেয়ে পটে। কাঁঠালগুড়ি টি এস্টেটের পাশাপাশি চারখানা

চায়ের বাগানের মালিক অমিয় ঘোষ বেশ সম্পন্ন লোক, বোধহয় ডিস্ট্রিকট বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যানও ছিলেন। তাঁর বড় ছেলে সুধীর সম্প্রতি বি-এ পাশ করছে। দ্বিতীয় ছেলে মনা একটু পাগলাটে। তৃতীয় সন্তান ভোম্বল তার সখের আর অন্ত নেই। ভোম্বলের সঙ্গে চোঙার কতগুলো বিশেষ ধরনের কথা জমে ওঠে যেগুলো ঠিক ধরতে পারে না টুটুল, আর আন্দাজে কিছুটা ধরতে পারলেও তা নিয়ে এত ফুসফুস গুজগুজ করবার কি কারণ আছে বোঝে না। আর এ সময় টুটুল কাছে এলেই তাদের আলাপ হঠাৎ বন্ধ। ভোম্বল অমনি চোখ নাচিয়ে বলে, সাইকেলে চড়বি না টুটুল ? টুটুল অপ্রসন্নভাবে সরে যায়। একদিন সে আড়িও পেতেছিল। ভোম্বল ফিসফিস করে বলছিল। অর্ধেক কথা শোনা যায়, অর্ধেক শোনা যায় না। এক রাজকুমারীর মনে সুখ নেই। সবাই সুখ দিতে আসে কেউ পারে না। সবাইয়েরই গর্দান যায়। তারপর নায়ক এলেন। সে এমন সুখ দিলে...এবং ভোম্বল অদ্ভুত কতগুলো অংগভংগী করতে থাকে আর চোঙা হেসে গড়িয়ে পড়ে। চোখ দিয়ে চোঙার জল বেরিয়ে পড়েছে হাসতে হাসতে। সেইভাবে জিজ্ঞেস করে,—তারপর ?—তারপর আর কি ? তারপর তারা মনের সুখে থাকতে লাগল আর এই রকম করতে লাগলে। ভোম্বল হাসতে-হাসতে চোখের জল বের করে উত্তর দেয়। সংগে সংগে দরজার পেছনে টুটুলের দিকে নজর পড়ে তার। ইস, আবার এলেবেলেটা এসেছে। টুটুল দৌড়ে পালিয়ে গেল। এ ঘটনার পর প্রায় সাত দিন সে ভোম্বলের সংগে কথা বলে নি।

এদিক থেকে ভোম্বলের ছোড়দা মনার সংগে তার বনে ভাল। অবশ্য বলতে গেলে মনা-ই তার প্রতি আকৃষ্ট। অমিয়বাবুর বড় ছেলে বেশ দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই একটা টি এস্টেটের ম্যানেজার। ভবনাথ-কে সপরিবারে তাদের সদ্য-কেনা চকোলেট রংয়ের ভি-এইট ফোর্ডে চাপিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছে, সবাই মিলে ডুয়ার্সে যাবার প্রতিশ্রুতিও আদায় করেছে স্বর্ণসুন্দরীর কাছ থেকে। ছোট ছেলে ভোম্বলও বেশ চালাক-চতুর, তার সৌখিন মেজাজ তার যথেষ্ট সচ্ছল বাপের পছন্দ। মনা এর ব্যতিক্রম। সে কলকাতার স্বামী প্রণবানন্দ অথবা অন্য কোন মহারাজের শিষ্য। ফর্সা, বেঁটে, রোগা, তোতলা, দুই স্বাস্থ্যবান ভাই থেকে একেবারে আলাদা। মনা এসে বাগানের এক কোণে বাতাবি লেবু গাছের নীচ থেকে তার সাইকেলের বেল দেবে। বাড়ীর ভেতরে সে যাবে না। কারণ বুড়ী কিম্বা অন্যান্য কোন নারীর সংগ তার অপছন্দ। টুটুল দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে এসে বলে—মনা-দা, চকোলেট এনেছো ?

মনা বুক পকেট থেকে চকোলেট বার করে। টুটুল চট করে মোড়ক সরিয়েই আনন্দে চিৎকার করে ওঠে,—কি মজা, গ্রেটা গার্বো ! মোড়কের ভেতর থেকে নীল জামা আর মুক্তোর হার-পরা গার্বোর ছবি। মনা সেদিকে চেয়ে অপ্রসন্নভাবে বললে,—'ওটা ফেলে দে। ওটার জন্যে তো আমি চকোলেট আনি নি। তুই খাবি বলে এনেছি।'

—বাঃ আমি যে জমাই। আমি জমাই, দাদা জমায়।

—আচ্ছা চল, তোর সংগে কথা আছে।

মনার নতুন সাইকেলের রডে চড়ে আরাম আছে। ভবনাথের সাইকেলটা অনেক পুরনো। আর চোঙা তাকে রডে নিয়ে চালালে গাড়াগর্তে পড়লেই পাছা ব্যথা করে। নদীর দিকে নির্জন রাস্তা ধরে চলতে-চলতে মনা বললে,—বাঙালীর কি অভাব জানিস ? আত্মশক্তি। বুঝেছিস ?

টুটুলের জিভ তখন চকোলেটের সরসতায় মন্থর।—হ্যাঁ মনাদা ! তাড়াতাড়ি মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দেয়।

—স্বামিজী কি বলে জানিস ? আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হতে বেশী লোকের দরকার নেই। মাত্র বারোজন। এই বারোজনের ওপরেই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

টুটুল লক্ষ্য করছিল নতুন সাইকেলে বেগ বাড়লেই কেমন একটা সাঁ-সাঁ শব্দ বেরোয়। বাবার সাইকেলে সে রকম হয় না। বোধহয় নারকেল তেল দিলে শব্দ বেরোতে পারে।

নদীর ধারে কয়েক মাস আগে পানু আর বুড়ী যেখানে বসেছিল তার কাছেই তারা বসে।

দুজনে পাশাপাশি বসার পর মনা বললে, একটু তোতলিয়ে,—তো-তোর দিদির কিন্তু নাম খারাপ হচ্ছে।

—নাম খারাপ? অবাক হয়ে চেয়ে থাকে টুটুল। একটু ভয়ও করে। তিস্তার ধারে সেই সন্ধেটার ছবি মনের মধ্যে খেলে যায়।

—হ্যাঁ, পানু-টা একটা রাসকেল। ও ভিজে-ভিজে বেরাল। আগেও ওরকম করেছে। তোর দিদির সর্বনাশ করবে বলে দিচ্ছি।

টুটুল ঘাবড়ে যায়। জিভে চকোলেটের মিষ্টি স্বাদ, একটু দূরেই রোদ্দুর-ঝলকানো জলের হাওয়া সব কিছু বিস্বাদ লাগে।—আমি ওসব জানি না মনা-দা। আমি কিছু জানি না।

—মাসীমাকে বলতে হবে। ভোম্বল আমাকে সব বলেছে।

টুটুল কাঁদো-কাঁদো হয়ে পড়ে।—আমি পারব না বলছি, মনাদা, প্রায় ফুঁপিয়ে ওঠে।

—পারতে হবে। তোমার দ্বারাই হবে। আ-আত্মশক্তির পরিচয় দিতে হবে। স্বামিজী অন্তর্দৃষ্টিতে সব দেখতে পান। যে বা-বারোজনের নাম-ঠিকানা দিয়েছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে তার মধ্যে তো-তোমার নামও আছে। স্বামিজী কখনও মিথ্যে বলবেন না। তোমার ওপরে অ-অনেক কিছু নির্ভর করছে।

প্রায় প্রত্যেকটা বাক্যের শুরুতেই মনা তোতলায়। একবার যাত্রা শুরু করতে পারলেই গোটা রাস্তাটা নির্ঝঞ্ঝাটে পার হতে বিশেষ অসুবিধে হয় না।

—বল, বলবে?

টুটুল যান্ত্রিকভাবে বললে—বলব। আজ বিকেলে নতুন সাইকেলে বেড়ানোর আনন্দ, চকোলেটের স্বাদ তার কাছে মাটি হয়ে যায়। আমবাগানে ক্রিকেটেই গেলে পারত সে, এরকম ফ্যাসাদে পড়তে হত না, টুটুল চিন্তা করে।

—এবারে আয়, আমরা আসন করি। মনা পা মুড়ে পিঠ খাড়া করে পড়ন্ত সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে। টুটুলকেও তার পাশে বসতে আহ্বান করে। মিনিট পনেরো কেটে যায়। টুটুলের বাঁ হাঁটুর নীচটা চুলকায়। সেদিকে হাত বাড়াতেই মনা সজোরে তোতলায় ন-ন-নড়িস নে। আরো পনেরো-কুড়ি মিনিট কেটে যায়। হঠাৎ তিস্তার পারে পুলিশ লাইন থেকে বিউগিল বাজে। একটানা বেজে আবার স্তব্ধ হয়ে যায়। এবার বোধহয় পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে ঘাসের মধ্যে থেকে।

—ঠিক ক-কপালের মাঝখানটায় কিছু মনে হচ্ছে? একটু গরম লাগছে? মানে এক রকম জ্যোতির মতো জিনিস ঠিকরে বেরোচ্ছে বলে মনে হচ্ছে? চোখ বন্ধ করেই মনা প্রশ্ন করে।

টুটুল এবার আড়চোখে মনা-দার দিকে তাকিয়ে বেশ করে চুলকিয়ে নেয় হাঁটু, নাকের ডগাটাও হাতের তালু দিয়ে ঘষে নেয়।

—অমন নড়িস নে। অধৈর্য হলে কি সিদ্ধিলাভ হয়?

আরও বোধহয় পাঁচ-সাত মিনিট কাটে। আধমরা আমগাছটা থেকে 'কু-উ-ক', 'কু-উ-ক' করে পাখী ডাকে। আবার ফড় ফড় করে উড়ে পালায়। আরও দূরে কয়েকবার ডাকে, তারপর শব্দ পাওয়া যায় না। এবার পড়ন্ত রোদের তেজটা ক্রমশই অসহ্য লাগে টুটুলের কাছে।

—এবার পাচ্ছিস? একটু গরম লাগছে ঠিক কপালের মাঝখানটায়?

—একটু অস্ফুট উত্তর আসে টুটুলের।

—আমি বলছি, তোর হবে। স্বামিজীর কথা কখনও মিথ্যে হয় না। আরও হবে। একেবারে জ্যোতি বেরোবে।...এবারে কি রকম?

—গরম লাগছে মনা-দা।

—হবে, তোর হবে। আনন্দে চোখ খোলে মনা। আজকে তাহলে এই পর্যন্তই থাক। আস্তে আস্তে হবে। হুড়বড়ালে চলবে না।

আবার যখন তারা ফেরে তখনও সাইকেলের মিষ্টি সাঁ সাঁ শব্দ টুটুলের কানে আসে। কিন্তু সেদিকে তার নজর ছিল না। এক অস্পষ্ট আশঙ্কা তার বুকে চাপ বাঁধে।

তাদের বাড়ির বেশ কিছুটা দূরে রাস্তার মোড়ে সাইকেল থেকে টুটুল-কে নামিয়ে মনা আবার তোতলায়, আ-র আ-র একটা কথা। তো-তোর দিদিকে বলবি মমতার সঙ্গে না মিশতে।

মমতা ভাল মেয়ে না। তু-তুই ছোট ছেলে বুঝবি না। স্বামিজী বলেছেন স্ত্রীলোক কু হলে তার মতে কু আর কিছু নাই।

মনা সাঁ সাঁ করে সাইকেল চালিয়ে আম-বাগানের গা দিয়ে রাস্তাটা ধরে মিলিয়ে যায়। টুটুল হতভম্বের মতো সেদিকে চেয়ে থাকে। একবার ভাবলে সামনে এগোবে নাকি, কিন্তু ক্রিকেট-পর্ব নিশ্চয়ই এতক্ষণ সমাপ্ত। টুটুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে এগোয়। আর কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ায়। চেনা গলার কথা ভেসে আসে। তাদের ঠিক কম্পাউন্ডের বাইরে মাঠের দিকটা থেকে ফিস-ফিস করে কথা আসছে মাঝে মাঝে হাসিরও আওয়াজ। এ জায়গাটায় পৌঁছতে কতগুলো কেয়ার ঝোপ, সচরাচর তারা এদিকে যায় না। কিন্তু এক অদৃশ্য টানে টুটুল সেদিকে এগোয়। সন্ধের অন্ধকার নামছে। কেয়ার ঝোপের ভেতর থেকেই স্পষ্ট দুটো মূর্তিকে দেখা যায় একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে আছে। টুটুল আর একটু এগোতে গিয়েই পিছু হাটে। পানুদা বুড়ীকে জাপ্টে ধরে চুমু খাচ্ছে।

চাবুক-খাওয়া ঘোড়ার মতো টুটুল দৌড় মারে। মনা-দার কথা শোনার পর যে চাপ সৃষ্টি হয়েছিল তা এতক্ষণে কাটতে থাকে, এতক্ষণে তার ফাঁকা মন একটা লক্ষ্যে ধাবিত হয়। তিস্তার ধারে যে দৃশ্য কয়েক মাস আগে দেখেছিল তার মধ্যে একটা মজা ছিল, তার পর চোঙা কয়েকবার দিদিকে শাসালে সে বড় দুটো চকোলেট দিয়ে তার দু ভাইয়ের সঙ্গে সন্ধি করেছে। কিন্তু মনা-দার কথার পর তার আজ সন্ধের কেয়াবনের দৃশ্য অন্যরকম লাগে, পানু-দাকে এক শত্রু শিবিরের লোক মনে হয়। দৌড়তে দৌড়তে সে গেট পার হয়। তারপর সমান তালে চোঙার প্রশ্ন ভ্রূক্ষেপ না করেই দোতলায় উঠে আসে। স্বর্ণসুন্দরীকে সামনে দেখেই তার বুক দমে যায়—মা মা! হাঁফাতে হাঁফাতে বলেই চুপ করে আরও হাঁফাতে থাকে।

—কি হল? ওরকম হাঁফাচ্ছিস কেন? ক্ষ্যাপা-দা আসে নি?

—নাঃ পানুদা দিদিকে চুমু খাচ্ছে!

হুড়মুড় করে কথাটা বলে সে বিমূঢ় ভাবে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ তার চোখ ফেটে জল আসে। কান্নায় বোঁজা বিকৃত ভাঙা গলায় বলে,—আমি কিছু জানি না মা, মনা-দা বলতে বলেছে।

স্বর্ণসুন্দরী যখন ভুরু কুঁচকে সামনে এসে দাঁড়ান তখন হঠাৎ মা-কে জাপটে ধরে টুটুল ফোঁপাতে থাকে। বারে বারে জেরা করেও বিশেষ কিছু জানতে পারেন না স্বর্ণসুন্দরী। অথচ টুটুল সচরাচর বাজে কথা বলে না। কাজেই কথাটা মোটেই ফেলার নয়। তা ছাড়া মেয়ের উড়ু-উড়ু ভাব তিনি কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করছেন। ফিটফাট থাকা তাঁরও পছন্দ। সেদিক থেকে বুড়ীর কাপড়-চোপড়ের দিকে সাম্প্রতিক অভিনিবেশ তাঁকে বিচলিত করে নি। কিন্তু মমতার বাড়ি যাচ্ছি বলে সময়-অসময়ে বাড়ির বাইরে যাওয়ার একটা অর্থ তিনি খুঁজে পান। পড়ার ঘরে টিক্-টিক্ করা পছন্দ নয় তাঁর। কিন্তু একদিন পাশ দিয়ে যেতে তিনি একটু থমকে ছিলেন। টেবিল ল্যাম্পের ওপর দিয়ে এমন ভাসাভাসা মুগ্ধ দৃষ্টিতে পানুর দিকে চেয়ে ছিল তার মেয়ে যে মুহূর্তের জন্যে তাঁর নিজের আত্মবিশ্বাসে ঘা পড়ে। তারপর ব্যাপারটার অসম্ভাবনা এতই প্রচণ্ড যে সেদিকে আর চোখ ফেরানোর প্রয়োজন মনে করেন নি। কিন্তু যে কারণে তিনি সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন তা হোল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড কেরানীর আস্পর্ধা। কুকুরকে লাই দিলে মাথায় চড়ে কথাটা বলেই ফেলেন বিহ্বল টুটুলকে। তারপর ওপর থেকে হাঁক দিলেন,—বুড়ী।

ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়ানো বুড়ী নিস্পৃহ গলায় নীচ থেকে জবাব দেয়,—যাই মা।

সেবার শীতের সকালে মস্ত একখানা নতুন চকোলেট রংয়ের ফোর্ড গাড়ি নিঃশব্দে এসে থামে ডেপুটি কমিশনারের বাগানে। গাড়ির চাবি আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে পাজামা পাঞ্জাবীর ওপর নীল চকোলেট জহর কোট আঁটা সুধীর ঘোষ নামে। কুচকুচে কালো এবং আশ্চর্য সুপুরুষ সুধীর। সাড়ে ছ'ফিট লম্বা হাল্কা খেলোয়াড়ি গড়ন, বুদ্ধিতে প্রখর কপাল ও চোখ, আর হাসলে

ঠোঁটের দু-পাশ চমৎকার আকর্ষণীয়। বলতে গেলে, সুধীর সব সময় হাসছে কিংবা হাসবার উপক্রম করছে। আর সে হাসলে স্বর্ণসুন্দরীদের নীচতলায় তার আওয়াজ ভেসে আসে।

স্বর্ণসুন্দরী বললেন,—বাঃ সুধীর, তুমি যে রাজার মতো হাসছো!

—হাসব না মাসীমা? আপনি যেরকম ঘাবড়িয়ে দিয়েছেন! হাঃ হাঃ হাঃ!

স্বর্ণসুন্দরী বুঝতে পারেন না সুধীরের প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহের সুযোগে সে অসভ্যতা করছে কি না। একবার ভুরু কুঁচকালেনও, কিন্তু সুধীর এমন প্রাণখোলা হাসিতে ঘর ভরিয়ে তোলে যে তিনিও হেসে ফেলেন। সুধীর হাসতে হাসতে বললে,—বুড়ী? ওটা তো একরত্তি মেয়ে! আর পানুটা তো মহা ইডিয়েট! নিজের কেরীয়ার নিজে নষ্ট করল। তবে আপনি মাসীমা এমন ঘাবড়ে গিয়েছিলেন!

—না না সুধীর। তোমরা আজকালকার ছেলেরা ব্যাপারটা মোটেই গুরুত্ব দিতে চাচ্ছো না। আমার সবচেয়ে রাগ হয়েছিল কেন জানো?

—হ্যাঁ, সেটা বুঝতে পারছি, আপনি বলছেন স্ট্যান্ডার্ডের কথা, না? সুধীর এবার গম্ভীর হয়ে বললে।

—হ্যাঁ অনেকটা...

—আচ্ছা মাসীমা, পানু-র যদি স্ট্যান্ডার্ড থাকত তাহলে...

—যদির কথা নদীতে।

—তা অবশ্য! সুধীর চেয়ারে বসে পা নাচায়।

—আমার বরাবরই মিনমিনে লোক ভাল লাগে না।

—আমাকে কেমন লাগে? সুধীরের ঠোঁটে আবার হাসির উপক্রম। আর সে হাসিতে সামান্য বিদ্রূপ নেই। স্বর্ণসুন্দরী সেদিকে চেয়ে হেসেই ফেলেন, তুমি নিজেই জানো। বলেই মনে মনে ভাবলেন রংটা যদি সাফ হত তাহলে গৌরীর সঙ্গে কি চমৎকারই না মানাত। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনকেই বলেন, রং-এর কথা বাদ দিলে সুধীরের শত্রুও তাকে সুপুরুষ বলবে। তাছাড়া এ বয়সে দুটো নামকরা টি-এস্টেটের ম্যানেজার। সুন্দর স্বভাব। বাড়িঘরের অবস্থা যথেষ্ট স্বচ্ছল। এরকম ঘরে গৌরী গেলে তিনি খুশিই হবেন। তাছাড়া বুড়ীর হঠকারিতায় তিনি এমন ঘা খেয়েছেন যে, গৌরীর ব্যাপারে ভাবিত হয়ে পড়েছেন। গৌরী বি-এ দিল। এবার ধরেছে এম-এ পড়বে। কিন্তু তাঁর মেয়ে তো আর চাকরী করবে না, সুতরাং বিদুষী সে যথেষ্টই হয়েছে, আর হবার প্রয়োজন নেই। স্বর্ণসুন্দরীর ইচ্ছে গৌরী কলকাতার পাট চুকিয়ে এখানেই উঠে আসুক বড়দিনে। সুধীর এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার পর থেকেই এ ইচ্ছা আরও বলবতী হয়েছে। এ ছাড়া আরও এক কারণে গৌরীর প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার হোস্টেলে বাস তুলে দিতে তিনি মনস্থ করেছেন। তা হল তাঁর বড় মেয়ের চিঠিতে তাঁর সদ্য ইউরোপ ফেরত জামাইয়ের সঙ্গে গৌরীর সম্পর্কে এক প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত।

—চা-বাগানে তোমার ফাঁকা লাগে না সুধীর?

—আমার এখন খুব ভাল লাগে মাসীমা। কলকাতায় হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের হট্টগোলের পর বাবা যখন বাগানে ঠেলে দিলেন তখন বেজায় খারাপ লেগেছিল। ভীষণ আড্ডাবাজ জানেন তো! কথা না বলতে পারলে আঁকপাঁক করতাম। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে ছাতি মাথায় করে জল ঠেলে এপাড়া ওপাড়া করতাম শুধু আড্ডা দেবার জন্যে। আর এখন ঠিক উল্টো, মাইলের পর মাইল, চায়ের ঝোপ, আর একটা দুটো পাখীর আওয়াজ।

এরকম নির্বান্ধব পুরী বাপু আমার ভাল লাগে না। স্বর্ণসুন্দরী যেন তাঁর মেয়ে গৌরীর হয়ে কথা বলছেন।

—আমারও তাই মনে হত। এখন আর হয় না।

—কেন বাবা? এক বছরেই এমন বুড়ো হয়ে গেলে?

—ঠিক তা নয় মাসীমা। দেখলাম আমাদের জগৎটা কেমন ফক্কা হয়ে গেল এই ক'বছরেই। যেসব জিনিস নিয়ে ভাবতাম সেগুলো আসলে কোন ভাবনাই ছিল না। খালি কথা আর কথা, কথার

পিঠে কথা। কথার বন্যায় আমরা ভেসে যেতাম।

—তা মানুষ কথা বলবে না? কথা না বললে প্রাণ বাঁচে?

সুধীরের পা নাচানো বন্ধ। তার ঠোঁটের পাশে হাসির উপক্রম এখনও আছে কিন্তু চাহনি অনেক কোমল স্নিগ্ধ। বললে, এখন বেশ ভাল আছি। সকাল আটটায় বেরিয়ে যাই ফ্যাক্টরীতে। সেখান থেকে একবার আসি বাড়িতে খেতে। বিকেলে সাইকেল করে যাই মাইল দুয়েক দূরে আমাদের লোকজনদের জন্যে ব্যারাক উঠছে তার তদারক করতে। যখন বাংলোতে ফিরি সন্ধে নামছে। এই বেশ ভাল মাসীমা। জীবনটা বেশ ছকে ফেলা গেছে। আগে জীবনের কোন ছক ছিল না। এই গাড়িতে করে কাশ্মীর গেলাম, সারা রাত্তির ধরে হল্লা করলাম বন্ধুদের সঙ্গে। আর ভাল লাগে না।

—এত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেলে চলবে কেন?

—বুড়ো না মাসীমা, এটা ঠিক বুড়ো হওয়ার লক্ষণ না। কোন একটা কিছু নিয়ে থাকা চাই। তাতে ইন্টারেস্ট নেওয়া যাকে বলে, এইটাই জীবন। এছাড়া যা আছে সেগুলো কথা, কি বলুন?

—কি জানি বাপু, আমার তো মনে হয় বেঁচে যে আছি এটাই যদি না বুঝতে পারি তাহলে আর বেঁচে কি লাভ?

সুধীর অন্যমনস্কভাবে গাড়ির চাবি আঙুলে পাক দিতে থাকে। আস্তে আস্তে বলে, কলেজ জীবনে বাবাকে খুব করুণা করতাম। আমরা এত মজা করছি, হুল্লোড় করছি, আর বাবা সারা জীবন পড়ে আছেন চায়ের বাগানে। আগে আসামে ছিলেন; ছেলেবেলায় আমিও আঁকপাঁক করতাম বাগানে কিছুদিন থাকলে। সময়ে সব পাল্টে যায়, না মাসীমা?

—হ্যাঁ, মানুষ বুড়ো হয়ে যায়।

—আমি ওরকম ভাবি না। আমার মনে হয় সময় আমাদের শেখায়। আমরা সময়ের কাছ থেকে শিখি।

স্বর্ণসুন্দরী উসখুস করে বললেন,—তুমি আবার কবিতা টবিতা লেখো না তো?

সুধীর অবাক হয়ে বললে,—কবিতা? না না, সাত জন্মে কবিতা লিখি নি। যদি বলেন গাড়ির মেকানিক হতে পারি, টেনিস ট্রেনার হতে পারি। তবে কবিতা টবিতার মধ্যে নেই।

—যেরকম কথা বলছো আজকে আমার তো ভয় হচ্ছে সাধু সন্ন্যাসী হয়ে যাও কিনা।

সুধীর আবার হাসিতে ঘর ভরিয়ে তুললে।—সাধু আমি নই মাসীমা, সাধু মনা। কলকাতায় গেলেই কোনো মঠে যায়। সাধু সঙ্গ করে। তবে মাথাটা খুব পরিষ্কার মনার। দেখবেন, ও আমার চেয়েও ভাল বাগান চালাবে।

—যদ্দিন বয়স আছে আমোদ আহ্লাদ করে নাও। আমি হৈ হৈ পছন্দ করি, আমার মেয়েও।

—আপনার বড় মেয়ে?

—না, হেনা বরাবরই খুব শান্ত, বিচক্ষণ। আমার মেয়ে গৌরী একেবারে হুড়ো। ওকে বকতাম ছেলেবেলায় কিন্তু মনে মনে হিংসেও করতাম। আমিও ঐরকম ছিলাম ছেলেবেলায়। তুমি তো গৌরীকে দেখোনি। ও আসছে বড়দিনে। আমি লিখে দিয়েছি ওসব এমে টেমে হবে না।

—তাহলে চলুন, বড়দিনে একটা আউটিং করা যাবে।

—আমার জামাইও আসছে, বড় মেয়ে আসছে।

—বেশ তো! সুধীর আঙুলে চাবি জড়াতে জড়াতে উঠে পড়ে।

ভবনাথের জামাই, বড়মেয়ে, গৌরী বড়দিনের সুরুতেই তাদের লটবহর নিয়ে হাজির। গৌরী গত দু' বছরে আরও সুন্দর হয়েছে, কিন্তু একটু বিষম, তার কলেজে হস্টেলের বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ হল্লার জীবনে ছেদ পড়ায় গম্ভীরও! তার অনেকদিনের লাল ট্রাঙ্ক গাড়ি থেকে নামাতেই চেঁচায়, দিদি, আমাদের সঙ্গে থাকবে রে, আর যাবে না।'

বড়মেয়ে হেনা অনেকটা লম্বা, আর কালো। চেহারায় গৌরীর ঠিক বিপরীত। ছটফটানি নেই, হাসিও ম্লান। আস্তে আস্তে ঘাড় তুলে বড়বড় চোখে তাকায়। মুখের রেখা কোমল, খুব স্পর্শ-কাতর। নবুর বিয়েতে কদিনের জন্যে মাত্র দেখা হয়েছিল। স্বর্ণসুন্দরী বড় মেয়েকে বুকে জড়িয়ে

ধরে সশব্দে চুম্বন করেন।

জামাই মদন ঘোষের এখন বয়স চল্লিশ। কালো বেঁটে। রোগা, কিন্তু প্রচণ্ড এনার্জির আকর। সাত বছর জার্মানীতে বিয়ের আগে চার বছর, পরে তিন বছর। বি-ই কলেজ থেকে পাশ করে কিছু-দিন চুন সুরকির দোকান দিয়েছেন ট্যাক্সি চালিয়েছেন, কানাঘোষা শোনা যায় জার্মানীতে ভারতীয় বিপ্লবীদের সংগে যোগাযোগ ছিল। তবে এখন সে অধ্যায় কেটে গেছে। এখন মদন ফিলিপ্স কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার।

মদন গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমেই হাঁক দেয়, সাবধানে নামাবে, কাঁচের জিনিস আছে। স্বর্ণ-সুন্দরীর অনেক দিনের সাধ মদন পূর্ণ করেছে। দামী বিলিতি ডিনারের সেট এসেছে সংগে।

খামচে খামচে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে শ্বশুরকে বললে,—বললাম, গাড়িতে আসব। কোন অসু-বিধে নেই। আপনার মেয়ে রাজী হল না। আমার সম্পর্কে একেবারে কন্‌ফিডেন্স নেই।

ভবনাথ মৃদু হাসেন। জামাইয়ের গাড়ি হয়েছে অথচ তাঁর এখনও হয়নি। তাঁর বড় ছেলের সাম্প্রতিক অকৃতকার্যতার কথাও স্মরণে আসে। প্রতাপকে এতগুলো টাকা দিয়ে মাসে মাসে পুষতে না হলে ইতিমধ্যে তাঁর গাড়ি হয়ে যেত। কয়েকটা ইংরেজ প্লান্টারের কাছ থেকে অফারও এসেছে।

স্বর্ণসুন্দরী আবার আনন্দে থৈ থৈ করেন। নাতনি বুলু যে এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে গৌরীর পেছনে দাঁড়িয়েছিল তাকে কোলে টেনে নিয়ে হাঁক ছাড়েন—গোপীনাথ, গোপীনাথ, স্টোভ ধরাও।

সন্ধের পর দোতলায় বারান্দায় পারিবারিক মজলিশ বসে। এ মজলিশের চেয়ারম্যান স্বর্ণ-সুন্দরী। ভবনাথ দূরে ক্যাম্পচেয়ারে বসে থাকেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি একটু বেশী নীরব। প্রতাপের আই. সি. এস. পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা এবং প্রায় বছর খানেক বছর দেড়েক টালবাহানা করে শেষ পর্যন্ত চাটার্ড একাউন্টেন্সি পড়ার অনির্দিষ্ট তীর্থযাত্রা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। জোরাল আলোয় দেয়ালের গায়ে ফুলন্ত বোগেনভিলিয়া ঝলমল করে। সেদিকে চেয়ে তিনি টের পান যে তাঁর ভাগ্যাকাশের সূর্য এবার হেলেছে পশ্চিমদিকে। যদি প্রতাপটা দাঁড়াত তাহলে আরও কিছুদিন বোধহয় খাড়া হয়ে থাকতেন।

জুরিখ থেকে টমাস মান এসেছিল আমাদের ক্লাবে মদন কথার তুবড়ি ফোটায়। একবার গৌরী আর একবার স্বর্ণসুন্দরীর দিকে চেয়ে বলে আমাদের দেশের হেঁজি পেঁজি সাহিত্যিক না। নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, গয়টের ওপরে বললে। সে এক অন্য রকম দেশ মা, সব মানুষ কাজ করছে, সব মানুষ চিন্তা করছে, আমাদের দেশের মতো ঘুমিয়ে নেই।

গোপীনাথ আরও এক কাপ সুগন্ধ দার্জিলিং চা নিয়ে আসে। ডাঙ্কে ডাঙ্কে! উৎসাহের সংগে পুরনো অভ্যাসে চেঁচিয়ে ওঠে মদন। তারপর শাশুড়ী ঠাকরুনের বিহ্বল দৃষ্টির দিকে চেয়ে ব্যাখ্যা করে।—জার্মানে ধন্যবাদ দিলাম। গৌরীর দিকে চেয়ে বললে, তোমাদের কি ছাতা ইংরেজী সাহিত্য পড়ায়? তাতে কোন কথার জোর আছে?' মদন নির্ভুল উচ্চারণে হাইনে আবৃত্তি করে। তাকে অন্যরকম দেখায়। ভবনাথও চমকিয়ে সেদিকে চোখ মেলেন। তাঁর চাকরি ও পারিবারিক জীবনে এই ধূমকেতুটির আবির্ভাব মন্দ লাগে না। খানিক ক্ষণ পরে অবশ্য তাঁকে উঠতে হয়। রায় লিখতে বসেন বৈঠকখানায়।

স্বর্ণসুন্দরী কিছুই বোঝেন না। কিন্তু এই জুরিখ, বার্লিন, হামবুর্গের গল্প, সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ এক অপরিচিত গন্ধ রস বয়ে নিয়ে আসে। গৌরী ভক্তের মতো চেয়ে থাকে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে জামাইবাবুর দিকে। খালি হেনা প্রবল বিষাদের প্রতিমূর্তির মতো বসে থাকে। স্বর্ণ-সুন্দরী দুতিনবার খোঁচা দিলেও তার কোন পরিবর্তন হয় না।—আমার মাথা ধরেছে শেষে বললে।

—আপনার মেয়ের কথা আর বলবেন না। ও যে কি চায়, বুঝি না। খালি সংসার করো, খাও দাও, ব্যস। আর কোন চিন্তা নেই, কোন আইডিয়া নেই। মদনের শেষ কথায় প্রতিবাদের একটা কাঁপুনি হঠাৎ হেনাকে নাড়া দিয়েই থেমে যায়।

স্বর্ণসুন্দরী মেয়েকে বলেন,—কিরে কিছু বলছিস না যে!

—বলছি মাথা ধরেছে!

বিরাট রুই মাছের মুড়োর ঘণ্ট তদারক করতে স্বর্ণসুন্দরী উঠে যান রান্নাঘরের দিকে।

জামাইয়ের জন্যে আউটহাউসে মুর্গী রান্নারও ব্যবস্থা হয়েছে। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে বড়মেয়ে উঠে পড়ে। গৌরী আস্তে আস্তে বললে,—আপনি দিদিকে অমনভাবে—

—সত্যি কথা বলার সৎসাহস আমার আছে গৌরী। তা ছাড়া কেন বলব না। আমার সঙ্গে আমার স্ত্রীর মানসিক কোন যোগাযোগ নেই। কিছু না!

গৌরীর সুন্দর মুখখানায় আতঙ্কের ছায়া পড়ে। সে বুঝতে পারে এবার কথার মোড় কোনদিকে নেবে। এবং সেদিকেই নেয়। মদন বললে, এই যেমন ধরো তুমি। তোমাকে যে আমি ভালবাসি তার জন্যে তোমাকে তো সাতপাক দিতে হয়নি। আমাকেও টোপর পরতে হয়নি।

—আস্তে, মদন-দা আস্তে!

—আস্তে কেন? এ ব্যাপারে হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়া ভাল। আমি ওসব মেয়েলি ন্যাকামী পছন্দ করি না। তুমি আমাকে সোজাসুজি বল, তুমি ভালবাসো কি না, বল। তুমি যা বলবে আমি মেনে নেব।

কিছু বলবার জন্যে গৌরীর পাতলা ঠোট দুটো কেঁপে উঠল। কিন্তু তার মুখ থেকে কিছু ফুটবার আগেই মদন বললে,—তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমি জানি। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাসো। তোমার ভয় হচ্ছে তোমার দিদির সংসার ভেঙ্গে যাবে, বুলুর ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে। এইসব ভাবছো। এইগুলো তো বাইরের কথা। এগুলোর সামনে আমরা দাঁড়াব কিন্তু অন্যভাবে। তুমি তো আমাকে ভালবাসো, এ ব্যাপারে তুমি নিজে আরও শক্ত হও। শুধু খুকী হয়ে থেকো না। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক মানেই খুকী অথবা বুড়ী। তুমি এই দুটো টাইপ থেকে আলাদা হও।

গৌরী এই কথার ঝড়ের সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। সে বুঝতে পারে না এটা ভালবাসা কি অন্য কিছু। কিন্তু যখনই নির্জনে মদন তাকে নিয়ে বসে এবং এইরকম কথা বলে তখনই তার বুক কাঁপে, ভয়ে উদ্বেগে অথচ এক অভূতপূর্ব আকর্ষণে। আর সবচেয়ে বড় কথা, মদন তা জানে। মদন জানে যে গৌরীকে ডাক দিলেই সে তার কাছে চলে আসবে। এই অসহনীয় আকর্ষণের অদৃশ্য দড়িটা বারে বারেই ছিঁড়তে চেয়েছে গৌরী গত কয়েকমাস ধরে, কিন্তু বারে বারেই জড়িয়ে পড়েছে। গৌরী মাথা নীচু করে থাকে। তার বুক তোলপাড় করে। হাতের মুঠো শক্ত করে বলে—আমি বাবা-মা-র বিরুদ্ধে কিছু করতে পারব না।

—কাওয়ার্ড, ইউ আর এ কাওয়ার্ড! মদন চাপা গর্জন করে। সেই খুকী, সেই এম-এ পড়া খুকী। আচ্ছা, আমাদের দেশটা কি চিরকাল এইরকম থাকবে?

গলার স্বর চড়িয়েই বলতে থাকে।—আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সব সময় বড় বড় কথা বলবে। অথচ কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। নিজের মনের কাছে কি জবাবদিহি করবে গৌরী? না, তার কোন প্রয়োজন মনে কর না? একে কি বলে জানো? ম্যাসোচিজম্। নিজের পিঠ ফুঁড়ে একরকম আনন্দ আছে না, সেই রকম। আচ্ছা, দেখো, আমি কি রকম পারিবারিক যুপকাষ্ঠে বলি! স্ক্যাণ্ডালাস্!

গৌরী পাথরের মতো বসে থাকে। স্বর্ণসুন্দরীর পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। চিকেন কাটলেট-টা ঠিক তোমার মনের মতো হবে না, বলে দিচ্ছি। আসতে আসতেই বললেন।

—বেশী পুর দিয়ে দিয়েছে বোধ হয়।—সেরেছে! মদন জবাব দেয়।

তিন

পরদিন সকালে ছেলেদের শোবার ঘর থেকে একটা আওয়াজ খুব ঘন ঘন উঠতে থাকে। আজকে কী? চামর্চি! বারে বারে লাইনটা উঁচু নীচু খাদে উঠতে থাকে।—কান একেবারে ঝালাপালা করে দিলি। বুড়ী চেঁচিয়ে ধমক দেয়।

বাইরে দুটো গাড়ি এসে লেগেছে। সামনে সুধীরের চকোলেট রংয়ের বিরাট ফোর্ড গাড়ি। পেছনে আর একখানা বাদামি শেভ্রলে।

—সুধীরদা, আপনি একশো মাইল তুলতে পারবেন ? চোঙা জিজ্ঞেস করে।

সুধীর ভবনাথের সঙ্গে লনে বেড়াচ্ছিল শীতের রোদ্দুরে। টুটুল কাছে এসে আস্তে আস্তে বললে,—আমি কিন্তু আপনার পাশে বসব।

চোঙা বললে,—আমিও।

—তোমার কি মনে হয় চায়ের শেয়ারের দাম উঠবে ? বাজারের যা অবস্থা তাতে তো কেনার কথা ভাবতেই ভয় করে, ভবনাথ বললেন।

—আমি বলছি মেসোমশাই আর দুতিন বছরের মধ্যেই চড় চড় করে দাম উঠবে। আমরা কিনছি, আপনাকেও বলছি। কয়েকটা বাগানের নাম করে দিচ্ছি, সেই সেই কোম্পানির কিনবেন।

—প্রতাপটার জন্যেই সব চলে যাচ্ছে।

—বেশী করে কিনুন।

—আমার গরম জল হয়েছে ? গোপীনাথ ? ওপরতলা থেকে মদনের হাঁক আসে। কিছুক্ষণ পরেই একটা একটা করে মাল গাড়িতে তোলা হয়। খাবারের ঝুড়ি, চায়ের সরঞ্জাম, সুটকেশ, ট্রাঙ্ক, ছোট বেডিং।

—মাসীমা কি বিদেশ যাচ্ছেন নাকি ?

স্বর্ণসুন্দরী বারান্দায় আসতেই সুধীর বললে।

—বড় বেডিংটা তো নিলাম না।

—বেডিং নেবার কোন দরকার নেই। বলেই তো দিলাম মাসীমা। বাগানে সব পাবেন।

বুড়ী এসে মায়ের পাশে দাঁড়াল। পানুদা পর্বের পরে বুড়ী কিন্তু বিশেষ পাল্টায়নি। ঘাড় কাত করে দাঁড়াবার দৃপ্ত ভঙ্গী সে আয়ত্ত করেছে, তার অন্যান্য দু বোন থেকে তা আলাদা। কলার তোলা কমলালেবু রংয়ের সোয়েটার আর খাটো নীল স্কার্টের সঙ্গে সাদা হাই হিল তোলা জুতোয় সে একটুকরো কমলা-নীল-সাদা পাথরের দীপ্তিতে ঝলকায়। সুধীরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে এমন ভাবে তাকায় যেন তা শত্রুপক্ষ পর্যবেক্ষণ। পানুদা যে হাওয়ায় কর্পূর হল তার কারণ সুধীরদা। সুধীরদা কোন ট্যাঁফো করবার অবকাশ দেয়নি, ভাল ভাবে বিদায় নিতে পারেনি পানুদা, (গলার কাছে একটা ব্যথা নড়েচড়ে ওঠে বুড়ীর)। পানু-দাকে লোকটা গিলে ফেলেছে। তারপর সে আরও টের পায় লোকটার ঘন ঘন আগমন, তার মায়ের উৎসাহ এ সমস্ত ব্যাপারের পেছনে দিদি আছে। এই গোপন কথাটা হাবেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, বুড়ীর কাছে ঢাকা পড়েনি। বুড়ী আরও একবার চকোলেট রংয়ের ফোর্ড গাড়ীখানার পাশে লম্বা পাজামা-পাঞ্জাবী-পরা লোকটার দিকে চেয়ে ঠোঁট চাটে। বলাই একবার বলেছিল না তাঁর মাকে যে মা আঁচে বাঘ ধরে, বুড়ীও তা পারে। মৃদু হাসির রেখা তার মুখের কোণে জেগে মিলিয়ে গেল। সোজা পায়ে নেমে এসে সুধীরের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলে,—আমি আপনার গাড়িতে যাব।

সুধীর অবাক হয়ে মেয়েটিকে লক্ষ্য করে, ঠিক এলেবেলে নয়। এক মুহূর্তে মনে আসে পানুর আত্মপক্ষ সমর্থনে মরীয়া যুক্তি।—আমি প্রথমে কিছু করিনি, সুধীরদা। ঐ আমাকে...

—বেশ তো, অনেক জায়গা আছে।

এবার গৌরী হেনার পেছনে পেছনে আসে। লাল জংলা সিল্কে ঝলমল করে। মাথায় সাদা বুটিদার নীল সিল্কের স্কার্ফ, চোখে গগলস্। তার ফর্সা খেলোয়াড়ি হাতে ব্যাগটা ঝোলাতে ঝোলাতে যখন শীতের রোদ্দুর-ঢালা সিঁড়ি দিয়ে নামে তখন সুধীর সেদিকে চেয়ে চোখ ফেরাতে পারে না। প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট সুধীর একটু যে না ঘাবড়ায় তা নয়। চা বাগানের বাংলোর বারান্দায় বসে বসে দূরে নীল পাহাড়ের গা থেকে গড়িয়ে-নামা চায়ের ঝোপের সারির ওপর সাদাটে শুকনো একহারা গাছগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে বিকেলের পর বিকেল কাটানো কি তার পক্ষে সম্ভব হবে ?

পেছনে হেনা একেবারে বৈপরীত্যের ছবি। ভীষণ আত্মসচেতন, কাঁচুমাচু। সে যে আজ একটু সেজেছে, মানে নীল জর্জেট পরেছে, একটু হাল্কা করে লিপস্টিকও লেবড়েছে ঠোঁটে তা যেন আবিশ্ব মানুষের দ্রষ্টব্য। তার স্বাভাবিক শান্ত বিষাদ-ভরা চেহারাখানা লাজুক হাসিতে

ঢেকে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে জুতোতে ঠোক্কর খায়।

—কি যে করো! সবটাতে তাড়াহুড়ো। মেয়েকে স্কুলে পাঠাচ্ছো না কি!

গলা উঁচু সাদা পুরোহাতা জার্মান পুলওভার পরা বেঁটে লোকটা দরজা থেকে বেরিয়েই চড়ুই পাখীর মতো তড়াক তড়াক করে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোয়।—থার্মোস-টা এনেছো গৌরী, তুমি আমাদের সঙ্গে এসো। আমার রাগ-টা তুলে দিয়েছেন তো মা? বুড়ী, বুড়ী, মাই ডার্লিং।

কৌতূহলী সুধীর এই সাদা তামাটে চড়ুই পাখীটার দিকে চেয়ে মজা পায়। বলে—আপনি স্যার আমার গাড়িতে আসুন।

—চলুন, চলুন! আমরা একবার ব্ল্যাক ফরেস্টে গিয়েছিলাম ফ্রাউ ক্রুয়েগারের সঙ্গে। বাব্বাঃ সে কি পার্টি! সারারাত ধরে হোটেলে নাচগান। ওরা কাজও করতে পারে, ফুর্তিও করতে পারে।

সব মাল দুটো গাড়িতে তোলা হলে গোপীনাথ হাজির হয়। ধোক্কড় পুরনো মেটে আলেস্টার (বোধহয় হেনার ছিল) তার বেঁটে শরীরটা এমনভাবে ঢেকেছে যে তার খাটো ধুতি মালুম হয় না। পায়ে বাবুর পুরনো বুটজুতো, হাতে টিফিন কেরিয়ার। স্বর্ণসুন্দরী হাঁকলেন,—মদন, তুমি আমার পাশে এসে বসো, তোমার জার্মানীর গল্প শুনতে শুনতে যাব।

মদন উৎসাহিত হয়ে শাশুড়ীর পাশে বসে। স্বর্ণসুন্দরী চোখের ইসারায় গৌরীকে সামনের গাড়িতে উঠতে বললেন। স্ত্রী শাশুড়ি এবং সামনের সীটে শ্বশুর মশাই থাকাতে মদন কেমন থমথমে মেরে যায়।

সামনে তিস্তা, ধু ধু বালি। বিচালি বিছানো পথে নীচু গীয়ারে কোঁ কোঁ করে গাড়ি দুটো দু'মাইল পার হবার পর ঝকঝকে নীলচে পাহাড়ী জলে পাটাতনফেলা দুখানা বজরা। গাড়ি দুটো যখন তাতে তোলা হয় তখন অনেক দূরে ছেড়ে আসা ওপারে একটা নির্জন খেজুর গাছের দিকে চেয়ে চেয়ে বুড়ীর সমস্ত মনটা টলমল করে ওঠে। তারা তখন নৌকোর পাটাতনে দাঁড়িয়ে। চোঙা বুড়ীকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করছিল। কাছে এসে বললে,—তুই কি ভাবছিস বুড়ী বলে দেব? তারপর বুড়ীর জবাবের অপেক্ষা না রেখেই আঙুল দেখিয়ে বলে,—ঐ খেজুর গাছটা, না রে?

—ভাগ! বুড়ী আবার তার সীটে গিয়ে বসে।

তিস্তার ওপারে পড়েই গাড়ি হু হু করে ছোটে। চমৎকার ডুয়ার্সের রাস্তা শীতের রোদ্দুরে ঝকঝকে ফাঁকা। এক-আধটা লরী যায় কয়লা নিয়ে চা বাগানের দিকে, উল্টো দিক থেকে কখনও কখনও ছুটন্ত প্রাইভেট গাড়িতে লাল মুখ। দু-তিন ঘণ্টার পর জঙ্গল শুরু হয়। ঘন সবুজ মোটা-গুড়ি দীর্ঘ শালের সমারোহের মধ্যে দিয়ে গাড়ি ছুটতে থাকে। উৎসাহে চোঙা চীৎকার করে,—আরও জোরে, সুধীর-দা, আরও জোরে।' উৎসাহে গৌরীও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। স্পীডোমিটারের কাঁটা লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে ওঠে। বাইরে মাঠঘাট বনজঙ্গল কালভার্ট টেলিগ্রাফের তার শুধু সাদা লাগে। সেভেন্টি, সেভেন্টি, সেভেন্টি-ফাইভ এইট-টি। এইট-টি হয়েছিল সুধীরদা? মুহূর্তের আশী মাইল স্পর্শ করেই নামতেই থাকে কাঁটা। সামনে কালভার্ট, সত্তর, ষাট, শেষে পঞ্চাশে ছোটে। উৎসাহে-উদ্দীপনায় বুড়ী গৌরী টুটুল সবাই সোরগোল তোলে। আশী মাইল গতিতে তারা ছুটেছিল এই কৃতিত্বের শরিক তারা সবাই এ রকম মনোভাব তাদের চীৎকারে হাসিতে কথাবার্তায় প্রকট। বুড়ী তো প্রায় সুধীর-দার প্রেমে পড়ো পড়ো। স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে এক সমাহিত যৌবনের প্রতিমূর্তির মতো সুধীরদা, তার পাশে পানু-দাকে অনেক ফিকে লাগে। পানু-দাকে কখনও ভাবাই যায় না এই রকম ভূমিকায়, পানু-দা যেমন সব সময় মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বিশেষ করে এই শাল পাইনের সমারোহে। এই শীতের উজ্জ্বল সকালে পানু-দাকে আবার ফিরে পেলে কেমন হত? এ রকম চিন্তা কাঁটার মতো বুড়ীকে বেঁধে, কিন্তু বুড়ী টের পায় সে ব্যথা অনেক ভোঁতা হয়ে এসেছে কয়েক মাসে। আর বোধহয় কয়েক মাস গেলে সেটা কেবল বাল্যকালের ঘটনা হয়ে থাকবে এ রকম আন্দাজ করতে পারে।

গৌরীও মাঝে মাঝে চোখ ফেরায় সুধীরের দিকে। সে যে খুব একটা আকর্ষণ বোধ করে তা নয়। বলতে কি, মদনের প্রতি তার আকর্ষণ এখনও অটুট কিন্তু সে আকর্ষণের ফলাফল ভাবতে তার মাথা ঘোরে। গত দু তিন বছরে ব্যাপারটা খুব পেকে উঠেছে। বিশেষ করে জার্মানী থেকে

প্রত্যাবর্তনের পরই মদন তার এই শালীর মধ্যে ইউরোপীয় নারীর মানসিকতা ক্রমশ আবিষ্কার করতে থাকে। কিন্তু গৌরী বুঝতে পারে এটা শুধু মদনের তাত্ত্বিক আকর্ষণ নয় (যা সে প্রায়ই বোঝাতে চায়)। সবচেয়ে তার অবাক লাগে তার দিদির কথা ভেবে। দিদি তার মা-কে বলেছে সব কথা, এটা স্বর্ণসুন্দরী তাকে আঁচ দিয়েছে। কিন্তু দিদি কেন তাকে ভয় করে? কেন ব্যাপারটা এস্পার-ওস্পার করে ফেলে নি এতদিন? এজন্যে দিদির প্রতি করুণা জাগে। কেমন এক ভারী অব্যক্ত বেদনার রূপ হয়ে দিদি ঘুরে ফিরে বেড়ায়, কিন্তু তাকে কিছু বলবার সাহস সঞ্চয় করতে পারে না, শেষে মা-কে সেকাইত করে একটা সীন করেছে। এখন সমস্ত ব্যাপারটা থেকে গৌরী পালিয়ে যেতে চায় আর তা যদি সম্ভব হয়, সুধীরের হাত ধরে তাহলে তাই করবে।

দুপুর গড়িয়ে এলে তারা লাটাগুড়ি জঙ্গলে এল। বড় রাস্তা ছেড়ে সুধীর যখন গাড়ি নিয়ে ছোট রাস্তা ধরে জঙ্গলের ভেতরে এসে পড়ে তখন চারপাশের নৈঃশব্দ্য অন্ধকার এবং ঠাণ্ডা গাড়ির ভেতর কথাবার্তা চীৎকার থামিয়ে দেয়। পাক খেয়ে খেয়ে গাড়ি এগোতে থাকে, তারপর খোলা এক জায়গায় এসে থেমে যায়। স্বর্ণসুন্দরী নেমেই হাঁক দেন,—গোপীনাথ, স্টোভ ধরাও।

সুধীর ও স্বর্ণসুন্দরীর মানা সত্ত্বেও ছেলেরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। ভবনাথ মোড়ার ওপর বসেছেন। তাঁর প্রায় গায়েই অর্কিড-মোড়া বিশাল শালের গুঁড়ি। এ অঞ্চলের গাছগুলোর গুঁড়ি দুটো লোকের হাতের বেড় থেকেও বড়। সেই ঋজু পঞ্চাশ ষাট বছরের অটুট শক্তির ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে ভবনাথ আনমনা হয়ে পড়েন। বস্তুত তিনি তাঁর শক্তির শিখরে। গত দু' বছরে স্বাচ্ছল্য অনেকখানি বেড়েছে। এখন আর টি-এ বিলের জন্যে তাকিয়ে থাকতে হয় না। চাকরী জীবনেও লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন। পাবনা বাড়ির অহরহ খাঁই খাঁই এখন শান্ত। ভাইপো ভাগ্নেরা গড়িয়ে গড়িয়ে একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, আর এ ব্যাপারে তাঁর আকর্ষণও ঢিলে। কাজেই মানসিক ঝামেলা থেকে তিনি মুক্ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে দেখতে পান যেন অস্তাচলে পূর্ণশশী। তিনি ঢলে পড়েছেন তাঁর সমস্ত বৈভব সত্ত্বেও যেমনভাবে তাঁর প্রতাপশালী বাবা অস্তে গেলেন। ভবনাথ এই বিষণ্ণ চিন্তা থেকে নিজেকে জোর করে ছাড়াবার চেষ্টা করেন। একটা কাঠবেড়ালী অর্কিড মোড়া গুঁড়িটার গা বেয়ে নেমে ঠিক তাঁর মোড়ার সামনে দুপা তুলে তাঁকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে জঙ্গলের পথ ধরে মিলিয়ে যায়।

গৌরীর দিকে চেয়ে ভবনাথ বললেন,—বাজনা নিয়ে এসেছিস?

গোপাল মাস্টারের কাছে শেখা বিদ্যেটা গৌরী এখনও ছেড়ে দেয়নি। গাড়ি থেকে বেহালার বাক্স বেরোয়। তারপর গোপালমাস্টার যেভাবে শিখিয়েছিল তেমনি চিবুকে যন্ত্র লাগিয়ে গৌরী রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজায়, 'হে ক্ষণিকের অতিথি, এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া।'

মন্দ লাগে না, পিৎসিকাটো দিয়ে বেহালায় রবীন্দ্রসঙ্গীত ভবনাথের পিপাসিত কানে আরাম দেয়। তিনি তাঁর চারপাশে এই রকম সামান্য আরাম চেয়ে এসেছেন সারা জীবন, তার বেশী কিছু চান নি। তাঁর বাপের আদর্শবাদ, পৌরুষের পরীক্ষা তাঁর পছন্দ নয়। এমনকি পারিবারিক খ্যাঁচ-গুলোও তিনি ভুলে থাকতে চান। তাঁর জামাইয়ের ব্যাপারটা নিয়ে স্ত্রী কয়েকদিন তাঁকে খুঁচিয়েছেন, সোজাসুজি মদনকে ধমকে দিতে বলেছেন কিন্তু তিনি বিশেষ গা করছেন না। বয়স্ক লোক নিজেরা বুঝতে পারবে। মদন যদি নাও পারে, গৌরী পারবে। গৌরীর হাতে ছড়ের ওঠা-নামা দেখতে দেখতে মনে হয়, সে নিশ্চয় এ ব্যাপারটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। আর গৌরীও বাজাতে বাজাতে এক আধবার তার বাপের দিকে চোখ তোলে। এবং চোখ তুলে বুঝতে পারে। এতদিন মনের মধ্যে যে ইচ্ছেটা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিল, সেটা যেন বেহালা বাজাতে বাজাতে তার আঙুলের মধ্যে দিয়ে এসে এক জায়গায় জমা হয়। আর ব্যাপারটাকে গড়াতে দেওয়া যাবে না—না! হঠাৎ বাজনা বন্ধ হয়ে যায়।

ক্ষিদের মাত্রা এমন বেড়ে গিয়েছিল যে, কড়াইশুটির ঘুগনি আর ডিমভাজা কম পড়ে গেল। স্বর্ণসুন্দরী বেশী করে মুড়ি দিয়ে মেখে ম্যানেজ দিলেন। বুড়ী চেঁচিয়ে উঠল, চোঙা তার আধখানা ডিম খেয়ে ফেলেছে। তারপর সুধীরদা কি ভাববে না ভেবেই খপ করে এক মুঠো ঘুঘনি চোঙার ডিশ থেকে তুলে নিলে। স্বর্ণসুন্দরী একহাতা ঘুঘনি দিয়ে চোঙাকে শান্ত করলেন।

চোঙা বললে, সে ভালুক দেখেছে। কালো, রোঁয়া-রোঁয়া।

—ওটা কুকুর চোঙা, এ'টো খাবার জন্যে এসেছে, সুধীর বললে।

—আপনি সেটা দেখেননি। নির্ঘাত ভালুকের বাচ্চা!

চা খাবার পর যখন সাজসরঞ্জাম তুলবার পালা তখন ছেলেমেয়েরা এদিক-ওদিকে ছিটিয়ে পড়ে। সবচেয়ে এগিয়ে যায় টুটুল। একটা বাঁক নিতেই সে সকলের থেকে আলাদা অদ্ভুত জগতে এসে পড়ে। একটানা ঝিঁঝি ডাকছে। দিনের বেলাতেও রোদ এসে পড়েনি। একদিকে কতগুলো পাইন, গা ভর্তি ঝুলন্ত মসের দাড়ি নিয়ে চুপচাপ্। ঠান্ডা ভেজা এক ধরনের সবজে অন্ধকারে একলা একলা দাঁড়িয়ে তার গা শির শির করে। এখানে যেন কোনদিন কোন মানুষের পা পড়েনি, এইরকম আবিষ্কারের শিহরণে টুটুল স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ চমকে ওঠে। খুব কাছেই গলার আওয়াজ। দিদির গলা, মেজদির আর কার? আর সেই জামাইবাবু, যার জন্যে বাড়িতে রান্নাবান্না শোরগোল। গলার আওয়াজ এদিকে আসতে আসতে থেমে যায়।

—ছাড়ো, আর না! সবাই দেখবে। আড়ষ্ট ব্যথা ও আনন্দে অবসন্ন গৌরীর গলায় টুটুল আবার চমকে ওঠে। এক অদৃশ্য আকর্ষণে একপা একপা করে এগিয়ে সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জামাইবাবু মেজদিকে কিরকমভাবে যেন খামচাচ্ছে, আর মদনের আলিঙ্গনে আঁকপাঁক করছে গৌরী, যেন সে ছুটে পালিয়ে যাবে, অথচ পারছে না। টুটুলের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মাস আগে আর একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়ে গেল। বুড়ী আর পানুদার আলিঙ্গনে আবদ্ধ মূর্তি দুটো পরিষ্কার ভেসে ওঠে তার মনে। একবার ভাবলে এখান থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু ঐ একই রাস্তা দিয়ে ফিরতে হবে, সামনে আরও ভিজে অন্ধকার, আরও ঝিঁঝির শব্দ।

—এবারে কিন্তু সত্যি কথা বলতে হবে গৌরী। আর কচি খুকিমো কোর না। ফর হেভেন্স সেক্। আমরা এখনও দুজনে নতুন সংসার গড়তে পারি।

গৌরী হঠাৎ হাতের মুঠি শক্ত করে লাফিয়ে ওঠে।

মদনের গলা বিকৃত শোনায়,—বুঝতে পেরেছি, এখন ঐ মাকড়াটার দিকে তোমার নজর পড়েছে। হি উইল বি এ ডাল কম্পানি, আই টেল ইউ। তোমার মা-ও তোমাকে ভিড়াবার চেষ্টা করছে। সাবধান, আমি বলে দিচ্ছি, আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়ব না।

গৌরী শেষ কথা শুনবার আগেই এগিয়ে যেতে থাকে, আর পেছনে পেছনে ফুসতে ফুসতে চলে মদন।

এতক্ষণ এই নির্জনতার যে অপরিচিত আনন্দের স্বাদে মুগ্ধ লাগছিল টুটুলের, তা কোথায় পালিয়ে যায়। বড় হওয়া মানেই কি এইরকম হওয়া? এইরকম চিন্তা মাথায় নিয়ে আরও সকলের সঙ্গে টুটুল গাড়িতে ওঠে।

লাল আর সাদা বোগেনভিলিয়ায় মোড়া ঝকঝকে সাদা দোতলা কাঠের বাড়িটার সামনে বাগানে সারি সারি তক্তায় বসানো টবে রকমারি ফার্ন, কেয়ারিতে গোলাপ হাওয়ায় দোল খায়। কাঠের সিঁড়ির মুখে বিরাট পিতলের গামলায় বসানো দেয়ালেতোলা গাছটা থেকে সাদা একটা গোলাপ টপ করে তুলে নিয়ে গৌরী চুলে গোঁজে। বাথরুমে কলে গরম জল। মুখ হাত ধুয়ে আলোর ঝলমল বারান্দাতে ছেলেরা সোরগোল তোলে। কাঠের সিঁড়িতে ছোটাছুটিতে এত আওয়াজ ওঠে যে ভবনাথ পর্যন্ত হাঁক দেন। প্রচুর খিদে এবং প্রচুর ভাল খাওয়ার সমাবেশ। নিরামিষ, আমিষ, মিষ্টি, কোন কিছুর বাদ নেই। এমন ভাল খেয়ে দেয়ে লেপের মধ্যে সিঁধিয়ে সকালে ঝকঝকে রোদ্দুরে বারান্দা থেকে সামনে দিগন্তবিস্তৃত চা-ঝোপের ঘন সবুজ গালিচার দিকে চেয়ে চেয়ে গৌরীর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে হয় না।

নীচ থেকে বুড়ী চীৎকার করে ডাকে,—দিদি আমরা ফ্যাক্টরি দেখতে যাচ্ছি সুধীরদার সঙ্গে। তাড়াতাড়ি নেমে এসো।

গৌরী দেখলে সবাই প্রস্তুত কেবল স্বর্ণময়ী, দিদি ও মদন ছাড়া। টুটুলের সঙ্গে দিদির মেয়েটা তাদের মাথা-সমান কসমস ঝাড়ের এদিক-ওদিক লুকোচুরি খেলছে। সুধীর একটা গলাঢাকা হাল্কা হলুদ উঁচুগলা পুলওভার, কালো পেন্টুলুন এবং হাতে ছোট ছড়ি নিয়ে সামনে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। সঙ্গে ভবনাথ। খাকি হাফপ্যান্ট, গরম কোট, পুরো মোজা, বরসটা

আরও কমে গেছে তাঁর। স্বাভাবিক চামড়ার লালিত্যে আর গত রাত্রির পরিপূর্ণ বিশ্রামে সেই রাণাঘাটের এস-ডি-ওর মতো লাগে। তাঁর হাতেও ছড়ি। ছড়ি তুলে গৌরীকে আহ্বান করলেন।

—আমি আর এখন যাব না। বেশ লাগছে। গৌরী বললে।

তারপর বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে রোদ্দুরে টুলের ওপর পা তুলে সে ব্যাগ থেকে টমাস হার্ডির উপন্যাস বার করে পড়তে শুরু করে। মাঝে মাঝে চায়ের গালিচা যেখানে পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে সেদিকে, আর মাঝে মাঝে চায়ের ঝোপের ওপর সারি সারি সাদাটে হাড়-গিলে গাছগুলোর তীক্ষ্ম শোভা দেখতে দেখতে সে ডুবে যায় গত শতাব্দীর মেষচরানো ওয়েলসের অখ্যাত গ্রাম্য জগতে যেখানে মাটির সোঁদা গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের ঘরের প্রেম এক অদ্ভুত অবাস্তব সমন্বয়ে তাকে আকর্ষণ করে। কতক্ষণ সে এই স্বপ্নের জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল খেয়াল নেই. নীচতলা থেকে স্বর্ণসুন্দরীর শাসনে গমগমে গলায় হঠাৎ ধড়মড়িয়ে ওঠে। স্বর্ণসুন্দরী আবার হাঁকেন,—গৌরী, একবার নীচে শুনে যাও তো।

সাধারণত স্বর্ণসুন্দরীর আত্মপ্রত্যয় এত বেশী, যে ছেলেমেয়েদের নীচুগলায় ডাক দিতে তিনি অভ্যস্ত। তাঁর ডাকে একথা স্পষ্ট যে এ ডাক যতই নীচু খাদে হোক তা উপেক্ষার নয়। খুব চেঁচা-মেচির মধ্যে যে অসহায়তা স্বর্ণসুন্দরীর হাবভাবে তা মোটেই নেই। কিন্তু মায়ের এই অস্বাভাবিক চড়া গলায় গৌরীর বুক কেঁপে উঠল। তাহলে মদন...ব্যাপারটা!—এরকম চিন্তার ধস্ হুড়মুড় করে নেমে তার এতক্ষণের স্বপ্ন অকস্মাৎ অবলুপ্ত করে। পা টেনে টেনে সে নেমে আসে নীচে।

নীচে চায়ের টেবিলে স্বর্ণসুন্দরী অপেক্ষা করছিলেন এই মুহূর্তটির জন্যে। মোটামুটি তিনি যেভাবে ছকেছিলেন আগে থেকে ঠিক পর পর গত কয়েক মিনিটে তাই ঘটে গিয়েছে। টেবিলের নীচে ভাঙা চায়ের পেয়ালা, ডিস। বেয়ারা সরাতে এলে তিনি তাকে ঘরে আসতে নিষেধ করলেন। আর সামনে হেনা ম্লান বিষাদের প্রতিমূর্তির মতো। কখনও ঘাড় হেঁট করে, কখনও চোখ দুটো স্বামীর চোখের দিকে স্থিরভাবে রেখে, পরমুহূর্তেই নামিয়ে ভয়ে ভয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে শেষ-পর্যন্ত এক অতিবিসদৃশ অসোয়াস্তির চেহারা হয়ে লেবড়ে থাকে চেয়ারে।

মদনকে দেখায় অগ্ন্যুৎপাত—শান্ত কিন্তু ধূমায়িত গিরি। সামনে একটা চায়ের কাপ উল্টে আছে। কিন্তু মদনের দৃষ্টি সেদিকে নেই। ঝিম মেরে বসে আছে তার ড্রেসিংগাউনের মাঝখানে তার ছোট পাখীর মতো মাথাখানা যতদূর সম্ভব সেঁধিয়ে।

স্বর্ণসুন্দরীই কথাটা তুলেছিলেন। ভবনাথ সুধীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাগানে যেতেই বললেন, মদন, তুমি যেও না, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

তারপর বিবর্ণ বড়মেয়েকে একবার প্রবল অবজ্ঞায় আপাদমস্তক দেখে বললেন, তুমি এসব কি করছো মদন? তোমার কি মাথাটাথা খারাপ হয়েছে?

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাকে বলছেন? মিহি সাবধানী গলায় মদন জবাব দেয়।

—তোমাকে না কাকে বলব? গৌরীকে ছেলে-মানুষ পেয়ে তুমি যা-তা করছো। তোমার লজ্জা করে না? ছিঃ!

প্রবল অবজ্ঞায় এবং অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তায় টলমল করেন স্বর্ণসুন্দরী। তাঁর ফর্সা মুখ রাঙা হয়ে ওঠে, কপালের ওপর চুলের গুছি এসে পড়ে। পাতলা ঠোঁট দুটো চেপে এমনভাবে মদনের দিকে চেয়ে থাকেন যে উত্তর দিতে গিয়েও উত্তর গলায় আটকে যায় মদনের। হঠাৎ বিকট চীৎকার করে মদন, আমি গৌরীকে ভালবাসি। গৌরী আমাকে ভালবাসে। ওকে ডাকুন। ও সবাইয়ের সামনে বলবে।

—চুপ করো, চুপ করো। ওসব ভালবাসার ঢং আর এ বয়সে সাজে না।

—আমার বয়স......

—তাছাড়া গৌরী আমাকে সব বলেছে। তুমি আমার বড়মেয়ের সঙ্গে জোচ্চুরি করেছো, আমার সঙ্গে করেছো, এখন গৌরীর সঙ্গে করতে চলেছো।

—বেশ করেছি, বেশ করেছি! জন্তুর মতো আওয়াজ করে সামনের বড় ডিশটা ঠেলে দেয় মদন, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা পেয়ালা ডিশ ঝন্ ঝন্ করে মেজেতে ভাঙে। মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় মদন।

—চমৎকার। আমার উপযুক্ত জামাই বটে! সাত হাজার টাকা যৌতুক দেওয়া জামাই। তুমি

এখন কি করবে মদন ? হেনার সঙ্গে থাকতে পারলে না, গৌরী তোমার মুখে—প্রবল অবজ্ঞায় প্রবল অসভ্য কথা বলে ফেলেন স্বর্ণসুন্দরী। মদনও স্তম্ভিত হয়ে যায়। তারপর নিজেকে সামলিয়ে বলে, গৌরীকে ডাকুন। ও নিজের মুখেই বলবে।

—তোমাকে বলতে হবে না। অ্যাদ্দিন ভাবতাম, তোমার মধ্যে পদার্থ আছে। তুমি যে তলে তলে মেয়েটাকে ফুসলাচ্ছো তা যদি জানতাম আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় তোমাকে ভিড়তে দিতাম না।

মদন লাফিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। —আমি এখনই চলে যাচ্ছি।

—দাঁড়াও। গৌরীকে ডাকি।

কাঠের সিঁড়ির হাতলে হাত ঘষতে ঘষতে গৌরী নামে। সে তখন আশ্চর্য রূপান্তরিত। মদনকে নিয়ে যে বিরাট টানাপোড়েন চলেছে তার জীবনে তা থেকে সে যেন সরে এসেছে। জীবনের এক পর্ব উত্তীর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে গৌরী। বর্তমান এখন স্মৃতিতে পর্যবসিত। তাই খাওয়ার টেবিলের সামনে গিয়ে সে অবলীলাক্রমে বলতে পারল, মা, ডাকছো ?

আর তার দিকে চেয়ে স্বর্ণসুন্দরীও চোখ কুঁচকান। একবার একটু ইতস্তত করে বলেন, তুমি, তুমি মদনকে ভালবাসো ?

গৌরীর পাতলা লাল ঠোঁটে হাসি খেলে।—বাঃ ভালবাসব না কেন ?

কিরকম প্রহেলিকার মতো তার এ আত্মজিজ্ঞাসা শোনায় তার মায়ের কাছে। মদনও তার সরু-গালটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয়। অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে স্বর্ণসুন্দরী চেঁচিয়ে ওঠেন, ছেলে খেলা কোর না গৌরী। আমি তোমাকে যা বলছি তার ঠিক জবাব দাও। মদনকে তুমি সত্যিই ভালবাসো ?

গৌরী এমনভাবে মায়ের দিকে তাকায় যে স্বর্ণসুন্দরী চোখ ফিরিয়ে নেন। এ যেন ঠিক সে নয় যাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করা গেছে, যাকে বুঝে দেওয়া যায় সবরকম, যার কষ্টে প্রাণ পাত করা যায় আর যার আনন্দ মনে হয় নিজেরই কীর্তি। গৌরীর চাহনিতে সেই একাত্মতা অনুপস্থিত। আর প্রত্যেক সন্তানের কাছেই প্রত্যেক জনক জননীর হেরে যাওয়ার সেই পুরনো নাটক নিজের প্রবল প্রতাপান্বিত জীবনে আবার ঘটতে দেখে স্বর্ণসুন্দরী প্রচণ্ড অস্থিরতা বোধ করেন। গৌরী মায়ের দিকে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে তাকায়। তাকে এই চায়ের টেবিলে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তার মা যে অপার ক্ষমাশীল বিচারপতির অভিনয় করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে সে কথা মনে করে তার ব্যঙ্গ আর প্রচ্ছন্ন থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে মদনের দিকে চোখ ফেরায় গৌরী। খুব ছোট্ট পুচুকে লাগে মদনকে আসামীর ভূমিকায়। গৌরী হঠাৎ হাই তোলে। দিদির দিকে এক নজর চেয়ে তাড়াতাড়ি বলে, মদন-দা খুব পণ্ডিত লোক, অনেক ব্যাপার জানে। কিন্তু কেমন যেন ! গৌরী হেসে ফেলে।

—বিচু ! মদন দাঁতের ফাঁক দিয়ে বললে।

—শুনলে তো, শুনলে ? স্বর্ণসুন্দরীর গলায় চাপা উল্লাস। তাঁর স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাস যেন ফিরে আসে।

আর গৌরী আস্তে আস্তে মায়ের পাশে চেয়ার টেনে বসে। হেনাও আতঙ্কে তার বোনের দিকে তাকায়। তাহলে স্বচক্ষে সে যা দেখেছে তা কি তার মতিভ্রম ?

—আর চা আছে ? আলগোছে কথাটা বলেই এক কাপ চা ছেঁকে নেয়। চায়ে চুমুক দিয়ে মদনের দিকে চেয়ে থাকে। আর সে রক্তে রক্তে বুঝতে পারে সময়ের কি প্রবল প্রতাপ। সময় এক-দিন তার শরীর এবং মদনের শরীর একত্রে বেঁধেছিল, তারপর সময়ের চাপেই সে বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। এখন সে মুক্ত। সেই নতুন মুক্তির আনন্দে গৌরী ভেতরে ভেতরে ঝলমল করতে থাকে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে মদন, আমি জানি গৌরী তোমার ঐ ঢ্যাঙা-টার দিকে নজর পড়েছে।

—মদন ! আমার বাড়িতে এ ধরনের কথা আমি সহ্য করব না।

—বেশ ! ঠিক আছে। বুলু, বুলু ! মদন লাফিয়ে উঠে মেয়ের নাম ধরে চেঁচাতে থাকে।

—বুলু তো বেড়াতে গেছে টুটুলদের সঙ্গে, নির্লিপ্ত গলায় গৌরী বললে।

—বেশ, আমি একলাই যাচ্ছি।

—আমিও যাব। হেনাও দাঁড়িয়ে ওঠে।

মেয়ে জামাই বেরিয়ে গেলে স্বর্ণসুন্দরী চুপ করে বসে থাকেন গৌরীর সামনে। নিজের কাছে

নিজের বয়েসটা আরও বেশী লাগে। গৌরী চুপচাপ চা খায়।

—চা ঠাণ্ডা না? একটা কিছু কথা বলবার জন্যেই কথাটা বলেন স্বর্ণসুন্দরী।

এবার গৌরীর হাসির রেখায় যেন মমতারও ছাপ আছে। কাপটা নিঃশেষ করে বলে, ঠাণ্ডা চা খেলে মা রং ফর্সা হয়।

পাতা ছাঁটার কাজ চলেছে। সবুজ সতেজ চা ঝোপের মখমল এক এক জায়গায় বেঁটে হাড়-গিলে ধোঁয়াটে চেটাল খোঁটার সারি। এরকম মুড়িয়ে নেড়া করে দেওয়া কাজ বুড়ীর অপছন্দ। বলে, এতোগুলো চায়ের পাতা কেন মিছিমিছি নষ্ট করছো সুধীরদা।

চা ঝোপ ছাঁটার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুধীরের মন্তব্য তার মনঃপূত হয় না। হাটতে হাঁটতে তারা এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ায়। পায়ে চলার রাস্তা জুড়েই নেপালী ছেলেমেয়েগুলো গোল হয়ে বসে জিরোচ্ছে, চায়ের সঙ্গে খাচ্ছে ভুট্টার খই। চোঙা পাশে দাঁড়াতে একটি তরুণ দুহাত জড়ো করে এক মুঠো খই দেয়। এরপর খানিক চড়াই উৎরাই। ডুয়ার্সের বাগান হলেও এ বাগানের একটা দিকে শ্যামল পাহাড়, জ্বালানির জন্যে গাছপালার ওপর আক্রমণ এখনও শুরু হয়নি। সেই ওঠানামা রাস্তায় অভ্যস্ত হাল্কা পায়ে সুধীর এগিয়ে চলে আর মাঝে মাঝে ভব-নাথের দিকে চেয়ে বলে, কাকাবাবু, অসুবিধে হচ্ছে না তো। ঐ যে আমাদের ফ্যাক্টরী দেখা যাচ্ছে। সবুজের মাঝখানে নতুন করোগেটের টিনের গাঢ় নীল রুপোলী রোদ্দুরে ঝলকায়। চোঙা আর টুটুল মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুধীরদাকে দেখতে থাকে। সাবালকত্বের এই গতিময় শক্তিমান চেহারা তাদের অভিভূত করে। কবে সুধীরদার মতো বড় হব এ চিন্তা চোঙা আর টুটুলের মনে এক অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা অর্জন করে। বেশ কয়েক বছর ধরে টুটুলের মনে যে স্বপ্নের জগৎ ছায়া ফেলেছিল, এমনকি লাটাগুড়ি জঙ্গলেও যা আবার ঘন হয়ে এসেছিল তা পালিয়ে যায়। ফ্যাক্-টরীতে চায়ের পাতা শুকানোর কলের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু সে কলকব্জাই দেখে না। এই বাগানের চায়ের পাতা ছাঁটাই, কলকব্জা চালানোর পেছনে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। গলাতোলা হলুদ পুলওভার পরা লম্বা লোকটা যে এই সব চালাচ্ছে সে এক কর্মজগতের নতুন নায়ক। চোঙাকে বলতে পারে না কিন্তু বুড়ীর গা ঘেঁষে ফিসফিস করে বলে, আমরা কবে এমন বড় হব দিদি?'

ভবনাথেরও ভাল লাগছিল। বড়মেয়ের বিয়েতে বরপক্ষের সাতহাজার টাকার বায়নার মতো এক্ষেত্রে নিশ্চয় কোন বায়না আসবে না। বড় মেয়ের বিয়েতে চোদ্দ হাজার খরচ হয়েছিল। গৌরীর বিয়ে নিশ্চয় আরও কমে সারা যাবে। তবে হাজার দশেকের কমে বোধহয় নামানো যাবে না। তাঁর সবচেয়ে প্রিয়কন্যাকে নিশ্চয় সবরকম দিতে থুতে চাইবেন স্বর্ণসুন্দরী।

—সামনের বছর ঐ টিলাটার ওপর আরও কয়েকটা কুলি কোয়ার্টার বানাচ্ছি, সুধীর তার সাদাপশমে ঢাকা ডান হাতখানা দিগন্তের একদিকে বাড়িয়ে দেয়।

—ঐ যে দেখছেন, ঐ বাগানটা—সানিভিউ—ওটা গত বছর কিনেছি।

এই বিস্তীর্ণ আকাশের নীচে সমস্ত জগৎটাই সুধীর-দার রাজত্ব—একথা একই সঙ্গে চোঙা আর টুটুলের মনে খেলে যায়। আর দিদির সঙ্গে বিয়েটা ঘটে গেলে তাদের এসব জায়গায় হামেশা যাতায়াতের সূত্রপাত হবে এ সম্ভাবনায় দুজনেই পুলকিত। ঢ্যাঙা ফর্সা রোগাটে, তার বাপমায়ের সম্পূর্ণ অমিল চেহারা। বুলু হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, আমিও তোমাদের সঙ্গে আসব টুটুলদা।

পরিতৃপ্ত ক্লান্তিতে সারা গা ভারী করে তারা ফিরতেই স্বর্ণসুন্দরী ভবনাথ ও পরে সুধীরকে খাটো গলায় কি সব বললেন। তারপর বুলুর ডাক পড়ে ওপর থেকে। আর কিছুক্ষণ পরেই বুলু আমি যাব না, কিছুতেই যাব না বলে কাঁদতে কাঁদতে নেমে আসে।

স্বর্ণসুন্দরী দোতলায় গিয়ে দেখেন বিদেশী শহরের লেবেল আঁটা নীল সুটকেস্‌খানা মদন গুছোচ্ছে। সেদিকে এক নজর চেয়ে বললেন, আমরা খেয়ে দেয়ে সবাই বেরোচ্ছি। এখান থেকে চামাচির কমলাবাগান, তারপর বাড়ি। কাল কলকাতা গেলেই চলবে।

—আমি হেঁটে ফিরব, মদনের গলায় আত্মপ্রত্যয়ের অভাব স্পষ্ট।

—জঙ্গলে অনেক বাঘ আছে। স্বর্ণসুন্দরী মদনের দিকে না চেয়ে বললেন।

পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে পাক খেয়ে অনেকটা ওপরে উঠে আসতে হয়। সামনে খাদ, উল্টো দিকে জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের চূড়োর গায়ে মেঘ। গাড়ি থেকে নেমে হঠাৎ ডান দিকে চোখ পড়ে কমলার বাগানের দিকে। বেঁটে গাছগুলো ঝুম ঝুম করছে ফলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিশোর-কণ্ঠের চেঁচামেচি ওঠে, ছুটোছুটি লেগে যায়। চোঙা আর টুটুল ক্রিকেট বলের মতো কমলা-গুলো ব্যবহার করে, গোপীনাথ এক লুঙ্গি ভর্তি করে কমলা জোগাড় করে। তাছাড়া রকমারি থলেতে লেবু গাড়িতে ওঠে। ফেরার পথে ডুয়ার্সের ফাঁকা, ম্লান, চাঁদঢাকা রাস্তায় আবার তীব্র গতিতে গাড়ি দৌড়য়। অনেকক্ষণ 'আজকে কী? চার্মার্চ' স্লোগানের মতো চেঁচিয়ে টুটুল আর চোঙার গলা ভাঙ্গা। ভবনাথের অনুরোধে গৌরী গান ধরে,

গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে।

যখন প্রায় মাঝ রাত্তিরে গেট পেরিয়ে গাড়ি বাড়ির সামনে এসে লাগল তখন শ্রান্তিতে ঘুমে সবাই টলমল। খুব বোঝা যাচ্ছিল না তাদের মধ্যে সেদিন সকালেই কোন বিভেদ বিরোধের নাটক অভিনীত হয়েছে। টুটুল যখন খাটে গিয়ে শোয় তখনও তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট হাসি খেলে। প্রায় ঘুমের মধ্যেই বিড়বিড় করে, আজকে কী? চার্মার্চ।

কালের কৌটিল্য ভবনাথকে স্পর্শ করেনি। মোটামুটি এক দৃঢ় নির্দিষ্ট সরল খাতে যৌবন জরা বার্ধক্য শৈশব কৈশোরের ধারা প্রবাহিত। এই আবহমানতায় কেউ যদি ডুবে থাকে তাহলে ভবনাথের মতে কপাল চাপড়াবার কারণ নেই কিংবা পরিবর্তনের জন্যে আঁকপাঁক করার কারণ ঘটে না। এই সরল নির্দিষ্টখাতে তার বংশধর প্রতাপের জীবন কেন বয়ে চলে না এ প্রশ্ন তাঁকে বিস্মিত ও আহত করে। উত্থান পতন সবই কালের লীলা একথাটা কোন গুরুজীর শিষ্য না হয়েও কি বোঝা যায় না?

আর কালের এই আবহমানতায় জীবনের এক নির্দিষ্ট ছক্ তাঁর মতে অপরিহার্য। এই ছকে যেমন উদ্দীপনার স্থান নেই তেমনি প্রয়োজন নেই উদ্ভ্রান্তির, কেবল মৃদু হাসি, অনুত্তেজ কণ্ঠ এবং এক কবোষ্ণ কৌতূহল নিয়ে এই উত্তপ্ত কোলাহলপূর্ণ জীবনের সামনে দাঁড়ানো ছাড়া মানুষের আর কি করণীয়? আর যেমন কোন কোন কবির কবিতা খোলে নির্দিষ্ট এক ছকের বন্ধনে তেমনি ভবনাথ তাঁর জীবনে এই নির্দিষ্টতায় মুক্তির স্বাদ পান। তাঁদের ছেলেমেয়েদের সময়ের চেহারা কি হবে তিনি জানেন না, তবে এটুকু আঁচ করেন তা হয়ত ভিন্ন শুধু নয় বিপরীত হতে পারে। হয়ত প্রতাপ কালের কৌটিল্যের প্রথম শহীদ। তাঁর অন্যান্য ছেলেদের কাছেও হয়ত তাঁর এই অতীত অনুত্তেজিত জীবননাট্য হবে বিদ্রূপের বস্তু। কিন্তু তিনি এই-টুকু বুঝেছেন মানুষকে বাঁচতে গেলে কালের আবহমানতায় আস্থা রাখতে হবে। অনবচ্ছেদ ভেঙে দেওয়ার জন্যে আঁকপাঁক করলে চলবে না।

তাই পরিবর্তনের বজ্রাভ দ্যুতি ভারতবর্ষের আকাশে আকাশে মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারলেও সেদিকে বেশীক্ষণ চোখ ফেরাননি ভবনাথ। যারা আসছে কিংবা আসবার চেষ্টা করছে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মারফত হোক গোলটেবিল বৈঠকের মারফতেই হোক তাদের তিনি জানেন না, চেনেন না, আগামীকে দিয়ে কোন ছক বাঁধা যায় না। কিন্তু অতীত বর্তমান নিয়ে বাঁধা যায় যেমন যায় ইংরেজের তৈরী আইনে, তার রাজ্যশাসনপ্রণালীতে।

কলকাতার বাড়ি সম্প্রতি আরও সাজিয়েছেন গুছিয়েছেন। এখন বেশ সম্ভ্রান্ত বাঙালী বাড়ির ছাপ এসেছে সেই চেহারায়। এক একবার ভাবেন এই সব কিছু ঢেলে দিয়ে বাড়ি বানানোর কি খুব বিশেষ অর্থ আছে? কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ভবনাথ মনে করেন কালের ইঙ্গিতেই তিনি পরি-চালিত যেমন পরিচালিত হয়ে তাঁর বাবা নিজেকে ঢেলেছিলেন পাবনা বাড়ির পেছনে। এক একবার তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকন্যাদের সঙ্গে তাঁর বয়সের ফারাকের কথা মনে আসে। ছেলেদুটো বড় হয়ে থাকলে অবসর গ্রহণের আগেই সাহেবসুবোদের ধরে কয়ে একটা কিছু করে দিতে পারতেন। এখন প্রতাপের খবর মানেই বিপর্যয়ের খবর। তবে এ সব চিন্তাতে তিনি মুষড়ে পড়েন না।

অবসর গ্রহণের পরও চাকরী করবেন। নেটিভ স্টেটে অনেকেই তো কাজ পাচ্ছে।

সেদিন সকালে ক্রসওয়ার্ড পাজল করছিলেন ভবনাথ। ছুটির দিনের সকাল। সাইকেলটা যথাস্থানে না থাকায় বুঝলেন পুত্রদ্বয় বেরিয়েছেন। বুড়ী পাশের ঘরে উইলিয়াম দ্য কঙ্কারারের পরাক্রম যে তর্কাতীত তাই গুন গুন করে পড়ছে আর মাঝে মাঝে নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচছে। একবার ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ভবনাথ, বাঁদরগুলো কখন বেরিয়েছে? তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই উইলিয়াম সেকসপীয়রের একটি বিখ্যাত উক্তি দিয়ে শূন্যস্থান পূরণে মনোযোগ দিলেন। ঘন্টাখানেক পরে যখন স্বর্ণসুন্দরী বেশ ভাবতে শুরু করেছেন ঠিক সেই মুহূর্তে সাইকেলের রডে টুটুলকে বসিয়ে চোঙা ফিরল। রোদ্দুরে তাদের মুখ লাল। ঘরে ঢুকেই চোঙা চেঁচিয়ে উঠল, মা সর্বনাশ। সুধীরদার পক্স হয়েছে।

স্বর্ণসুন্দরী বড়ি দিচ্ছিলেন। ডালবাটামাখা হাতেই উঠে এসে বললেন, সে কি?

—আমরা ঢুকতেই সুধীরদার মা বেরিয়ে এলেন। তারপর আমাদের বাইরে নিয়ে গিয়ে বললেন।

—কিরকম পক্স? ভবনাথও ভেতরের বারান্দায় উঠে এসে জিজ্ঞাসা করেন।

—ঠিক বলতে পারছি না। চোখ বন্ধ হয়ে গেছে, চেঁচাচ্ছে!

প্রথম কথাটা ঠিক, কিন্তু চেঁচাচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে কিছু শোনেনি চোঙা। কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব বুঝে কথাটা বলে ফেললে।

—বুঝেছি, বুঝেছি! এখনও বোধহয় সবগুলো বেরোয় নি, কষ্ট পাচ্ছে। তোমরা ছেলেরা জামা কাপড়গুলো বারান্দাতে খুলে রাখো। স্বর্ণসুন্দরী উঠে গিয়ে চিঠি লিখতে বসলেন সুধীরের মায়ের কাছে। বিকেলে চিঠির উত্তর এল। সাংঘাতিক স্মল পক্সে সুধীরের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। রোমকূপ কেটে রক্ত পড়েছে। বাঁচার আশা নাই।

দিন পনেরো পর চকোলেট রং-এর বিশাল শেভ্রলে গাড়িটা আবার টুটুলদের বাগানে এসে ঢুকল। এবার হুইলে বসে অপরিচিত চালক, বাজখাঁই গোঁফ, কপালে টিপ। ভবনাথকে সসম্ভ্রমে সেলাম করে দাঁড়িয়ে থাকল। সুধীরদার শ্রাদ্ধে নেমন্তন্ন।

গাড়িতে উঠে টুটুলের সব কিছু ভোজবাড়ির মতো লাগে। স্পিডোমিটারের কাঁটাটা ঠিক আগের মতোই আছে, আগাটা একটু চটা-ওঠা। আবার কি ডুয়ার্সের রাস্তায় গাড়ি ছুটছে?

থমথমে বাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামে। টুটুলের চোখ পড়ে একতলা বাড়িটার মাথায়। বিশাল সজনে গাছটা ফুলে ফুলে ঝলমল করছে।

কদিন যেতে না যেতেই শীতটা টপ করে কমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া ওঠে। বাড়িটার ওপর নীচে পাক খেতে খেতে হাওয়া ঘোরে। বোগেনভিলিয়ার রঙিন পাপড়ি দোতলার বারান্দায় উড়ে আসে।

টুটুল হাঁটুর চকলা উঠিয়েছে সাইকেল থেকে পড়ে। গৌরী গরম জল তুলো দিয়ে ঘা পরিষ্কার করছিল। বুড়ী একটি পত্রিকার পাতায় বিদেশিনীদের বেশভূষার পাতাখানা দেখছিল গভীর মনোযোগ দিয়ে। গেট খোলার আওয়াজ আসে। তারপর নুড়ির ওপরে সাইকেল চাকার শব্দ।

হাতে একখানা খাম নিয়ে ভবনাথ ঢুকলেন। গোপীনাথের জ্বর। স্বর্ণসুন্দরী লুচি ভাজছিলেন। ফুটন্ত ঘিয়ে ক্রমবর্ধমান লুচির দিকে চেয়ে ভবনাথ বললেন, আবার বাঁধাছাঁদা করো।

—এবার কোথায়?

—কলকাতায়।

কয়েকদিন পর ভোরের কুয়াশায় খোলা দুখানা ট্যাক্সিতে ভবনাথের পরিবার যখন শহরে ঢুকছিল, তখন টুটুল চোঙা জলপাইগুড়ির কথা প্রায় ভুলতে বসেছে। সাদা হাফপ্যান্ট-পরা এক ফিরিঙ্গি ছোকরা তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে সিগারেট টানছে। সেদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তারা চেয়ে থাকে। গৌরী খালি টুটুলের হাতে চাপ দিয়ে বললে, ভগবানকে ডাক্, আবার যেন আমরা কলকাতার বাইরে যেতে পারি।

দিন সাতেক যেতে না যেতেই রোদ চড়ে আর কলকাতার সেই চিরপরিচিত বসন্তকাল আসে

যখন ঘ্ুঁটেলেপা দাদের আর ইঁদ্রমারা বিষের বিজ্ঞাপন-আঁটা দেবদার্ গাছগ্লো হঠাৎ হলদে-সব্জ স্ট পরে ঝলমল করে হাওয়ায়। স্মৃতি ওড়ে ডাস্টবিনে শালপাতার ঠোঙায়, ভবিষ্যতের দিকে হাত বাড়াবার জন্যে কিশোর-কিশোরীদের মন ছলছল করে আর চল্লিশোত্তর মান্ষ নিজেদের বাল্যকালের দিকে চায়। এ রকম বসন্তে ভবানীপ্রের এক স্কুল থেকে কালীঘাট পার্কের সামনে নামে চোঙা আর ট্ট্ল। ট্রাম-বাসে ওঠা-নামা সম্পর্কে পাখী পড়ার মতো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের কিন্তু তব্ ট্ট্ল এখনও সবটা ধাতস্থ হয় নি। নেমেই তারা দৌড়য় বরফ কুচি আইস-ক্রিম্ খাওয়ার জন্যে। একটা গামছায় কয়েক ট্করো বরফ রেখে তাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে গ্ঁড়ো করে কাঠের সংগে লাগিয়ে লাল সিরাপ ছিটিয়ে যে এক পয়সার আইসক্রিম তা দ্'ভাইয়ের খ্ব প্রিয়। এ জন্যে তারা সবটা ট্রামে না গিয়ে মাঝপথে নেমে বাকী পথটা হাঁটে। ইতিমধ্যে একদিন পথে 'সাংগ্-ভ্যালি'-তে দ্ আনার ডবল ডিমের মামলেট দ্জনে ভাগ করে খেয়ে প্রচুর আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছে। রসাল বরফের কুচিগ্লো জিভে নাড়াচাড়া করতে করতে তারা দ্জনেই অবাক হয়ে খাওয়া বন্ধ করে ম্হ্র্তের জন্যে। গেটের কাছে চিনেবাদামওয়ালার সামনে বেশ বড়রকম ভিড়। ভিড়ের ভেতর থেকে একটা বিকট চীৎকার আসছে। টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম। দ্জনেই ভিড়ের দিকে এগোয়। হাতে হাতে লম্বা ইংরেজী খবরের কাগজের একটা পাতা। পাতা জ্ড়ে দ্দিকে দ্টো বিশাল ম্খ—চেম্বারলিন আর হিটলারের।

—এইবার বাছাধন জব্দ হবে। হিটলার যে সে লোক নয়! ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বললে।

—আমাদের কি হবে? আমাদের? আর একজনের গলা এল।

খাকি হাফশার্ট পরা কুচকুচে একটা কালো মোটাসোটা লোক। বোধহয় বাড়িম্খী ট্রাম কণ্ডাক-টর। চোখে পিচুটি, হাসিতে ম্খ উজ্জ্বল। এবং সে জন্যে কাঁচাপাকা গোঁফের নীচে গন্নাকাটা ঠোঁটের ভেতর থেকে দ্টো দাঁত ঝলকে ওঠে। হাম লোক পল্টন বনে গা, ভারী গলায় বলে লোকটা।

চোঙা আর ট্ট্ল ভিড় ঠেলে ভেতরের দিকে ঢ্কবার চেষ্টা করে। চোখে চশমাপরা এক য্বক ঘাড়ভর্তি কোঁকড়া চুল ঘ্রিয়ে ট্ট্লের দিকে তাকায়। তারপর অন্যমনস্ক ভাবে বলসে, —কোথায় য্দ্ধ হবে, আর কোথায় আমরা হট্টগোল করছি। ইংল্যান্ড জার্মানি য্দ্ধ করে কর্ক, আমাদের কি!

—আর কদিন বাদেই ব্ঝবেন আমাদের কি! মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক পাশ থেকে ফস্ করে বললেন। আরও গলা চড়িয়ে বললেন, —ইন্ফ্রেশান! ইন্ফ্রেশান!

—তার মানে?

—তার মানে? এই যে মাস মাস বিশটা টাকা মেসে ফেলে দিচ্ছো আর পোনামাছের ঝোল-ভাতটি হাজির হচ্ছে, এটি যাবে। হ্যাঃ।

কোঁকড়া চুলওয়ালা পরিচিত য্বকটির দিকে চেয়ে বললেন, জিনিসপত্তর সব মাগ্গি হয়ে উঠবে, ব্ঝলে? বাপের হোটেলে থেকে সাহিত্য চর্চাটর্চা আর চলবে না।

ঘামে ভিজে ম্খ লাল করে দ্ই ভাই ভিড় থেকে বেরিয়ে আসে অম্তবাজারের পাতাখানা হাতে নিয়ে। ট্ট্ল খানিকক্ষণ সেই বিশাল দ্খানা ম্খের দিকে চেয়ে থাকে। দ্জনেই প্রচুর তর্জন গর্জন করেছে। আর ছাপার হরফে সেই তর্জন গর্জন এত স্দ্র লাগে দ্ই ভাইয়ের কাছে যে তারা চারপাশের উত্তেজনার হদিস পায় না। পার্কে বাস্কেট বল খেলার তোড়জোড় চলেছে। হাতকাটা গেঞ্জিপরা ফর্সা একটি স্ঠাম তর্ণ শ্ন্যে সমস্ত শরীরখানা স্প্রিং-এর মতো ছ্ঁড়ে দেয় বল গোল আংটার মধ্যে ফেলার জন্যে। মেয়েরা দড়ি লাফায় আর সাদাকালো পমে-রিয়ান কুকুর নিয়ে এক বৃদ্ধ বৈকালিক ভ্রমণ শ্র্ করেন। এর ওপর হঠাৎ কি অনাগত ভবিষ্যৎ ছায়া ফেলেছে তা ব্ঝতে না পেরে বিহ্বলভাবে হিটলারের গোঁফের দিকে চেয়ে থাকে ট্ট্ল।

বাড়িতে ঢ্কেই কিন্তু পরিশ্রান্ত দ্'ভাই ছ্টতে ছ্টতে ওপরে উঠে আসে। মা, য্দ্ধ লেগেছে! য্দ্ধ! চোঙা চেঁচায়।

—সে আবার কি?

স্বর্ণস্ন্দরীর হাতে ছেলেমেয়েদের গরম জামা। বাক্সে তুলতে যাচ্ছেন।

—এই দ্যাখো, কাগজটা বাড়িয়ে দেয় চোঙা।

তারপর দুই নায়কের ওপর যখন তিনি চোখ বোলান তখন চোঙা আবার চেঁচায়, সব জিনিসপত্তর মাগ্‌গি হয়ে যাবে।

—বাবা কি যুদ্ধে যাবে? টুটুল জিজ্ঞেস করে।

—দূর। ওসব কিছু হবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

চতুর্থ পর্ব

দেহ নয় মন নয়, বিবাহ মানে নিরাপত্তা—একথা ভবনাথের অবসর গ্রহণের তারিখ যত এগিয়ে আসে ততই চারপাশের হাওয়া থেকে উড়ে আসে গৌরীর মনে। এখন গৌরী আর ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করে না, স্বপ্ন দেখে না, সে কেবল ভবিষ্যতের জন্যে তৈরী হয়।

তৈরী হওয়া মানে সিল্কের শাড়ী পরে স্নোপাউডার মেখে মাঝের ঘরে গিয়ে বসা। সেদিন বিকেলেও গৌরী তেমনি তৈরী হচ্ছিল। প্রথমে বুকটা একটু ধুকপুক করত, মুখ তার অজান্তে কঠিন অনুভূতিহীন দেখাত স্বর্ণসুন্দরীর চোখে নীরব ভর্ৎসনা সত্ত্বেও। কারণ স্বর্ণসুন্দরীর দৃঢ় ধারণা আই-পি-এস্‌ ছোকরা সুনীল সোম হাতছাড়া হয়ে গেল গৌরীর ঠ্যাঁটামিতে। গৌরীকে তার পছন্দও হয়েছিল, বেশ খানিকদূর এগিয়েছিল কথা বার্তা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে একবার দেখাসাক্ষাৎ করার ব্যবস্থাও হয়েছিল কিন্তু তারপর পাত্রপক্ষ চুপ মেরে যায়, লোক পাঠালেও সাড়া আসে নি।

আজকের পাত্র অবশ্য আরও শাঁসাল। বিজ্ঞানের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বছর দশেক হল আমেরিকাবাসী। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞানে জনৈক কেউকেটা। ছ সপ্তাহের ছুটিতে বিয়ে করতে এসেছেন দেশে।

—আমি কিরকম চাই জানেন? মডার্ন, আপ্‌-টু-ডেট কিন্তু ইন্‌ দ্য কোর অফ্‌ হার হার্ট শি মাস্ট বি ইন্ডিয়ান্‌। মানে, যাকে বলে ভারতীয়। শুকতো রাঁধবে আবার টেনিসও খেলবে। তাঁর লম্বা ফর্সা হাড়চওড়া শরীরের খাঁচাখানা স্বর্ণসুন্দরীর দিকে ফিরিয়ে ডক্টর বোস বললেন।

—আমার মেয়েও ঠিক ঐরকম, স্বর্ণসুন্দরী মুগ্ধদৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললেন। ডক্টর বোসের বয়স বোধহয় ছত্রিশ সাঁইত্রিশ, কিন্তু দেখায় তিরিশের নীচে। চুল-গুলো বড্ড উঠে গেছে কিন্তু মুখচোখের ভাব বেশ সজীব।

গৌরী ঘরে ঢুকতেই বোস তড়াক করে কোচ থেকে লাফিয়ে উঠে তাঁর লম্বা শরীর-খানা যথাসম্ভব দুমড়ে নমস্কার করলেন।

—আমার নাম প্রদীপ্ত বোস, নিজের পরিচয় দিলেন ডক্টর বোস।

গৌরী মৃদু হেসে বেতের চেয়ারখানায় বসে। কলকাতায় আসার পর গত এক বছরে তার চেহারায় যে পরিবর্তন সুরু হয়েছে তা খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ না করলে বোঝা যাবে না। তার সেই দামালে খেলোয়াড়ি চেহারায় ক্রমশঃ এক ক্লান্ত বিষণ্ণতা নামছে। এ পরিবর্তন তার মায়ের দৃষ্টি এড়ায় নি। সেজন্যেই তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন মেয়ের বিয়ের জন্যে। সেজন্যেই সম্প্রতি বাগবাজার বস্তির রেলকর্মচারী এবং পার্ট-টাইম বিয়ের ঘটক মুখার্জিবাবুকে এত আপ্যায়ন করে দোকান থেকে মিষ্টি আনিয়ে খাওয়াচ্ছেন। কারণ স্বর্ণসুন্দরী টের পান তাঁর মেয়ের সামনে যে মানসিক অনিশ্চয়তা তা বছরখানেক চললে গৌরবর্ণসত্ত্বেও তার চেহারা ক্রমে লেপাপোঁছা হয়ে যাবে। তখন বিশেষ আকর্ষণ থাকবে না।

মুখার্জি বাবুই এ সম্বন্ধ এনেছেন। মুখে মস্ত বড় ঊনবিংশ শতাব্দীর গোঁফ, ধুতির

ওপর চকোলেট রংয়ের শার্টপরা বছর পঞ্চাশের ভদ্রলোক সোফায় এককোণে বসে প্রবল-ভাবে থোড়া আন্দোলনে ব্যস্ত ছিলেন। আপাতত সে কাজে ইস্তফা দিয়ে সোজা হয়ে বললেন,—এসো মা, এসো মা, আমাদের প্রদীপ্ত হীরের টুকরো ছেলে। ওর বাবাকে চিনতাম, মাকে চিনতাম। নিজেই এসেছে। একেবারে পাগল!

স্বল্পপরিচয় কিংবা প্রায়-অপরিচয়কে অসামান্য গুরুত্বদানের যে সাফল্য তা মুখার্জি-বাবুর বরাবর আয়ত্তে। প্রদীপ্তের বাবা সাধারণ রেলকর্মচারী ছিলেন, বহুকাল আগে দেহ রেখেছেন। তবু মুখার্জিবাবু দাবী করেন যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল তাঁর সঙ্গে। তবে প্রদীপ্তর বিধবা মা যিনি শ্যামবাজার বালিকা বিদ্যালয়ে টিচারি করে ছেলে মানুষ করেছেন তাঁর সঙ্গে মেয়ের অভিভাবকরূপে দু-একবার মুখার্জিবাবুর পরিচয় ঘটেছিল বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে। প্রদীপ্ত বোসের এসব কথা একেবারে বিস্মরণ হবার কথা নয়, তাছাড়া তার বর্তমান রাজকীয় স্বাচ্ছন্দতায় বাল্যকালের স্মৃতি পীড়াদায়ক। একটু রূঢ়ভাবেই ডক্টর বোস বললেন,—মিস্টার মুখার্জি, আপনি একটু বাইরে যান। তারপর আত্মসচেতনভাবে তাঁর ভারী লাই-ব্রেরী ফ্রেমের চশমার ভেতর থেকে ভবনাথ ও স্বর্ণসুন্দরীর দিকে চেয়ে বললেন,—আমি একটু ওঁর সঙ্গে আলাদা আলাপ করতে চাই।

স্বর্ণসুন্দরী অবাক হলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হেসে বললেন,—বেশ তো। আমরা বুড়োরা এসবের মধ্যে না থাকলেই ভাল। আসুন মুখার্জিবাবু আমরা পাশের ঘরে বসি।

পাশের ঘরখানা মস্ত, সবুজ মোজেইক-করা ভবনাথের শোবার ঘর। ভবনাথ এক-পাশের ইজিচেয়ারখানায় বসেন আর উল্টোদিকে সিঙ্গাপুর বেতের বাহারে চেয়ারখানায় মুখার্জিবাবু অনর্গল বলে চলেন প্রদীপ্তের মায়ের অসামান্য চরিত্রগুণের কথা। ভবনাথ সবটাই বিশ্বাস করেন।

—আপনার কী সাবজেক্ট ছিল বি. এ-তে? বিজ্ঞ মাস্টারমশাইসুলভ প্রশ্ন করেন ডক্টর বোস।

গৌরী হেসে ফেলে। এতদিন বরের দাদা কাকা মামা, তার পিসী মাসী, এমনকি পাড়াসম্পর্কের শুভাকাঙ্ক্ষী দাদা এই জাতীয় লোকজনের প্রশ্ন শুনতে সে অভ্যস্ত ছিল। তারপর ভবনাথ নির্ঘাত বলবেন একটা গান করতে। তখন অর্গানে একটু বেশী গা দুলিয়েই তাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হবে। অথবা বৃদ্ধবৃদ্ধারা বলবেন কীর্তন গাইতে। তখন তাদের বারবার বাজানো ফাটা রেকর্ডে শোনা 'যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল, সখী গো', গাইতে হবে। এই একবছরের রুটিনে সে এখন অভ্যস্ত। মাঝখানে অবশ্য সরাসরি মোলাকাত হয়েছিল নিভৃতে তার পাণিপ্রার্থী আই. পি. এস্. ছোকরার সঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে হলদে ক্যানার ঝাড়ের পাশে লোহার বেঞ্চিতে। কিন্তু ঘাড়ের কোণে আব থাকায় ছোকরাটিকে নাকচ করে দেয় গৌরী।

—আপনি কি আমেরিকাতেই থাকেন বরাবর?

গৌরীর প্রশ্নের স্বাভাবিকতায় ভদ্রলোক বোধহয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এ নিয়ে দেড়মাসের ছুটিতে তৃতীয়বার পাত্রী দেখছেন। আর দুটো ক্ষেত্রেই তাঁর তৈরী করা প্রশ্ন-বাণে বিপন্ন শাড়িগয়নার পুঁটলি থেকে এ মেয়েটির প্রভেদ টের পান।

—হ্যাঁ, আমেরিকাতেই থাকি। ওখানে...মানে গুণের কদর আছে। এখানে আমাদের কে চায় বলুন?

—আপনার অসুবিধে হয় না?

—হয় না যে তা নয়, কিন্তু যে এমাউণ্ট অফ্ কম্ফার্টস্ আমরা পাই তা আপনারা ধারণা করতে পারবেন না। যেখানে আমরা থাকি সেখানে...

গৌরী কিছুটা কৌতূহলী হয়েই ভদ্রলোকের আমেরিকাবাসের বর্ণনা শোনে। ভদ্রলোকের দেহের গড়নের সঙ্গে সুধীরের লম্বা চেহারার মিল অনেকখানি। কিন্তু চুলের অভাব এবং বেশ কয়েকবছর ধরে গুরু দায়িত্বের চাপ মুখে যে রাসভারী প্রলেপ দিয়েছে তা থেকে সুধীরের কোমল মুখচ্ছবি আলাদা। ডক্টর বোস গল্প করেন তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের কথা, গাড়ি বাড়ি শুধু নয় কাজ করবার সমস্ত সুযোগ সুবিধের কথা। কিন্তু সেসব কথা কানে ঢোকে না গৌরীর। তার মনে হতে থাকে, এও তার জীবনে হয়ত এক চাবাগানের ক্ষণিক স্বপ্ন যেমন সে ভেবেছিল নিজেকে সুধীরের সঙ্গিনীরূপে।

—এখানে আপনাদের ইউনিভার্সিটিতে লাইব্রেরী কটা পর্যন্ত খোলা থাকে?

ভদ্রলোকের প্রশ্নে গৌরী অবাক হয়। লাইব্রেরীতে কয়েকবার গিয়েছে বটে আড্ডা মারবার জন্যে কিন্তু কখন বন্ধ হয় খোলে একথাগুলো জেনে রাখা প্রয়োজন বোধ করে নি।

—বড় জোর সন্ধ্যে পর্যন্ত, এই তো? আর আমাদের ওখানে সারারাত। সারারাত আপনি লাইব্রেরী ফেসিলিটি পাচ্ছেন। বলুন তো, কত বড় সুবিধে।

ফর্সা চওড়া কবজির ওপর বিশাল দামী ঘড়িটা হাত নাড়াতেই চকচক করে ওঠে।

যদিও তার নিজের মানসিকতার দিক থেকে একেবারে সুদূর, এও আর একটা ডুয়ার্সের চাবাগানের নৈস্তব্ধ্য কিন্তু তবু মুখ ফুটে গৌরী বললে,—সত্যি?

—আর কাজের সুবিধে? আপনি যা ইকুইপমেন্ট চাইবেন এনে দেবে।...টিচার্সস্টুডেন্ট রিলেশান? না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না।

ডক্টর বোস যতক্ষণ তাঁর স্বর্গরাজ্যের বর্ণনা দেন ততক্ষণ আপাতদৃষ্টিতে মনোযোগে মগ্ন শ্রোতাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বক্তাকে দেখতে থাকে। কোনো আব বা ঐ ধরনের কোনো শারীরিক খুঁত নজরে পড়ে না, যদিও চুলটা মাথায় আর একটু থাকলে ভাল হত। গালের দুদিকে দুটো মোটা দাগ নেমেছে, সে দাগ অভিজ্ঞতার কিংবা বিচক্ষণতার হতে পারে কিন্তু স্বামী হিসেবে গৌরীর মতে কিঞ্চিৎ অপ্রয়োজনীয়। চোখ দুটো ভাল। লোকটা ভালমানুষ, অন্তত তার জামাইবাবুর থেকে। ঠিক এই কারণেই হয়ত চার পাঁচ বছর আগে গৌরী খারিজ করে দিত এ ভদ্রলোককে। কিন্তু এ ক বছরের অভিজ্ঞতায় সে একটু ক্লান্ত। স্বামীর ভালমানুষামির ওপর নির্ভরতা খুঁজে না পেলে তার পক্ষে এত তাড়াতাড়ি বিদেশ যাত্রার ঝুঁকি নেওয়া দুষ্কর।

তাঁর যে পেপারটা বিশ্বজ্জনমহলে খুব তারিফ পেয়েছে ভদ্রলোক সে প্রসঙ্গ তুলতেই গৌরী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে,—আচ্ছা, আপনার কোন বান্ধবী ছিল না?

—বান্ধবী? কী করে বুঝলেন?

গৌরী হেসে ফেলে।—এই তো, আপনার কথাতেই বুঝলাম!

ডক্টর বোস অপ্রস্তুতভাবে বললেন,—বাঃ! আপনি ভাল ডিটেকটিভ হতে পারতেন।

—কী নাম তার? গৌরী সামনে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করে। স্পষ্টত ভদ্রলোকের যশগৌরবের চেয়েও বান্ধবী সম্পর্কে গৌরীর উৎসাহ প্রবল।

—নাম?...মানে এডিথ। ডক্টর বোস একটু ইতস্ততঃ করে বলেন। হঠাৎ এই অপ্রাসঙ্গিক কথাকে তাঁর শ্রোতা কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছে বুঝতে পারেন না।

—এডিথকে কেন বিয়ে করলেন না? এমন হাসিমুখে দুম্ করে প্রশ্ন করে বসে

গৌরী যে ভদ্রলোক বুঝতে পারেন না তাঁর চটা উচিত কিনা।

—অবশ্য আপনার যদি আপত্তি থাকে...হাসি আর কপট সংকোচ মিশে গৌরীকে খুব আকর্ষণীয় লাগে।

—না না আপত্তি আর কি...বিশেষ করে আপনার কাছে...আপনার তো একটা রাইট আছে এ বিষয় প্রশ্ন করার। আপনি বোধহয় জিজ্ঞেস করতে চাইছেন আমার কোনো পিছু-টান আছে কিনা, মানে আমি ক্লিন স্লেটে আবার আমাদের জীবন...সরি, আমার জীবন,... শুরু করব কিনা।

চাপা উত্তেজনা ভদ্রলোকের গলায়। আর গৌরী টের পায় তার সম্পর্কে এই আমেরিকা-বাসী সম্পূর্ণ আগন্তুকের আগ্রহ। আরও এক কপট সংকোচে সে ছলছল করে,—না না, বন্ধু হিসেবেও না, একজন সাধারণ পরিচিত লোক হিসেবে...

—না না, মিস্ চৌধুরী, বন্ধু নয় কেন? আপনার সংগে আমার সম্পর্ক কি শুধুমাত্র পরিচয়ের?

ভদ্রলোক যে এত তাড়াতাড়ি নিজেকে ধরা দেবেন এভাবে গৌরী তা ভাবে নি। বিশেষ করে দশ বছরের বিদেশবাসে বিদেশিনীদের সংগে সম্পর্ক তাঁকে আরও তৈরী করেছে বলে তার বিশ্বাস জন্মেছিল। অথবা এও হতে পারে—গৌরী হিসেব করে মাথা নীচু করে ডক্টর বোসের চকচকে আমেরিকান জুতো জোড়ার দিকে চেয়ে চেয়ে—লোকটা হয়ত অনেক ঘাটের জল খেয়েছে, আর বিচার বিবেচনা ভ্রূক্ষেপ না করে প্রথম পরিচয়ের সামান্য ভাললাগার তৃণখণ্ড ধরেই ঝাঁপ দিতে চায় ভবিষ্যতের অকূল দরিয়ায়।

—আমি একটা সাধারণ প্রশ্ন করেছিলাম আপনাকে, এডিথকে কেন বিয়ে করলেন না?

ভদ্রলোক সোফায় সোজা হয়ে বসলেন।—আসলে কি জানেন মিস্ চৌধুরী, ওরা ঠিক আমাদের মতো ম্যারিং টাইপ নয়।

গৌরী খলখলিয়ে হেসে ওঠে।—আর আমরা? আর আমরা ডক্টর বোস?

—আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন?

—না না, সত্যি জিজ্ঞেস করছি।

ডক্টর বোস হঠাৎ দাঁড়ালেন। একটু মনমরাই দেখাল তাঁকে। বললেন—আচ্ছা মিস্ চৌধুরী, আজ উঠি। রাত হয়ে যাচ্ছে।

গৌরীও দাঁড়িয়ে উঠলে। ভাবলে বলবে কিনা, বসুন না, তাড়া কিসের? কিন্তু বুঝতে পারলে না, তার পক্ষে বলা ঠিক হবে কি না। ডক্টর বোস বেশ একটা সৌজন্যের নিরেট আবরণ দিয়ে নিজের চারপাশ ঘিরেছেন। তার বাইরে নিজেও যাবেন না, অন্যেরও প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু এরকম বাধা নিষেধের মধ্যে আলাপ করতে গৌরী অনভ্যস্ত। অন্য-দিন যখন পাত্রপক্ষকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে গা দুলিয়ে অর্গ্যান বাজিয়ে রবীন্দ্রসংগীত করে তখন এসব প্রশ্ন ওঠে না। তখন তার নিজের সত্তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সে একটি অন্যতম পারিবারিক কর্তব্যে রত থাকে। কিন্তু ডক্টর বোসের সংগে আলাপ করতে তার ভালই লাগছিল। টপ্ করে তাঁর বিদায় নেওয়াতে সে বিহ্বল বোধ করে।

স্বর্ণসুন্দরী পাশের ঘরে আড়ি পেতেছিলেন। ডক্টর বোস চলে যাবার পর মেয়েকে একা পেয়ে বললেন,—ছিঃ ছিঃ। এমন একজন গণ্যমান্য লোককে তুই এরকম তেল্লাফেচাং করলি! তোর আর বর জুটবে না।

গৌরী আহত হয়ে বললে,—তোমার এই দোষ দেওয়ার অভ্যেসটা এখনও গেল না।

সে রাত্তিরে ভাল ঘুম হল না গৌরীর। কলকাতায় মাঝে মাঝে যে ভ্যাপসা গরমের রাত আসে যখন ফ্যানেও হিল্লে হয় না সেইরকম দম্‌আটকানো গুমোট রাত। গৌরী মোটামুটি বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা। আবার নতুন পাত্র ধরার জন্যে রাজভোগ খাওয়াবেন মুখার্জীবাবুকে তাঁর মা। কারণ প্রদীপ্ত বোস বোধহয় ফস্‌কালো।

আর ফস্‌কে গিয়েছে ভালই, গৌরী চিন্তা করে। তুমি খুব স্মার্ট হবে, মেজাজে আধুনিক হবে কিন্তু আমার মনের যে ধারণাটুকু তার চৌহদ্দীর মধ্যেই থাকতে হবে, তার বাইরে চলে গেলেই তোমাকে আমি চিনি না, জানি না,—ডক্টর বোস তাঁর হাবে ভাবে এই কথাটাই তাকে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু যা আগে কখনও হত না, এখন তাই হয়। গৌরীর মধ্যে এখন অপরাধীর ভাব জেগে ওঠে। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা সে এতদিন ভেবে এসেছে তাকে আরও আকর্ষণীয় করেছে অন্যদের থেকে তাই তার ভবিষ্যতের প্রতিবন্ধক, উঠতে বসতে স্বর্ণসুন্দরীর এই অনুযোগ সে আগের মতো একেবারে ফেলে দিতে পারে না।

সকাল সকাল গৌরী চানের ঘরে ঢোকে। আচ্ছাসে সাবান দিয়ে রগড়ে রগড়ে চান করে যেন তার সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সাবান জলে ধুয়ে মুছে তাদের মাঝের ঘরে আর এক আগন্তুকের জন্যে লেপাপোঁছা হয়ে বসতে পারে।

রোদ্দুরে তোয়ালে দিয়ে চুল ঝাড়ছিল গৌরী এমন সময় উত্তেজিতভাবে ঢুকলেন স্বর্ণসুন্দরী।—এই আয়, তোর ফোন। ডক্টর বোস ফোন করছেন। শিগ্‌গির। এমন উষ্ণতায় রাঙা দেখায় স্বর্ণসুন্দরীকে যেন তাঁরই কোন পাণিপ্রার্থী ডাকছে তাঁকে।

—হ্যালো মিস্ চৌধুরী! আমি প্রদীপ্ত...ডক্টর বোস বলছি।

—হ্যাঁ বলুন।

মুহূর্তের জন্যে চুপ। তারপর অপ্রস্তুত হাসির ভূমিকা নিয়ে কথা ভেসে আসে।—কাল হঠাৎ উঠে পড়েছিলাম। আপনার মাকে বলে আসতে পারি নি।

—মার সঙ্গে কথা বলবেন? ডেকে দেব?

—না না, দরকার নেই। মানে, আজ কি আপনি ফ্রি আছেন?

—মানে?

—মানে কোথাও এন্‌গেজমেন্ট আছে সন্ধ্যেবেলা?

নিঃশব্দ হাসিতে টোল খায় গৌরীর গাল। ভাগ্যিস ফোনে আলাপ, গৌরী ভাবে। এক মুহূর্ত চুপ করে বলে,—না, কোথায় আবার যাব? আমাদের সময়ের অত দাম নেই।

—এটা কী বলছেন! আমি বলছিলাম কি, আজ একটা ছবি দেখে আসি চলুন। ভাল ছবি হচ্ছে মেট্রোতে। চার্লস্ বয়ার আছে. নেপোলিয়ানের লাইফ।...অবশ্য আপনার যদি আপত্তি থাকে...তাহলে অবশ্য...

গৌরী উত্তর দিতে আবার একটু সময় নেয়। একবার মনে হয় যদি এই প্রস্তাবটা আসত এমন এক ডক্টর বোসের কাছ থেকে যার বয়স আরও দশ বছর কম তাহলে মন্দ হত না। এখন কেমন এক কাকাবাবুর সঙ্গে সিনেমা দেখার মতো লাগবে তার। কিন্তু...কী আর করা যাবে!

—আমি যেতে পারি। নীচু গলায় গৌরী বলে।

—থ্যাঙ্ক ইউ। আমি তাহলে আসছি সন্ধ্যেবেলা।

—আসুন।

বিকেল হতে না হতেই স্বর্ণসুন্দরী উত্তেজনা বোধ করেন। হাঁক ডাক লাগিয়ে দেন।

বস্তুতঃ এরকম উত্তেজনাই তাঁর বাঁচার অন্যতম রসদ। বড় ছেলে প্রতাপ, জামাই মদনকে নিয়ে বারেবারে উত্তেজনার ঝড় উঠেছে. এখন সে ঝড় প্রশমিত। স্বামীও অস্তাকাশে। এক্ষেত্রে বনং ব্রজেৎ-এর ভাব স্বর্ণসুন্দরীর মোটেই নেই। তাই মেয়েকে পরানোর জন্যে যখন জ্যাবড়া কানবালা নিয়ে গরমে হাঁসফাঁস করেন তখন মায়ের কান্ড দেখে গৌরী মুচকি হাসে।

—ওটা মাঝের ঘরের জন্যে। আমি না কানের ড্রপ-টা পরছি।

—তোর যা খুশি করগে. কিন্তু মনে রাখিস...

—কী মনে রাখব মা ?

—তোমার সঙ্গে তক্ক করব না মা। এটুকু বলছি, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না।

—একটা আব আছে মা, কানের পাশে। তুমি দেখো নি ?

—অসম্ভব ! মিথ্যে কথা বলিস নে। আমি এই চুনের দেয়াল সাক্ষী করে বলছি...

মাকে জড়িয়ে ধরে গৌরী। আলিঙ্গনে আবদ্ধ উত্তেজনায় অভিভূত স্বর্ণসুন্দরীকেই মেয়ের মতো দেখায়। কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন—তুই আর বাগড়া দিস নে। আবার ঐ বিট্‌লেটাকে রাজভোগ খাওয়াতে হবে। আবার পাত্রের সন্ধানে হাপিতোশ করে বসে থাকতে হবে,...আর এরা ভদ্রলোক। যৌতুক বলে এক পয়সা নেবে না। হাবে ভাবে আমাকে বলেছে প্রদীপ্ত। ও তোর দিকে ঝুঁকেছে, বুঝতে পারছিস না ? কী হাবলি মেয়ে বাবা !

নেপোলিয়নের জীবনে যা ছিল সম্ভবত তিল তাই তাল করে হলিউড এক ভীষণ নাটুকে কাঁদুনে ছবি ছেড়েছে বাজারে। নেপোলিয়নের প্রাক্তন প্রণয়ী এখন বৃদ্ধা, তার স্মৃতির জাবর কাটছে। হলশুদ্ধ মহিলাদের ফোঁসফোঁসে গৌরীও যোগ দেয়। প্রদীপ্ত বোসের ইন্টারেস্ট নেপোলিয়নে নয়। অন্ধকারে আবেগ-উচ্ছ্বসিত তরুণীটির হাতে মৃদু চাপ দেন তিনি। গৌরী প্রথমে হাত সরিয়ে নিয়েছিল তারপর আপত্তি করে না। আর এ বয়সে তারুণ্যের প্রথম যুগে ফিরে যেতে নিজেরই অসুবিধে হয় প্রদীপ্ত বোসের। দেড়মাসের ছুটির মধ্যে আর তিন সপ্তাহ বাকী আছে। এর মধ্যে একটা এসপার ওসপার করে নেওয়া দরকার। প্রদীপ্ত বোস বুঝতে পারেন তাঁর আর পাত্রী দেখবার ক্ষমতা নেই। মা বেঁচে থাকলে আর বয়স তিরিশের নীচে থাকলে যে পদ্ধতিতে ভাতডাল খাওয়ার মতো অবলীলাক্রমে বিয়েটা ঘটে যায় সেই অবলীলাক্রম তাঁর জীবনে আর ঘটবে না। কাজেই গৌরীর যদি আপত্তি না থাকে তাহলে গৌরীই তাঁর ভাবী স্ত্রী। সামনে দুজন শ্বেতাঙ্গিনীর পেছনে পেছনে চোখ লাল করে গৌরী যখন হলের দরজায় ঘরমুখী মানুষগুলোর শোভাযাত্রায় এসে দাঁড়ায় তখন অন্ধকারে তাঁর কমবয়সী অভ্যাসের দরুন আত্মগ্লানি কাটিয়ে ওঠেন ডক্টর বোস।

তারপর চীনে রেস্তোরায় চিকেন চাওমিয়েন ও সুইট সাওয়ার প্রন।

প্লেট অর্ধেক হতে না হতেই ডক্টর বোস প্রশ্ন করেন,—আচ্ছা মিস্ চৌধুরী, আপনি কি...মানে আপনার আমার সম্পর্কে...কতগুলো ঝুলন্ত নুডল মুখের মধ্যে চালাতে চালাতে নিজের অপ্রস্তুত ভাবখানা কাটাবার চেষ্টা করেন।

—ছবিটা বেশ, না ? চার্লস বয়ার গ্রেট !

নেপোলিয়নের কথায় হঠাৎ প্রদীপ্ত বোস বলে ফেলেন এডিথের কথা। বললেন, এডিথের নিজের পড়াশোনায় মন ছিল না কিন্তু ওর মাস্টার ছিলেন ইতিহাসে দিকপাল।

—আপনি এডিথকে ভালবাসতেন ?

ভদ্রলোকের খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এ প্রশ্নে যে তাঁর সাজানো বাগান পুড়িয়ে ফেলার

মতো আগুনের হল্‌কা প্রচ্ছন্ন তা টের পান। তবে ভাবী স্ত্রীর কাছে নৈতিক সততার প্রশ্নটা একেবারে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—অনেকদিন হয়ে গেল, ও বোধহয় বাসত। ঠিক মনে নেই।

—আপনি? নিশ্চয় এখন না বলবেন! আবার চাপা বিপজ্জনক হাসি খেলতে থাকে গৌরীর সারা মুখ জুড়ে।

—আপনার কাছে আমি লুকোব না। আপনাকে অন্তত বলব...খুব ভাবগম্ভীর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভদ্রলোকের মতো শোনায় তাঁর গলা।—কিন্তু তার আগে বলুন, আমাকে আপনার মানে...

মুহূর্তে তাদের মাঝের ঘরের দৃশ্য গৌরীর মনে খেলে যায়। মুখার্জীবাবু আবার রাজভোগ খাচ্ছেন, সে আবার সেজেগুজে প্রতীক্ষা করছে। তাড়াতাড়ি বলে,—যদি বলি হয়েছে...,যদির-ওপর জোর না দিয়ে।

—থ্যাঙ্ক ইউ! ভদ্রলোক প্লেটটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে চেয়ারে পিঠ দিয়ে বসেন। তারপর আস্তে আস্তে বলেন,—এডিথ আমার কাছে আসত, তেমনি স্যামের কাছেও যেত। তারপর ইজিপ্টে চলে গেল অ্যানথ্রপলজিকাল প্রোজেক্টে। আসলে ঠিক বিয়ে করবার মতো সে ছিল না।

—নইলে?

—ডোন্ট বি নটি! শুধু নিজেই প্রশ্ন করছেন। আর আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন। আর পছন্দ অনেকেই অনেককে করে মিস্ চৌধুরী। কিন্তু তার ভিত্তিতে তো...আমি চাই যার সঙ্গে ঘর বাঁধব সে আমাকে রেস্‌পেক্ট করে। সেই জন্যেই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলাম।

ভদ্রলোক চুপ করে যান। একটু আত্মসচেতনভাবে কফির পেয়ালায় চুমুক দেন।

গৌরীও কিছু বলে না। মাথা নীচু করে কফি পান করে। অনেক কথা একসঙ্গে মনে এসে যায়। ঠিক গুছিয়ে ভাবতে পারে না তবে ভালবাসা মানে যদি প্রবল আকর্ষণ বোধ হয় তাহলে তার জামাইবাবুকেই সে ভালবেসেছে। কতখানি মন কতখানি দেহ এভাবে সে ভাবতে পারে না। বিশেষ করে 'রেসপেক্ট' কথাটায় তার হাসি পায়। ডক্টর বোসকে সে নিশ্চয় শ্রদ্ধা করে আরও অনেকের মতো, লোকে যেমন মাস্টারমশাইকে শ্রদ্ধা করে, জ্যেঠা-মশাইকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণসুন্দরীর সাবধানবাণীও তার কানে আসে। আর হাতের লক্ষ্মী যাতে পায়ে ঠেলার বিপদ না ঘটে সেজন্য মাঝে মাঝে ডক্টর বোসের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। একবার হাতঘড়িটার দিকে তাকায়।

—'বড্ড দেরী হয়ে গেল, না?' ডক্টর বোস বিল দেবার জন্যে ভারী গলায় হাঁক দিলেন।

এরপর দিন তিনেক চুপচাপ। কোনো সাড়াশব্দ নেই। গৌরী তো মনে মনে অপ-মানিত বোধ করে। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণসুন্দরীর উপদেশের ঝড় বইতে থাকে। এমনকি ভবনাথ যিনি সাতে পাঁচে থাকেন না তিনিও রাইটার্স বিল্ডিং থেকে ফিরে ঘামে ভেজা তসরের কোট ছাড়তে ছাড়তে নীচু গলায় বললেন মেয়েকে,—তোর সঙ্গে প্রদীপ্তর কি কোনো কথা হয়েছিল?

সন্ধ্যের পর মুখার্জীবাবু এলেন। সশব্দে ঠাণ্ডা দই খেতে খেতে বললেন,—গিয়েছে, ভালই হয়েছে। আপনি কিছু ভাববেন না, মা। ওর থেকে আরও অনেক ভাল পাত্র আমার

হাতে আছে। তারপর গোবরডাঙা না পটলডাঙার জমিদারের একমাত্র পুত্র, রেলের এ-টি-এস, রাজপুত্তুরের মতো চেহারা, পোর্ট কমিশনার্সের কভেনান্টেড অফিসার, কয়লাখনি সম্রাটের নাতি থেকে শুরু করে সিলেটের নামজাদা তরুণ ব্যবসায়ী এবং বালিগঞ্জের মস্ত বাড়ি-ওয়ালার পাইলট পুত্র সবকটার ইতিহাস আদ্যোপান্ত বলে গেলেন। এবং বলে গেলেন এমন-ভাবে যেন তাঁদের সঙ্গে তিনি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন। যেমন, 'গত রোববার মনা মিত্তির ডেকেছিল। ওর ভাই আমার সম্বন্ধী। আমি বললাম মনাকে—ওরকম প্রিন্সের মতো ছেলের চেহারা, পঁচিশ বছর বয়সে পনেরোশো টাকা মাইনে, গাড়ি, তোমার ছেলের বিয়ের ভাবনা ?' অথবা 'লাহোরে ওর বাবা সেট্‌ল করেছে। ওখান থেকে লিখেছে,' বলে পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বার করে কী খুঁজতে খুঁজতে হতাশভাবে বললেন, 'যা ভুলো মন, ফেলে এসেছি চিঠিটা! ছেলে এ-টি-এস্ হয়েছে কিন্তু তাই বলে কোনো খাঁই নেই। ছেলেটাকে বলতে গেলে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি।'

স্বর্ণসুন্দরী মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে থাকেন। কিন্তু পাশের ঘর থেকে এ কথো-পকথন গৌরীকে ক্লান্ত করে অপরিসীম। এইরকম জনৈক দিকপালের সম্বন্ধ এনেছিলেন একদা মুখার্জীবাবু। নিকষ কালো বৃদ্ধ ভদ্রলোক, বোধহয় পাত্রের জ্যেঠামশাই, গৌরীর গান শোনার পর হঠাৎ পাশ থেকে তার হাতখানা টেনে নিয়ে ঘষতে শুরু করলেন কব্জির অগ্রভাগ। গৌরীর চোখে জল এসেছিল। দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সবাইকে হতভম্ব করে দেয়।

এমন বেজার লাগে গৌরীর যে ভাইদের নিয়ে ক্যারম্ খেলাটাও জমে না। বিশেষ করে চোঙা যখন প্রশ্ন শুরু করে, এমেরিকাতে কি ক্যারম্ খেলা হয়? কিংবা টুটুল বলে, —এবার পুজোয় আসবে না? তখন এই রঙ্গভরা বসুন্ধরা তাকে আরও বেজার করে তোলে।

পরদিন সকালে খালি ঘরে ফোন বাজছিল। গৌরী ফোন তুলতেই ডক্টর প্রদীপ্ত বোসের গলা ভেসে আসে,—হ্যালো মিস্ চৌধুরী?...ও...আচ্ছা, আপনাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম। আপনি কি সত্যিই...? মানে আপনি হয়তো ভাবতে পারেন আমি যাচাই করছি, আপনার হয়ত সিলি লাগবে! মানে, আমার পজিশন যেন ইন্‌ফ্লুয়েন্স করে না আপনার ডিসিশন...আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না হয়তো, বাট আই মিন্ সীরিয়াসলি...

আবার এক অপরিসীম ক্লান্তিতে অবশ হয়ে আসে গৌরীর মন। এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়, সেদিন প্রেক্ষাগৃহে হাতে হাত রাখাও। ডক্টর বোস একটু ভালবাসা-ভালবাসা খেলতে চান। এবং ক্লান্ত লাগলেও গৌরীকে তাই খেলতে হবে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে গৌরী বলে ওঠে,—এটা কী বলছেন ডক্টর বোস? আপনার কী পজিশন আমি তা কিছুই জানি না। কিছু জানার দরকার আছে—বলুন? গৌরীর গলায় হাসি জলতরঙ্গের মতো বেজে ওঠে।

তার এই হাসিই শেষ পর্যন্ত ডক্টর বোসের দোমনাভাব ঝেড়ে ফেলতে সাহায্য করে।

—তাহলে, তাহলে,...আমাদের বিয়েতে আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?

—আপনি কিছু বোঝেন না! গৌরী আবার হেসে উঠল।

—থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ।

গৌরীর হাসি তাঁর কানে বাজতে থাকে। এবয়সে সংসার পাতবার ভরসা দেয় বিদেশে ভারতীয় গবেষকদের অন্যতম পথিকৃৎ ডক্টর প্রদীপ্ত বোসকে।

[ক্রমশঃ]

চতুরঙ্গ উপন্যাসের শিল্পকৃতি

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশশো এগারো থেকে একুশের মধ্যে বাংলাদেশের নাগরিক যুবমানসে বেঁচে থাকার প্রকার প্রকরণ প্রত্যয় ও পুরুষার্থ ধীরে ধীরে পাল্টাতে শুরু করে। বলা যেতে পারে ঊনবিংশ শতকের বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের ক্ষণায়ু স্বর্ণযুগের প্রত্যাবর্তন যে আর সম্ভব নয় এ বোধ দৃঢ় হয়ে ওঠে। ক্ষুদিরামের বিস্ফোরিত বোমাই সমাপ্তি ঘোষণা করল 'বঙ্গীয় ভিক্টোরিয়ান'দের ভ্রান্ত স্টেবিলিটিসাধনার। এই সময়েই বাঙ্গালি যুবক সেই অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে চেয়েছে যা তার বর্তমানকেও গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল। একই সঙ্গে সে গভীরের দিকে ঝুঁকেছে—নিজের স্বজ্ঞায় মেলাতে চেয়েছে ভাবনা এবং বাস্তবের দুই প্রান্তকে। এই সময়েই চৌদ্দ সালেই লেখা হল "চতুরঙ্গ"। তখনো ইংলন্ডে নব প্রকরণের উপন্যাস রচনা শুরু হয়নি। বাহুল্যবর্জিত, নির্মেদ, তৎপর অথচ গূঢ়ভাষী, অপরিচিত অথচ আত্মার অভিজ্ঞানে চিরচেনা এই উপন্যাস যেন মজঃফরপুরের বিস্ফোরণে আবির্ভূত বাঙ্গালি যুবক। সে আমাদের চেনার দিগন্তে ঠিক আসেনা। কিন্তু কিছুতেই আমাদের অনাত্মীয় নয়। প্রশ্ন জাগে "গোরা"র পর রবীন্দ্রনাথ "চতুরঙ্গ" লিখলেন কেন? তাঁর মধ্যে কোনোদিনই শৈল্পিক আত্মানুবর্তন নেই বলে, নেই বলে পুনরাবৃত্তির প্রবণতা—এ প্রশ্ন আরো জরুরী। এ তো শুধু ফর্মের ভাঙ্গাগড়া নয়। ফরাসী চতুরঙ্গের ভূমিকায় রোলাঁ পিয়ার্‌সনের একটি অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেছেন। উনিশশো ষোলোয় ভারত থেকে বাইরে গিয়ে, উনিশে ফিরে এসে পিয়ারসন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না এদেশের পরিবর্তনকে। উপন্যাসে কবিতায় ফর্মের ভাঙ্গাচোরা এই সময়েই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ কমবেশী সেই জাতীয় উপন্যাসিক যাঁরা অভিজ্ঞতার মূল্যেই উপন্যাসকে অনিবার্য মাধ্যম বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। একদিকে যে অভিজ্ঞতাটি তাঁরা অগ্রাধিকারী ও অবশ্যপ্রকাশ্য বলে মনে করেন, সেই মূল্যবোধটিই তাঁদের উপন্যাসের আঙ্গিকরীতির প্রকৃত স্রষ্টা এবং যথার্থ নিয়ামক। অন্যদিকে এই আঙ্গিকরীতির আলোকবর্তিকাটি জ্বলে উঠলেই লেখক ঠিকভাবে উপলব্ধি করেন তাঁর অভিজ্ঞতার মূল্য। "গোরা"-র বিপুল পটভূমি, চরিত্রমেলা, নায়কের স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ এক অন্বেষা, বৃত্তধর্মী গল্প এবং সংবৃত সমাপ্তি যে অভিজ্ঞতার ভাষ্য, চতুরঙ্গের বিদ্যুল্লতা নায়িকা, কাহিনীর কাটা-ছেঁড়া রূপ, নায়কের আদ্যন্ত ব্যতিক্রমী স্বভাব এবং বিবৃত উপসংহার তা থেকে পৃথক এক অভিজ্ঞতার টীকা।

প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে আমাদের একথা বুঝতে দেরি হয়নি যে 'চতুরঙ্গ' থেকেই উপন্যাসের ফর্মের ভাঙ্গাচোরা শুরু হল—এমনকি বাংলা সাহিত্যেও। এই ফর্মের ভাঙ্গা-চোরা ইংরাজি উপন্যাসেও শুরু হয়েছে বিংশের দ্বিতীয় দশক থেকেই। উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীদের সংলাপ এবং কার্যকলাপের চেয়ে তাদের চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করার অভিপ্রায় এই সময় থেকেই ইংরাজি সাহিত্যে উঁকি দিয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজে অভিজ্ঞতা যত জটিল থেকে জটিলতর হতে থেকেছে ততই বিশ্ববীক্ষা স্থান ছেড়ে দিয়েছে আত্মবীক্ষাকে। লেখকেরা তাঁদের বস্তুনিষ্ঠতার বিনিময়ে নিয়ে এলেন এক আত্মপ্রক্ষেপের গূঢ় কৌশল। সৃষ্ট চরিত্রের ভাবনাপ্রবাহের আড়ালে আড়ালে অনুপ্রবেশের ফলে উপন্যাসের আঙ্গিকরীতিও প্রত্যক্ষতা

থেকে দূরে সরে গেল—জয়েসীয় আঙ্গিক-নিরীক্ষা তারই চূড়ান্ত পরিণাম। রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় বিলাতভ্রমণ যখন ঘটছে তখনও কিন্তু এ জাতীয় নতুন রীতির যাত্রারম্ভ হয়নি। কিন্তু এটাও রবীন্দ্রনাথের চোখ এড়ায়নি যে উপন্যাসসাহিত্যে—এদেশের প্রেক্ষাপটেও—ব্যক্তির সর্বৈব বন্ধন-মুক্তির প্রশ্ন ও তার প্রতিক্রিয়াই প্রধান হয়ে উঠছে। ইংরাজি উপন্যাস সাহিত্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে, বাংলা উপন্যাসসাহিত্যে সে জাতীয় কোনো পটভূমি ছিল না। কেননা, ইংলন্ডে চেখভের গল্পের অনুবাদ প্রকাশে, ফরাসী উত্তর-ইম্প্রেশনিস্টদের ফ্রাই-সংগঠিত প্রদর্শনীতে, আবছায়া বাতাসে ফ্রয়েডের ভাবনার পাখির পক্ষবিধূননে, ব্যক্তির জটিল গহনের যে প্রাধান্যবিস্তারের উদ্যোগপর্ব সূচিত হল, বাংলা দেশের এই অষ্টাবক্র ঔপনিবেশিক কাঠামোয় সে-ইতিহাসের অনুবৃত্তি সম্ভব ছিল না। প্রথমটিকে রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় অনুভব করেছিলেন তৃতীয় বিলাতযাত্রায়—দ্বিতীয়টি তাঁর অধিগত ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র হিসাবে—দেশীয় বুর্জোয়া শক্তির আত্মবিকাশের শোচনীয় ইতিহাসের দ্রষ্টা হিসাবে। ১৮৩৬ সালের ১৮ই জুন শেরিফের আহ্বানে অনুষ্ঠিত কলকাতা টাউন হলে প্রদত্ত দ্বারকানাথের উল্লসিত বক্তৃতায় মফঃস্বলবাসীদের থেকে কলকাতাবাসীদের অগ্রসরতা ইংরাজদের প্রতি যে অভিনন্দন টেনে এনেছে, তার উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথে বর্তায়নি। তিনি বরঞ্চ ধিক্কার হেনেছেন এই অসম বিকাশের বিকারকে।

তাই যে-ভাবে ডরোথি রিচার্ডসন বা ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ উপন্যাস-প্রকরণে রূপান্তর ঘটান, এখানে রূপান্তর সেভাবে ঘটার কথা নয়। সেখানে নারী সাংস্কৃতিক সচেতনতা অর্জন করেছে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাধীনতার অংশভাক্‌ হিসাবেই। এ পথে তার গৃহগত নারী-ভূমিকার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি ঘটলেও শেষ পর্যন্ত সে পুরুষপ্রধান সমাজের আর্থনীতিক প্যাটার্নেরই এক ভগ্নাংশে পরিণত হয়। এ পরিণতি সত্ত্বেও সচেতন নারীমানস হারায় না সজাগ জিজ্ঞাসা। তাই বুর্জোয়াসংস্কৃতির অন্তর্বিরোধ যখন জটিলতর হয়ে উঠেছে, যখনই তা পূর্বের গতিশীলতা হারিয়ে ফেলতে বসেছে, তখনই ঐ সজাগ মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে অবশ্যম্ভাবিরূপে। নারী-স্বভাবেই এ প্রতিক্রিয়ার রূপ হয়েছে বিশিষ্ট—নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমানতা, তরঙ্গপ্রতিম কম্পনশীলতা এবং ইতিহাসনিরপেক্ষ ব্যক্তি-অনুভূতির অগ্রাধিকার ইত্যাদি। কিন্তু এখানে ও প্রশ্ন নিরর্থক। পারিবারিক প্যাটার্নে যেখানে সামন্ততন্ত্রের জের দুর্মর, সামাজিক-আর্থনীতিক প্যাটার্নেও যেখানে ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বেঘোরে প্রাণ হারায়—সেখানে ঐ জাতীয় ভাবনাপ্রবাহের কল্পনা অসঙ্গতিদুষ্ট হতে বাধ্য। দামিনী-উদ্ভাবনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ এটাই নির্দিষ্ট করলেন যে এখানে—এই ইংরেজের কলোনির কারাভ্যন্তরীন কারায় নারীর বৌদ্ধিক আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন অপেক্ষা আরো জরুরী তার সমগ্র অস্তিত্বের প্রশ্ন। লক্ষণীয় যে "সবুজ পত্রে"ই বেরিয়েছিল 'স্ত্রীর পত্র', "সবুজপত্রে"ই প্রকাশিত 'হালদার গোষ্ঠী'তে যা ব্যক্তির সত্যকে উদ্ভাসিত করল বিপরীত আলোক-সম্পাতে, 'স্ত্রীর পত্রে' তাই হল ঋজু, প্রত্যক্ষ। "সবুজপত্রে"ই বেরুল 'হৈমন্তী' 'বোষ্টমী'। "সবুজপত্রে"ই বেরুল "চতুরঙ্গ।" যেহেতু এই সমগ্র অস্তিত্ব শচীশ অথবা দামিনী কারো কাছেই দেশকালনিরপেক্ষ হতে পারে না, সেহেতু এ-উপন্যাসে "গোরা"র মতো উচ্চারিত না হলেও, একটা দেশকাল-চেতনা তথা ইতিহাসচেতনা উপস্থিত। সে কারণেই এর আঙ্গিক-রীতিও হয়েছে স্বয়ম্ভর।

তথাপি এ কথাও তো উপেক্ষিত হবার নয় যে উপন্যাসের ফর্মের ভাঙ্গাগড়া সুরু হয়েছে। সেই অ্যারিস্টটলীয় প্লট-বিন্যাস বা পাত্রপাত্রীদের অনুকারী নাট্যস্পর্শী সংলাপ

বা-আচরণ আচরণীয়, এপিক কাঠামোর প্রয়োজনও আর নেই। আর দরকার নেই নাটক বা মহাকাব্যের কাছে হাত পাতার। এতদিনে বাংলা উপন্যাস সাবালক হতে চলেছে।

দুই

"গোরা" পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের কথক সাধারণত সেই প্রথাসিদ্ধ সর্বজ্ঞ ঔপন্যাসিক। যদিও প্রেক্ষণ-বিন্দুর প্রয়োজনীয় স্থানান্তর ও পাত্রান্তর ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্বিষ্ট চরিত্রবাস্তবতা আবিষ্কারে বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন, যদিও "চোখের বালি" ও "গোরা"-তেই সে-রীতি হয়েছে সর্বাধিক শিল্পময়—তথাপি "চতুরঙ্গে"র পূর্ব পর্যন্ত চরিত্র এবং ঘটনার সঙ্গে শিল্পসম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে রবীন্দ্রনাথই কথক। "চতুরঙ্গে" তা নয়। চতুরঙ্গ-কথক শ্রীবিলাস। এই কথক নির্বাচন, এই প্রেক্ষণবিন্দুর ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ। শ্রীবিলাস তার আপাত সাধারণত্বের ছদ্মবেশে একটি বিশিষ্ট চরিত্রকল্পনাও বটে। শ্রীবিলাস সেই সাধারণ যুবক বুদ্ধি এবং হৃদয়ের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে যে বুদ্ধিকে বিসর্জন দেয় না, কিন্তু অগ্রাধিকার দেয় হৃদয়কেই। গোরার বন্ধু বিনয় এবং শচীশের বন্ধু শ্রীবিলাসের মাধ্যমে প্রকাশ পায় রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গলার নবযুগের সমাজ-ইতিহাসবোধের বিশিষ্ট সচেতনতা। লক্ষণীয় যে টলস্টয়ের মতো রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতেও সমাজ-ইতিহাসের একটা বিশেষ পৃষ্ঠা ছিল নির্দিষ্টভাবে মুদ্রিত। টলস্টয়ের কাছে এটা ছিল ডিসেম্ব্রিস্ট আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল রামমোহন বিদ্যাসাগরের নবযুগাভিযানের স্মৃতি। এই মানবিক প্রেরণাভূমি থেকে টলস্টয় এবং রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছেন তাঁদের নায়ক ও পাত্রপাত্রীদের পুরুষার্থের নবীন তাৎপর্য। তাদের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার মানদণ্ড এই ইতিহাসচেতনা থেকেই সংগৃহীত হল। বঙ্গীয় ভিক্টোরিয়ানদের দুর্বলতা থেকে রবীন্দ্রনাথ মুক্ত ছিলেন বলেই কোনো কৃত্রিম স্থায়িত্বের জন্য তিনি আগ্রহী ছিলেন না। গোরা শচীশ পরেশবাবু জগমোহন প্রভৃতি চরিত্রকল্পনায় দেখা গেল সর্ববিধপাশ-বিমুক্ত, সকল রকমের 'প্রেসারগ্রুপ' থেকে মুক্তি-সন্ধানী ব্যক্তিত্ব। এরা বৃহৎ মানুষ। বিনয় বা শ্রীবিলাস এদের পাশের আর দশ জনের মত 'সাধারণ' মানুষ। কিন্তু যে কালগত পটভূমিকায় এরা স্থাপিত সে কালসমুদ্রের কম্পনের ফলে সাধারণও হয়ে ওঠে অসাধারণ। বিনয়-ললিতা এপিসোড, বা শ্রীবিলাস-দামিনী পরিণাম এ কথাই প্রমাণ করে যে বিদ্যাসাগরের জীবনের বৃহত্ত মহত্ত্ব যতই উত্তুঙ্গ হোক, সে জীবন-মন্ত্রকে মূর্তি দিতে এগিয়ে আসে শ্রীশ। সর্বৈব আলোড়নের মাঝখানে ফাঁসির দড়ির দিকে এগিয়ে যায় অনাটকীয় ভাবে ক্ষুদিরাম। যে সুপারস্ট্রাকচারের দিকে লক্ষ্য রেখে গোরা বা শচীশ ছকের পর ছক ভাঙ্গতে চায়, বিনয় বা শ্রীবিলাস তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, কিন্তু তারাই অকস্মাৎ হয়ে ওঠে গতিময়।

"গোরা" উপন্যাসে লেখকই কথক—"চতুরঙ্গে" শ্রীবিলাস। শ্রীবিলাসকে কথক নির্বাচনের কারণ খুবই দৃঢ়। শচীশ দামিনী এবং জগমোহন ননীবালা-জীবনকথায় লেখকের কথকতা শিল্পগুণের প্রতিবন্ধক হতো—ওদরে টেনশনের নাটকীয়তা লেখকমাধ্যমী বর্ণনায় প্রয়োজনীয় নিরাসক্তি ও দূরত্ব বজায় রাখতে পারতো না। গুণমুগ্ধ শ্রীবিলাস ও অনুরক্ত শ্রীবিলাসকে আমরা প্রথম থেকে ঘটনায় ও নায়ক-নায়িকার জীবনবিষয়ে জড়িত বলে মেনে নিয়েছি। তার উক্তি একারণেই অত্যুক্তি হলে সখাসম্মিত ক্ষমা পায়, ঊনোক্তি হলেও বন্ধুবাচন বলে পার পেয়ে যায়। আবার সে, ঘটনা এবং পাত্রপাত্রীর অতিসন্নিহিত থাকার ফলেই তার কাছে

কোনো কিছুই নাটকীয় দূরত্বে দৃশ্যময় নয়। শ্রীবিলাস বলেছে বলেই ঘটনার তীব্রতা বর্ণনার সংক্ষিপ্ততায় তীক্ষ্ম সূচ্যগ্র হতে পেরেছে। দামিনীর মৃত্যুতেই শ্রীবিলাসের কথকতা শেষ। তার শোকার্ত মর্মবেদনার অনুমেয় গভীরতাকে সে নৈঃশব্দ্যের অতলে ডুবিয়ে দিয়েছে। দামিনী এবং শচীশের মাঝখানে শ্রীবিলাসের ভূমিকা শ্রীবিলাস নিজেই বিশ্লেষণ করেছে চমৎকার—'এই নাট্যের মুখ্যপাত্র যে দুটি তাদের অভিনয় আগাগোড়াই আত্মগত—আমি আছি প্রকাশ্যে, তার একমাত্র কারণ, আমি নিতান্তই গৌণ'। দামিনীর স্বীকৃতি—'তুমি যদি সাধারণ মানুষ হইতে তবে কিছুই ভাবিতাম না'—শ্রীবিলাস আপাতমূল্যেই নিয়েছে। কিন্তু এই গৌণত্বজনিত কোনো ক্ষোভ বা বেদনা যদি তার থেকেও থাকে, তাকে সে উপেক্ষা করেছে সাধারণত্বের অহংকারে—যার অপর নাম অভিমানহীনতা। এবং এই সকৌতুক অভিমানহীনতার কারণেই একদিকে যেমন স্তিমিত হয়েছে নাট্যাতিশয্যের প্রলোভন, তেমনি তার নিজের ভবিতব্যের মুখোমুখী সে যখন হয়েছে, তখনো তার কথনভঙ্গীতে লাগল না করুণ নাটকের শেষ দৃশ্যের বিষণ্ন চরিত্রের বাষ্পাচ্ছন্নতা। সুতরাং এ উপন্যাসের নিরুচ্ছ্বসিত ঋজুতা স্বভাবজ।

তিন

বঙ্কিমচন্দ্র যে অর্থে নাট্যাশ্রয়ী রীতির অনুকরণ করেছেন, ঠিক সে অর্থে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন উপন্যাসে নাট্যরীতি প্রয়োগ করতেন না। কেন করতেন না, সে আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধকার তাঁর "বাংলা উপন্যাসের কালান্তর" গ্রন্থে করেছেন বলে পুনরাবৃত্তিতে বিরত হওয়া গেল। কিন্তু একথাও ঠিক পাত্রপাত্রীদের সমগ্র-ব্যক্তিত্ব-সম্ভূত আর এক টেন্‌শন তাঁর উপন্যাসে এক স্বতন্ত্র অন্তর্গূঢ় নাটক সৃষ্টি করে। "চতুরঙ্গে" কিন্তু সে জাতীয় নাটক সম্পূর্ণ অন্যরূপ ধরেছে। এ যুগের সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেরণাতে যে সতত পরিবর্তনের সংকেত উদ্ভাসিত হয়েছে, বের্গসঁ-র দর্শনে রবীন্দ্রনাথ তার এক দার্শনিক সমর্থন পেয়ে থাকবেন। জগমোহন ও শচীশের বিরতিবিহীন ক্রমোন্মোচন একদিকে বের্গসঁয়ের এই ধারণার ছায়া, অপর দিকে তা রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপীয় ও স্বাদেশিক অভিজ্ঞতার সমর্থন -Our personality shoots, grows, ripens without ceasing. Each of moments is something new added to what was before. We may go further : it is not only something new, but something unforeseeable. জগমোহন ও শচীশ এই দুই উচ্চতম বৌদ্ধিক স্তরের ব্যক্তির জীবনে এই অননুমেয়ের ধাক্কা স্বভাবতই গতিশীলতার ফল। ননীবালা-ঘটনা এবং দামিনী-পরিণাম তার বড়ো প্রমাণ। ছোট প্রমাণগুলি ছড়িয়ে রয়েছে এর আশেপাশে। শ্রীবিলাসের প্রেক্ষণবিন্দু ব্যতিরেকে সমস্ত ব্যাপারটি একটি মিথ্যা নাটকে পর্যবসিত হতো।

কিন্তু এ-প্রেক্ষণবিন্দু সর্বদা এবং সর্বত্র কি অক্ষুণ্ণ থেকেছে? লেখকীয় নীরবতা বা 'অথরিয়াল সাইলেন্স' যাকে বলেছেন সমালোচকেরা, তা কি কখনোই লঙ্ঘিত হয়নি? এখানে একটা কথা স্মরণীয়—ফ্লবেয়ারের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত জেমসীয় সিদ্ধান্তে যাই বলা হোক লেখকের স্বকণ্ঠ বা অনুপ্রবেশ মাত্রেই অশৈল্পিক, এত জোরের সঙ্গে এমন কথা বলা চলে না। লরেন্স স্টার্ন-এর ট্রিস্ট্রাম শ্যান্ডিই শুধু নয়, এ ব্যাপারে খোদ ফ্লবেয়ারের "মাদাম বোভারি" থেকেও উদাহরণ টানা চলে। প্রেক্ষণবিন্দুর স্থানান্তর ঘটিয়ে লেখকের শিল্প-

সম্মত অনুপ্রবেশের চমৎকার নিদর্শন রয়েছে "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসে। কপালকুণ্ডলার রূপবর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে নবকুমারের প্রেক্ষণবিন্দু। এ প্রেক্ষণবিন্দু ছিল অপরিহার্য, কেননা নবকুমারের রূপানুভূতির 'আয়রনি' এই নাট্যরসাশ্রিত উপন্যাসের অন্যতম বিষয়। তার গাঢ় ভূমিকা এখানেই রচিত হল। পক্ষান্তরে নবকুমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও মতিবিবির রূপবর্ণনায় উপন্যাসকথকের দৃষ্টিবিন্দু ব্যবহৃত হল। কারণ পূর্বোক্ত কোনো আয়রনি অভিপ্রেত ছিল না তো বটেই, আরো বড়ো কথা লেখক সাধারণ প্রেক্ষকের ভূমিকায় নেমে এসে মতির রূপচরিত্রের লৌকিকতাকেও স্থাপিত করেছেন। উপন্যাসাশ্রিত নাট্য-দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটেছে এইভাবে। "চতুরঙ্গে" শ্রীবিলাসের প্রেক্ষণবিন্দুকে লেখক কয়েকটি ক্ষেত্রে সীমার বাইরে টেনে নিয়ে গেছেন। শ্রীবিলাস ও সর্বজ্ঞ লেখকের ভেদসীমাটি তখন যেন অস্বীকৃত হয়েছে। শচীশের দিনলিপির ব্যবহার যদিবা সে অস্বীকৃতিকে কিছুটা ছদ্ম-বেশ পরাতে চেয়েছে, কিন্তু অন্ততঃ উপন্যাসের 'শ্রীবিলাস' পর্বে নদীর চরে শচীশ-দামিনী সংবাদে শ্রীবিলাসের প্রেক্ষণবিন্দু ও ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণ একাকার হয়ে গেছে। এই অংশে দামিনী-শচীশ সংলাপের প্রাক্কালে যে বিখ্যাত চিত্রকল্পের সমতুল্য নিসর্গবর্ণনা তা কার দৃষ্টিসম্ভূত ? নিশ্চয় দামিনীর নয় ? তাহলে শ্রীবিলাসের। শ্রীবিলাসের হলে সে প্রায় সর্বত্রচারী এবং সর্বজ্ঞ ঔপন্যাসিকের ক্ষমতাই অধিগত করেছে বলতে হয়।

তাহলেও ক্ষতি হয়নি। কেননা, শ্রীবিলাস, এবং সেহেতু লেখকের, মূল উদ্বেগের বিষয় দামিনী। উপন্যাসের মূল ঘটনায় দামিনীর বিদ্রোহ আসল কথা। দামিনীই প্রমাণ করল যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সামাজিক ও পারিবারিক আর্থনীতিক কাঠামো-ই শুধু পুরুষপ্রাধান্যসূচক, বা পুরুষাধিপত্যে চালিত নয়, আধ্যাত্মিক মুমুক্ষাও সেখানে পুরুষাধি-পত্যের বশম্বদ। ননীবালার ও নবীনের স্ত্রীর ভিন্নার্থ আত্মহত্যা থেকে মনে হয় লেখক এসময়ে নারীর ব্যক্তিমর্যাদার অবদমন বিষয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। দামিনীকল্পনা তারই ফল। যে ঘটনা শচীশকে ঠেলে দিল ভক্তিসাধনায়, সেই জাতীয় ঘটনাই দামিনীকে নিয়ে গেল ব্যক্তিমুক্তির প্রত্যক্ষ প্রশ্নে। সব রকম ছক ভেঙে ভেঙে তার যাত্রা। লেখকের দামিনী-মনোভাব, ও শ্রীবিলাসের দামিনী-মনোভাব কতকটা এক বলেই এখানে প্রেক্ষণবিন্দুর সামান্য স্থানান্তরণে কোনো ক্ষতি হয়নি।

চার

তীব্র গতিচ্ছন্দকে মূর্ত করা হয়েছে শচীশ-দামিনীর ব্যক্তিত্বচিত্রনে। পর পর অব-চ্ছিন্ন ঘটনাচিত্রকে যে পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে তাকে বলা যায় সিনেম্যাটোগ্রাফিক। মাঝে দ্রুত কাটের সঙ্গে তুলনীয় যেন কতকগুলি খবর বা তথ্য। 'দুই বছর শচীশের কোনো সং-বাদ পাইলাম না', 'পাথর আবার গলিল', 'আবার একদিন কানাকানি এবং কাগজে কাগজে গালাগালি চলিল'—এগুলি এবং এজাতীয় আরো নানা উক্তি নতুন নতুন সিকোয়েন্সের অবতারণা। যে কোনো বৈপ্লবিক ছন্দের এ উপযুক্ত আঙ্গিক রীতি। স্মরণ করলেও করা যেতে পারে বের্গস‍ঁয়ের এই উক্তি—যা কিনা সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে সেই দার্শনিকের ব্যাখ্যা —This impulsion, once received, sets the mind off on a road where it finds both the information it had gathered and other details as well; it develops, analyzes itself in terms whose enumeration follows

on without limit—তিনি আরো বলছেন যে it was not a thing but an urge to movement—তাই শ্রীবিলাসের বিবৃতির ভিতর দিয়ে ব্যক্তিস্বগুলির নাড়ীর স্পন্দন-মুহূর্তগুলিই ফুটে উঠেছে, যা আপাতভাবে অবচ্ছিন্ন, কিন্তু তার মাধ্যমে আকৃতি পায় অস্তিত্বের পূর্ণস্বরূপ, যা শেষ পর্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। চিত্রশিল্পী যেমন যা এঁকে চলেছেন তার পূর্ণপরিণতি পূর্বাহ্ণে অনুমান করতে পারেন না, তেমনি each of our states, at the moment of its issue, modifies our personality being indeed the new form that we are just assuming.

ব্যক্তির এই তরঙ্গলীলা শ্রীবিলাসের মন্ময় দৃষ্টিতে প্রতিভাত হবার কালে সৃষ্টির বিচিত্র নিয়মে এক স্থায়ী চিত্রকল্পের আকার পরিগ্রহ করেছে। কাব্যে এবং উপন্যাসে চিত্রকল্পের সার্থকতা বিচারের মানদণ্ড স্বভাবতই এক নয়। সার্থক শিল্পকর্মে বিশিষ্ট কবিতায় চিত্রকল্পই হতে পারে একটা অভিজ্ঞান। উপন্যাসে চিত্রকল্প সাধারণত থাকে চরিত্র বা ঘটনার অধীন। কিন্তু "পোর্ট্রেট অফ এ লেডি" উপন্যাসে ইসাবেল আর্চারের জীবনকথা প্রসঙ্গে বাগানের চিত্রকল্প যখন তারই জীবনের সংকটময় পরিস্থিতিতে একটা ধূসর কুয়াশাচ্ছন্ন জলাজঙ্গলের চিত্রকল্পে রূপান্তর লাভ করে তখনই বোঝা যায় এ আরোপিত চিত্রকল্প নয়, এ চরিত্রপাত্র বা ঘটনার টানে উদ্ভূত চিত্রকল্প। কিম্বা তারও বেশী—এই চিত্রকল্পই তখন উপন্যাসের ভাবভাষা। "চতুরঙ্গ" উপন্যাসে বহু ব্যবহৃত চিত্রকল্প—ঢেউ>সমুদ্র>জাহাজ বা নৌকা বিষয়ক। যথা—

(ক) মা, আমার ঘরে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, তাই নিন্দায় কোটালের বান ডাকিবার সময় আসিল; কিন্তু ঢেউ যতই ঘোলা হোক, আমার জ্যোৎস্নায় তো দাগ লাগিবে না।

(খ) এইখানকার মানুষের ভিতর দিয়া আত্মীয়-অনাত্মীয় চেনা অচেনা সকলের গালি খাইতে খাইতে পালের নৌকা যেমন করিয়া উজান জলে বুক ফুলাইয়া চলিয়া যায় যৌবনের শুরু হইতে আজ পর্যন্ত তেমন করিয়া চলিয়াছি—

(গ) হঠাৎ প্লাবনে উপচিয়া পড়িল......

(ঘ) এদিকে ব্যবসায়ের উলটা হাওয়ায় ঝাপট খাইয়া অন্নদার ভরাপালের ভাগ্যতরী একেবারে কাত হইয়া পড়িল।

(ঙ) শচীশ বলিল, 'উপরে ঢেউ দেখিতেছ বটে কিন্তু ধৈর্য ধরিয়া ভিতরে তলাইতে পারিলে দেখিবে, সেখানে সমস্ত শান্ত।'

(চ) আমি বলিলাম, 'প্রকৃতির স্রোতের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে জীবনতরী বাহিয়া চলিতে হইবে। আমাদের সমস্যা এ নয় যে স্রোতটাকে কী করিয়া বাদ দিব; সমস্যা এই যে তরী কি হইলে ডুবিবে না, চলিবে।'

(ছ) সেদিন দক্ষিণ হাওয়ায় দূর সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ পৃথিবীর বুকের ভিতরকার একটা কান্নার মতো নক্ষত্রলোকের দিকে উঠিতে লাগিল।

(জ) শচীশের এ কী চেহারা। প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপটা খাওয়া, ছেঁড়াপাল, ভাঙা-মাস্তুল জাহাজের মতো ভাবখানা।

(ঝ) উইলটা যদি শচীশের হাতে থাকিত তবে এতদিনে ভাবের স্রোতে রসের ঢেউয়ে কাগজের নৌকাখানার মতো সেটা ডুবিয়া মরিত।

(ঞ) যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায়

সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধুলো লইয়া বলিল, 'সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।'

উদ্ধৃত চিত্রকল্পগুলির সমস্ত ঢেউ, সমস্ত সমুদ্র শচীশ দামিনী এবং শ্রীবিলাস সকলেরই মুক্তি এবং বন্ধনের নানা ঘাতপ্রতিঘাতের দর্পণ। এমনকি যখন তা অপরের সম্বন্ধে উক্তি তখনো তা শ্রীবিলাসেরই জীবনগত অভিজ্ঞতার ভাষায় রূপময়। কিন্তু লেখক ও শ্রীবিলাসের অনুভূতিতে দামিনীর সংগ্রামই মুখ্য। মুখ্য তার জীবনের আয়রনি। তাই দামিনীর সমস্ত যন্ত্রণা এবং আর্তি যখন মৃত্যুতে সমাপ্তির দিকে চলেছে তখন আর পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাসঞ্চারী বা ইলাস্ট্রেটিভ চিত্রকল্প বাতিল হয়ে গেছে। তখন দেখা দিল সেই নিগূঢ়ভাষী সংকেতময় রূপান্তরণী, ট্রান্সফর্মেটিভ চিত্রকল্প—হার্ডিতে বা লরেন্সে যার দেখা পাওয়া যায়। তখন পরিবেশ-সম্ভূত নিসর্গচিত্রই হয়ে ওঠে গূঢ়ভাষী চিত্রকল্প। শ্রীবিলাস-পর্বের প্রারম্ভেই দামিনীর স্মৃতিসর্বস্ব শ্রীবিলাস যখন ভাঙ্গা পোড়ো নীলকুঠির অরণ্য-আক্রান্ত রূপ বর্ণনাকালে বলে, 'তার ফাটলে ফাটলে ঘন ঝোপ করিয়া ভাঁটিফুলের ও আকন্দের গাছ উঠিয়াছে, একেবারে ফুলে ভরা—বাসরঘরে শ্যালির মতো মৃত্যুর কান মলিয়া দিয়া দক্ষিণা বাতাসে তারা হাসিয়া লুটোপুটি করিতেছে।'—তখন আর কেউ নয় দামিনীর মৃত্যু-উত্তীর্ণ জীবনবোধই চকিতে সংকেতময় হয়ে উঠেছে—সেই দামিনী, যে শ্রীবিলাসের কাছে 'গৃহিণী হইল না', 'মায়া হইল না'—'সে সত্য রহিল। সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ছায়া বলে।' এ আর অর্থপরিস্ফুটক চিত্রকল্প নয়। শ্রীবিলাসের দামিনী-অভিজ্ঞতার অভিঘাতে নিসর্গ-প্রতিবেশই হয়ে উঠেছে ভাবনাপ্রতিবিম্ব।

আর সেই নদীর চরে, যেখানে দামিনী পৌঁছে গেল 'একটা সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে', যেখানে 'পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'। যেখান থেকে ঘটেছিল সব রঙের নির্বাসন—'যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি, যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে'—সেখানে এই অসামান্য যন্ত্রণাময় অন্বেষার চিত্রকল্প শ্রীবিলাসের স্মৃতির সহ-যোগে দামিনীর জীবনের রূপক হয়ে ওঠে। এরই পরে দামিনী পৌঁছে যায় বর্ণে বর্ণে অভিরাম জলকণায় স্নিগ্ধ সরসতার কূলে। সেখানে বসে শচীশ। শচীশের প্রত্যাখ্যান কিন্তু দামিনীকে আবার সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে গেল, যেখানে 'চারিদিকে শূন্য বালি রাত্রি-বেলাকার বাঘের চোখের মতো ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল।' যে টেন্‌শন আধুনিক জটিল-তায় তোলে অস্তিত্বের তারে তারে নতুন আক্ষেপস্পন্দ, এই চিত্রকল্প সেই গহন ব্যক্তিত্ব-রূপের ভাষা। এই অংশে যে, চিত্রকল্পটি গড়ে উঠে ভেঙে গিয়ে আবার গড়ে উঠেছে—তা শচীশ এবং দামিনীর ভিন্নার্থক মুক্তিবোধের দ্বান্দ্বিক সমন্বয় সাধনের প্রয়াসী কল্পনা। এই দ্বান্দ্বিক সমন্বয় সাধনের জন্যই শ্রীবিলাসের ভাষার ডায়েরি-রেজিস্টারও ধীরে ধীরে শেষের দিকে কাব্যধর্মী হয়ে ওঠে। সে ভাষার আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে।

ঐরাবতের মৃত্যু

দিনেশচন্দ্র রায়

জয়ন্তিয়া পাহাড় যেখানে অধিত্যকাতে সমতল সেখানে প্রতিদিন অপরাহ্নকালে একটি দীর্ঘ-ছায়া রায়ডাক নদীর বেলাভূমিতে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত হয়ে শুয়ে থাকে। মনে হয় হাতের কনুই মাথার নীচে দিয়ে ছায়াটা ডান কাতে শুয়ে আছে। এই বেলাভূমি অগণিত প্রস্তর-খণ্ডদ্বারা সমাধিস্থ। শেষ মধ্যাহ্নে দূর থেকে এই নানা আকারের এবং বর্ণের পাথরগুলোকে চারণক্ষেত্রে বিচরণরত গরুরপাল বলে মনে হয়। আর সেই ছায়াটা অবিকল ডান কাতে শুয়ে থাকা একজন রাখাল। বিকেলটা যখন আরও গভীর হয়, সূর্য যখন পশ্চিমের দিকে আরও একটু নীচে যায়, তখন ছায়াটা কোন প্রাগৈতিহাসিক লোকপালক, অন্তর্জলী যাত্রা করে এই মহানদীর তীরে মুমূর্ষু, নানা আকারের পাথরগুলো তখন নারী, পুরুষ, বালক-বালিকার রূপ নেয়। দুহাতে মুখ ঢেকে তারা শোকে এবং ক্রন্দনে মুহ্যমান।

এই অধিত্যকাতে একবর্গ মাইল এলাকা জুড়ে ছাড়া ছাড়া ছোট ছোট গ্রাম, ধানক্ষেত। কিছু গরু মোষের বাথান। বিচ্ছিন্ন কয়েকটি শালবন, সেইরকম শালবন যা এইসব মাঠের মধ্যে ছিমছাম পরিষ্কার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আশেপাশের ছোটছোট গ্রামের মধ্যে এই শালবীথি-গুলো কেমন পটে আঁকা ছবির মতো দেখতে। কিন্তু তারপরেই রায়ডাক রিজার্ভ ফরেস্ট। বাংলা দেশের পূর্বদিগন্ত জুড়ে বিস্তৃত নিবিড় নির্জন ভয়ংকর অরণ্য। রায়ডাক নদী এই জঙ্গলকে পাশ কাটিয়ে তেড়েফুঁড়ে দক্ষিণগামী। এই নদীর পশ্চিম দিকে বেশ বড় একটা মাঠ। মাঠ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ছবির মতো একটি গ্রাম। নাম মহাকালগুড়ি। মাঠখানা পায়ে হাঁটা পথের সাদা পৈতে গলায় দিয়ে সবুজ ঘাসে শিশিরে কুয়াশাতে জলকণাতে শীতল, কোমল। পায়েহাঁটা পথ পশ্চিমে সেই ছবির মতো গ্রামে এবং পূবে একটা খুব মজবুত পাকা পুল পেরিয়ে একেবারে জঙ্গলের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে।

মহাকালগুড়ি গ্রামে বুনো মানুষদের বসতি। বনের শ্রমিক রাভা উপজাতিদের জন্য সরকারী বন-বিভাগ এই গ্রামের পত্তন করেছে। দোতালা সমান উঁচু করে কাঠের দেওয়াল এবং পাটাতন দেওয়া বাড়ি। টিনের দোচালা ছাদ, বেশ যত্ন করে প্রতিবছরে লাল রং ফেরানো। দুশোটি পরিবারের জন্য দুশো এমনি ঘর লাইনবন্দী হয়ে দক্ষিণমুখো এবং পূব-পশ্চিমে বিস্তৃত। তিনটি সারিতে এই দুশো বাড়ি বানানো হয়েছে। দুসারি বাড়ির মাঝখান দিয়ে সুরকী ঢালা রাস্তা। এই এলাকাজুড়ে সাজানো বাড়িগুলোতেই কিন্তু গ্রাম শেষ নয়, পশ্চিম-পাশে একটি বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে প্রতিটি পরিবারের অতিরিক্ত আত্মীয়স্বজন, বুড়োবুড়ি এবং কামিনদের জন্য কাঁচা বাড়ি আছে। বাড়িগুলোর নিকানো উঠান, পরিষ্কার ডোয়া, দেওয়ালে রাশিচক্রের মতো সবুজে কালোতে কিছু বিচিত্র আলপনা। প্রতিটি পরিবারের জন্য একখানা করে তাঁত ঘর, হাঁসমুরগী এবং শুয়োরের খাঁচা। গ্রাম শেষ হলে প্রায় তিন বর্গ-মাইল এলাকা জুড়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে রাভারা ঝুম চাষ করছে। গ্রামের শেষে এই উন্মুক্ত অঞ্চলে সবুজ লতাপাতার একটা তীব্র গন্ধ সবসময় পাওয়া যায়।

কৃষিকাজের ক্ষেত্রে রাভারা এখনও সার, জলসেচ এবং একই জমিতে একাধিক ফসল ফলানোর কৌশল জানে না। গড়ে তিন বৎসর তারা এক একটা জমিতে চাষবাস করে এবং

তারপর সেই জমি ফেলে অন্যজমিতে সরে যায়। জমির সঙ্গে রাভাদের মানবিক সম্পর্ক কোনদিন গড়ে ওঠে নি। অন্যদিকে সরকারী বনবিভাগের সঙ্গে তাদের মূল সম্পর্ক মজুরীর বিনিময়ে অনিয়মিত এবং অতি অল্প কাজ করা। যে কোন বিচ্ছিন্ন উপজাতির মতোই রাভাদের যৌথ জীবনের তাই কোন বনিয়াদ নেই। কোন রক্ষাকবচকুণ্ডল এই উপজাতিদের সামগ্রিক অবলুপ্তি থেকে বাঁচাতে পারছে না।

রাভারা প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের একটা সম্পর্ক নিজেরাই রচনা করেছে,—আর সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাভারা মনে করে যে রায়ডাক নদী, অরণ্য, জয়ন্তিয়া পাহাড়, সবুজ মাঠ, মহাকালগুড়ি বস্তির একমাত্র নিয়ামক তারা। তাদের সমস্ত পূজাপাঠ, সংস্কার, ব্রত, গান, নাচ এই কর্তৃত্ব হারানোর ভয় থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য। যে কোন আদি মানবগোষ্ঠীর মতো রাভারা মহাজ্ঞানী। এক অদৃশ্য নিয়তি, যার অন্য নাম ইতিহাস, তার অস্তিত্ব তারা জানে। তারা বুঝতে পেরেছে যে তারা হেরে যাচ্ছে। তাই একদিকে স্বাভাবিক নিয়মে মহাকালগুড়ির স্থিতিস্থাপকতার অনিবার্যতাকে তাদেরই শাসনক্ষমতা এবং সমষ্টিগত উৎকর্ষের সাফল্যের চরম প্রকাশ ভাবে। যে মানবগোষ্ঠী অর্থনৈতিক শ্রেণীচেতনার আলো থেকে বঞ্চিত এবং তজ্জনিত কারণেই সংগঠিত হতে অপারগ তার মতো অন্ধ এবং পঙ্গু আর কেউ নয়। এই কারণেই রাভারা আস্তে আস্তে সংখ্যায় কমে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে একটি সুন্দর সবল মানবগোষ্ঠী। মেয়েরা দল বেঁধে কাপড় কাচতে আসে সকালে। একটা মোটা বেঁটে কাঠের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে ওরা একগাদা সেদ্ধকরা কাপড় কাচে। কাপড় কাচার শব্দগুলো কাটাকাটা হয়ে একটার পর একটা ঢিলের মতো জঙ্গল থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে। এই সময়ে মেয়েরা গান করবেই করবে, গানের তালে তালে পাথরের ওপর কাপড় আছড়াবে। শব্দগুলো জঙ্গলে ছুটে যায়, ফিরে আসে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে, মনে হয় কোথায় যেন খুব বিষ্টি হচ্ছে।

মাথা ঘসবার সময় মেয়েরা ক্ষারে ভেজানো চুল মাথার ওপর দিয়ে উল্টে দেয়। একজন আর একজনের মাথা ঘসে দেয়। এই সময়ে ঐ সব নারীদের ঘাড়ের অংশ, যা সাধারণত চুলে ঢাকা থাকে, অনাবৃত হয়ে পড়ে। রাভা রমণীদের ঐ অনাবৃত অংশ মঙ্গোলীয়পীতাভ, পাকা জামরুলের কথা মনে করিয়ে দেয়। ওদের স্নান যখন শেষ হয় তখন নদীসংলগ্ন মাঠে মেলে দেওয়া রংবেরঙের কাপড়-চোপড় শুকিয়ে কড়মড় করছে। সেই টাটকা রোদ্দুরে সদ্য শুকনো কাপড় পরে, জলভরা কলসি মাথায় নিয়ে দলবেঁধে ওরা বস্তির দিকে রওনা হয়। গভীর অবগাহন স্নানের পর এই রমণীদের মুখগুলো একটু ফ্যাকাশে লাগে, ওদের তেলহীন ভেজা চুল দুভাগে ভাগ হয়ে ডান এবং বাঁ কাঁধ বেয়ে বুকের দুদিকে পড়ে। শীতের ছোটবেলাতে বিকেলের ছায়া, কলসীগুলোর ছায়া একদল শিশুর মতো ওদের পাশে পাশে চলতে থাকে।

বস্তির বালকবালিকারা সমস্ত গরুবাছুর নিয়ে সকালেই জঙ্গলে ঢোকে। তারপর সারাদিন এক বিরাট এলাকা জুড়ে ওরা চরে বেড়ায়। প্রত্যেকটি গরু এবং বাছুরের গলাতে একটা করে ঘণ্টা বাঁধা থাকে। যাতে ওরা দূরে গেলেও ঘণ্টার শব্দে হদিশ করা যায়। সেই সকাল থেকেই সারা জঙ্গল গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর প্রতিধ্বনিতে সঙ্গীতময়। রায়ডাকের বিস্তীর্ণ জলরাশির ওপর দিয়ে সেই প্রতিধ্বনি যখন সাঁতার কেটে এপারে আসে তখন তা ভাগীরথীতীরে পাঁচশত বৎসরের পুরাতন কোন পর্তুগীজ গির্জার ঘণ্টাধ্বনির মতো প্রাচীন এবং পৌরাণিক।

গরুর পাল এবং রাখাল জঙ্গল ও জনপদের সংযোগরক্ষাকারী সেই মাঠে পৌঁছালেই

রাভাবস্তিতে উনোনে উনোনে ভাতের হাঁড়ি চড়ে। সূর্যঘড়ির সেই বিখ্যাত ছায়া রায়ডাকের তীরে ক্লান্ত রাখালের মতো নিদ্রিত থাকতে থাকতেই পুরুষেরা জঙ্গলের কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরে। সেই ছায়া অন্তর্জলী যাত্রায় শায়িত মুমূর্ষু রূপে রূপান্তরিত হওয়ার আগেই সবাই খেতে বসে যায়।

জয়ন্তিয়া পাহাড় যখন অন্ধকারে আকাশে প্রায় বিলীন হয়ে যায়, রায়ডাক থমথম করে, জাদুকরের রজ্জুর মতো কুয়াশা গগনগামী, ঘোলাটে আকাশে চাঁদও একখণ্ড বিমূর্ত খদ্যোততুল্যপ্রভ, গভীর অরণ্য থেকে বিচিত্র শব্দ আলাদা আলাদা কিন্তু পরিণামে এক এবং প্রতিধ্বনিতে মৃত,—তখন এই মাঠে শালের গুঁড়িতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বালিয়ে পাণ্ডা সর্দার প্রথম এসে বসে। দু হাঁড়ি হাড়িয়া আগুনের একপাশে পড়ে থাকে, হাঁড়ি দুটোর একাংশ আগুনের শিখাতে আলোকিত কিন্তু অধিকাংশই অন্ধকার, ফলে হাঁড়ি দুটোকে দুটো বিমূর্ত বিগ্রহের মতো দেখায়। আগুনের বৃত্তের বাইরে দুটো সানকীতে শুয়োরের নাড়িভাজা এবং ছোলা সেদ্ধ। ভোগের দুটো থালার মতো সানকি দুটো বিগ্রহযুগলের সামনে পড়ে থাকে।

পাণ্ডা সর্দার তার বিয়াল্লিশ বছরের জীবনের বত্রিশ বছর রায়ডাকের জঙ্গলে কাজ করছে। প্রথমে গরু চরাতো, তারপর শুকনো পাতা আর কাঠ কুড়িয়ে আঁটি বেঁধে এখান থেকে উনিশ মাইল দূরের জনপদে ফিরি করে বেচতো। তখন এই ডুয়ার্সে সরকার পাকা বাড়ি করে দেয় নি। রাভারা লতাপাতার কিংবা খড়ের ছাউনি দিয়ে ঘর বানাতো, গ্রাম বসাত, বনে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খেটে পেতো চার আনা পয়সা। তখন বছরে নয়মাস বর্ষা। একটানা তিনমাস রোদ উঠতো। প্রচণ্ড ম্যালেরিয়া আর ব্ল্যাকওয়াটারে পিঁপড়ের মতো মানুষ মরতো। ডাক্তার বদ্যির কোন নামগন্ধ ছিল না। আলিপুরদুয়ারে গোরুর গাড়ি নিয়ে যেতে দুদিন একরাত্তির লাগতো। কুকুর আর বেড়ালের মতো বাঘ এসে ঘরের দরজা আঁচড়াতো। সন্ধ্যে থেকে নেকড়ের চোখ জ্বলে জ্বলে উঠতো, চিতাবাঘ শুকনো পাতা চারপায়ে মড়-মড়িয়ে ওৎ পেতে বসে থাকতো, কথা নেই বার্তা নেই প্রতি বৎসরেই একটা না একটা গুণ্ডা হাতী এসে রাভা বস্তি তোলপাড় করে যেত।

এই বিজন বনে এমন সব জায়গা ছিল যেখানে মানুষ পেঁছাতে পারতো না। কতো তার আব্রু ছিল, পর্দা ছিল, ইজ্জত ছিল। এখন জঙ্গলের কাপড় খুলে হাজার হাজার বেজন্মা তার ওপর বলাৎকার করছে। বনের ভিতর প্রায় পাকা সড়ক বানানো হয়েছে। গাড়ি করে এখন এই জঙ্গলের যেখানে খুশী যাও।

একটা বুড়ো বাঘ ছিল এই রায়ডাকে। লোকে বলত দেওবাঘ, পাণ্ডা ঐ বাঘটাকে রাতেবিরেতে এমনকি দিনদুপুরেও দু-একবার দেখেছে। কিন্তু বাঘটার একটা পাকা নিয়ম ছিল—সে ঠিক সন্ধেবেলা এই মাঠের উত্তর কোনা ঘেঁসে নিঃশব্দে এসে নদীতে জল খেয়ে আবার চলে যেত। কোনওদিন কারও কোন ক্ষতি করে নি। এমনি চলছিল অনেকদিন। সবাই ভাবতো এই বুড়ো বাঘ আসলে বাঘ নয়, এই জংগলবাড়ির কর্তা দেও, প্রতি সন্ধ্যাতে বাঘের রূপ নিয়ে এসে সব দেখে শুনে বেড়ায়। কোন দিকে সেই বুড়ো বাঘ চাইতো না, তার সামনে মানুষ কি জানোয়ার পড়লে পাশ কাটিয়ে যেতো। বুড়ো বাঘটা এই জঙ্গলের অংশ হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অপ্রত্যক্ষভাবে সবাই তার খোঁজখবর নিত।

আজ থেকে ঠিক দুবছর আগে এমনি শীতকালের সন্ধেবেলাতে পাণ্ডাসর্দার ও অন্যান্য রাভা পুরুষেরা আগুনের পাশে বসে হাড়িয়া পান করছিল, আচমকা অনেক-

গুলো গুলির আওয়াজ হোল। দূর থেকে অনেকগুলো কণ্ঠস্বর ওদের হুসিয়ার করে দিয়ে বললো, কেউ যেন জায়গা ছেড়ে না ওঠে—এক পা এগুলেই গুলি করবে। ততক্ষণ বুড়ো বাঘের আর্তনাদে সারা রায়ডাক আর মহাকালগুড়ি কাঁপছে। তারপর থেকে আর কেউ কোন-দিন ঐ বুড়ো বাঘটাকে দেখে নি।

বিচিত্র কম্বল গায়ে দিয়ে রাভাপুরুষরা এক এক করে এসে আগুনের চারপাশে বসছে। এই বিজনমাঠে সকলকে শালকাঠের আগুন প্রায় দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেই শীতের কুয়াশায় চিত্রবিচিত্র কম্বল গায়ে সুরাপানরত মূঢ় রাভা পুরুষরা সমস্ত চিত্রটাকে রাজকীয় করে তুলেছে। কারণ রাভারা বেশী কথা বলে না, তাদের প্রকাশভঙ্গি এবং উচ্ছ্বাস নিতান্ত সীমিত। আসলে এই অন্ধকারে লেলিহান অগ্নিশিখাই একমাত্র আশার সঞ্চার করতে পারে, অভয় দিতে পারে, বেঁচে থাকার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারে। বস্তিতে মেয়েরা তখন সমবেত গান ধরেছে—

চিকা জরেইঙ্ পান জেরেঙ্
ঘুঘু মাংসা হাপ্‌চা
ওকই মালাম্ মালাম্
বনেইঙ্
ওকই আপন হেপা ॥

আগুন, যূথবদ্ধ সুরাপান, নারীকুলের সমবেত গান—এই সমস্ত একটা বিন্দুতে এসে মিলে একাকার হয়ে যায়।

রায়ডাক অরণ্য মোটামুটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। উত্তরের পুরো অংশ শালবন, দক্ষিণে সেগুন আর টিকের আবাদ, পূবে গর্জন, শিমূল এবং বেতের গভীর জঙ্গল, পশ্চিমে পুরোটা নতুন আবাদ।

উত্তরে শালবনে শালপ্রাংশু মহাভুজ বনস্পতির দল সোজা আকাশের দিকে, তাদের কাণ্ডগুলি মোটা, বলবান মল্লদের নগ্ন জঙ্ঘার মতো। ঘন পাতার নিরবচ্ছিন্ন বুনোনি ভেদ করে সূর্য এখানে তাকাতে পারে না। আলো-আঁধারির একটা লুকোচুরি, আলোছায়ার জাল, মুঘল স্থাপত্যের কিছু জালি, রাজপুত বীরদের দীর্ঘ উজ্জ্বল সোজা দুএকটি আলোর বর্শা, ছুটন্ত ছায়া, করোটি চক্ষুর মতো কিছু কিছু অন্ধকার জায়গা এই অঞ্চলে পাওয়া যাবে। আরও ভেতরে শোনা যাবে কল্লা ঝিঁঝিঁ পোকাদের না থামা চিৎকার। বনমুরগীর চকিত একটি কি দুটি ডাক এবং তারপর অব্যর্থ চুপচাপ। আরও ভেতরে ঢুকলে কি শোনা যাবে, কি দেখা যাবে, কি ভাবা যাবে সেটা কেউ জানে না। তবে বড় বড় বাঘ এবং চিতা নাকি পাওয়া যায়।

দক্ষিণে সেগুন আর টিকের আবাদে একটা চন্দন-চন্দন গন্ধ পাওয়া যায়। এখানে গাছগুলো এখনও সাবালক হয় নি, কিন্তু ডালপালা পাতাতে গভীর হয়েছে। গাছগুলোর তলা নিড়িয়ে পরিষ্কার করা। ফলে একটা গাছের সঙ্গে আর একটা গাছের দূরত্বটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। শীতের দুপুরে কলসী কাঁখে ঘোমটা দেওয়া একদল বউ দেখে প্রথমে চমকে উঠলেও একটু দাঁড়াতে হবে এবং তারপর বোঝা যাবে এগুলো এক ঝাঁক ছায়া। তাছাড়া শূন্যে দোদুল্যমান রজ্জুর মতো কিছু কিছু ঝুলন্ত সূর্যরশ্মি, বনপথ জুড়ে জেব্রার পিঠের মতো আলোছায়া—ছায়া—আলো।

এই বন জুড়ে শীতকালে টিয়ারা একেবারে আসর জমিয়ে বসে। সারাদিন তাদের

কোলাহল। বনমুরগীদের আড্ডাও এইদিকেই। যদিও ওরা দারুণ চালাক, চট্ করে পাত্তা পাওয়া মুস্কিল। সন্ধ্যার দিকে প্রচুর লাফারু দেখা যাবে, সজারু ঝমঝমিয়ে হাঁটবে, খাটাসের বিকৃত ডাক শোনা যাবে, ফেউএর কান্নাতে ভয় লাগবে। কালো বনশুয়োরের দল মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে তচনচ করে গুপ্তধন খোঁজে।

পুবের গর্জন আর শিমুলবন এই বনের অবহেলিত অংশ। ওদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। নিরক্ষীয় লতাপাতাতে এইজন্যই বন খুব গভীর এবং চুপচাপ। শুধু মোটা মোটা ডাল জুড়ে বহু মৌচাক ঝুলছে। গাছের কাণ্ড এবং পাতা লাল ডেঁয়ো পিঁপড়েতে ভরা, বর্ষাকালে কালো টুসটুসে জোঁক বিষ্টির মত ঝুপঝুপ করে নিচে পড়ে। বিষাক্ত বিছে এবং সাতরঙ্গা ফড়িং দিনরাত ঘুরে বেড়ায়। সংগঠিত বনাঞ্চলে যেমন পথঘাট বানানো হয় এদিকে তেমন কিছু নেই। বুনো হাতীর দল এই দিকটাতে চড়ে বেড়ায়। দুমানুষ সমান হাতী ঘাসে সমস্ত অঞ্চল একেবারে অদৃশ্য। অন্ততঃ হাতে গোনা দশটি গণ্ডার এদিকে অবশ্যই আছে। সাক্ষাৎ যমদূতের মতো ভালুক দুপায়ে হেঁটে বেড়ায়। পশ্চিমের পুরো অঞ্চলে নানারকম দামী গাছের নতুন আবাদ। বালক দলের মতো লকলকে বাচ্চা গাছগুলো শিশিরে বিষ্টিতে আলোতে ঝলমল করে। জ্যোৎস্নারাতে চাঁদের আলো এই টাটকা গাছ-গুলোর কালচে লাল পাতা বেয়ে চলকে পড়ে। এখানে রাতে সাম্বার, নীল গাই আর চিত্রিত হরিণের দল ঝাঁক বেঁধে আসে কাঁচ পাতার লোভে। ঘুঘুর ঝাঁক সারাদিন খুব গভীর শান্ত স্বরে ডাকে। কালো ভালুক গলায় সরু একটা সাদা বৃত্ত নিয়ে পোকামাকড় ধরে খায়। নেকড়ের দল ওৎ পেতে বসে থাকে অন্ধকারে। রায়ডাকে ফেলিং বা গাছকাটা অনেকদিন বন্ধ। সেইজন্য রায়ডাকে কোথাও ফাঁকা, পোড়া, শূন্য জায়গা নেই। রায়ডাকের সারাটা দেহে কোন ক্ষতচিহ্ন পাওয়া যাবে না, এমনকি একটা জরুলচিহ্ন পর্যন্ত না।

শীতের শেষে ফুলে ফুলে শালবন ভরে যায়, সেই ফুলের তীব্র মিষ্টি গন্ধে চারিদিক ম ম করে। ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি এসে মধু সংগ্রহ করে। বড় বড় প্রজাপতি, খুদে মাছি, দলে দলে কাঠবেড়ালির ভিড় লেগে যায়। রাভা বস্তিতে এই সময় জ্বরের মহামারী সুরু হয়। শাল ফুলের গন্ধে নাকি জ্বর আসে, সেই জ্বর ঠিক রোগ নয়, একটা নেশা। প্রবল জ্বরেও মানুষ পুরো বেহুঁশ হয় না, কিন্তু ধাপে ধাপে অবচেতনার স্তর থেকে স্তরান্তরে নামতে থাকে, নামতে নামতে তারা আলো-অন্ধকারময় গোধূলিতে নানা ছায়ামূর্তি দেখে নানা সংলাপ শোনে, টুকরো টুকরো গানও কোথা থেকে ভেসে আসে। তারপর একটা কালো, খুব কালো, পর্দাতে চেতনা ঢাকা পড়ে, আর কিছু মনে থাকে না। বর্ষাকালে কাকের ডিমের মত কালো মেঘচাপা সূর্যালোকে কেমন জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে, মেঘমণ্ডলীর আড়ালে কেউ যেন হ্যাজাক লাইট জেলে দিয়েছে। দু একটি নিঃসঙ্গ ময়ূর এখনও দেখা যায়। তবে তারা পেখম মেলে না।

শরতে আকাশের রং জীবন্ত এবং তন্ময়, রায়ডাক ফরেস্টের বনস্পতিদের শীর্ষদেশ-গুলো এক নিরবিচ্ছিন্ন নিশ্ছিদ্র সবুজ মহাদেশের মতো মহাশূন্যে কাঁপতে থাকে, একটি বহুবৃদ্ধ ধনেশ পাখি তার বিরাট দুই পাখা দুপাশে ছড়িয়ে বাঁকানো বর্শার মতো ঠোঁট নিয়ে পৌরাণিক জটায়ুর মতো ঘুরে ঘুরে এই অরণ্যের শীর্ষদেশ প্রদক্ষিণ করে। আসলে পার্বত্য বর্ষার তমসা আর অন্ধকার রহিত, সূর্যের ওপর কোন ছায়া নেই, শিশুর হাতের তেলোর মত রোদটুকু মিষ্টি আর তুলতুলে,—ঠিক এই রোদে তেল না দেওয়া চুল খুলে রোদে বসে একজন রাভা রমণী অন্যের মাথার উকুন বাছে, এই রোদে এই রমণীদের ভীষণ

উষ্ণ এবং পরিত্রাতা মেরী মাতার মতো লাগে।

মহাকালগুড়িতে সকাল হোল। মোরগরা দারুণ ডাকাডাকি সুরু করেছে। এমনি সময়ে চার বুড়ো যারা রায়ডাকের পারে পেঁছে গিয়েছিল তারা হাঁফাতে হাঁফাতে বস্তিতে ফিরে এলো। বুড়োদের চোখ তখন প্রায় উল্টে যাবার অবস্থা, এত হাঁফাচ্ছে যে নিশ্বাস নিতে পারছে না। তখনও নারী পুরুষ বালক বালিকা সবাই বস্তিতে, সুতরাং একটা বিরাট জনতা মুহূর্তে সেই চারজন বুড়োকে ঘিরে ধরলো, কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ কেউ কিছু বুঝতেই পারলো না ব্যাপারটা কি। কিন্তু ভীষণ একটা কিছু ঘটেছে এটা বুঝতে কারও কোন অসুবিধে হোল না। পান্ডা সর্দ্দার এসে বুড়োদের ঝাঁকাতে লাগলো। কিন্তু বুড়োরা এতো ঝাঁকানি এবং পান্ডার চিৎকারেও তখনি কিছু বলতে পারলো না। প্রায় দুঘটি করে জল খেলো এক-একজন, তারপর চোখের কোনা মুছে, ঠোঁটের ওপর হাতের চেটো ঘসে, অনেকবার কাশতে কাশতে, থেমে থেমে, তারা যা দেখেছে খুলে বললো।

পান্ডা সর্দারই প্রথম কথা বললে। পঞ্চায়েতের সদস্য ছাড়া আর সবাইকে ঘরে ফিরে যেতে নির্দেশ দিল। পান্ডা পরিষ্কার গলাতে, ধীরে ধীরে, আজ বস্তির বাইরে কাউকে যেতে নিষেধ করলো। জঙ্গলের কাজ বন্ধ করে দিল।

রাভা পঞ্চায়েতের পাঁচজন সদস্য এবং তার মুখিয়া পান্ডা সর্দ্দার কিছুতেই বুঝতে পারছিলো না যে সমস্যাটা কোনদিক থেকে বিচার করবে। রাভারা চায় সকাল হবে, দুপুর হবে, সন্ধ্যা হবে, রায়ডাক প্রবহমান থাকবে, জয়ন্তিয়া পাহাড়ের সেই চূড়াটা বরফের টুপি পরে পাদ্রীসাহেবের মতো প্রার্থনায় রত থাকবে। এই নির্ভুল প্রাকৃতিক সংগঠন এবং নিখুঁত নৈমিত্তিক রোজনামচার বাইরে যদি কোন ব্যতিক্রম আসে, কোন ঘটনা ঘটে, কোন প্রতিরোধ আসে, তবেই তারা ভাবে এই আদি প্রকৃতির ওপর তাদের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে গেছে। আজকের ঘটনাতেও সেই নিরাপত্তাবোধের অভাবে পঞ্চায়েত অসহায় বোধ করল।

রাভাদের পঞ্চায়েৎ কেবলমাত্র বিয়েসাদির বিচার আচার করে, জরিমানা আদায় করে ভয় দেখায়। কোন ছোকরা কোন ছুকরীর সাথে লটপট করল, অমনি তার দুশোটাকা জরি-মানা হলো। কোন রাভাই একসঙ্গে দুশো টাকা বের করতে পারবে না, ফলে পান্ডা সর্দার তাকে টাকা ধার দেবে। কিন্তু পান্ডাই বা একসঙ্গে এতো টাকা পাবে কোথায়, সুতরাং সলসলাবাড়িতে সুকুল কাঁইয়া খুতি নিয়ে বসে আছে, মাসে শতকরা দশটাকা সুদে টাকা আনবে, প্রতিমাসে তলব বাঁটবার সময় পান্ডা সুদের টাকা কেটে নেবে, না কুলোলে ক্ষেতের শস্য দিয়ে পুরো করতে হবে, তা না হলে ব্যাগার খাটতে হবে। এই ব্যবসায়ে সুকুল কাঁইয়ার সঙ্গে পান্ডার ভাগ একেবারে আধাআধি। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা এত সহজে সব-সময় মেটে না। মাঝে মাঝে খুব গোলমাল হয়ে যায়। তখনই পঞ্চায়েতের বড় মুস্কিল। সে মুস্কিল সনাতন এবং ঐতিহাসিক। তার উদাহরণ একবছর আগে এই মহাকালগুড়িতেই পাওয়া গেছে।

ছেলেটার ডাক নাম ভূপিন, ভালো নাম কামেন, স্কুলে নাম লিখিয়েছিল সান্তারাম। ছেলেটা সন্তালপুরের মিশনারি স্কুলে পড়তো। পড়তে পড়তেই উপজাতি কল্যাণ বিভাগ থেকে একটা চাকরী পেল। বেশ ভালো বেতন। ছেলেটির কাজ হোল রাভাদের আইডিন খাওয়ানো এবং লজ্জাবতীলতা থেকে সংক্রামিত ওদের পায়ে যে বিষাক্ত ঘা তার নিরাময়ের জন্য উপযুক্ত ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করা। সান্তারামকে জেলা হাসপাতালে এই জন্য তিন-মাস তালিম দেওয়া হলো। কিন্তু তালিম নিয়ে সান্তারাম ফিরে এলে পান্ডা তার পেছনে

লাগলো। পান্ডার সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে না গিয়ে সান্তারাম নিঃশব্দে নিয়মিত কিছু-কিছু বাছাই করা গলগন্ড এবং আসামী ঘায়ের রুগীর চিকিৎসা করে চললো। চিকিৎসায় হাতে হাতে ফল পাওয়া গেল। রোগযন্ত্রণাতে কাতর রোগীরা পান্ডার অপ্রত্যক্ষ চোখ-রাঙ্গানী গ্রাহ্য না করে সান্তারামের চিকিৎসা সাগ্রহে গ্রহণ করলো।

রায়ডাকের জল এবং জঙ্গলের লতা রাভাদের কাছে পবিত্রতা এবং অন্নদাতার প্রতীক। কিন্তু রায়ডাকের আইডিনহীন জল ডাইনী আর বনের লতা সংমা,—তা থেকেই রাভা-জাতির দুই রোগ গলগন্ড এবং দূষিত ক্ষতের জন্ম, এটা প্রমাণিত হোক পান্ডা তা কিছুতেই চাইছিল না। সান্তারাম প্রথম কিস্তিতে জিতে গেল। পান্ডা তালে থাকল কবে তাকে বাগে পাওয়া যায়। সান্তারামকে কিন্তু সহজেই বাগে পাওয়া গেল। সান্তালপুরের হেলথ সেন্টারে একটি খৃষ্টান মেয়ে হেলথ্ অ্যাসিস্টান্টের কাজ করে। তার কাজের এলাকার মধ্যে মহাকালগুড়িও পড়ে। মেয়েটি ছিপছিপে, দুই বেণী করে চুল বেঁধে রোদে মুখ লাল করে সাইকেলে সান্তারামের ডিসপেনসারিতে শুক্রবার আর সোমবার আসতো। সান্তারাম খুব মন দিয়ে কাজ করতো, আর মাঝে মাঝে তার ছোটছোট চোখ জ্বলজ্বল্ করে সেই মেয়েটির দিকে তাকাত। ক্রমে ক্রমে মহাকালগুড়ি, সন্তালপুর, সলসলাবাড়িতে মাঝে মাঝেই ওদের দুজনকে একসঙ্গে দেখা যেতে লাগল। এর কিছু দিন পরেই সান্তারামের বাবা পান্ডাকে নালিশ করলো যে সন্তালপুরের গির্জাতে সান্তারাম খৃষ্টান মতে ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করেছে। এবং সান্তারাম নিজেও খৃষ্টান হয়েছে। সেদিন সন্ধ্যাতেই রাভা বস্তির ঐ বিখ্যাত মাঠে রবরবিয়ে পঞ্চায়েৎ বসলো। সান্তারাম কিন্তু এটা আগে থেকেই অনুমান করে-ছিল এবং আলিপুরদুয়ার কোর্টে এস. ডি. ওর সঙ্গে দেখা করে সাবডিভিশনাল মেডিকেল অফিসারের সুপারিশে আত্মরক্ষার জন্য পুলিশের সাহায্য পেল। সন্ধ্যাবেলাতে যখন পঞ্চা-য়েতে সান্তারামের কঠিনতম শাস্তির কথা আলোচনা হচ্ছে তখন ফরেস্ট রেঞ্জারকে নিয়ে থানার বড়বাবু এলো। বড়বাবু এবং রেঞ্জারবাবু পান্ডাকে ডাকিয়ে পরিষ্কার ভাবে জানালো, সান্তারামের বিবাহ এবং ধর্মান্তর পুরোপুরি আইনসম্মত। পান্ডার বা পঞ্চায়েতের বিচার করার কোন এক্তিয়ার নেই; তাছাড়া সান্তারাম আর তার স্ত্রী দুজনেই গভরমেন্টের চাকুরে, তাদের ওপর কোন অত্যাচার হলে পান্ডাকে পুরোপুরি দায়ী করা হবে। এরপর পঞ্চা-য়েতের পাঁচবুড়ো মাথা নীচু করে যে যার ঘরে ফিরে গেল। সান্তারাম সেদিন সন্ধ্যাতে হা হা করে সারা গা কাঁপিয়ে হেসে উঠলো, হাসতে হাসতেই বললো, সর্ষে ক্ষেতে কাক তাড়াবার জন্য বাঁশের ওপর কালো পাতিল বসানোর কোন প্রয়োজন নেই, পঞ্চায়েতের পাঁচ-জন মেম্বারকে পাঁচকোনায় দাঁড় করিয়ে দাও, এই জীবন্ত কাকতাড়ুয়াদের দেখে কোন কাকের সাধ্যও থাকবে না সর্ষেক্ষেতের ত্রিসীমানাতে আসবার।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল থাইচরণের বুড়ী মাকে নিয়ে। ঐ বৎসর বর্ষাশেষে মহাকাল-গুড়িতে খুব খারাপ ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিলো। সান্তারাম আর তার স্ত্রী রাতদিন খেটে রুগীদের চিকিৎসা করতে লাগলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় চার পাঁচটি শিশুর মৃত্যু ঠেকানো গেলো না। কিন্তু পান্ডা সর্দার আর পঞ্চায়েতের চারজন সদস্য ঠিক করলো যে থাইচরণের মাকে ডাইনী ধরেছে, আর তার জন্যই এই অসুখ বিসুখ, শিশুমৃত্যু। ফলে গোপনে পান্ডা থাইচরণের মাকে হত্যা করার চক্রান্ত করলো। ডাইনী চক্রের মারণ উচাটনের কুসংস্কারের ফলে এখনও এই অঞ্চলে প্রচুর বৃদ্ধাকে হত্যা করা হয়। সান্তারাম এই চক্রান্তের খবর কোনভাবে জানতে পেরে রেঞ্জার সাহেব এবং পুলিশের সহায়তায় বুড়িকে খুনের

হাত থেকে বাঁচায়।

আজ এসেছে তৃতীয় চ্যালেঞ্জ। আজও পান্ডা আর পঞ্চায়েতের আর চারজন সদস্য প্রচুর বিড়ি পুড়িয়ে, রাশি রাশি হাড়িয়া গিলে, সারাদিন আলোচনা করেও কোন সমাধান খুঁজে পেল না। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যার আগে আগে তারা রেঞ্জ অফিসে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিল।

পান্ডা লণ্ঠন হাতে নিয়ে আগে আগে চললো, তার পিঠে বন্দুক তার কোমরে টোটার বেল্ট, পেছনে মশাল হাতে চারজন বৃদ্ধ পঞ্চ তাকে অনুসরণ করলো।

পরদিন সকালে রেঞ্জারবাবু রাভা বস্তিতে এলো। সমস্ত রাভা নারীপুরুষদের নিয়ে ঐ মাঠে মিটিং ডাকলো। রেঞ্জারবাবু এবং পঞ্চায়েতের সদস্যরা সবাইকে বুঝিয়ে দিল, যাকে রায়ডাকের তীরে হাতীঘাসের বনে দেখা গেছে, সে প্রকৃতপক্ষে গভরমেন্টের সম্পত্তি। তাকে রক্ষার দায়িত্ব রাভাদের। কিছুদিন ধরে পোচারদের উৎপাতে জঙ্গলে কোন মূল্যবান প্রাণীকেই রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং রাভাদের নজর রাখতে হবে। কারণ আশেপাশে কিছু সাংঘাতিক পোচার আছে। তারা গন্ডারের নাসাখড়্গ পর্যন্ত কেটে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং রেঞ্জারবাবু পান্ডার সবাইকে সজাগ থাকতে বললো। ঘটনাটা ডি. এফ. ও. অফিসে রিপোর্ট করার জন্য সেই সকালেই রেঞ্জারবাবু রাজাভাতখাওয়া রওনা হয়ে গেল। সন্ধ্যার পর সমস্ত ঘটনাটা নিজে গিয়ে দেখে আসবার জন্য রেঞ্জারবাবু পান্ডাকে নির্দেশ দিল। পান্ডার যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য রেঞ্জ অফিস থেকে একটা পাঁচ ব্যাটারীর টর্চও এসে গেল।

পান্ডা সমগ্র ডুয়ার্সে একজন নামকরা শিকারী। পায়ের দাগ দেখে জন্তুর নাম, বয়স, লিঙ্গ নির্ণয় করার দুর্লভ ক্ষমতা পান্ডার আছে। তাছাড়া গভীর বনে ঝরাপাতার মর্মর শুনে পান্ডা বলে দিতে পারে কোন জন্তু হাঁটছে, তার আয়তন কত বড়, কতো দূরে কোন দিকে মুখ করে এগুচ্ছে। এ বনের সমস্ত অঞ্চল, প্রবেশ এবং নির্গমন পথ, কোন অংশে কোন সময়ে কোন জন্তু পাওয়া যাবে—এ তথ্য পান্ডার নখদর্পণে। বনেবাদাড়ে পান্ডার একমাত্র সঙ্গী তার বন্দুক, টোটার বেল্ট। পান্ডা গভীর বনে যখন যায় তখন একেবারে একা একা যায়। জোছনাতে নিজের ছায়াটাকে পর্যন্ত তখন অসহ্য মনে হয়। গভীর রাত পর্যন্ত মদ্যপান করার পর পান্ডা অধিকাংশ দিন রাতেই বনে যায়। আসলে পান্ডার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে অরণ্য আছে। এই অরণ্য তার অস্তিত্বেরই অংশ, জঙ্গলের বোঁটাতে সে ফলের মত ঝুলছে।

পান্ডা সম্পর্কে এ ব্যাপারে দুটো মত প্রচলিত আছে। পান্ডার চরিত্রে নারীর প্রতি একটা প্রচন্ড অনাসক্তি আছে। রাভাদের মধ্যে এটা খুবই দুর্লভ। রাভা রমণীদের গায়ের রং শরৎকালের মধ্যরাত্রির মতো পান্ডুর, মনে হয় সেই রঙের মধ্যে গভীরতা আছে, স্তরভেদ আছে। কিন্তু পান্ডা ওদের দিকে ফিরেও তাকায় না। তাই রাভারা বলে পান্ডা নানা তুকতাক জানে, আর তারই ফলে রায়ডাক জঙ্গলের ভেতর দিকে রোজরাতে মৃতাপত্নীর সঙ্গে দেখা করে, কথা বলে।

পান্ডা সম্পর্কে দ্বিতীয় মত হলো সে ভুটান থেকে পাচার হওয়া নানা প্রকার মূল্যবান জিনিষের স্মাগলিং করে। তাই বনে জঙ্গলে সারারাত লোকচক্ষুর অন্তরালে সে তার কাজকর্ম চালায়।

পান্ডার লম্বা লম্বা লালচে চুল পিঠে ছড়িয়ে পড়ে, কপাল ঘিরে একটা কালো সুতো

বাঁধা, বড় চুল যাতে কপালের ওপর এসে না পড়ে, নাকটা রাভাদের মত বোঁচা নয় একটু তীক্ষ্ণই বলা চলে, চোখ দুটো গোলগোল, কিন্তু ঠোঁটটা খুব লাল। রাভাদের দাড়িগোঁফ এমনিতেই কম। যেটুকু আছে সেটুকুও পান্ডা কোনদিন কামায় না।

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা পান্ডা একটা খাকি হাফ প্যান্ট, কালো রংএর একটা গোলগলা গেঞ্জি, লাল কেডস পরে। গলায় একটা নিকেল জাতীয় ধাতুর মালা। পান্ডা কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে যখন বনের পথে একা একা ঘোরে তখন তাকে কেমন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী অথবা যীশু যীশু লাগে।

আসলে অরণ্যের সঙ্গে পান্ডার সম্পর্কটা মানবিক এবং মমতায় ভরা। পান্ডা অরণ্যের বিশুদ্ধতা এবং প্রাণিজগতের সংরক্ষণে বিশ্বাসী। এই জঙ্গলকে বাঁচানোর জন্য সে তার লম্বা রুক্ষ লাল চুল, তামাটে দেহ, লাল ঠোঁট নিয়ে পরিত্রাতার মতো ক্রুশে বিদ্ধ হতে রাজি।

পান্ডা এই দুপুর রাতে সরকারী হুকুমে সরেজমিনে তদন্ত করতে যাচ্ছে সেই ঘটনা, যা নিয়ে সারাটা মহাকালগুড়ি তোলপাড় হচ্ছে। রাত গভীর, অন্ধকার সূচীভেদ্য হলেও পান্ডা টর্চ জ্বাললো না। দুপাশে ঘন হাতীঘাস আর আসামীলতার জঙ্গল, মাঝখানে আইবুড়ো মেয়েদের সিঁথির মতো পায়ে হাঁটা পথ, শীতের কুয়াশাতে কম্পমান, একটা যবনিকা যেন সরে সরে যাচ্ছে। বেগবান ঠান্ডা বাতাস সরীসৃপ-নিঃসৃত শিষের মতো চরাচরকে চাবুক মারছে, আকাশের অন্ধকার এবং তারকামন্ডলীর নিস্তব্ধতা একটা সমান্তরাল রেখা হয়ে রায়ডাকের বৃক্ষরাজীর শীর্ষদেশে মিশে গেছে। নিহত নিশি ফাঁসির দড়ি গলায় দিয়ে বনস্পতির ডালে ডালে ঝুলছে। নতুন আবাদে অনেকগুলো বার্কিং ডিয়ার ডেকে উঠলো, কোথা থেকে একটা নতুন চিতাবাঘ ক্রমে কয়দিন ধরেই খুব ডাকাডাকি করছে, রাতের পাখিগুলো খুব দ্রুতলয়ে অনেকক্ষণ ডেকে ডেকে একেবারে থেমে গেল। পান্ডা স্পষ্ট বুঝতে পারল একটা নিঃসঙ্গ বাঘ নদীতে জল খেয়ে ফিরে যাচ্ছে, একদল সাম্বার লম্বা লম্বা পায়ে ঝরাপাতাতে ঝরনার মতো শব্দ তুলে উধাও হলো, সেই পেঁচাটা যা এই নদীর পারের শিরিশ গাছটাতে বসে বসে রোজ ডাকে, আজও ডাকছে। পান্ডা একটুও তাড়াহুড়ো না করে সেই নির্দিষ্ট জায়গাতে এসে পোঁছল। এতক্ষণ পান্ডা তেমন কিছু ভাবে নি। কিন্তু এখন সে নির্দিষ্ট; চারপাশ থেকে উঁচু সেই কাছিমের পিঠের মতো ঢিবিটার ওপর দাঁড়িয়ে বুঝলো এবার তার সঙ্গে মুখোমুখি হতে হবে।

পান্ডা ভীষণ ভয় পেলো। মুখোমুখি হওয়া একটুও মুস্কিল না, এই কাছিমপিঠ ঢিপির ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ,—একটা বোতাম টিপলেই পিচকারির মতো আলোর ঝটকাতে সব সলক করে দেবে এবং সে তার অদৃষ্টকে স্পষ্ট দেখতে পাবে। কিন্তু পান্ডার হাত যেন অবশ হয়ে এলো। সে জোরে জোরে নিশ্বাস নিলো। আকাশে তাকাল। পান্ডা বুঝলো তার পায়ের নিচে কাছিমের পিঠ নড়ছে। কাছিমটা যদি চলতে চলতে রায়ডাক নদীর গভীরে তাকে পিঠে নিয়ে ডুব দেয় তাতে ক্ষতি নেই,—তবু ঠিক এখন কোনপ্রকারে সচেষ্ট, ক্রিয়াশীল হতে পারবে না, সে যাকে দেখতে এসেছে তাকে দেখতে চায় না।

পান্ডা চোখ বুঁজে রাভাদের গ্রামলক্ষ্মী এবং একমাত্র দেবী রুনতুক বাশেকের ধ্যান করতে লাগলো। রুনতুক্ আর বাশেক দুই বোন। একটা লাল নিখুঁত মাটির পাতিলের গলা পর্যন্ত চাল ভর্তি করে পাতিলের মুখে একটা ডিম বা তোঁচা বসিয়ে দেওয়া হয়।

তারপর ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণে চিংসাংগং বা চারকোনা বাঁশের মাচার ওপর সেই পাতিলটা বসিয়ে দেওয়া হয়,—এই বিমূর্ত বিগ্রহের নামই রুনতুক্। ঠিক এমনি আর-একটি ঘট একই উপচারে সাজিয়ে রুন্তুকের ডানপাশে বসালে সেটাই বাশেক নামে পূজিতা হয়।

পান্ডা মনে মনে মানত করতে লাগলো,—রুন্তুক্-বাশেক, আমাকে শক্তি দাও। ধূপদীপ দেবো। সিঁদুরে রাঙাব। কাপাস্ তুলো দিয়ে সাজাব। পিটুলি দিয়ে নৈবেদ্য দেবো। সাদালাল কাপড়ের টুকরোর অংগাভরণ, মদ, শুয়োর আর আতপচালের ভোগ দেব, —আমার দুটো হাত চালু রাখ, পায়ের নিচের কাছিমটাকে থামাও, আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করো।

অনেকক্ষণ পরে, কতক্ষণ পরে পান্ডা জানে না, আস্তে আস্তে চোখ খুললো। পান্ডা এবার তার হারানো শক্তি ফিরে পেতে লাগলো। হাত নাড়িয়ে দেখলো ঠিক আছে। পা দুটো শক্ত হয়ে ক্রমে মৃত কাছিমের পিঠে ঠিকঠাক, শুকনো জীবের চারপাশে লালার সঞ্চার বুঝতে পারছে।

পান্ডা রুন্তুক্-বাশেক দেবী স্তোত্র উচ্চস্বরে আবৃত্তি করতে সুরু করলো—

হে রুনতুক্ বাশেক তোমরা দুটি বোন,
ওগো রুনতুক্ তোমাকে দিলাম সোনার ঘর
বাশেক, তোমাকে দিলাম রুপার ঘর,
তোমরা দয়া করো।
হাতীর পিঠে চেপে রাগ করে চলে যেও না
গোসা করে ঘোড়ার চড়ে পালিও না
হে দুই দেবী, আমাদের কৃপা কর।
হল জল জি নেউ, হল জল জি নাই।
সোনা নগউ না বউ, সোনা নক্তং নাঔ।
হত্তিরায় তাসায়
ঘড়া বউ তাসায়
হল জল জি নেউ, হল জল জি নাই।

পান্ডার কণ্ঠনিঃসৃত এই ছন্দোবন্ধ মন্ত্র শব্দব্রহ্ম হয়ে এই মহারণ্যের সমস্ত পশুপক্ষীর কণ্ঠনাদ, শুষ্ক বৃক্ষপত্রের মর্মরধ্বনি এবং সরীসৃপ বাতাসের কশাঘাতের আর্তনাদকে সমাধিস্থ করলো। মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত এই কবিতার পঙ্ক্তি অটবীমধ্যে মহাসমুদ্রের মতো গর্জন করতে লাগলো, শব্দব্রহ্মের আদিনিনাদ প্রবল শৈত্যপ্রবাহে এবং সূচীভেদ্য অন্ধকারে খদ্যোততুল্য স্বর্গীয় জ্যোতিতে প্রাণের সঞ্চার করলো। সকলের অলক্ষ্যে আরও একবার প্রমাণ হলো,—কবিতা অনাদি এবং অমর।

পান্ডা টর্চ জ্বাললো। টর্চটা জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে চোখ ধাঁধিয়ে গেলো, কিছুই দেখতে পেল না, তারপর অন্ধকারের তৃতীয়নেত্রনির্গত সেই আলো জ্যোতির্বলয়ে পরিণত হলো, দেবদেবীদের ছবিতে তাঁদের মাথার পেছনে যেমন একটি জ্যোতির্বলয় থাকে কতকটা তেমনি। সেই আলোর বলয় অনেকক্ষণ এদিক ওদিক, গাছের গুঁড়িতে, গাছ থেকে নামা মোটা মোটা লতাতে, একটা ছুটন্ত শেয়ালের গায়ে ঘুরে ফিরে এসে ওর মুখে পড়লো। ওর সারাটা কালো শরীর রাতের অন্ধকারে মিশে আছে, রাতের গা থেকে ওর শরীর আলাদা করা যাচ্ছে না, শুধু জ্যোতির্বলয়ের নীলাভ আলোতে ওর মুখখানা ভেসে উঠলো। ও যেন

কোন অবতার, অন্ধকার রাতের গর্ভ থেকে মাথা তুলে উঠে আসছে—ত্রাতারূপে।

পান্ডা দেখলো ওর চোখদুটো সাধারণ আর দশটা হাতীর মতো ছোট এবং কিছুটা বর্তুলাকার। কিন্তু সেই চোখে পুরাতন পৌরাণিক দিঘীর জলের মতো কালচে হিমেল গভীরতা। এই চোখ দুটোকে প্রথমে নিষ্ঠুর মনে হতে পারে কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে তাতে বিষণ্ণতাই প্রধান। বিরাট শুঁড় ঝুলছে, গালের দুপাশ থেকে বিরাট দু'টো মোটা দাঁত মসৃণ কিন্তু ভীষণদর্শন এবং প্রায় ভূমি ছুঁই ছুঁই।

পান্ডা আর দ্বিতীয়বার টর্চ জ্বালেনি, সুতরাং ঐ গজকে আরেকবার দেখার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কিংবদন্তি অনুসারে মুমূর্ষু হাতীকে তাড়িয়ে দেবার পর গভীর বনে কোন খরস্রোতা নদীর তীর ছাড়া আর অন্য কোথাও তার যাবার জায়গা থাকে না। সেই বৈতরণীতীরে সে ধীরে ধীরে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। হাতীর দেহে মৃত্যু অকস্মাৎ আসে না। সব স্টেশনে থামা মন্থর রেলগাড়ির মত মৃত্যু আস্তে আস্তে ঝিকমিকিয়ে আসে। কিন্তু কি করে কে জানে, শকুনরা সব কিছু টের পেয়ে যায়, জঙ্গলের আকাশে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়তে থাকে। বনের নানা অংশ থেকে শেয়াল, নেকড়ে অন্যান্য ছ্যাঁচড়া মাংসাশী প্রাণীরা মৃত্যুপথযাত্রী গজবৃদ্ধের আশেপাশে জড়ো হতে থাকে। মাটির তলা থেকে অগণিত লাল পিঁপড়ে, গাছের কান্ড বেয়ে বিষাক্ত লাল ডাঁই, কোথা থেকে কেউ জানে না, অগণিত খুদে মাছি হাতীটার চারপাশে একটা ব্যূহ রচনা করে। তারপর আস্তে আস্তে হাতীটা মারা যায়। চারপায়ের ওপর মুখ থুবড়ে বসে থাকলেও প্রথম কয়েকদিন কিছুতেই মনে হয় না হাতীটার দেহে প্রাণ নেই। আস্তে আস্তে মৃত গজের পেট ফুলতে আরম্ভ করে, সমস্ত দেহটা বেলুনের মতো ফুলে তিনগুণ হয়ে যায়। কিন্তু ফোলারও একটা সীমা আছে, সেই সীমা অতিক্রম করলেই শবদেহের নানা অংশ ফেটে ফেটে হাঁ হয়ে যায়। পুচ্ছকে বিন্দু ধরে শুঁড়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যদি একটা সরলরেখা টানা যায় তবে সেই সরলরেখা থেকে ম্যাপের সাংকেতিক উপনদীর মতো অগণিত ফাটল পিঠ বেয়ে পেটের তলা পর্যন্ত এবং সেই সব ফাটলগুলির মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট সাদা কৃমিকীট কিলবিল করে : শেয়াল আর নেকড়েরা প্রথমেই শুঁড়টাকে খেয়ে ফেলে। কিন্তু শকুনরা লেজের দিক থেকেই সুরু করে, ডাঁই আর পিঁপড়ের দল শবের পশ্চাদ্দেশ দিয়ে দেহের অভ্যন্তরে চলে যায়, পানভোজনের পর শুঁড়হীন মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এবার শেয়ালরা ক্রমশ চারটি পা, হৃৎপিন্ড অনায়াসে খেয়ে নেয়, ফলে, বুকের দুপাশে, যেখানে পাঁজরা, সেখানে গুহামুখের মতো দুটো গর্ত দিয়ে একেবারে পেটের ভেতরটা পর্যন্ত দেখা যায়। দুর্গন্ধে বনের বাতাস আহত হয়, সুরেলা পাখিরা বনান্তরে উড়ে যায়। শবের দেহনিঃসৃত রস এবং পচা মাংসের স্বাভাবিক রূপান্তরে যে জৈবিক সারের সৃষ্টি হয় তা থেকে নতুন নতুন আত্মজোলা চারাগাছ একমাসের মধ্যেই মাথা তোলে। শবদেহে পরিত্যক্ত মাংস এবং চামড়া মাটিতে মিশতে থাকে।

এমনি করে অনেকদিন কেটে যাবার পর বর্ষা আসে, তীক্ষ্ণ এবং অবিরত বৃষ্টিধারায় ধুয়ে ধুয়ে কঙ্কালটা পরিষ্কার হয় এবং ফুলে ফেঁপে ওঠা সেই খরস্রোতা নদী গভীর বিস্তৃত হয়ে মহাগজের কঙ্কালকে ডুবিয়ে কুলুকুলু নিনাদে চৈত্রমাস পর্যন্ত অবিশ্রান্ত বয়ে যায়। তারপর সেই বিরাট কঙ্কালটা আর দেখা যায় না।

ঠিক রায়ডাকের পরে, যেখানে হাতীঘাসের বিরাট জঙ্গল বাঁশঝাড়টাকে ঘিরে রেখেছে, সেইখানে হাতীটা দাঁড়িয়ে আছে। হাতীটা একদম চুপচাপ। খরস্রোতা রায়ডাক এখানে

ভীষণ তীব্র এবং অসংখ্য পাথরের বাধাতে ফোঁসফোঁসাচ্ছে,—ফলে হাতীঘাস, বাঁশঝাড় আর বৃদ্ধ হাতীর জলে প্রতিফলিত ছায়া ছিন্নভিন্ন, অবয়বহীন, খণ্ডখণ্ড এবং পরিবর্তনশীল। শীতের সকালের আলোতে এই ছায়াগুলি সঞ্চরণশীল অনেকগুলি কচ্ছপ, দুপুরে সূর্য পশ্চিমগামী হলে এই টুকরো টুকরো ছায়াগুলি যেন জোড়া লাগতে থাকে এবং অবশেষে বিকেলে বিসর্জন দেওয়া কষ্টিপাথরের ভৈরবমূর্তি হয়ে অন্ধকারে লয় পায়।

পরদিন সকালে নদীর পুবপারে রাভা পুরুষরমণীদের প্রচণ্ড ভিড় হলো। সবাই সমবেত হয়ে অনেকক্ষণ ধরে ওকে দেখতে লাগলো। সমবেত রাভা জনতা সার্বজনীন হতাশা, —সেইজন্যই মহৎ, মহাসমুদ্রে মধ্যরাত্রির মতো প্রগাঢ়, বর্ষণক্লান্ত দিবাশেষে রক্ত সন্ধ্যার মতো লোহিত, সন্ধ্যাতে শিবাধ্বনির মতো পিঙ্গল।

সন্ধ্যার দিকে সান্তারামের সেই খৃষ্টান বউ-ই প্রথম কথাটা তুললো। তারপর কথাটা জোর পেল আরও তিনজন তরুণীর গলাতে এবং অতঃপর একটা শ্লোগানের মতো মুখে মুখে ফিরতে লাগলো প্রস্তাবটা। আদিবাসীদের জীবনে খৃষ্টান হওয়া তাদের জীবনের মূল্যবোধের কোন মৌলিক পরিবর্তন আনে না। ফলে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হলেও কুলাচার লোকাচার, ব্রত, পুজো, পার্বণ মানতে কোন বাধা নেই। সুতরাং সান্তারামের লালটুকটুকে, নাকখ্যাঁদা, লম্বা বউটা যখন রুনতুক-বাশেকের সাবজনীন পুজোর প্রস্তাব দিল তখন সবাই স্বাভাবিক ভাবেই তা গ্রহণ করলো। রাভারা যেন একটা মুক্তির পথ খুঁজে পেলো।

পরদিন সারাদিন সেই ঐতিহাসিক মাঠে হাতীটাকে ডানহাতে রায়ডাকের ওপারে রেখে চললো পুজার আয়োজন। সেই আয়োজন, চলাফেরা, আন্দোলনের মধ্যে রাভারা আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হতে লাগলো।

সন্ধ্যাবেলাতে লকলকে আগুন জ্বললো। অনেকগুলো দীর্ঘস্থায়ী মশাল জ্বালানো হলো। ফলে মাঠটা আলোকিত কিন্তু তবু পবিত্র। এই আগুন রায়ডাকের থমথমে বিজনতা রক্ষা করে, অন্ধকারের মৃদঙ্গ থেকে উত্থিত নদীর কলতানকে বাঁচিয়ে রাখে, মশালের আলোতেও শিশিরসিক্ত অন্ধকার মন্দিরের গর্ভমুখের মতো শুচিস্নিগ্ধ।

পাণ্ডা নিজেই পুজো করলো। অনেকগুলো শুয়োর বলি দেওয়া হলো। মুরগীদের গলা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো রুনতুক-বাশেকের বেদীর সামনে। মুণ্ডহীন মুরগীদের দেহগুলি ঝটপট করতে লাগলো, রক্তে রক্তে লাল হয়ে গেল মশালের আলো। রাত বাড়ছে, তারারা দিক পরিবর্তন শুরু করেছে, বনভূমির কীটপতঙ্গের ডাক দীর্ঘবিলম্বিত, দূরে কোথাও সেই নবাগত চিতাটা ডাকছে। সান্তারাম হঠাৎ দাঁড়িয়ে, মুঠোহাত আকাশে তুলে, বক্তৃতা দিতে শুরু করলো। পাণ্ডাও এই সময়ে উঠে দাঁড়ালো এবং সান্তারামের কোমর ডানহাতে জড়িয়ে নাচ শুরু করলো। হঠাৎ সমবেত রাভা পুরুষ রমণীরা আবিষ্কার করলো যে, 'হায়! হায়! আমরা আমাদের শারীরিকভাবে বেঁচে থাকার, সমস্ত হতাশাকে জয় করবার একমাত্র সঞ্জীবনী আমাদের রাভা নাচকে ভুলে ছিলাম,—নাচো, নাচো, নাচো, সবাই নাচো নাচো।'

মাঠ জুড়ে সেই লকলকে আগুনের আলোতে, চতুর্দিকে মশাল পরিবেষ্টিত হয়ে নৃত্যরত নারীপুরুষদের ছায়াগুলো চঞ্চল এবং তৎপর হলো, অরণ্যের জমাট প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে মাদলের বোল রায়ডাকের জল সাঁতরে একরাশ কাঁচের চুড়ির মতো জয়ন্তিয়া পাড়াড়ে ভেঙে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হলো।

এবার শেষ রাতের তারারা বুঝি প্রখর হলো, কারণ মশালগুলো নিভে গেছে এবং

সেই পূত অগ্নিশিখাও নিভু নিভু, তবু এই মাঠ মেটে-মেটে আলোতে একটু বা সলক। সমবেত নাচের শেষে বিবাহানুগ বা বিবাহাতিগ অবিমিশ্র যৌনাচার ছাড়া রাভারা বাঁচতে পারবে না, তাই নিভু নিভু আগুন এবং প্রখর তারকামণ্ডলীর জ্যোতিতে আলোকিত মাঠের চারপাশে পুরুষ এবং নারীরা নির্বিচারে সুরতক্রিয়াতে লিপ্ত হলো। লুপ্ত হলো রক্ত-সম্পর্কের নিষেধ, স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততা, বয়স এবং সম্পর্কের বাধা।

একটা অন্ধকার কোনাতে মাটিতে পোঁতা বাঁশ ধরে পান্ডা একা একা দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ সান্তারামের বউ খুঁজতে খুঁজতে তার সামনে দাঁড়ালো। পান্ডা চেয়ে দেখলো মেয়েটি আলুলায়িতকুন্তলা, এই প্রচণ্ড শীতেও ঘর্মাক্ত, তার শরীর থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধ আসছে। মেয়েটি পান্ডাকে জড়িয়ে ধরলো। বলশালিনী চিতাবাঘের মত মেয়েটি পান্ডাকে হিঁচড়ে নিয়ে চললো আরও অন্ধকারের দিকে। পান্ডা এতো নেশাতেও ঠিক বুঝতে পারলো যে শেষ বারের মতো সান্তারামের বউ-এর কাছে হেরে যাবে। কারণ পান্ডা একটা নিভন্ত আগ্নেয়গিরি। পান্ডা প্রচণ্ড ঝটকাতে সান্তারামের বউকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিল, তারপর—বিশ্বচরাচরকে চমকে দিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠলো। প্রথমে সেই চিৎকার একটা নিঃসঙ্গ বার্কিং ডিয়ারের ডাক হলো এবং জ্যামুক্ত তীরের মতো অরণ্যে প্রবেশ করেই ফিরে এলো হস্তিযূথের বৃংহতি হয়ে, অবশেষে জয়ন্তিয়াপর্বতের পাদদেশে শার্দূলগর্জন হয়ে অশ্রুত।

পরের দিন। সন্ধ্যা। মাঠে আগুন। পান ভোজন। বস্তিতে প্রত্যাবর্তন। নিদ্রা। শুধু-মাত্র পান্ডা কাঁধে বন্দুক এবং কোমরে গুলির কোমরবন্ধ জড়িয়ে মাঠের প্রান্তে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, ফণিমনসার মতো।

পান্ডা ছোটবেলাতে শোনা একটা রাভা উপকথা ভাবছিল। জয়ন্তিয়া পাহাড় যেখানে শেষ হয়েছে আর ভুটান রাজ্য শুরু হয়েছে, সেইখানে একটা উতরাই নেবে গেছে গভীর অন্ধকার খাদের মধ্যে। রাভারা মরে গেলে সেই খাদে চলে যায় এবং সেখান থেকেই এই মহাকালগুড়ির রাভা গ্রামে সূক্ষ্মদেহে যাতায়াত করে। সেই মিলনক্ষেত্রে, অর্থাৎ জয়ন্তিয়ার শেষে আর ভুটানের শুরুর বিন্দুতে, এক যবনীর পানশালা আছে, উপকথাতে উল্লেখ আছে যে রুনতুক্ বাশেকই যবনীর রূপ ধরে ঐ ভাঁটিখানা চালায়। রাভাদের আত্মারা চিরকালের মতো খাদের মধ্যে মিলিয়ে যাবার আগে এখানে শেষবারের মতো পানভোজন করে। এই শীতল মাঝরাতে পান্ডা শুধু ভাবছিলো সেই যবনীর দোকানে শেষপাত্র পান করে গভীর খাদে মিলিয়ে যেতে পারলে সে যেন বেঁচে যায়।

কিন্তু পান্ডার চিন্তাতে বাধা পড়লো একটা গাড়ির আওয়াজে। একটা জীপগাড়ির হেডলাইটে অন্ধকার সোজাসুজি দুখণ্ডে ভাগ হয়ে গেল। পান্ডা প্রথমে ভাবলো ফরেস্টের সাহেবরা, কিন্তু যখন লক্ষ্য করলো জীপটা এসে বড় রাস্তার শেষ প্রান্তে লাইট নিভিয়ে, স্টার্ট বন্ধ করে চুপচাপ, তখন বুঝলো এ অন্যকিছু। অনেকক্ষণ পর জীপ গাড়ি থেকে ছয়টি ছায়ামূর্তি নামলো। আপাদমস্তক একটা করে লম্বা কালো জোব্বাতে ঢাকা, মাথায় বাঁদর টুপি, হাতে প্রত্যেকের বন্দুক, শুধু একটা লোকের হাতে একটা অদ্ভুত বাঁকানো যন্ত্র। জীপগাড়ি থেকে নেমে সেই ছায়ামূর্তিগুলি একবারে চুপচাপ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলো। তারপর দলের সবচেয়ে লম্বা ছায়ামূর্তি ডান হাত আকাশে তুলে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করলো। জোছনা খুব পাতলা, কিন্তু চারপাশে সব কিছু দৃশ্যমান, থোকা থোকা জোনাকীগুলো সেই সব কালো ছায়ামূর্তিগুলো ঘিরে ধরেছে। ওরা একবারও টর্চ জ্বালায় নি। ক্রমে ক্রমে দুটো মূর্তি সেই উঁচু জায়গাতে দাঁড়ালো, অন্যচারটি ব্যূহ

রচনা করলো। এইভাবে ওরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর যে লোকটার হাতে সেই অদ্ভুত বাঁকানো যন্ত্র আছে সেই টর্চ জ্বাললো। টর্চের আলোটা একটা হিংস্র সাপের মতো কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে মাঠের মধ্যে বুকে হেঁটে ঘুরে বেড়াল। যে গাছের কাণ্ডের আড়ালে পাণ্ডা লুকিয়ে ছিল সেইখানে সেই সাপটা অন্তত দুবার এলো এবং ফিরে গেল। তারপর সেই ভয়ঙ্কর সাপটা হিলহিলিয়ে হাতিটার সামনের ডান পা বেয়ে উঠতে লাগলো, জড়িয়ে জড়িয়ে দুটো গজদন্তকে অনেকক্ষণ ধরে আদর করলো এবং অবশেষে ওর ডান কানের নিচে এসে স্থির হলো।

পাণ্ডা সজাগ হলো। কাঁধ থেকে বন্দুক নামিয়ে টোটা ভরল অন্ধকারেই, ক্যাচ করে শব্দ হলো, সেই সাপটাকে ওরা আবার ছেড়ে দিল, সাপটা বুকে হেঁটে সারাটা অঞ্চল তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। রাতটা মেটে জোছনায় ফিরে এলো। ঢিবির ওপরে সেই ছায়ামূর্তিগুলো পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। সব চুপচাপ। আসলে ছায়ামূর্তিগুলোর কোন তাড়াহুড়ো নেই। ওরা খুব আস্তে ধীরে অসীম ধৈর্য নিয়ে এগুতে চায়। কিন্তু পাণ্ডার ধৈর্য শেষ সীমাতে পৌঁছেছে, ঐ মহাবৃদ্ধ গজ আর হয়তো এক সপ্তাহ পরেই মারা যাবে, কিন্তু আজ রাতে এই মুহূর্তে পাণ্ডা ঐ হাতীটার একসপ্তাহের পরমায়ু রক্ষা করার জন্য ছটফট করতে লাগলো। পাণ্ডার অস্থিরতা যতোই বাড়তে থাকে ততই সে তার কৌশল, পরিকল্পনা, চাতুর্য হারাতে থাকে। আর ছায়ামূর্তিদের অনড় অচল ধৈর্য ওকে আরও পাগল ক'রে তুললো। পাণ্ডা জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল, ঘাড় বেঁকিয়ে নিজের গণ্ডদেশ কাঁধের সঙ্গে ঘসলো, তারপর বাঁ কাঁধে বন্দুকের কুঁদো লাগিয়ে, ঘোড়াতে হাত দিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো।

মোষের পিঠে চেপে পাণ্ডা বাঁশী বাজাতো। এই মাঠে ধবধবে সাদা বকের দল সেই কত ভোরে ভিড় করতো। বাঁশি বাজিয়ে ওদের পাশ দিয়ে গেলে ওরা একটুও সরতো না। ভয় পেতো না। পাণ্ডার চোখের সামনে অকস্মাৎ হাজার হাজার বক উড়তে লাগল। পাণ্ডা মাথা ঝাঁকালো। বন্দুকের সেফ্‌টি ক্লাচ আটকে বন্দুক পিঠে ঝোলাল। আবার গাছের আড়ালে চলে এলো। পাণ্ডা ক্রমশ ধীরে ধীরে বিচারক্ষমতা ফিরে পেল। বিচারক্ষমতা ফিরে পেয়েই বুঝতে পারলো সে ভয় পেয়েছে। তাছাড়া তার ব্যক্তিগত ভয় পাওয়া বা না পাওয়া ছাড়াও এটা পরিষ্কার যে এই ছায়ামূর্তিগুলো একটি সংগঠিত পোচারের দল, দ্বিতীয়তঃ এরা প্রত্যেকেই সশস্ত্র, তৃতীয়তঃ এই দলটি এগিয়ে এলেও এদের সাহায্যের জন্য আরও লোক এবং অস্ত্র পেছনে রয়েছে। ঘটনাটা এখনি রেঞ্জারবাবুকে জানানো প্রয়োজন। বুনো বেড়ালের মতো একটুও শব্দ না করে পাণ্ডা হাতীঘাসের বনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরপর দুটো শক্তিশালী রাইফেলের গুলির আওয়াজ এবং তারপরই সেই বৃদ্ধ হাতীর ফাটা শাঁখের আওয়াজের মতো করুণ আর্তনাদ আকাশ পাতাল অরণ্য পর্বত নদী কাঁপিয়ে তুললো। সেই বৃংহতি এতো তীব্র এবং করুণ যে তার কোন তুলনা পাওয়া যাবে না, এবং সেই বৃংহিতের নিনাদে রাভা পুরুষরা বেরিয়ে এলো। রাভা জনতা এবং মশাল দেখেই সেই ছায়ামূর্তিগুলো একসঙ্গে ছয়টি রাইফেলে ফাঁকা আওয়াজ করলো, ফলে রাভারা মশাল নিভিয়ে বস্তিতে ফিরে গেলো।

ইতিমধ্যে বৃংহতি থেমে গেছে, সেই অদ্ভুত বাঁকা যন্ত্রের করাতটা নিয়ে দুটো পাঁচ ব্যাটারীর টর্চের আলোতে গজদাঁত কাটার কাজ চললো। ঘণ্টাখানেক পরে জীপটার পেছনের লাল আলোটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

রাভারা আবার মশাল জবালালো। তারা বুঝতে পারছে না কি করবে। পান্ডাকেও তারা খ‍ুঁজে পাচ্ছে না। সে কোথায় গেছে কেউ জানে না। সুতরাং অবশেষে তীর ধনুক, ভাল্লা, মশাল নিয়ে একটি দল রেঞ্জ অফিসের দিকে রওনা হলো। প্রায় আধঘণ্টা নিঃশব্দে হাঁটার পর সেই দলের আগে আগে যে মশালধারী যাচ্ছিল সে থমকে দাঁড়ালো, তারপর নিচে নামিয়ে নিচু হয়ে কি যেন দেখতে লাগলো, অতঃপর হাঁটুগেড়ে বসে মশাল সমেত ডান হাত এবং খালি বাঁ হাত আকাশের দিকে তুললো। ততক্ষণে দলের সবাই এসে হুমড়ি খেয়ে গোল হয়ে বসে পড়ে দুহাত আকাশের দিকে তুললো। মশালটা মাটিতে পুঁতে দিল।

পান্ডা সর্দার চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তাকে প্রায় চেনা যায় না। বিজন বনের পথ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। বন্দুকটা অনেকটা দূরে ছিটকে পড়ে আছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে একেবারে নিশ্চিত হবার জন্য পান্ডা মুখের মধ্যে ব্যারেল ঢুকিয়ে তবে ঘোড়া টিপেছিল।

রীতি বিষয়ক আলোচনা

(যুক্তিকে সুপরিচালিত করার জন্য এবং বিজ্ঞানের মধ্যে সত্যকে অনুসন্ধানের তাগিদে)

রনে দেকার্ত

এই প্রাথমিক সত্যগুলি[১] হতে অন্যান্য যে-সব সত্য আমি টেনে বার করেছি, এবার আরেকটু এগিয়ে সেই সত্যগুলির আগাগোড়া সারিটিকে দেখানো আমার পক্ষে সহজ হবে[২]। কিন্তু সেটা করতে গেলে যেহেতু এমন কিছু প্রসঙ্গের[৩] আলোচনার প্রয়োজন এখন পড়বে যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে এবং যেহেতু সেই পণ্ডিতদের সঙ্গে কলহে মাতারও কোনো ইচ্ছা আমার নেই, তাই মনে হয় সে-সব বিষয়ে উচ্চবাচ্য না করাই আমার পক্ষে ভালো হবে —শুধু যা করতে পারি, তা সে-প্রসঙ্গগুলি ঠিক কী-কী, সেটা অতি সাধারণভাবে বলা, যাতে আরো জ্ঞানী[৪] যাঁরা আছেন, তাঁরাই বিচার করতে পারেন এ-সব ব্যাপারে জনসাধারণকে আরো বেশি করে কিছু জানানো উচিত হবে কিনা। এখুনি যে-তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছিলাম ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য, সেটি ভিন্ন অন্য কোনো তত্ত্বে আস্থা রাখতে যাব না এবং একমাত্র যে-জিনিসটি আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে এত বেশি পরিষ্কার ও নিশ্চিত-ভাবে যা জ্যামিতিজ্ঞদের কোনো প্রমাণই হতে পারেনি আগে, সেই জিনিসটি ভিন্ন অন্য কিছুকে সত্য বলে মানব না, আমার এই সিদ্ধান্তে আমি চিরকাল অবিচল থেকেছি। এবং তা সত্ত্বেও এটুকু বলব, দর্শনের ক্ষেত্রে যতরকমের প্রধান জটিলতা নিয়ে আলোচনার প্রথা আছে, শুধু যে তার সবগুলিতে অল্প সময়ের ব্যবধানে নিজেকে তৃপ্ত করার উপায় আমি খুঁজে পেয়েছি তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করেছি ঈশ্বর কোনো বিশেষ নিয়মকে প্রকৃতিতে এইভাবে বলবৎ করেছেন এবং তাদের প্রত্যয়ের এমন একটি ছাপ রেখেছেন আমাদের আত্মার মধ্যে যে যখন সেগুলি নিয়ে ভালো করে ভাবতে একবার পেরেছি, তখন যা-কিছু রয়েছে বা ঘটছে এই পৃথিবীতে, তার সব কিছুতেই যে এই একই নিয়মগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে, এ-বিষয়ে আমাদের আর কোনো সন্দেহ থাকবে না। অতঃপর, নিয়মগুলি ধরে এগোলে আর কী-কী হতে পারে যখন বিচার করতে বসলাম, তখন মনে হল অন্যান্য এমন অনেক সত্যও আমি যেন আবিষ্কার করছি যেগুলি যা-কিছু আমি এতদিন শিখেছি বা শেখার আশা রেখেছি, তার সব কিছু হতে আরো প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান।

কিন্তু যেহেতু আগেই এক নিবন্ধে এই নিয়মসমূহের প্রধানগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি—যদিও কিছু কারণ বিবেচনা করে সে-নিবন্ধটি এখনো প্রকাশ করতে পারিনি[৫] —আমি তাই সেখানে যা বলেছি, এখানে তার মাত্র সারাংশটির উল্লেখ সমীচীন হবে মনে করছি। জড় জগৎ সম্বন্ধে যা-কিছু জানি বলে ভেবেছিলাম, সেটাকে লিপিবদ্ধ করার আগে যাতে পুরোপুরি উপলব্ধি করি, এই উদ্দেশ্যই সেখানে আমার ছিল। কিন্তু ঠিক যেমন চিত্রকরদের পক্ষে সমতল এক চিত্রে কোনো ঘন বস্তুর সকল বিভিন্ন পার্শ্ব একই রকম ভালোভাবে বর্ণিত করা সম্ভব নয় এবং তাই তাঁরা কোনো একটি মুখ্য পার্শ্ব বেছে নিয়ে সেইটিকেই আলোর দিকে তুলে ধরেন ও অন্যান্য পার্শ্বগুলিকে ছায়ায় ঢাকেন এমনভাবে যাতে আলোকিত পার্শ্বটির দিকে তাকিয়ে থাকলে তাদের যতটুকু দেখা যায় ঠিক ততটুকুই যেন এখানেও দেখতে পারা চলে, তেমনই, যা-কিছু আমার চিন্তায় ছিল, তার সবটাই আমার আলোচনায় ঢোকাতে পারব না জেনে শুধু আলো বলতে যা আমি বুঝেছিলাম, সেটারই

যথাসম্ভব বিস্তারিত ব্যাখ্যায় নিযুক্ত হলাম। পরে, এই অবসরে, সূর্য ও গতিহীন তারকারাজি সম্বন্ধেও কিছু যোগ করলাম আলোচনায়, কারণ আলোর প্রায় সমস্তটাই আসে এদের কাছ থেকে। যোগ করলাম আকাশের কিছু কথাও, কারণ তার মাধ্যমে আলো এক জায়গা হতে অন্যত্র প্রেরিত হয়। কিছু কথা গ্রহাবলী, ধূমকেতু ও পৃথিবী সম্বন্ধেও, কারণ আলো প্রতিভাত হয় তাদের মাধ্যমে। এবং বিশেষ করে কিছু কথা যোগ করলাম পৃথিবীর উপরে অবস্থিত যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধে, কারণ তারা হয় রঙিন, নয় স্বচ্ছ, নয়তো দীপ্যমান। এবং অবশেষে যোগ করলাম মানুষ সম্বন্ধেও কিছু কথা, কারণ সে-ই আলোর দর্শক। তবু এ-সমস্ত জিনিসকে একটু ছায়ায় যাতে ঢাকতে পারি এবং যাতে তাদের সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচলিত কোনো মতামত অনুসরণ অথবা খণ্ডন করতে বাধ্য না হয়ে নিজে যেটা ভাবি সেইটাই নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আমি তাই সিদ্ধান্ত নিলাম এই সব যাবতীয় লোকদের ছেড়ে দিতে এদেরই তর্কের মধ্যে এবং কথা বলতে মাত্র নিচের বিষয়টি নিয়েই : আজ যদি কোথাও কোনো কাল্পনিক স্থানে ঈশ্বর যথেষ্ট পরিমাণে জড় একত্রিত করে এক নতুন পৃথিবী রচনায় হাত দেন, সেই জড়ের বিভিন্ন অংশকে নানা রকমে ও কোনো শৃঙ্খলা না মেনে নড়াতে-চড়াতে থাকেন যতক্ষণ-না তা পরিণত হয় এমন এক অব্যবস্থিত বস্তুপিণ্ডে যা তার বিশৃঙ্খলতায় কবিদের যে-কোনো কল্পনার সামিল হতে পারে, এবং পরে যদি তিনি আর কিছু না করে শুধু তাঁর সাধারণ সহযোগিতার হাতটি বাড়িয়ে দেন প্রকৃতির দিকে এবং প্রকৃতিকে ছেড়ে দেন তাঁরই প্রবর্তিত নিয়মকানুন অনুযায়ী নড়তে-চড়তে, তাহলে কী ঘটতে পারে সেই নতুন পৃথিবীতে[৬]। এইভাবে, সর্বপ্রথমে, এই জড়টির বর্ণনা আমি দিলাম এবং তাকে চিত্রিত করার চেষ্টা করলাম এমনভাবে যাতে এক ঐ ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আগে যা বলা হয়েছে তা ব্যতীত পৃথিবীতে এমন আর কিছু না থাকে যা আমার কাছে ঠেকতে পারে এর চেয়ে আরো বেশি পরিষ্কার বা আরো বোধগম্য। কারণ ইচ্ছা করেই আমি ধরে নিলাম যে এই জড়ের মধ্যে এমন কোনো আকার বা গুণ নেই যা নিয়ে আমাদের দার্শনিকরা তর্কে মাততে পারেন, বা তার মধ্যে সাধারণভাবেও এমন কোনো জিনিস নেই যার সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের আত্মায় অতি স্বাভাবিকভাবে প্রতিপন্ন নয় ও তাই তাকে অস্বীকার করার ভান করা চলে। এছাড়া আমি দেখালাম প্রকৃতির নিয়মগুলি কী, এবং আমার যুক্তিকে একমাত্র ঈশ্বরের অন্তহীন সম্পূর্ণতা ভিন্ন অন্য কোনো তত্ত্বের উপর খাড়া না করে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম সেই সমস্ত নিয়মগুলি যাদের সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ কারুর থাকতে পারে—শেষে দেখাতে সচেষ্ট হলাম, সেই নিয়মগুলি এমন যে ঈশ্বর যদি আরো বহু পৃথিবীর সৃষ্টি করতেন, তাহলেও তাদের প্রত্যেকটিতে ঐ একই নিয়মগুলি প্রতিপালিত না হয়ে যেত না। এর পরে আমি দেখালাম কী করে ঐ নিয়মগুলির অনুবর্তী হয়ে সেই বিশৃঙ্খল বস্তুপিণ্ডের জড়ের সব থেকে বড় অংশটি এক বিশেষ উপায়ে আপনা থেকেই তৈরী হয়ে নিজেকে এমন গুছিয়ে নেবে যে তা হয়ে উঠবে আমাদের আকাশের অনুরূপ, দেখালাম কেমন করে সেই জড়ের কোনো-কোনো অংশে রচিত হতে পারবে এক পৃথিবী, কোনো-কোনোটিতে গ্রহসমূহ ও ধূমকেতু, আবার অন্য কোনো-কোনোটিতে বা সূর্য ও গতিহীন তারকারাজি। এবং এখানে, আলোর বিষয়ে আমার বক্তব্যটাকে আরো ব্যাপ্ত করে বেশ দীর্ঘভাবে ব্যাখ্যা করলাম কোন্ আলো খুঁজে পাওয়া যায় সূর্যে ও তারকায়, এবং কী করে সেখান হতে সেই আলো এক মুহূর্তে[৮] আকাশের বিরাট-বিরাট স্থান অতিক্রম করে, এবং কী করেই বা গ্রহসমূহ ও ধূমকেতু হতে প্রতিভাত হয়ে তা পৃথিবীর দিকে

আসে। এইসব আকাশ ও গ্রহনক্ষত্রের উপাদান, অবস্থান, গতি ও অন্যান্য যাবতীয় গুণাগুণ সম্বন্ধেও অনেক কথা এই সঙ্গে যোগ করলাম যাতে এটা যথেষ্টভাবে জানাতে পারছি বলে মনে করতে পারি যে আমি যে-পৃথিবীর বর্ণনা দিলাম, তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা আমাদের এই পৃথিবীর সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে না বা অন্তত মিলে যাচ্ছে বলে ঠেকবে না। এর পর চলে এলাম বিশেষত পৃথিবীর কথায় : যদিও স্পষ্ট করে ধরে নিয়েছি যে পৃথিবী যে-জড় দ্বারা গঠিত, তার ভিতরে ঈশ্বর কোনো অভিকর্ষ ঢোকাননি, তবু, কী করে, সেই জড়ের সকল বিভিন্ন অংশের প্রত্যেকটি একেবারে ভূ-কেন্দ্রের অভিমুখী না হয়ে পারে না; ভূ-পৃষ্ঠে জল ও বায়ু থাকার ফলে কী করে আকাশ ও নক্ষত্ররাজির বিন্যাস-পদ্ধতি, বিশেষত চাঁদের অবস্থান, সেখানে এমন এক জোয়ার-ভাটা তুলতে বাধ্য যা সম-পরিস্থিতিতে লক্ষিত আমাদের সমুদ্রগুলির জলস্ফীতি ও জলহ্রাসের অনুরূপ, এবং এ ছাড়াও যেমন জলের তেমনি বায়ুর যে-একটি গতি থাকে, পূর্ব হতে পশ্চিমে, যেমনটি গ্রীষ্মমণ্ডলেও দেখা যায়; কী করে সেই পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে আকার নেয় পর্বতমালা, সিন্ধুরাশি, উৎস-শ্রেণী ও নদীকুল, কী করে সেখানে খনিতে আসে ধাতু, প্রান্তরে গজায় উদ্ভিদ, এবং সাধারণভাবে মিশ্র বা যৌগিক পদার্থ বলতে যা-কিছু বোঝায়, তারাই বা কী করে সেখানে জন্ম নেয়। এবং অন্যান্য জিনিসের মধ্যে যেহেতু নক্ষত্ররাজি ব্যতীত এক অগ্নিরই কথা জানি যা নাকি আলোক উৎপাদন করতে পারে পৃথিবীতে, তাই যা-কিছু আছে অগ্নির প্রকৃতিতে, সেটা অতি পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্য আমি মনোনিবেশ করলাম : আগুন কী করে উৎপন্ন হয়, কী করে তা বৃদ্ধি পায়, কী করে তাতে কখনো শুধু আলোকহীন উত্তাপ এবং কখনো-বা শুধু উত্তাপহীন আলোই থাকে; কী করে সেই আগুন বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন রঙ ও গুণাগুণের প্রবর্তন করতে পারে; কী করে তা কোনো-কোনো বস্তুকে দ্রবীভূত এবং অন্য কোনো-কোনো বস্তুকে আরো কঠিন করে; কী করে তা সেই সব বস্তুর প্রায় সমস্তটাকেই আত্মসাৎ করে অথবা তাদের পরিণত করে ভস্মে কিংবা ধোঁয়ায়; এবং অবশেষে কী করে সেই ভস্ম হতে, শুধু তার ক্রিয়ার প্রবলতার মাধ্যমে, সে রূপ দেয় কাঁচকে। ভস্মের এই কাঁচে রূপান্তরের মতো আশ্চর্য ঘটনা প্রকৃতির অন্য কোনো বস্তুতে ঘটতে দেখিনি বলেই এটির বর্ণনায় সবিশেষ আনন্দ পেলাম।

তবু এই সব থেকে এমন সিদ্ধান্তেও পৌঁছোতে চাইনি যে আমি যেভাবে বলছি, এ-পৃথিবী ঠিক সেইভাবেই তৈরী হয়েছে—কারণ আরো অনেক বেশি সম্ভব যা, তা হল একেবারে গোড়া হতেই ঈশ্বর এটিকে রূপায়িত করেছিলেন যেমনটি এটি হওয়া উচিত তেমনটি করে[৯]। কিন্তু এটা নিশ্চিত, এবং এ-মতটির প্রচলনও আছে ধর্মশাস্ত্রবেত্তাদের মধ্যে, যে এখন তিনি পৃথিবীকে সংরক্ষণ করে রয়েছেন যে-ক্রিয়ার মাধ্যমে, সেই একই ক্রিয়ার দ্বারা তাকে তিনি সৃষ্টিও করেন। তাই এমনও যদি মনে করা যায় যে গোড়ায় বিশৃঙ্খল বস্তুপিণ্ড ভিন্ন পৃথিবীর অন্য আকার তিনি দেননি—অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এটাও ধরে নিতে হবে যে সেটি করার পর প্রকৃতির নিয়মগুলি প্রবর্তন করেন, পরে প্রকৃতির দিকে তাঁর সহ-যোগিতার হাতটি বাড়ান যাতে সে তার প্রথামতো কার্যক্ষম হতে পারে—তাহলেও সৃষ্টির অলৌকিকতার প্রতি অবিচার না করে[১০] এটা মেনে নেওয়া চলে যে একমাত্র এই একই উপায়ে পুরোপুরি জড় বস্তু বলতে যা-কিছু বুঝি, তার সবই কালে-কালে সেই আকারই নিতে পারবে যে-আকারে আজ আমরা তাদের দেখছি। এবং তাদের প্রকৃতিটাকেও জানা তখন আরো অনেক সহজ হবে যখন প্রথম থেকেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ না হয়ে বরং এইভাবে ধীরে

ধীরে তারা জন্মেছে বলে আমরা বিচার করতে পারব।

প্রাণহীন বস্তু ও উদ্ভিদ হতে আমি চলে এলাম প্রাণীদের, বিশেষত মানুষের বর্ণনায়। কিন্তু যেহেতু এসব বিষয়ে আগের অনুযায়ী একই প্রকারে আলোচনা করার মতো যথেষ্ট জ্ঞান আমার ছিল না—অর্থাৎ যে-প্রকারে এতক্ষণ ফলকে প্রমাণ করি হেতুর দ্বারা, এবং দেখাই কোন্ উপাদানে ও কী উপায়ে সেই ফলকে উৎপন্ন করতে প্রকৃতি বাধ্য—আমি তাই এই অনুমান করেই সন্তুষ্ট থাকলাম যে প্রথম যখন ঈশ্বর মানুষের শরীর গঠন করেন, সেটা তিনি করেন হুবহু আমাদের শরীরের অনুরূপ করেই, যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাহ্যিক আকারের ক্ষেত্রে তেমনি শরীরের বিবিধ যন্ত্রের অন্তর্গঠনেও। এবং এ-শরীর গঠন করলেন সেই একই জড়ের দ্বারা যার বর্ণনা আগে দিয়েছি। তাতে গোড়ায় ঢোকালেন না কোনো যুক্তিক্ষম আত্মা অথবা এমন অন্য কিছুও যা উদ্ভিদোপম বৃদ্ধিশীল বা সুবেদী কোনো আত্মার[১১] কাজ করতে পারে। শুধু সেই মানুষের হৃদয়ে তিনি উস্কিয়ে রাখলেন ঐরকম একটি আলোকহীন আগুন যারও কথা আগে ব্যাখ্যা করেছি, এবং যার স্বভাবের একমাত্র যে-উপমা মনে আসছে তা হল শুকনো হওয়ার আগে খড়কে এক জায়গায় বন্ধ করে রাখলে যে-আগুন তাকে গরম করে তোলে, অথবা থেঁতলানো আঙুরের উপর রেখে গাঁজানোর সময় নতুন মদকে যে-আগুন উত্তপ্ত করে ফোটায়, এও যেন ঠিক সেই আগুনের মতো। কারণ এর ফলে সেই শরীরের মধ্যে যে-যে ক্রিয়াকলাপ জাগতে পারে, তা বিচার করতে গিয়ে দেখলাম যে তার প্রত্যেকটির পক্ষে হুবহু সেইভাবেই চালু থাকা সম্ভব আমাদের এই শরীরেও, তা তার সম্বন্ধে সজ্ঞানে আমরা ভাবি বা না-ই ভাবি—ফলে দাঁড়াচ্ছে যা, তা আমাদের আত্মা, অর্থাৎ শরীর থেকে পরিষ্কারভাবে পৃথক সেই বস্তুটি যার বিষয়ে কিছু আগে বলা হয়েছে যে তার একমাত্র প্রকৃতিই হল চিন্তা করার সামর্থ্য, সেই আত্মা বস্তুটির এ-ক্ষেত্রে কোনো অবদান যদি নাও থাকে, তবু শরীরমাত্রেরই ক্রিয়াকলাপ সর্বত্র সমানভাবে চলতে থাকবে। এবং এই কারণেই বলা সম্ভব যে যুক্তিশক্তিহীন জন্তুরাও আমাদের সদৃশ—অর্থাৎ সেই ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এমন একটিকেও আমি খুঁজে পেলাম না যা কোনো প্রকারে চিন্তার উপর নির্ভরশীল এবং সেই কারণে যাকে বলা চলে শুধু আমাদের বা মানুষ নামক প্রাণীর জন্যই নির্দিষ্ট[১২]। উল্টে চিন্তার উপর নির্ভরশীল যে-ক্রিয়াকলাপগুলি, তাদের প্রত্যেকটিকেই আমি মানুষের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি বেশ পরে, যখন এটা অনুমান করে নিয়েছি যে ঈশ্বর যুক্তিক্ষম এক আত্মার সৃষ্টি করেন ও পরে সেটিকে আমার বর্ণিত উপায়ে শরীরের সঙ্গে যুক্ত করেন।

কিন্তু বিষয়টিকে ঠিক কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি পর্যালোচনা করছিলাম, সেটা দেখানোর জন্য হৃৎপিণ্ড ও ধমনীদের গতিবিধি নিয়ে কিছু ব্যাখ্যা এখানে উপস্থাপিত করতে চাই। এবং যেহেতু হৃৎপিণ্ড ও ধমনীদের এই গতিবিধি সকল প্রাণীর মধ্যে সর্বপ্রথমে ও সবচেয়ে বেশি সাধারণভাবে পরিলক্ষিত হয়, তাই এর সম্পর্কে যা বলা চলে, তাঁর দ্বারা শরীরের অন্যান্য যাবতীয় গতিবিধি ব্যাপারে কী ভাবা যায় বা না যায় সেটা লোকে সহজেই বিচার করতে পারবে। এবং, যা ব্যাখ্যা করছি, তা বুঝতে যাতে কারুর কোনো কষ্ট না হয়, আমি তাই এখানে শারীরস্থান সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান যাদের নেই, তাদের বলব যে আমার লেখা পড়ার আগে তারা যেন একটু কষ্ট করে ফুসফুসসমন্বিত কোনো বৃহৎ জন্তু বা প্রাণী পেলে তার হৃৎপিণ্ডটাকে নিজেদের সামনে কেটে দুখানা করে। কারণ সে-হৃৎপিণ্ড মোটামুটি একেবারে মানুষেরই হৃৎপিণ্ডের অনুরূপ, এবং সেটা কাটলেই তার

যে-দুটি প্রকোষ্ঠ বা অন্তঃস্থ ফাঁপা-মতন বস্তু আছে, তা তাদের নজরে পড়বে। প্রথমে দেখা যাক তার ডানদিকের প্রকোষ্ঠটি যাতে এসে মিলছে বেশ প্রশস্ত দুটি নল। সেই নল দুটির একটি হল গিয়ে মহাশিরা, যা রক্তের মুখ্য আধার এবং যা গাছের গুঁড়ির মতো, শরীরের অন্যান্য সমস্ত শিরা-উপশিরা তারই শাখা-প্রশাখা মাত্র; দ্বিতীয় হল ধামনিক শিরা, যার এমন নামকরণটি খুব উপযুক্ত হয়নি, কারণ আসলে এটি হল গিয়ে ধমনী যার উৎপত্তি হৃৎপিণ্ডে এবং যা পরে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নানান শাখা-প্রশাখায় ফুসফুসগুলির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এবারে দেখা যাক তার বাঁ দিকের প্রকোষ্ঠটি যাতেও একই ভাবে এসে মিলছে আগের মতনই বা তার চেয়ে আরো বেশি প্রশস্ত অন্য দুটি নল। এই নল দুটির একটি হল গিয়ে শিরাশ্রিত ধমনী, যে-নামকরণটিও খুব উপযুক্ত হয়নি, কারণ এটি শিরা ব্যতীত অন্য কিছু নয়, এবং শিরাটি আসছে ফুসফুস দুটি হতে, যেখানে তা বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে রয়েছে এবং সেই শাখা-প্রশাখাগুলিও আবার ওতপ্রোতভাবে সংজড়িত একদিকে যেমন ধামনিক শিরাটির শাখাগুলির সঙ্গে, অন্য দিকে তেমনি শ্বাসনালীর যে-পথটি রয়েছে, তারও শাখা-প্রশাখার সঙ্গে—এই শেষোক্ত পথটি ধরেই শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু ঢোকে; দ্বিতীয় নলটি হল মহাধমনী, যা হৃৎপিণ্ড হতে বেরিয়ে শরীরের সর্বত্র তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছে। যাদের এইসব দেখানো হচ্ছে, চাই সযত্নে তাদের সামনে তুলে ধরা হোক সেই এগারোটি ঝিল্লীও, যা এগারোটি ছোট-ছোট দরজার মতো সেই ফাঁপা প্রকোষ্ঠ দুটির ভিতরের চারটি ছিদ্রের মুখ খুলছে আর বন্ধ করছে। এই এগারোটি ঝিল্লীর তিনটি রয়েছে মহাশিরার প্রবেশ-পথে—তাদের অবস্থানটি এমন যাতে যে-রক্ত তারা বহন করছে, হৃৎপিণ্ডের ডান দিকের ফাঁপা প্রকোষ্ঠটিতে সে-রক্তের গড়িয়ে পড়াটা তারা কিছুতে ঠেকাতে পারছে না ঠিকই, তবু রক্তটা যাতে সেখান থেকে বেরিয়ে না যায়, সে-ব্যবস্থাটি তারা নিচ্ছে। অন্য তিনটি ঝিল্লী রয়েছে ধামনিক শিরার প্রবেশ-পথে, এদের অবস্থানটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের—এমন, যাতে যে-রক্ত রয়েছে ঐ ফাঁপা জায়গাটিতে, তাকে ফুসফুস দুটির মধ্যে ঢুকতে তারা দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু যে-রক্ত রয়েছে ফুসফুস দুটিতে, তাকে ফাঁপা জায়গাটিতে ফিরতে দিচ্ছে না। এই প্রকারে আরো দুটি ঝিল্লী রয়েছে শিরাশ্রিত ধমনীর প্রবেশ-পথে, তারা ফুসফুসের রক্তকে হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকের ফাঁপা স্থান অভিমুখে গড়িয়ে যেতে যদিও দিচ্ছে, সে-রক্তকে আগের জায়গায় ফিরতে দিচ্ছে না। এবং শেষ তিনটি ঝিল্লী রয়েছে মহাধমনীর প্রবেশ-পথে, তারা রক্তকে হৃৎপিণ্ড হতে বেরিয়ে যেতে দিচ্ছে, কিন্তু সেখানে ফিরে আসতে দিচ্ছে না। এবং ঝিল্লীগুলির সংখ্যা-বিভাগ এমন কেন, তার একটি ব্যতীত অন্য কারণ খোঁজার দরকার পড়ে না—আর সেই কারণটি হল এই যে জায়গাটা অমন বলেই শিরাশ্রিত ধমনীর ছিদ্রটি যেহেতু ডিম্বাকার, সেটি দুটি ঝিল্লীতে বন্ধ হওয়া আপনা থেকেই সোজা, ঠিক যেমন অন্যান্য ধমনীর ছিদ্রগুলি গোলাকার, তাই তিনটি ঝিল্লীতে তারা আরো সহজে বন্ধ হতে পারে। যারা দেখছে এইসব, চাই এটাও তারা বিবেচনা করুক যে গঠনের দিক থেকে শিরাশ্রিত ধমনী ও মহাশিরা হতে মহাধমনী ও ধামনিক শিরা আরো অনেক বেশি শক্ত ও দৃঢ়, এবং প্রথম দুটি হৃৎপিণ্ডে ঢোকার আগে চওড়া হয়ে ওঠে ও সেখানটায় দুটি ছোট গেঁজিয়ার মতো জিনিস সৃষ্টি করে, যে-জিনিস দুটি পরিচিত হৃৎপিণ্ডের দুই কান বা অলিন্দ রূপে এবং যে-মাংসে গঠিত তারা, সেটা হৃৎপিণ্ডের মাংসের অনুরূপ। দেখা দরকার এটাও যে শরীরের অন্য কোনো জায়গা হতে হৃৎপিণ্ডে সবসময়ই বেশি উত্তাপ থাকে, এবং সেই উত্তাপের ফল এমন যে যখনই কয়েক বিন্দু রক্ত ঐ ফাঁপা জায়গা দুটিতে

প্রবেশ করে, সে-রক্ত অচিরে স্ফীত হয়ে ওঠে ও বিস্তার লাভ করে—যেমন সাধারণত করে থাকে যে-কোনো তরল পদার্থই যখন তাকে বিন্দু-বিন্দু করে ফেলা যায় বেশ তপ্ত কোনো নলের মধ্যে।

এর পরে তাই হৃৎপিণ্ডের গতিবিধি ব্যাখ্যার জন্য আমার অন্য কিছু যোগ করার দরকার নেই; শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট যে যখন ঐ ফাঁপা জায়গাগুলি রক্তে ভরা থাকে না, তখন স্বভাবতই রক্ত প্রবাহিত হয় মহাশিরা হতে ডান দিকের প্রকোষ্ঠটিতে ও শিরাশ্রিত ধমনী হতে বাঁ দিকের প্রকোষ্ঠটিতে—বিশেষত যখন এই নল দুটি সর্বদাই রক্তে পরিপূর্ণ থাকে এবং হৃৎপিণ্ডের দিকে মুখ-করা তাদের ছিদ্রগুলি তাই আর বন্ধ হতে পারে না। কিন্তু যে-মুহূর্তে দুই বিন্দু রক্ত ঢুকেছে, একটি বিন্দু করে ফাঁপা জায়গা দুটির প্রতিটিতে —এবং বিন্দু দুটিও বেশ বড় আকারের না হয়ে যায় না, যেহেতু যে-ছিদ্রগুলি দিয়ে তারা ঢুকছে সেগুলি যেমন বেশ মোটা-মোটা, যে-নলগুলি দিয়ে তারা আসছে সেগুলিও রক্তে খুবই ভরতি—সঙ্গে সঙ্গে সেই বিন্দু দুটি সেখানে যে-উত্তাপ পায় তার ফলে বিরলীকৃত হয়ে পড়ে ও ছড়িয়ে যায়। এই উপায়ে রক্ত-বিন্দু দুটি সারা হৃৎপিণ্ডটাকে স্ফীত করে তুলে যে-পাঁচটি ছোট-ছোট দরজা রয়েছে নল দুটির প্রবেশপথে—অর্থাৎ সেই নল দুটি যা দিয়ে তারা নিজেরাই এসেছে—এবারে সেই দরজা পাঁচটিকে তারা ঠেলতে থাকে ও বন্ধ করে দেয়। এটা তারা করে, যাতে বেশি রক্ত হৃৎপিণ্ডে নেমে না আসতে পারে। এবং ক্রমশই বিরলীকৃত হতে-হতে তারা একই সঙ্গে ঠেলতে থাকে ও অবশেষে খুলে ফেলে অন্য ছয়টি ছোট দরজা, যেগুলি রয়েছে সেই দুটি নলের প্রবেশ-পথে যার মধ্য দিয়ে তারা বেরিয়ে যায় অচিরেই—এবার এইভাবে স্ফীত করে ধামনিক শিরা ও মহাধমনীর সকল শাখা-প্রশাখা-গুলিকে, বলতে গেলে হৃৎপিণ্ডকে স্ফীত করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। অবশ্য হৃৎপিণ্ড, এবং একই ভাবে ঐ ধমনীগুলিও, মুহূর্তের মধ্যে চুপসে যায়, কারণ যে-রক্ত সেখানে ঢুকেছিল, তা ততক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এবং ওদের ছয়টি ছোট দরজা বন্ধ হতেই মহাশিরা ও শিরাশ্রিত ধমনীর পাঁচটি ছোট-ছোট দরজা খুলে গিয়ে পথ করে দেয় আরো দুটি অন্য রক্ত-বিন্দুর, যারাও ঠিক আগের বিন্দু দুটির মতোই হৃৎপিণ্ড ও ধমনীগুলিকে পুনরায় স্ফীত করে। যেহেতু যে-রক্ত এভাবে ঢুকছে হৃৎপিণ্ডে, তা হৃৎপিণ্ডের কান বলে পরিচিত দুটি গেঁজিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাই গেঁজিয়া দুটির গতিবিধি হৃৎপিণ্ডের বিপরীত—যে-কারণে হৃৎপিণ্ড যখন ফুলে ওঠে, এরা তখন চুপসে যায়। শেষে, গাণিতিক প্রমাণের শক্তি যারা জানে না, এবং সত্য যুক্তিকে সম্ভাব্য থেকে পৃথক করে দেখতেও যারা অভ্যস্ত নয়, সে-ধরনের লোক যাতে পরীক্ষা না করেই এটাকে অস্বীকার করার ঝুঁকি না নেয়, আমি তাই তাদের জানিয়ে রাখতে চাই যে যে-গতিবিধির কথা আমি এতক্ষণ ধরে ব্যাখ্যা করলাম, তা বাধ্যতামূলকভাবে নির্ভরশীল এমন সব যন্ত্রের নিছক অবস্থানের উপর যাকে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে থাকতে দেখা যায় নিজের চোখ দিয়ে, সেই গতিবিধি নির্ভরশীল এমন একটি উত্তাপের উপর যাকে অনুভব করা চলে সেখানে নিজেরই আঙুল ছুঁইয়ে—সেই গতিবিধি নির্ভরশীল রক্তের যে-বিশেষ প্রকৃতির উপর, তাকেও জানা চলে পরীক্ষার দ্বারা। এই নির্ভরশীলতা ঠিক সেইরকম, যে-একই বাধ্যতামূলকভাবে কোনো বড় ঘড়ির গতিবিধি নির্ভরশীল হয় তার সমভার এবং চাকাগুলির শক্তি, অবস্থান ও আকারের উপর।

কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে, এভাবে হৃৎপিণ্ডে ক্রমাগতই গড়িয়ে পড়ে-পড়েও শিরার রক্ত কেন নিঃশেষিত হয় না, এবং হৃৎপিণ্ডের ভিতর দিয়ে যত রক্ত যাচ্ছে তার সবই ধমনীতে

এসে হাজির হচ্ছে বলেই ধমনীগুলিই বা কী করে রক্তে অত্যধিক পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে না, তাহলে উত্তরে আমার অন্য কিছু বলার দরকার নেই—শুধু ইংলন্ডের এক চিকিৎসক[১৩] এ-বিষয়ে যা ইতিমধ্যেই লিখে গেছেন, তার উল্লেখই যথেষ্ট হবে। ইংরেজটি তাঁর এই আবিষ্কারে সকলের প্রশংসার্হ হয়েছেন, কারণ তিনিই প্রথম জানালেন যে, ধমনীদের প্রান্ত-সীমায় এমন বহু ছোট-ছোট পথ আছে যার মধ্যে দিয়ে যে-রক্ত ধমনীরা হৃৎপিণ্ডের কাছ থেকে পাচ্ছে তা শিরাগুলির ছোট শাখা-প্রশাখায় ঢুকে পড়ে এবং সেখান থেকে আবার তা হৃৎপিণ্ডের দিকে ফেরে, যাতে এই রক্তের গতিবিধি হয়ে দাঁড়ায় এমন একটা সঞ্চালন যা সমানে চলছে-চলছেই। সেটা তিনি বেশ ভালোভাবেই প্রমাণ করছেন অস্ত্রচিকিৎসকদের সাধারণ পরীক্ষার মাধ্যমে—যে অস্ত্রচিকিৎসকেরা দেখিয়েছেন যে শিরার যে-স্থানটি তাঁরা উন্মুক্ত করছেন, তার উপরে যদি হাতটাকে সামান্য জোরের সঙ্গে বাঁধা যায় তো সেখান থেকে তখন যত বেশি রক্ত বেরোবে, ততটা রক্ত বেরোত না যদি হাতটা তাঁরা একেবারেই না বাঁধতেন। এবং ফল হত সম্পূর্ণ বিপরীত যদি হাতটাকে তাঁরা বাঁধতেন তলার দিকে, অর্থাৎ করতল ও ছিদ্রের মাঝামাঝি কোনো জায়গায়, অথবা সেই হাতকে যদি তাঁরা বাঁধতেন উপরেই, কিন্তু খুব জোরের সঙ্গে। কারণ এটা অতি পরিষ্কার যে বাঁধুনিটা যদি সামান্য জোরের সঙ্গে হয় তো যে-রক্ত আগে থেকে রয়েছে হাতে, সেটাকে যেমন তা শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের দিকে যেতে দেবে না, তেমনি নতুন রক্ত যাতে ধমনীর মাধ্যমে ক্রমাগতই সেখানে আসতে পারে, সেটাও তা ঠেকাবে না। এটা হয়, কেন-না ধমনীগুলির অবস্থান শিরাগুলির নিচে এবং শিরাগুলির চেয়ে তাদের গাত্রাবরণ আরো শক্ত বলেই তাদের উপর চাপ দেওয়া ততটা সহজ নয়—তাছাড়া হৃৎপিণ্ড থেকে বেরিয়ে তাদের মাধ্যমে করতলের দিকে যে-প্রবলতার সঙ্গে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায় রক্তে, তা দেখা যায় না যখন শিরাগুলি ধরে রক্ত সেখান থেকে ফেরে হৃৎপিণ্ডের দিকে। এবং যেহেতু এই রক্ত হাত থেকে বেরোচ্ছে সেই ছিদ্রের দিকে যা রয়েছে শিরাগুলির কোনো একটিতে, তাই বাঁধুনির উপরে, অর্থাৎ বাহুর প্রান্তসীমার দিকে, এমন কিছু পথ থাকতেই হবে যা ধরে রক্ত আসতে পারে ধমনীগুলি হতে। রক্ত-সঞ্চালন নিয়ে ইংরেজ চিকিৎসকটি যা বলছেন, তাতে এটাও তিনি বেশ ভালো-ভাবেই প্রমাণ করছেন যে শিরাদের আগাগোড়া পথের নানা জায়গায় কিছু-কিছু ঝিল্লীর অবস্থানটি এমনই, যাতে রক্তকে শরীরের মাঝামাঝি কোনো স্থান হতে প্রান্তসীমার দিকে যেতে সেই ঝিল্লীগুলি কিছুতেই দেবে না—শুধু রক্ত যাতে সমস্ত প্রান্তসীমা হতে ফিরতে পারে হৃৎপিণ্ডের দিকে, একমাত্র সেই ব্যবস্থাই নেবে। এবং পরীক্ষা এটাও দেখাচ্ছে যে যে-কোনো একটি ধমনীও যদি কাটা যায়, তার মধ্য দিয়ে শরীরের যাবতীয় রক্ত অতি অল্প সময়ে বেরিয়ে আসতে পারে—এমনকি সে-ধমনী যদি হৃৎপিণ্ডের খুব কাছাকাটি কোনো স্থানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে এবং তাকে কাটা হয় হৃৎপিণ্ড ও বাঁধুনির কোনো মধ্যবর্তী জায়গায়, তাহলেও ফল হবে একই, যাতে এমন কল্পনা কিছুতে না করা যায় যে এর কারণে যে-রক্ত বেরোচ্ছে, তা আসছে অন্য কোথা হতে।

কিন্তু আরো অনেক জিনিস রয়েছে যার ফলে বোঝা যায় রক্ত-সঞ্চালনের সেই কারণটিই সত্য যেটি আমি বলেছি[১৪]; কারণ, প্রথমত, যে-রক্ত বেরোচ্ছে শিরা থেকে এবং যে-রক্ত বেরোচ্ছে ধমনী থেকে, এদের মধ্যে যে-পার্থক্য[১৫] লক্ষিত হয় তার একমাত্র হেতু হল এই যে হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে যাওয়ার ফলে বিরলীকৃত ও পাতিতের মতো হয়েছে বলেই সেই রক্ত আরো সূক্ষ্ম ও জীবন্ত, এবং মুহূর্তের মধ্যে হৃৎপিণ্ড থেকে বেরোনোর পর, অর্থাৎ ধমনীতে থাকা-

কালীন, সে-রক্ত আরো তপ্তও—যতটা সূক্ষ্ম বা জীবন্ত বা তপ্ত তা ছিল না হৃৎপিণ্ডে ঢোকার একটু আগে, অর্থাৎ শিরায় তার থাকার সময়ে। এবং সতর্ক থাকলে এই পার্থক্যটা স্পষ্ট ঠেকে রক্ত যখন হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি রয়েছে, তখন—যেসব জায়গা হৃৎপিণ্ড হতে বহু দূরে, সেখানে এ-পার্থক্য ততটা প্রতীয়মান হবে না। এ ছাড়া ধামনিক শিরা ও মহা-ধমনীর বহিরাবরণ যে-চর্মে আচ্ছাদিত, তার কাঠিন্যটাই ভালো করে জানিয়ে দেয় যে রক্ত এই ধমনীগুলির গায়ে যতটা জোরের সঙ্গে ধাক্কা মারে, শিরাগুলির ক্ষেত্রে ততটা করে না[১৬]। এবং হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকের প্রকোষ্ঠটি ও মহাধমনী যদি ডান দিকের প্রকোষ্ঠটি ও ধামনিক শিরা হতে প্রশস্ততর ও বৃহত্তর হয়ই তো তার কারণ কি শুধু এই নয় যে শিরা-শ্রিত ধমনীর রক্ত হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর যেহেতু একমাত্র ফুসফুসেই আসছে, তাই অন্য যে-রক্ত সরাসরি আগত মহাশিরা হতে, তার চেয়ে এই রক্ত একদিকে যেমন আরো সূক্ষ্ম, অন্য দিকে তেমনি এটি বিরলীকৃতও হয় আরো ভালভাবে ও আরো সহজে? এবং নাড়ী টিপে চিকিৎসকরাই বা কী ঠাওর করতে পারবেন যদি-না এটা তাঁদের জানা থাকে যে রক্তের প্রকৃতি যেভাবে বদলায়, তাতে হৃৎপিণ্ডের উত্তাপ অনুযায়ী তা বিরলীকৃত হতে পারে আগের তুলনায় কম অথবা বেশি ভালভাবে, এবং কম অথবা বেশি জোরের সঙ্গে? এবং যখন বিচার করা যায় এই উত্তাপ কী প্রকারে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিব্যাপ্ত হয়, তখন স্বীকার করা কি উচিত নয় যে এটা হতে পারছে একমাত্র রক্তেরই মাধ্যমে, যে-রক্ত হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে গিয়ে সে-জায়গাটায় নিজেকে উত্তপ্ত করে, পরে সেখান থেকে নিজে যেমন সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, উত্তাপটাকেও ছড়িয়ে দেয়? এরই জন্য শরীরের কোনো অংশ হতে যদি রক্ত তুলে নেওয়া যায়, তার দ্বারা উত্তাপও সঙ্গে-সঙ্গে তুলে নেওয়া হবে। এমন-কি হৃৎপিণ্ড যদি জ্বলন্ত কোনো লৌহখণ্ডের মতোও তপ্ত হয়, তবু হাত-পা গরম করে রাখার পক্ষে সে-উত্তাপ কিছুতে পর্যাপ্ত ঠেকবে না, যদি-না সেই হৃৎপিণ্ডের ক্ষমতা থাকে সর্বক্ষণই নতুন রক্তের চালান দিয়ে যাওয়ার। এর থেকে জানা যায় শ্বসন-পদ্ধতির আসল উপযোগিতা হল এই যে তা ফুসফুসে যথেষ্ট পরিমাণে তাজা বায়ু বহন করে আনে যাতে হৃৎপিণ্ডের ডান দিকের প্রকোষ্ঠ হতে যে-রক্ত ফুসফুসে আসছে, এবং যে-রক্ত সেই প্রকোষ্ঠে থাকাকালীন ইতিমধ্যে যেমন বিরলীকৃত তেমনি প্রায় বাষ্পে পরিণত, তা ফুস-ফুসে ঘন হতে পারে এবং বাঁ দিকের প্রকোষ্ঠে নতুন করে পড়বার আগে আবার পরি-বর্তিত হতে পারে রক্তে[১৭]—এটা এমন যদি না হত তো যে-আগুন সেখানে রয়েছে, তার যোগ্য খাদ্য হিসেবে রক্ত ব্যবহৃত হতে পারত না। এই প্রমাণের সাক্ষ্য মেলে যখন দেখি যে-জন্তুদের ফুসফুস নেই, হৃৎপিণ্ডে একটি ভিন্ন প্রকোষ্ঠও তাদের নেই; এবং শিশুরা মাতৃগর্ভে থাকাকালীন যখন ফুসফুস ব্যবহার করতে পারে না, তখন তাদেরও থাকে এক-দিকে যেমন একটি ছিদ্র যার মাধ্যমে মহাশিরা হতে কিছু রক্ত গড়িয়ে পড়ে হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকের প্রকোষ্ঠটিতে, অন্যদিকে তেমনি একটি পথও যার মাধ্যমে ফুসফুসের মধ্য দিয়ে না গিয়ে কিছু রক্ত ধামনিক শিরা হতে মহাধমনীতে চলে আসে। তারপর হজমের সেই ব্যাপারটা, সেটাই বা পাকস্থলীতে কী করে ঘটবে যদি-না সেখানে হৃৎপিণ্ড ধমনীদের মাধ্যমে কিছু উত্তাপ পাঠিয়ে দেয়, এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে অতি প্রবহমান কিছু রক্তও, যার সাহায্যে সেখানে যে-ভুক্ত মাংসখণ্ডগুলি রাখা হয়েছে, তা গলে যেতে পারে? এবং যে-ক্রিয়ার ফলে ঐ মাংসখণ্ডগুলির রস পরিণত হয় রক্তে, তাকেও বোঝা কি তখন সহজ হয়ে ওঠে না যখন বিচার করা যায় যে সেই রক্ত দিনে হয়তো একশো কি দুশো বারেরও বেশি করে

হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে গিয়ে-গিয়ে পাতিত হয়ে চলেছে ? এবং পুষ্টি ও শরীরে নানা তরল পদার্থের[১৮] উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার জন্য বেশি আর কিছু বলার কি দরকার আছে যে যে-শক্তির সঙ্গে বিরলীকৃত হয়ে রক্ত ধায় হৃৎপিণ্ড হতে ধমনীদের প্রান্তসীমার দিকে, তারই ফলে সেই রক্তের কিছু-কিছু অংশ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে স্থিত অন্য রক্তে এসে আটকে যায়, পরে সেই অন্য কিছু রক্তকে হটিয়ে তার জায়গা সে দখল করে নেয়, এবং তখন যেসব লোমকূপের তা সম্মুখীন হয়, তাদের অবস্থান বা আকার বা ক্ষুদ্রতা অনুযায়ী তার কিছু অংশ এখানটার বদলে ওখানটায় ছোটে—ঠিক যেভাবে চোখ থাকলেই দেখা যায় কী করে নানা রকমের ছিদ্রবহুল নানান চালনী ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন প্রকারের শস্য পৃথক করার কাজে ? এবং অবশেষে, এই আগাগোড়া ব্যাপারটায় যেটা সব থেকে লক্ষ্য করার বিষয়, সেটা হল জীবৎ সত্তাগুলির[১৯] জন্ম, যে-সত্তাগুলিকে তুলনা করা চলে অতি মিহি কোনো হাওয়ার সঙ্গে, বা বরং খুব-জীবন্ত ও খুব-পবিত্র কোনো শিখার সঙ্গে যা অপর্যাপ্ত পরিমাণে উঠেই চলেছে হৃৎপিণ্ড হতে মস্তিষ্কে, সেখান থেকে স্নায়ুর পথ ধরে এগোচ্ছে পেশীর দিকে এবং গতি দিচ্ছে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে। এবং রক্তের যে-অংশগুলি আপেক্ষিকভাবে বেশি চঞ্চল ও সূক্ষ্মাগ্র বলেই এই জীবৎ সত্তাগুলির যথার্থ উপাদান হওয়ার আরো বেশি যোগ্য, তারা অন্যত্র না গিয়ে কেন মস্তিষ্কের দিকে যায়, এর পিছনে অন্য কোনো কারণ ভাবার প্রয়োজন নেই—শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে সেই রক্তকে সেখানে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে যে-বিশেষ ধমনীগুলি সেগুলি হৃৎপিণ্ড থেকে সোজা আসছে মস্তিষ্কে. এবং বলবিদ্যার নিয়মগুলি যদি ধরি, যে-নিয়ম প্রকৃতির ক্ষেত্রেও সমানই প্রযোজ্য, তো তদনুসারে দেখি অনেকগুলি জিনিস যখন একসঙ্গে এমন একই কোনার দিকে এগোতে চায় যেখানে সকলের জায়গা হওয়া সম্ভব নয়, অর্থাৎ ঠিক যে-জিনিসটি ঘটে রক্তের ঐ অংশগুলির পক্ষে হৃৎপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠটি হতে বেরিয়ে মস্তিষ্কাভিমুখে যেতে চাওয়ার সময়, তখন তাদের মধ্যে বেশি দুর্বল ও কম চঞ্চলেরা বেশি শক্তদের দাপটে সে-পথ থেকে সরে আসবেই এবং শেষে ঐ বেশি শক্তরাই একলা যাবে সেখানে।

এই সব জিনিসই অতি বিশেষ করে আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম আমার সেই নিবন্ধটিতে যেটি এক সময় প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম। তাতে আরো যা দেখাই, তা মনুষ্য-শরীরের স্নায়ু ও পেশীগুলির কী-রকম গঠন হওয়া উচিত যাতে তাদের শক্তি থাকে সেই শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করতে—এবং তাই দেখা যায় মুণ্ড শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে তাতে প্রাণ না থাকা সত্ত্বেও কী করে তা নড়া-চড়া করে আরো খানিকক্ষণ এবং মাটী কামড়ে পড়ে থাকে। সে-নিবন্ধে দেখাই জাগরণ এবং নিদ্রা ও স্বপ্ন ঘটানোর জন্য প্রয়োজন-বিশেষে মস্তিষ্কের মধ্যে কোন্-কোন্ পরিবর্তন সাধিত হওয়া দরকার, কী করে ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যস্থতায় আলো-শব্দ-গন্ধ-স্বাদ-উত্তাপ ও বিভিন্ন বাহ্যিক পদার্থের যাবতীয় অন্যান্য গুণাগুণ সেই মস্তিষ্কে নানা রকম ধারণা মুদ্রিত করতে পারে, এবং কী করেই বা সেই একই মস্তিষ্কে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদি অন্যান্য আভ্যন্তরিক বৃত্তিসমূহ তাদেরও স্ব-স্ব ধারণাগুলি পাঠাতে সক্ষম হয়। দেখাই, যেখানে ঐ ধারণাগুলি গৃহীত হচ্ছে, সেই সাধারণ বোধ[২০] বলতে কী বোঝা দরকার; যে-স্মৃতিশক্তি তাদের সংরক্ষণ করে, সেটাই বা কী; বা সেই কল্পনাশক্তিটাই বা কী, যা তাদের নানাভাবে পাল্টাতে পারে, যা কখনো এক ধারণা হতে অন্য নতুন ধারণার সৃজনেও সক্ষম হয়, এবং যা একই পদ্ধতিতে জীবৎ সত্তাগুলিকে বিভিন্ন পেশীর মধ্যে বিতরণ করে সেই শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি চালায় এত অজস্র রকমে—এবং যে-সব

বাহ্যিক বস্তুর সংস্পর্শে আসে সেই শরীরের ইন্দ্রিয় ও আভ্যন্তরিক বৃত্তিসমূহ, তাদেরও কারণে ঐ কল্পনাশক্তি এত অজস্রভাবে নড়ায়-চাড়ায় অংগপ্রত্যংগগুলিকে যে, যেটা আমাদেরই নিজেদের শরীরের ক্ষেত্রে দেখেছি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি চলতে সক্ষম হয় আপনা থেকেই, আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর না করেই। এটা তাদের কাছে একেবারেই অদ্ভুত ঠেকবে না যারা জানে মানুষ মাথা খাটিয়ে অতি অল্প জিনিসের সাহায্যে যত বিচিত্র ধরনের যন্ত্রচালিত পুতুলই বানাতে পারুক না কেন—এবং যে-কোনো প্রাণীর দেহে যে-বিপুল সংখ্যক হাড়-পেশী-স্নায়ু-ধমনী-শিরা ও অন্যান্য যাবতীয় জিনিস আছে, তার তুলনায় এ-ধরনের পুতুলের উপকরণ নিশ্চয় নিতান্তই সামান্য—তবু ঈশ্বরের নিজের হাতে গড়া বলেই এই দেহ এমন এক যন্ত্র, যা মানুষের আবিষ্কৃত যে-কোনো যন্ত্র হতে অতুলনীয়ভাবে বেশি সুশৃঙ্খল হবেই, এবং যে-মনোরম গতির অধিকারী ঐ দেহ, তাও সম্ভব নয় মানুষের তৈরী কোনো পুতুলে।

এবং এখানে আমি বিশেষ করে দাঁড়াই এটি দেখাতে চেয়ে যে যদি এই ধরনের কোনো যন্ত্র পাওয়া যেত যা যুক্তিশক্তিহীন কোনো বানর বা অন্য কোনো প্রাণীর বাহ্যিক অবয়বের সকল অংগে সমন্বিত হত তো তাহলে সেই যন্ত্রের অংগগুলি যে সেই-সেই প্রাণীর অংগ-গুলির প্রকৃতিরই হুবহু অনুরূপ নয়, সেটা বোঝার কোনো উপায়ই আমাদের থাকত না। উল্টে যদি এমন যন্ত্র পাওয়া যায় যাতে আমাদের শরীরের অনুরূপ অংগ রয়েছে এবং যা সর্বরকমে যথাসম্ভব আমাদের কর্ম বা আচরণের অনুকরণ করছে, তা হলেও সেটা যে কিছুতেই যথার্থ মানুষের মতো হচ্ছে না, এ-কথা বোঝার দুটি অতি-নিশ্চিত উপায় আমাদের কিন্তু সব সময় থাকবে। সেই দুটি উপায়ের প্রথমটি হল এই যে ঐ যন্ত্রের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না কথা বলা বা কথা রচনা করতে গিয়ে নানান স্বাভাবিক ভঙ্গী করা, যেমনটি আমরা করে থাকি যখন আমরা কী ভাবছি-না-ভাবছি তা অন্যকে জানাতে চাই। কারণ সে-রকম কোনো যন্ত্রের কল্পনা করা খুবই চলে যা তৈরী এমনভাবে যাতে তা কথা উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়, এমন-কি শারীরিক কোনো ক্রিয়া যখন তার অংগে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটায়, তখন সেই উপলক্ষের উপযোগী কিছু কথাও হয়তো সে আওড়ে ফেলতে পারে—এই যেমন কেউ তাকে স্পর্শ করল কোনো জায়গায় আর সংগে-সংগে সে প্রশ্ন করে বসল তাকে কী বলতে চাওয়া হচ্ছে, বা অন্য এক জায়গায় তাকে ছোঁওয়া হল আর সে চেঁচিয়ে উঠল তার লাগছে বলে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তার সামনে যা-কিছু বলা হচ্ছে, সে-সবের প্রসঙ্গ অনুযায়ী উত্তর দেবে তার কথাগুলোকে নানাভাবে সাজিয়ে—যেটা যত হতবুদ্ধিই হোক, সব মানুষে পারবে—এটা করা সম্ভব হবে না সে-যন্ত্রের পক্ষে। এবং উল্লিখিত দ্বিতীয় উপায়টি হল, এমনও যদি হয় যে সে-যন্ত্র বহু জিনিস করছে আমাদের যে-কোনো কারুরই মতন বা হয়তো তার চেয়ে আরো ভালো করে, তবু অন্য অনেক জিনিস থাকবেই যাতে সে ব্যর্থ হতে বাধ্য—যার থেকে বোঝা যাবে যে-জিনিসটা তাকে চালাচ্ছে, সেটা জ্ঞান নয়, শুধু তার অঙ্গগুলির বিশেষ বিন্যাস বা অবস্থান মাত্র। কারণ, যেখানে যুক্তি হল এমন এক বিশ্বজনীন কল যাকে কাজে লাগানো চলে সকল রকমের উপলক্ষে, সেখানে প্রতিটি বিশেষ কাজের জন্য ঐ যন্ত্রের দরকার হয় তার অঙ্গগুলির বিশেষ বিন্যাস-পদ্ধতি। এর ফলে এমন যন্ত্রের অস্তিত্ব সম্ভব ঠেকে না যার নাকি এত রকমের বিভিন্ন অঙ্গ রয়েছে যে সেগুলিকে তা জীবনের সর্ব প্রয়োজন অনুযায়ী চালাতে পারবে ঠিক সেইভাবে যে-ভাবে আমাদের যুক্তি চালায় আমাদের।

অর্থাৎ, পশু ও মানুষের পার্থক্যটা কোথায়[২১] সেটাও জানা যায় উপরে বর্ণিত ঐ

দুটি উপায় হতেই। কারণ, যেটা খুবই লক্ষ্য করার বিষয়, তা হল এমন মানুষ কোথাও নেই —তা সে-মানুষ যত হতবুদ্ধি বা যত বোকাই হোক না কেন, এমন-কি পাগলদেরও এর থেকে বাদ দিচ্ছি না—যে নাকি সক্ষম নয় একটি কথার সমষ্টিকে সাজাতে এবং তার দ্বারা তৈরী করতে এমন একটি ভাষণ যার মাধ্যমে সে অন্যকে বোঝাতে পারে তার চিন্তা-ভাবনা। এবং পক্ষান্তরে, এমন আর অন্য কোনো প্রাণীই নেই যার পক্ষে হেন কাজ সম্ভব, তা সে-প্রাণী যত সম্পূর্ণই হোক না বা যত ভাগ্য নিয়েই জন্মে থাকুক না। এ-রকমটা যে হচ্ছে, তার কারণ এই নয় যে ঐ সব প্রাণীদের অঙ্গের দিক থেকে কোনো ঘাটতি আছে, যেহেতু দোয়েল ও তোতা পাখিদের যদিও দেখা যায় কিছু কথা আমাদের মতো উচ্চারণ করতে, আমাদের মতো কথা তারা বলতে পারে না—অর্থাৎ যেটা ভেবেছে, স্পষ্টত সেটাই তারা বলছে, এমন নয়। অন্যদিকে মানুষের বেলায় দেখি, যারা মূক ও বধির হয়ে জন্মেছে এবং তাই যারা পশুদেরই মতো কি আরো বেশি করে বঞ্চিত সেই অঙ্গগুলি হতে যা অন্যদের বাকশক্তি দেয়, তারাও স্বয়ং আবিষ্কার করে থাকে এমন কিছু সঙ্কেত যার মাধ্যমে তারা নিজেদের বোঝাতে পারে অন্যদের কাছে—যে-অন্যেরা সাধারণত তাদের সঙ্গে থাকে বলেই তাদের ভাষা শেখারও অবকাশ পায়। এবং এর মানে শুধু এই নয় যে মানুষের থেকে পশুর যুক্তিশক্তি কম—কথা যা, তা হল ঐ যুক্তিশক্তিটা পশুদের একেবারেই নেই। কারণ সকলেই জানে কথা বলতে পারার জন্য খুব কম যুক্তিশক্তিরই দরকার পড়ে—এবং যত বৈষম্যই লক্ষ্য করা যাক না কেন একই প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে, অথবা এক মানুষ থেকে আরেক মানুষেও, এবং যতই বলা যাক না কেন যে একজনদের শিখিয়ে-পড়িয়ে তোলা আরেকজনদের থেকে সোজা, তবু একটা বানর বা তোতা পাখি, তা তারা হয় হোক না কেন তাদের স্ব-স্ব প্রজাতির সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিনিধিই, তারা যে এ-ব্যাপারে নির্বোধতম বা ন্যূনপক্ষে বিকৃতমস্তিষ্ক কোনো মনুষ্য-শিশুরও সমান হতে পারবে, এ-কথা বিশ্বাস করা কিছুতেই যাবে না। এর কারণ হল এই যে আমাদের চৈতন্যের প্রকৃতি আর তাদের চৈতন্যের প্রকৃতি দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। এবং আভ্যন্তরিক বৃত্তিসমূহের তাগিদে শরীরে যে-স্বাভাবিক গতিবিধি জাগে, এবং যা যন্ত্র ও প্রাণী উভয়েই অনুকরণ করতে পারে, তার সঙ্গে কিন্তু কথা বলার ক্ষমতাটাকে এক করে গুলিয়ে ফেলা উচিত হবে না। কোনো-কোনো প্রাচীনদের মতো এমন ভাবাও যুক্তিযুক্ত হবে না যে পশুরা আসলে সত্যিই কথা বলে, শুধু আমরাই তাদের ভাষাটা বুঝি না। কারণ সেটা যদি সত্যি হত তো তাদের ও আমাদের বহু অঙ্গ একই রকমের বলেই তাদের জাতভাইকে যেটা বোঝাচ্ছে, সেটা তারা আমাদেরও বোঝাতে পারত। এটাও রীতিমতো লক্ষ্য করার বিষয় যে যদিও তাদের কোনো-কোনো কাজে কিছু প্রাণী আমাদের চেয়ে বেশি নৈপুণ্য দেখায়, অন্য বহু কাজে সেই একই প্রাণীদের কোনো নৈপুণ্যই দর্শিত হয় না। যার ফলে কোনো-কোনো কাজ তারা আমাদের চেয়ে আরো ভালোভাবে করছে বলেই এটা প্রমাণিত হয় না যে তাদের বুদ্ধি আছে, কারণ কাজ ভালো করছে বলেই যদি বুদ্ধি থাকে তো তাহলে সে-বুদ্ধি আমাদের যে-কোনো কারুর চেয়েই বেশি থাকত তাদের এবং সে-ক্ষেত্রে অন্যসকল কাজই তারা আরো ভালো করত। বরং যেটা প্রমাণিত হচ্ছে, সেটা হল বুদ্ধি তাদের নেই এবং একমাত্র প্রকৃতিই তাদের চালাচ্ছে, তাদেরই অঙ্গসমূহের বিন্যাস অনুযায়ী। ঠিক যেমন বড় কোনো ঘড়ি, যা তৈরী শুধু চাকায় আর স্প্রিং-এ, তা ঘণ্টা গুনে যায় কাঁটায়-কাঁটায় এবং সময়ের মাপ রাখে এমন যথাযথভাবে, যেটা নাকি আমরা পারব না আমাদের সকল সতর্কতা অবলম্বন করেও।

এর পরে আমি বর্ণনা দিই আত্মার, যা সম্পন্ন যুক্তিশক্তিতে, এবং দেখাই কেন তার পক্ষে জড়ের শক্তি হতে উদ্ভূত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়, যেমন নাকি উদ্ভূত হয়েছে অন্য অনেক জিনিস যার কথা আগে বলেছি। উল্টে বলি, সে-আত্মাকে ইচ্ছাপূর্বক সৃষ্টি করার দরকার, এবং দেখাই, কোনো কর্ণধার যেভাবে তার জাহাজে উপস্থিত থাকে, কেন শুধু সেইভাবে মনুষ্য-শরীরে অবস্থিত হওয়াটাই আত্মার পক্ষে যথেষ্ট নয়—সেটা হয়তো যথেষ্ট ঠেকত শুধু শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনার জন্য। কিন্তু এখানে দরকার যা, তা সেই আত্মার পক্ষে শরীরের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ও মিলিত হওয়া, যাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা ছাড়াও যে-ধরনের ভাব ও বাসনা আমাদের থাকে, সেগুলি জাগতে পারে, এবং এইভাবে রচিত হতে পারে এক যথার্থ মানুষ। এ ছাড়া, অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলেই আত্মার প্রসঙ্গটি নিয়ে আমি এখানটায় একটু বিস্তারিতভাবে মাতি। কারণ ঈশ্বরকে অস্বীকার করে কেউ-কেউ যে-ভুলটি করে—যে-ভুল কিছু আগে উচিত মতো খণ্ডিত করতে পেরেছি বলে আমি মনে করি—সেই ভুলটা বাদ দিলে অন্য যে-কোনো ভুলের থেকে যা সবচেয়ে বেশি করে ধর্মের সোজা রাস্তা হতে দুর্বলমতিদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তা হল এই ধারণা যে পশুদের ও আমাদের চৈতন্যের প্রকৃতি এক এবং তাই মাছি বা পিঁপড়ের ক্ষেত্রে যেমন আমাদেরও তেমনি এ-জীবনের পরে কিছু ভয়ের নেই, কিছু আশা করারও নেই। আসলে এই দুই চৈতন্যের প্রকৃতিতে তফাতটা যে কতখানি, তা জানলে বোঝা যায় অন্য সেই যুক্তিও যা আমাদের আত্মাকে শরীর হতে সম্পূর্ণ এক স্বাধীন প্রকৃতির বলে প্রমাণ করে। এবং তাই শরীর গেলেও আত্মা মৃত্যুর অধীন হয় না; তা ছাড়া এমন কোনো কারণই যেহেতু দেখছি না যার দ্বারা সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, আমরা স্বভাবতই এই বিচারে প্রবৃত্ত হই যে এ-আত্মা অবিনশ্বর।

পাদ-টীকা

[১]কোনো জ্যামিতিক প্রমাণের প্রতিজ্ঞাগুলির ক্ষেত্রে যেমন, কার্তেজীয় পদার্থবিদ্যায় সত্যগুলিও একটি থেকে আরেকটি অনুমিত হয়।

[২]স্পষ্টতই, অধিবিদ্যার থেকে পদার্থবিদ্যা নিয়ে বলতে তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন। এর আগের খণ্ডে আলোচনা করেছেন অধিবিদ্যা। এখানে আলোচ্য পদার্থবিদ্যা।

[৩]যেমন, পৃথিবীর গতিবিধি বিষয়ক প্রসঙ্গ।

[৪]অর্থাৎ যাজকীয় কর্তৃপক্ষেরা।

[৫]রচনাটি হল "পৃথিবী অথবা আলোক-বিষয়ক নিবন্ধ", যেটি দেকার্ত লিখতে সুরু করেন ১৬২৯-এ। কিন্তু ১৬৩৩-এ গ্যালিলিও-র (১৫৬৪-১৬৪২) শাস্তির খবর পেয়ে লেখাটি প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নেন। শেষে লেখাটি প্রকাশিত হয় ১৬৬৪-তে, দেকার্তের মৃত্যুর চোদ্দ বছর পরে।

[৬]দেকার্তের এই প্রকল্পটির সহজ অর্থ হল এই যে একবার যখন ঈশ্বর পৃথিবীর সৃষ্টি-কর্ম সমাধা করেছেন, তখন পৃথিবী সম্পূর্ণ নিজের উপরই নির্ভর করে থাকবে এবং পরিচালিত হবে একমাত্র বলবিদ্যার নিয়ম-কানুন অনুযায়ী। পাস্কাল (১৬২৩-১৬৬২) এর বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন ও বলেন : "দেকার্তের এটা আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না। তাঁর দর্শনে সর্বত্র ঈশ্বরকে দিব্যি পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়েছেন, শুধু পৃথিবীকে তার গতিপথে চালিয়ে দেওয়ার বেলায় তাঁর দরকার পড়ল ঈশ্বরের আঙুলের টোকাটির। কিন্তু তার পরেই, ঈশ্বরকে নিয়ে আর কিছু করার তাঁর নেই।"

[৭]অর্থাৎ মধ্যযুগের দার্শনিক চিন্তাধারার উল্লেখ করেছেন দেকার্ত।

[৮]দেকার্তের এ-ধারণা ভুল—কারণ আলোর পক্ষে মহাকাশের বিরাট-বিরাট দূরত্ব এক মুহূর্তে পার হওয়া সম্ভব নয়।

[৯]এ-ব্যাপারে তৎকালীন খৃষ্টীয় বিশ্বাসের বিরোধিতা করতে চাননি বলেই দেকার্ত এ-কথা বলছেন।

[১০]অর্থাৎ সৃষ্টির অলৌকিকতাকে দেকার্তও উড়িয়ে দিচ্ছেন না। বস্তুর পক্ষে আপনা থেকে উদ্ভূত

হওয়া সম্ভব নয়—কারণ আগে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করতে হবে জড়, পরে প্রকৃতির নিয়মগুলি বেঁধে দিয়ে বস্তুকে তিনি সংরক্ষণ করবেন প্রতি পদে।

[১১] অর্থাৎ যা-কিছু চিন্তা নয়, তার সবই যান্ত্রিক, যেমন যন্ত্র মনুষ্য-শরীরও—এই দৃঢ়বিশ্বাস দেকার্তের।

[১২] আত্মা ও শরীরের মধ্যে যে-সারগত পার্থক্য দেকার্ত করছেন, কার্তেজীয় যান্ত্রিকতা বলে যা পরিচিত, সেটা তারই স্বাভাবিক ফল। দেকার্ত যান্ত্রিকতার প্রচার করছেন, জড়বাদের কথা বলছেন না।

[১৩] উইলিয়ম হার্ভে (১৫৭৮-১৬৫৭)।

[১৪] অর্থাৎ এখন এই অনুচ্ছেদে যা বলছেন, তা সবই হার্ভের বিরোধিতা করে।

[১৫] দেকার্ত বলছেন, হৃৎপিণ্ডের ভিতরে যে-উত্তাপ আছে, তারই ফলে রক্ত শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও গতিবিধির কারণ সেইটাই। অন্যদিকে হার্ভের মত হল এই যে হৃৎপিণ্ডই কুঞ্চিত হওয়ার সময় ধমনীতে রক্ত পাঠিয়ে দেয়, এবং তাঁর প্রকল্প অনুযায়ী শিরাশ্রিত রক্তের ধামনিক রক্তে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটা অব্যাখ্যাত থেকে যায়, যদিও দেকার্তের প্রকল্পে সেটি অব্যাখ্যাত থাকে না। কিন্তু শিরাশ্রিত রক্তের ধামনিক রক্তে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটা ঘটছে হৃৎপিণ্ডে, এমন বিশ্বাস করে দেকার্ত ভুল করেন—আসলে ঘটনাটা ঘটছে ফুসফুসে, শ্বসন-প্রক্রিয়ার পরিণাম হিসেবে, যেটা ১৭৭৭ সালে ফরাসী রসায়নবিদ লাভোআজিএ (১৭৪৩-১৭৯৪) পরিষ্কার করে দেখাবেন।

[১৬] শিরা ও ধমনীর পারস্পরিক গঠন বিষয়ে এই যে-পার্থক্যটি করছেন দেকার্ত, সেটি ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত—কারণ ফুসফুসের যে-ধমনীটি, তাতে থাকে শিরার রক্ত। রক্ত-সঞ্চালনের ব্যাপারটা আজ আমরা যেভাবে জানি, দেকার্ত সেভাবে বোঝেননি। তাঁর ধারণা ছিল, হৃৎপিণ্ড হতে ধমনী দিয়ে একমাত্র ধামনিক রক্তই বেরোতে পারে (ফুটন্ত অবস্থায়) এবং শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে যা ফিরে আসে, তা শিরাশ্রিত রক্ত মাত্র (হিমশীতল হয়ে)।

[১৭] সমসাময়িক অধিকাংশ চিকিৎসাবিদদের মতোই দেকার্তও ধরতে পারেননি ফুসফুসের আসল ক্রিয়াটি। সেই ক্রিয়াটিকে তিনি ভেবেছিলেন ফুসফুসের এক হিমায়ন পদ্ধতি হিসেবে।

[১৮] অর্থাৎ থুথু, প্রস্রাব, ঘাম।

[১৯] জৈব পদার্থের মধ্যে নিহিত অদৃশ্য কিছু কণিকা, একমাত্র যাতেই লুকিয়ে থাকে প্রাণের রহস্য সমস্ত জীবের। এরকম একটি ধারণা মধ্য যুগের দার্শনিকদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

[২০] মস্তিষ্কের মধ্যিখানের একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থি, যেখানে এসে হাজির হয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত অনুভূতির প্রতিবিম্ব।

[২১] এই অনুচ্ছেদে দেকার্ত খণ্ডন করছেন মঁতেইন-এর (১৫৩৩-১৫৯২) একটি প্রিয় প্রতিপাদ্য। মঁতেইন বলতে চেয়েছিলেন, পশুরা আসলে যুক্তিশক্তিহীন নয়—শুধু মানুষই পশু ও তার নিজের মধ্যের পার্থক্যটাকে বাড়িয়ে দেখে। এমনও তিনি বলেন যে কখনো-কখনো এক মানুষের সঙ্গে আরেক মানুষের যে-বৈষম্য দেখা যায়, তা মানুষের সঙ্গে পশুর বৈষম্য থেকে বেশি। পশুরা যে যুক্তিশক্তিহীন নয়, তার স্বপক্ষে মঁতেইন-এর যুক্তি হল : এক, পশুদের ভাষা আছে, যদিও মানুষ সেটা বোঝে না; দুই, কোনো-কোনো পশু-পক্ষী-কীটের (যেমন, বাবুই পাখি, বা মৌমাছি, বা পিঁপড়ে) মধ্যে এমন দক্ষতা ও গুণপনা দেখা যায় যা মানুষে মেলা ভার। কিন্তু দেকার্ত কোনো পশুকেই কোনো রকমের যুক্তিশক্তির অধিকারী বলে মনে করেন না। কোনো ব্যাপারে দক্ষতা মানেই যে যুক্তিশক্তিরও অধিকারী হওয়া, তা নয়।

শব্দপঞ্জী

এই খণ্ডে ব্যবহৃত কিছু বাংলা শব্দের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা এখানে পাঠকদের সুবিধার্থে দেওয়া হল, সঙ্গে সমার্থক ফরাসী ও ইংরেজী শব্দ, আগে ফরাসী পরে ইংরেজী। এখানে প্রদত্ত কোনো-কোনো ফরাসী শব্দ আজকের প্রচলিত রীতি হতে পৃথক ঠেকতে পারে, কিন্তু দেকার্ত সেইভাবেই তাদের ব্যবহার করেছিলেন। প্রদত্ত কোনো-কোনো শব্দের বাংলা তর্জমাও হয়তো একটু অস্বাভাবিক ঠেকতে পারে, কিন্তু তেমন সব শব্দের সেই অর্থই এখানে দেওয়া হয়েছে যে-অর্থে দেকার্ত তাদের ব্যবহার করেছিলেন বলে অনুবাদক ধারণা করেন।

অঙ্গ, organe, organ
অধিবিদ্যা, metaphysique, metaphysics
অনুমিত, déduit, deduced
অভিকর্ষ, pesanteur, gravity
অস্ত্রচিকিৎসক, chirurgien, surgeon
আত্মা, âme, soul
আভ্যন্তরিক বৃত্তিসমূহ, passions intérieures, interior sensations

উদ্ভিদোপম বৃদ্ধিশীল আত্মা, âme végétante, vegetative soul
কর্ণধার, pilote, pilot
গেঁজিয়া, bourse, purse
গ্রন্থি, glande, gland
গ্রীষ্মমণ্ডল, tropiques, the tropics
জড়, matière, matter
জড়বাদ, matérialisme, materialism
জীবৎ সত্তাগুলি, esprits animaux, animal spirits
ঝিল্লী, petite peau, membrane
তত্ত্ব, principe, principle
ধামনিক শিরা, veine artérieuse, arterial vein
নিবন্ধ, traité, treatise
পদার্থবিদ্যা, physique, physics
পরীক্ষা, expérience, experiment
পাতিত, distillé, distilled
প্রকল্প, hypothèse, hypothesis
প্রজাতি, espèce, species
প্রতিজ্ঞা, proposition, proposition
প্রাণহীন বস্তু, corpse inanimé, inanimate body
বলবিদ্যা, mécanique, mechanics
বিরলীকৃত হওয়া, se raréfier, to rarefy
মধ্য যুগের দার্শনিকরা, scolastiques, scholastics
মহাধমনী, grande artère, aorta
মহাশিরা, veine cave, vena cava
যন্ত্র, machine, machine
যন্ত্র, organe, organ
যান্ত্রিকতা, mécanisme, mechanism
যুক্তিক্ষম আত্মা, âme raisonnable, rational soul
যৌগিক পদার্থ, corps composé, compound body
শারীরস্থান, anatomie, anatomy
শিরাশ্রিত ধমনী, artère veineuse, venous artery
শ্বাসনালী, trachée-artère, wind-pipe
সমভার, contrepoids, counterweight
সম্ভাব্য, vraisemblable, probable
সম্পূর্ণ, parfait, perfect
সংবেদী আত্মা, âme sensitive, sensitive soul
সূক্ষ্মাগ্র, pénétrante, pointedly penetrating
স্থান, espace, space
স্নায়ু, nerf, nerve
স্প্রিং, ressort, spring
হিমায়ন, réfrigération, refrigeration

মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য　　[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

স মা লো চ না

গোধূলিতে জ্যামিতি—লোকনাথ ভট্টাচার্য। কৃত্তিবাস প্রকাশনী। কলিকাতা-১৭। মূল্য তিন টাকা

যে কবিতা চমকিত করে আর যে কবিতা দীক্ষিত করে, তাদের দুয়ের মধ্যে তফাতটা শুধু গুণগতই নয়—প্রকারগতও বটে। যা আমার মধ্যে সঞ্চারিত করবে একটা ভঙ্গি, যা সহসা খুলে দেবে একটা জানলার পর্দা, তা মুগ্ধও করতে পারে, চমকিতও করতে পারে—কোনটাই ফেলে দেবার বিষয় নয়। কিন্তু যা কিছুই করে না, শুধু সন্ধ্যার মতো ঘন হয়ে আসে, মেঘের মতো গাঢ়, যা এক অনতিলক্ষ্য, অথচ নির্ভুল, পদক্ষেপে উত্তরোত্তর অধিগত করে, অধিকৃত করে—তা অন্য ধরনের কবিতা। এরা বিরল হতে পারে, সে সুবাদেই এদের দেখা পেলে স্বীকৃতি জানানোও আনন্দিত আবশ্যিকতা। লোকনাথ ভট্টাচার্যের "গোধূলিতে জ্যামিতি" এজাতীয় কবিতা। এ কিন্তু তাঁর আজকের অকস্মাৎ উচ্চারণ নয়। একদা যুবকের প্রথম দিনগুলিতে ইনিই কোনারকের ভগ্ন মন্দির-মূর্তির ভাবানুষঙ্গে এক দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন। নিশ্চয় তাতে ছিল অনেক কথা যা শ্রুতি-অভিরাম, যা প্রথম প্রেমিকের উচ্চারণের মতোই আবেগকে উন্মোচিত রাখতেই ভালোবেসেছিল। কিন্তু সেদিনের ঐ কবির সঙ্গে আজকের এই কবির যত ব্যবধানই থাক না কেন, সেই ব্যবহিত দূরত্বটুকু পূর্ণ করে রেখেছে প্রস্তুতি ও বিকাশের দীর্ঘমাত্রার ছন্দ। একথা ঠিক, আজ বলার চাল পাল্টেছে, কবিতাকে কবিতার মতো পঙ্‌ক্তিবিন্যাস দিতে তাঁর পরাঙ্মুখতার কথাও আজকে নতুন নয়—তবু আজও যখনই শিল্পের জগৎ ও বর্তমান জগতের সর্বত্র নানা অনন্বয়ের কথা তিনি বলেন, বলেন মানুষের অন্তর্গূঢ় বিষণ্ণতার কথা, বিষণ্ণতার নীল পাপড়িগুলির মধ্যবিন্দুর স্থিত গন্ধটুকুর কথা—তখন সেই যাত্রারম্ভের পদক্ষেপটিকেও সবমিলিয়ে নতুন করে জানা যায়।

তিনি অবশ্যই এখনই পৌঁছানোর কথা ভাবছেন না। সে কারণেই তাঁর পদচারণা অনলস—অথচ তা লক্ষ্যবিস্মৃত নয়। তাঁর এই চলার দিকে তাকালে দুটো বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। এক, তিনি কবিতাকে কোনো পক্ষের প্রতিনিধি বা মুখপাত্র করেন নি; দুই, অথচ, তিনি আঙ্গিককে খুঁজেছেন বহতা জীবনেরই উৎসে। এবং, আর একটি প্রধান কথাও তাঁর সম্বন্ধে জেগে ওঠে অবারিতভাবেই—লোকনাথ সেই সময়ের বাঙালী কবিদের একজন প্রবল ব্যতিক্রম, যখন জীবনানন্দকে অনুসরণ করা একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছিল। শুধু এই কেতাকে পরিহার করে নিজেকে বিশিষ্ট করে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য থাকলে, কথাটা এত বড়ো করে বলার কিছু ছিল না। যেহেতু তাঁর বলার বিষয় ছিল সহযাত্রীদের থেকে ব্যাপকতর, স্বতন্ত্র, সেইহেতুই তিনি বুঝেছিলেন, জীবনানন্দের একার্থসাধক বাচ্যাঙ্গিক তাঁর অনুধাবনীয় হতে পারে, অনুকরণীয় নয়। তাঁর কবিতাকে তিনি প্রত্যক্ষের জলহাওয়া থেকে এতটা দূরে নিলেন না, যেখানে ব্যক্তির শব্দবিলাস হয়ে ওঠে ব্যক্তিত্বেরই যথেচ্ছ বিহার, যথা-অভিরুচি লীলা। আবার এ কবিতা হয়ে উঠল না সাধারণ্যের কবিতা। লোকনাথ জনগণের কবিও নন।

"গোধূলিতে জ্যামিতি" কবিরই ব্যক্তিগত স্বর। বিন্যাসে এবং প্রক্ষেপে সে-স্বর অর্জন

করেছে এক চারিত্র। চারিত্রের সেই সহজাত আধুনিকতাই এই কাব্যের নির্দ্বিধ আত্মকথা। আমিই ক্ষমার্হ যদি এ ধারণা আমার ভ্রান্ত হয় যে, "গোধূলিতে জ্যামিতি" অনেকগুলি কবিতার সমষ্টি নয়, একটিই দীর্ঘ কবিতা। নামকরণ থেকেই শুরু করা যায় কবিতাপাঠ। গোধূলির সঙ্গে যে-রঙের অনুষঙ্গ, জানালার আঁকিবুকিতে যে-ব্যক্তিগত বিষণ্ণতা ও স্বপ্ন— এই দীর্ঘ কবিতার বিষয় হল সেটাই। ঐ দুয়ের বিপরীত সমাবেশের মধ্যে অন্বয় এবং অনন্বয়ের যে কাটাকুটি, কিন্তু যাকে পেরিয়ে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে রেখার ভাষা— এ কবিতার শব্দসম্পাতে তাইই রূপ পেয়েছে। উৎসর্গপত্রে উচ্চারিত হয়েছে একালের বন্দী শব্দদের আর্তি—

> এই শতাব্দীর আমি এক মানুষ, অন্যান্য শতাব্দীর
> মতোই—শুধু আমারই মতো কতিপয় মানুষের জন্য
> আমার আত্মীয়তার সযত্নে সাজানো কথাগুলি
> এ-দুর্গের চার দেয়ালে বন্দী হয়ে আছে উদ্ধারের
> প্রার্থনা নিয়ে বুকে।

(পর্দার ওপারে পর্দা)

এক বিস্ময়কর মৃদু আস্তিকতা ধূপের মতো নীরবে ছড়িয়ে দিয়ে আপন অস্তিত্ব কবিতা-গুলিতে—'গুরুকে দেখছি না, যদিও পাশেই তিনি আছেনই—নইলে এ অন্ধকার কী করে শিল্প হল, কেন মন শুনছে মৃদঙ্গ বাজছে?' অথবা 'আমি তো জগৎ নয়, আমি থেকে আমরা-য় যাওয়াতেই নিসর্গ।' ত্রিকোণের প্রথম বাহুতে শিল্পে ও নিসর্গে যে-জগৎ কম্পমান অবিনশ্বরতায় বিরাজিত, তা প্রাধান্য পেয়েছে। একটা সামূহিক জীবনচেতনাও হয়তো ব্যক্তি-গত উচ্চারণের ভিতর দিয়ে ভূমিষ্ঠ হতে চেয়েছে। ত্রিভুজের দ্বিতীয় বাহুতে ছায়া ফেলেছে সমকাল। 'আততায়ী'দের কথা, 'প্রতিশোধে'র ভাষা, সংশয় ও তৃষ্ণার রুক্ষতার প্রসঙ্গগুলি কলকাতা ও বাঙালীর তথা আমাদেরই তাৎকালিক অনপনেয় গ্লানিকে স্মরণ করিয়ে দেয়—

> আমাদের যুগটা শেষ হয়ে এল নাকি? ঘড়া জলশূন্য প্রায়? এক
> বিন্দু পানীয়ের কসরতে যদি এখনো মাতি তো নিজেরই ঘাম ঝরবে
> মেরে কেটে দুয়েক ফোঁটা, ক্লান্ত খচ্চরের মতো হাঁপাবো, তবু পাত্রের
> তলানি হতে হয়তো পাঁকই উঠবে, আঁচরে তাও উঠবে না।

যদিও 'দেয়ালে দেয়ালে ভীষণ বার্তার' মধ্যে 'কাকচক্ষু পানীয়' দুঃসম্ভব তথাপি; 'আশা তুমি রাখবেই হে সন্ধ্যার মানুষ—আমি ক্ষীণকণ্ঠ আজ বহুদূর হতে, সঙ্গী তোমার'। ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুতে প্রমাণিত হয় ব্যক্তির উত্তরণের বাসনা, বাত্যাতাড়িতের প্রতীক্ষা উপকূলের জন্য। 'একদিন এ আকাশ জ্বলবে-জ্বলবে দেখো, এ অরণ্য আনন্দে নাচবে।' কিংবা—

> যত নারী চিনেছি, হেঁটেছি আমি যত পথ—
>
> চারিপাশের চেয়ে-থাকা নিসর্গের নন্দিত নিশ্বাসের হাওয়ায়
> হাওয়ায় তারা ছুটে মিলতে, মিশে যেতে চায় এসে
> তোমারই নামাঙ্কিত দরজায়।

তৃতীয় বা ত্রিকোণের শেষবাহুর প্রথম কবিতাটি আমার কাছে একটি সার্থক কবিতা— 'তোমার সঙ্গে সঙ্গমের সময় সুজাতা'। একটা আচমকা বিষয়ের জন্যই যে কবিতাটির

গৌরব নয়—সে কথা যেকোনো মনোযোগী পাঠকই জানেন। কাকে শ্লীল বলে, কাকে অশ্লীল বলে, এ তর্কে যাঁরা মশগুল হতে ভালোবাসেন, এই ধরনের লেখাই তাঁদের জানিয়ে দেয়—কাউকে শ্লীল বলে না, কাউকে অশ্লীলও বলে না—অ্যাটিট্যুডই ব্যাপারটির বিচারক। কিন্তু সেটাও এখানে বড়ো কথা নয়। এই অসামান্য কবিতাটির প্রধান কথা হল আর্ত উদ্বেগাকুল আধুনিক মানুষের পার হয়ে যাবার, পৌঁছে যাবার তীব্র ঘন বাসনা। ব্যর্থতা যে মানুষের শিয়রে সতত অপেক্ষমান তারই জন্য লোকনাথ একটি অলৌকিক প্রতীকাধার নির্মাণ করেছেন—অথচ শেষ আশ্বাস থেকে বিচ্যুত হননি। মানুষের সেই বাঞ্ছিত উত্তরণের মতো কবিতাটিও উত্তীর্ণ হয়েছে এক অমল আলোয়। 'অতএব সুরঞ্জনা' গভীরতায় অনুরূপ আর একটি। আজ আমাদেরই গড়া কথা থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়া দরকার। অনেক কথাই ঢালাই হয়েছে অনেক দিনের পুরনো ধাতুতে। আমাদের সমস্ত স্বীকারোক্তি তার আসন্ন মুহূর্তে সেই ছাঁচে ঢুকে পড়তে চায়—'হতভাগা কথা পাশেই রয়েছে ঘুপটি মেরে, মুড়ি দিয়ে শুয়ে'।

অতএব হে আশ্চর্য স্তনের সুরঞ্জনা, একলা যুঝতে আমি
আর পারছি না যে-যুদ্ধ এত পথ ভেঙে পৌঁচেছ বলেই
অন্তত তোমারও আংশিক—অনেক দূর এসেছ, আরেকটু
এগোতে হবে। মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে যে,

তাকে করতে চাই মৃতদেহ, পরে দুজনে ধরাধরি
করে নিয়ে যাব মর্গে।

কথার ওপারে যে নীরবতা এ যেমন তার জন্য খুঁজে ফেরা—'মর্গে' তেমনি জানিয়ে দিচ্ছে ব্যাধিমূল সম্বন্ধে কৌতূহলকে। 'এরাত্রে দরকার যা, তা মন্ত্রের, অগ্নিগর্ভ উচ্চারণের'—এই গাঢ় উচ্চারণ কখনো কখনো স্তোত্রের মতো উদাত্ত হয়ে উঠেছে। অথচ এক কাঙ্ক্ষিত সংবেদিতার কারণে তা স্তোত্রের মতো সুদূর হয়ে ওঠে না। ত্রিকোণের দ্বিতীয় বাহু পর্যায়ের 'পাগলটা কত্থকটা' কবিতাটি স্মরণীয়। এক নাগরিক স্থূলতাকে আঘাত হানেন কবি, স্বার্থপরতাকেও—

ভিতরে দাঁড়িয়ে-থাকা উত্তরতিরিশ এক খুকু, ঘামে
জ্যাবজেবে, চেপ্টে যাওয়া, চশমাপরা, অল্প একটু আকাশের
জন্য আকুল। আমার দিকে তাকাস কেন নেকি—মনে মনে
বলি—আমি তোকে দেব আকাশ?

এই স্থূলতার সামনেও পাগলটা নেচে চলে। পাগলটাকে তার যথাযথতা থেকে একটুও উদ্ধার করা হয়নি। কবির নিজস্ব প্রার্থনা আর পাগলের ঘৃণিত ধিক্‌কারের মাঝখানে সমাসন্ন সার্বিক রাত্রির মুখে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা এই, 'পাগলটা কত্থকটা শিখেছিল একদিন, অবশ্য শিখেছিল'—। এইভাবে বস্তুতে নিহিত জ্ঞানেরই আর এক ছবি ফুটে ওঠে 'নেতার ছবি' কবিতায় অথবা 'মদিগ্‌লিয়ানি, জানি'-তে।

সব ছাপিয়ে যে-দুটি ব্যাপার আমাকে সংক্রামিত করে, যে বেদনায় আমিও হয়ে উঠি প্রণয়াহত, তার একটি হল এই কবির বিনয়ী ভালবাসা—আজ বহু উদ্ধত উক্তির আত্ম-নিনাদের স্মৃতিতে আকীর্ণ হৃদয় এমন কথা অনেকক্ষণ ধরে শুনতে চায়—

মুক্তো হয়নি যে-মলিন শঙ্খের কুচি, যখন তাকে খুঁজে

> পাবে এই ভাঙা ঘরের বেদীতে—পাবেই, কারণ এ-পথ
> দিয়েই তোমায়-তোমাদের যেতে হবে—জেনো এখানে
> তোমাদের এক আত্মীয় ছিল, রইল, তোমাদেরই মতো
> দুঃখের দুরন্ত সমবেত যাত্রায় যে দীপ্ত চোখে হাঁটতে
> চেয়েছিল।

এই প্রাণময় মানবিকতার কারণেই লোকনাথের কবিতা কখনো শব্দের খেলায় মাতে না, ইতস্তত 'রকচারী' হয়ে যুবকত্ব ফলায় না। আত্মীয়তার জন্য আকাঙ্ক্ষা বা কম্যুনিকেট করার আকুলতায় সূচিত হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা থেকে উত্তরণের পণ। এইখানেই লোকনাথের তাৎপর্যময় আধুনিকতার ব্যাখ্যাসূত্র। আত্মীয়তা তাই তাঁর এত প্রিয় প্রসঙ্গ—আত্মীয়হারা মানুষের হয়ে তাঁর এই আকুলতা। দ্বিতীয় গুণটি হল, এক স্বস্থ নাতিপ্রকট দার্শনিক আস্তিক্য। এখানে লোকনাথ একেবারেই ভারতীয়। সে-সব মুহূর্তে ধরা পড়ে তাঁর দেওয়া জীবনের মানে—'ধুঁকতে ধুঁকতে নয়, বলতে চাই আমার বাঁচা ভুরু কুঁচকেও নয়', অথবা 'মানুষের স্পন্দিত হৃদয়' কবিতাটি, যে অংশে কবির আশ্রয়বাসনার সঙ্গে অন্বিত হয়েছে চরিতার্থ সমাপ্তির বাসনা।

এই স্বতন্ত্র স্বরের মূল্যায়নে আমাদের ভুল হয় না। নানা অভিজ্ঞতার আলো ঋজু ও তির্যক নানা রেখায় এসে মিলিত হয় অনুভূতির বিন্দুতে। জীবনকেও দিতে চাইতে হবে শিল্পের নিভৃত মর্যাদা। জানতে হবে শিল্প যেমন শিল্পীর প্রতিকৃতি, তেমনই নিসর্গেরও। এটাই "গোধূলিতে জ্যামিতি"র আবহ-সুর।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুনির্মল রচনাসম্ভার ১ম খণ্ড। সম্পাদক : নির্মলেন্দু গৌতম ও হরিবন্ধু মুখটি। ফরোয়ার্ড পাবলিশিং কনসার্ন। কলিকাতা। মূল্য ষোল টাকা।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গত দুই বছর গ্রন্থাবলীর বছর বলে চিহ্নিত থাকবে। বিদ্যাসাগর রচনাবলীর বিক্রয়সাফল্যে অনুপ্রাণিত হ'য়ে বহু প্রকাশক গ্রন্থাবলী প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। বাঙালী হুজুগে বলে একটা বদনাম আছে। এ হুজুগটা বেশ চলেছে। তবে অন্যান্য হুজুগের সঙ্গে এ হুজুগের একটা-গুণগত পার্থক্য আছে। বই বিক্রী হওয়াটা খুবই আনন্দের কথা। অনেকেই হয়তো গৃহশোভা বর্ধনের জন্য বই কিনবেন, আবার অনেকে পড়বেনও। চাই কি, অন্যান্য বই কিনতেও উদ্যোগী হতে পারেন। আরেকটি আনন্দের কথা এই হুজুগের ফলে বহু বই প্রকাশিত হচ্ছে যে সব বই বা যে সব লেখক এতদিন প্রায় বিস্মৃতির অন্তরালে ছিলেন। আবার ত্রৈলোক্যনাথের বই পাওয়া যাচ্ছে, মীর মশারফের বই পাওয়া যাচ্ছে এ আমাদের সৌভাগ্য। শিশুসাহিত্যও এ হুজুগের ফলে কিছুটা সুবিধা পেয়েছে। বেশ কয়েকজন প্রকাশক শিশুসাহিত্যের চিরকালের সেরা বইগুলি আবার প্রকাশে ব্রতী হয়েছেন। সুনির্মল বসু গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড তারই সাক্ষ্য বহন করে।

আমাদের দেশে শিশুসাহিত্য কথাটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিশোরসাহিত্য এবং শিশুসাহিত্য দুটিই তার মধ্যে পড়ে। অথচ এ দুটি সাহিত্যের জাত আলাদা। কিশোর-

সাহিত্যের সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কদের কোনো যোগ থাকতে বাধা নেই। বস্তুত সম্প্রতি অত্যন্ত জনপ্রিয় কয়েকটি উপন্যাস মূলত কিশোরদের জন্য লেখা হ'লেও সেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের এক সাপ্তাহিকের পাতায়। কিশোরসাহিত্য পড়ে বড়রাও আনন্দ পান কিন্তু শিশুসাহিত্য শিশুর নিজস্ব জগতের ব্যাপার। হারাধনের দশটি ছেলের নানা দুঃখের কাহিনী শিশুদের মন উদ্বেলিত করে। চিরকাল তাদের কথা তার মনে থাকে। শিশুসাহিত্যের পাঠকরা ছোট মাপের দেহ কিন্তু কষ্টিপাথরের মতো মনের অধিকারী। সেই কষ্টিপাথর খুব সহজেই বলে দিতে পারে কোনটা খাঁটি কোনটা বা মেকী। তাই কিশোরসাহিত্য রচনা করা যত সহজ শিশুসাহিত্যিক হওয়া তত সহজ নয়। অন্তত বাংলা সাহিত্য এ দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হবার পরও শিশুসাহিত্যে এর অনগ্রসরতা দেখে সেই সন্দেহই হয়।

শিশুসাহিত্যের দিকপালরা হলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী এবং যোগীন্দ্রনাথ সরকার। এ'দের রচনা কালজয়ী। "ঠাকুরমার ঝুলি" আজ পর্যন্ত সমান আদৃত। আজ যখন বাংলা দেশ সাহেব হ'বার বিশ্বামিত্র সাধনায় নিমগ্ন তখনো কেমন করে জানি বুদ্ধু ভুতুম কিংবা দেড় আঙুলেরা টিকে গেছে। কয়েকবছর আগে প্রকাশিত "ঠাকুরমার ঝুলি"র রেকর্ডও হাজার হাজার বিক্রী হয়ে সেই প্রমাণই দিয়েছে। উপেন্দ্র-কিশোরের "টুনটুনির বই"এর অন্তত দশটা সংস্করণ বাজারে চলছে এবং প্রত্যেকটারই কাটতি অসাধারণ। যোগীন্দ্রনাথ বাংলাসাহিত্যে কিছুটা অনাদৃত ব্যক্তি। বাংলা শিশুসাহিত্যে তাঁর পর্বতপ্রমাণ দানের তুলনায় তাঁর সমাদর নিতান্তই অল্প। তবু "হাসিখুশি", "হাসি-রাশি", "হিজিবিজি", "আষাঢ়ে গল্প" আজও শিশুচিত্তজয়ী। সুনির্মল বসু সেই গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী এবং বোধহয় সেই ঐতিহ্যের শেষ চিহ্ন। এই শতাব্দীর ত্রিশের দশকে সুনির্মল বসু তাঁর লেখার জাদুতে ছোটদের মনে একটি স্থায়ী আসন করে নিয়েছিলেন। সহজ ভাষায় সরস ভাবে তিনি লিখতেন ছোটদের জন্য। সব কিছুই তিনি লিখেছেন : গল্প কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক। তাঁর "বেড়ে মজা" যেমন সদ্য-পড়তে-শেখা ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিয়েছে তেমনি আরেকটু বড়রা আনন্দ পেয়েছে "দিল্লীকা লাড্ডু"র গল্পগুলিতে। পাতা-বাহারে গল্প আর ছবি আজো চোখবুজলে দেখতে পাই। ত্রিশ আর চল্লিশের দশকে যেসব পূজাবার্ষিকী বেরোত তার একটা বড় আকর্ষণ ছিল শিম্পাজী পরিবারের রঙচঙে মন-মাতানো ছবির সঙ্গে সুনির্মল বসুর অসামান্য কবিতাগুলি। সুনির্মল এখন নেই, শিম্পাজী পরিবারের ছবি যিনি আঁকতেন তিনিও আর আঁকেন না। প্রকাশক তাই অন্যদের দিয়ে সেই ছবিগুলি আঁকান এবং কবিতা লেখান। কিন্তু তেমনটি আর হয় না।

বাঙালীর দুর্ভাগ্য সুনির্মলের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই বাজার থেকে সুনির্মলের বই উধাও হয়ে গেল। সংস্করণ শেষ হবার পর ছাপাবার তাগিদ আর কেউ অনুভব করলেন না। ততদিনে বাঙালীরা বুঝে গেছেন যে ছোটদের "ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশীপ" কবিতা শেখানোটাই যুগ-ধর্ম, কমিকস্ই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। সুতরাং সুনির্মলদের প্রয়োজন আর নেই। মাত্র সতেরো বছর আগে মৃত্যু হ'লেও তিনি প্রত্নতত্ত্বের সামগ্রী হয়েছেন।

ভাগ্যে গ্রন্থাবলীর হুজুগ এসেছিল। তাই আজ আবার সুনির্মল বসুর নাম মনে পড়েছে। ৫০টি ছোট গল্প, তিনটি ছোট উপন্যাস, ১৪টি নাটিকা আর চারটি সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী নিয়ে সুনির্মল রচনাসম্ভার বেরিয়েছে। সেই সব বারবার পড়া গল্প আবার পড়ছি, দেখছি তার উজ্জ্বলতা একটুকু ম্লান হয় নি। স্মৃতিব্যাকুল হয়ে শুধু ভাবছি কি ভাবে আমরা আমাদের নিজস্ব কীর্তিকে অবহেলা করে চলেছি।

কিন্তু অবিমিশ্র আনন্দ আমাদের কপালে লেখা নেই। নইলে এমন একখানি সুন্দর গ্রন্থের এত বিশ্রী ছাপা হ'বে কেন। যেমনি নিম্নশ্রেণীর কাগজ, তেমনি ছাপা। ওপরের প্রচ্ছদের কালি হাতে উঠে আসে। বাড়ীতে আনবার আগেই বইটি মলিন লাগে। বই পড়া শেষ হবার আগেই বাঁধাই ঢলঢলে। বইটি ছাপার মধ্যে কোথাও কোনো শ্রদ্ধার নিদর্শন নেই। সবটাই দায়সারা গোছের। সুনির্মল বসুর পাওনা আরেকটু বেশী। অবহেলা বা অবমাননা কোনটাই তাঁর প্রাপ্য নয়।

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবাদ

বিদেশে ঘটনাপ্রধান রচনাকে গুণানুযায়ী আখ্যায়িত করতে 'নভেল', 'ফিক্‌শান' অথবা 'ন্যারেটিভ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়; বাংলা ভাষায় সেখানে শব্দের দৈন্য—উপন্যাস বা নভেল নামে অভিহিতকরণ ভিন্ন গত্যন্তর নেই। যদিচ ইংরেজী, ফরাসী বা জার্মান উপন্যাসের সঙ্গে তুলনায় বাংলা উপন্যাস নামীয় গ্রন্থরাজিকে যথার্থই উক্ত আখ্যা দেওয়া যায় কিনা, তা অদ্যাবধি বিতর্কের বিষয়; তথাপি বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রই বাংলায় একমাত্র ঐতিহ্য এবং মানদণ্ড হিসাবে গণ্য এবং তার প্রতিই আমাদের বিশ্বাসস্থাপনা। অবশ্য পরিণামে যে সার্বত্রিক দুর্দশার নরকে আমাদের নির্বাসন ঘটেছে, সে-সত্যে অচেতন থেকেই প্রসঙ্গ ও প্রকরণ বিষয়ে উৎসাহিত হয়েছেন কালান্তরের ঔপন্যাসিকেরা; কিন্তু ইতিপূর্বেই যে-সর্বনাশ ঘরে ও বাইরে ব্যপ্ত হয়েছে, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় কোন উৎসাহ কদাচ পরিলক্ষিত হয়নি। ইউরোপে শিল্পায়ন এবং তার ফললাভে যে-সামাজিক ও আর্থনীতিক ঘটনাবলী ব্যক্তিজীবনে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের চেতনাকে প্রতিষ্ঠা দিল, সে-সমবেত ঘটনাবলীর সূত্রে উপন্যাসের জন্ম; এবং এবম্প্রকার জাগতিক মূল্যজ্ঞান যেমন ঔপন্যাসিকের অনায়ত্ত থাকলে, নিতান্ত ভাবুক-তায় তার স্বধর্মবিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী, তেমনি প্রত্যয় ও প্রকরণও যে সমাজসম্পর্ক বদলের সঙ্গেই রূপান্তরের দাবী জানায়, তা অর্বাচীনেরও অগোচর থাকা পাপ। র‍্যালফ্‌ ফক্স যদিচ বুর্জোআ সমাজের অবক্ষয়ের সঙ্গে উপন্যাসেরও ভিন্ন প্রকার পরিণামের চিন্তায় কিছু অতিশয়োক্তিই করেন, তথাপি প্রাথমিক সত্য হিসাবে তাঁর বক্তব্যের উল্লেখ এখানে অনিবার্য :
—The novel is the epic art form of our modern, bourgeois, society; it reached its full stature in the youth of that society, and it appears to be affected with bourgeois society's decay in our time. কিন্তু কেবলমাত্র এই উদ্ভবের প্রশ্নই নয়, ব্যক্তিচেতনায় বিশেষ সামাজিক ঘটনাবলীর প্রতিফলন ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়াও উপন্যাস রচনাক্ষেত্রে সমভাবে কার্যকর। এবং প্রায় সকল অর্থেই ঔপন্যাসিককে কার্যত কঠিন প্রয়াসেই আয়ত্ত করতে হয় সামাজিক প্রতিনিধিত্ব। কারণ চেতনার উজ্জীবনের ধাপগুলি নিতান্ত সামাজিক সংঘটের ফলাফল, এ-ধারণায় শেষ পর্যন্ত যান্ত্রিক জড়বাদই প্রশ্রয় পায়। অন্যথায় এতাবৎ লিখিত বাংলা ভাষায় লিখিত কাহিনীগুলি উপন্যাসেরই মর্যাদা পেত; অনাদৃত হতো না নিতান্ত কেচ্ছা-কাহিনীরূপে। এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের, 'শুনেছি বাংলা উপন্যাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রাক্‌চল্লিশ ডেলিপ্যাসেঞ্জার আর উত্তরচল্লিশ

পৌরস্ত্রী'—বিজ্ঞ মন্তব্যকে স্বীকৃতি দিয়েই লজ্জায় অধোবদন হতে হতো না একালীন শিল্পীসমাজকে।

অবশ্য যে-আত্মতৃপ্তির কারণে বাঙালী ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের অনাসৃষ্টিকেই শিল্পের পরাকাষ্ঠা ভাবেন, তা যে কেবলমাত্র তাঁদের অজ্ঞতাপ্রসূত তাই নয়, তাদের অক্ষমতাও অন্যতম প্রধান কারণরূপে চিহ্নিত হতে পারে। একান্তভাবে বাজার-কাট্‌তিকেই যাঁরা পরমার্থজ্ঞান করেন, তাঁদের বিষয়ে কোন গুরুত্ব না দিয়েও, যে-সৎ ও পরিশ্রমী ঔপন্যাসিকেরা যথার্থই সৃষ্টিতে আন্তরিক, তাঁদের ব্যর্থতাই প্রধান আলোচ্য এবং এর কারণের অনুসন্ধানে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রমুখের সৃষ্টিকর্মের বৈজ্ঞানিক আলোচনা অবশ্য কর্তব্য। এক্ষেত্রে সমালোচকের দায়িত্বই প্রধান; তাঁকে একক প্রয়াসে যেমন একদিকে অতীত প্রয়াসের মূল্যায়নে নিরত হতে হয়, তেমনি ভবিষ্যতের সামনেও উচ্চারণ করতে হয় কঠোর সতর্কবাণী। দুর্ভাগ্য যে বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় এবম্প্রকার সমালোচকের আবির্ভাব ইতিপূর্বে ঘটেনি; ভালো বা মন্দের অর্থহীন সংজ্ঞায় এতাবৎ বাংলা উপন্যাসের আলোচনা সীমাবদ্ধ থেকেছে: সামাজিক কারণসমূহ, প্রকরণগত দুর্বলতা ও ব্যর্থতা ইত্যাদি প্রধান বিষয় সম্পর্কে নীরব থাকা সম্ভবত রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থও এর ব্যতিক্রম নয়। এমনকি মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে লিখিত তাঁর 'তারাশঙ্কর' সম্পর্কিত প্রবন্ধটিতেও কোন চিন্তাবৈচিত্র্য লক্ষিত হয় নি। তথাপি উক্ত বিষয়ের আলোচনায় তিনিই আমাদের কুলগুরু এবং তাঁর আকরগ্রন্থের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন ভিন্ন আমাদের মহাভারত অশুদ্ধ হতে বাধ্য। অবশ্য সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ পোদ্দার বা অচ্যুত গোস্বামী প্রমুখের নাম আমার অপরিজ্ঞাত নয়। তারাশঙ্কর বিষয়ে কার্তিক লাহিড়ীর আলোচনা ('ঐতিহ্য প্রগতি তারাশঙ্করের উপন্যাস'; "এক্ষণ" পৌষ-চৈত্র, ১৩৭৮) সাম্প্রতিক আলোচনাক্ষেত্রে উদাহরণযোগ্য।

কিন্তু কার্তিক লাহিড়ীর যে গ্রন্থটিকে* কেন্দ্র করে বর্তমান আলোচনা, তার বিষয়বস্তু মুখ্যত ঐতিহ্যের স্বরূপ নির্ধারণ, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র যার মধ্যমণি, এবং বিষয় প্রধানত 'বক্তব্য রূপায়ণে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও রীতি'। বিস্তারিত আলোচনার স্বার্থে লেখক সমগ্র বিষয়টিকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করেন : (ক) ঘটনা-প্রধান উপন্যাস, (খ) মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস, ও (গ) মননধর্মী-উপন্যাস। এবম্প্রকার পর্ববিভাগে সংশয় থাকা স্বাভাবিক এবং সে-সংশয় থেকে লেখকও মুক্ত নন। তত্রাচ স্বদেশে ও বিদেশে লেখকমাত্রেই অবগত যে এরূপ স্থূল পর্ববিভাগ করা ছাড়া লেখকের গত্যন্তর নেই। ব্যাপারটা যে কোন ক্ষেত্রেই আপোষ নয়, এ-তত্ত্ব পপ্‌-ইন্‌টেলেক্‌চুয়লদের বোধগম্য না হওয়াই স্বাভাবিক এবং রিচার্ডসের গ্রন্থ রচনা ও ক্লিয়েন্থ ব্রুক্‌স্‌, উইলিয়ম উইম্‌স্যাট বা রবার্ট পেন ওয়ারেন-এর পদ্ধতি প্রয়োগেই যে আধুনিকতার চূড়ান্ত সত্যে উপনীত হওয়া চলে এ-মতামত উক্ত বুদ্ধিজীবীদেরই যোগ্য। যদিচ সামান্যতম সুস্থবুদ্ধি ও বিষয়টির ওপর সশ্রদ্ধ আগ্রহ থাকলেই তাঁরা আবিষ্কার করতে পারতেন ক্লোদ্‌ ভিগ্নে', লেঅ' তোরাঁ, এমানেল্‌ রোবে কিংবা আর্মা রেনোঁ প্রমুখকে, যাঁদের প্রথাসিদ্ধ সমালোচনাতেই যথার্থ ব্যাখ্যাত হয়েছেন কামু বা সার্ত্র এবং প্রায় একই সঙ্গে ফরাসী ও জার্মান সাহিত্যের ঐতিহ্য। অবশ্য সাহিত্য বা শিল্পালোচনার ক্ষেত্রে মতভেদ অত্যন্ত স্বাভাবিক; এমনকি লেখক নিজেও সামান্যকাল পরেই নিজের বক্তব্যে সন্তুষ্ট থাকেন না, হার্বার্ট রীড যার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কার্তিক লাহিড়ী নিজেও ভূমিকায় লেখেন, 'গ্রন্থের সমস্ত সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি এখন একমত নই, এমন

* বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি : ডঃ কার্তিক লাহিড়ী। সারস্বত লাইব্রেরী।

কি এখন লিখলে হয়ত এভাবে লিখতাম না'। সুতরাং অনস্বীকার্য যে বিষয়টি সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ শেষ পর্যন্ত থেকেই যায় এবং লেখককেও কখনও কখনও বিরোধী পক্ষেই দাঁড়াতে হয়। কিন্তু আপাতত এবম্প্রকার বিতর্কে আমার অনীহা।

পূর্বেই উল্লেখিত যে কার্তিক লাহিড়ীর আলোচনা প্রধানত বাংলা উপন্যাসের প্রকরণ বিষয়ে; যদিচ প্রত্যয় ও প্রকরণের সংযুক্তিতেই উপন্যাস এবং একের অভাবে অন্যের স্বরূপ নির্ণয় যথার্থই অসম্ভব, তথাপি নামত এই আংশিক বিষয়ের আলোচনা তাৎপর্য হারায় না সম্ভবত এ-কারণেই যে উপন্যাস ও শুদ্ধ বিজ্ঞানের গবেষণার মধ্যেকার ভেদরেখা শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়; সেকারণেই রূপকল্প ও প্রযুক্তির প্রসঙ্গেই অনিবার্যভাবেই দৃশ্যমান হয় প্রত্যয়ের স্বরূপ, যা স্বভাবতই উপন্যাসের আত্মাকেও ক্ষণিক আভাসে পাঠকের গোচরীভূত করে। যদিচ লেখক এখানে খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ মেনে নিয়েই তাঁর আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন, 'বক্ষ্যমান আলোচনায় উপন্যাসের আত্মা অপেক্ষা শরীরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ব'লে আলোচনাটি সমালোচককের বিচারে খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ হ'তে বাধ্য, যেহেতু আত্মা ও শরীরের হরিহর মিলনই সজীবতা, সম্পূর্ণতা।'

প্যারীচাঁদ মিত্রের দাবীর যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে "আলালের ঘরের দুলাল"-কে বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাসরূপে স্বীকৃতি দিয়েই লেখকের আলোচনার সূত্রপাত। না-মেনেও উপায় নেই, কারণ তাহলে তো অস্বীকার করতে হয় স্পেনে "লাইফ অব দা জারিল্লো দে তরমিস"-এর ভূমিকা, যা পরবর্তীকালে সম্ভবপর করে পিকারো উপন্যাসের সৃষ্টি। লেখকের বিবেচনায় এই পর্বের নামকরণ, 'ঘটনা-প্রধান উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসের প্রত্ন পর্যায়', ব্যাপ্তি বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাস পর্যন্ত বিস্তৃত। এ-প্রসঙ্গে লেখকের যুক্তির উল্লেখ অনিবার্য, 'বঙ্কিম-উপন্যাসে ঘটনাপরম্পরার বিবরণদানই চূড়ান্ত নয়, উপন্যাসে স্বীয় বক্তব্য ও তত্ত্বপ্রমাণে বঙ্কিমচন্দ্রের মত তৎপর ও মনোযোগী পুরুষ সত্যই দুর্লভ। জীবনের বিভিন্ন, বা সময় সময় একই সমস্যা রূপায়ণের জন্য তাঁর প্রযত্ন বিস্ময়ের; এবং উপন্যাসের আদি কর্মিকের পক্ষে নানা পরীক্ষায় নিযুক্ত থাকা অবশ্যই দুঃসাহসিক। কিন্তু বক্তব্য বা তত্ত্বপ্রমাণের জন্য বঙ্কিম-চন্দ্র বহির্ঘটনা ও কাহিনীর প্রতি একান্ত নির্ভরশীল ছিলেন। সংলাপ বা পরিবেশ চিত্রণে বঙ্কিম-উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর অন্তরের চিত্র বহুসময় সুতীব্র উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হয়, তবু সমগ্র উপন্যাসে বহির্জগৎ ও ঘটনার আধিপত্য সর্বদা প্রবল ও প্রকট। সেজন্য বঙ্কিম-উপন্যাস, আমাদের বিশেষ মনোযোগের বিষয় হলেও 'ঘটনাপ্রধান উপন্যাস' রূপেই চিহ্নিত।' প্যারীচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত এই পর্বে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, দামোদর মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এবং শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

বাংলা উপন্যাসের ঐতিহ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, এ-বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ অল্প। তাঁর বয়স্ক মননে বাংলা উপন্যাস যে কেবল সাবালকত্ব অর্জন করেছে তাই নয়, তিনিই প্রথম আমাদের সচেতন করেন ঔপন্যাসিকের দায়িত্ববোধ বিষয়ে। এতাবৎকালের বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় বঙ্কিম-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর পরিচয়, 'জীব-নের অপরিমেয় অতলস্পর্শ গভীরতা' (?) ইত্যাদি বহু শব্দসম্ভারসম্বলিত আলোচনা হয়েছে কিন্তু কদাচ কোন ভাবনায় বিশ্লেষিত হয়নি কেন তিনি সামাজিক উপন্যাসের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী না হয়ে একান্তভাবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের দিকে ঝুঁকেছিলেন, অথবা কোন সামাজিক কার্যকারণসূত্রে তাঁর ব্যক্তিজীবনের দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত, তাঁর উপন্যাসকেই

বিপর্যস্ত করেছে। এ-সমস্যাবলী কার্তিক লাহিড়ীর বিষয়বস্তুর অঙ্গীভূত নয়, তথাপি 'ঔপন্যাসিক ও নীতিবিদের দ্বন্দ্ব' নামীয় অংশে প্রসঙ্গক্রমে যে সূত্রাবলীর উল্লেখ করেন তা সর্বাংশে পরবর্তী আলোচনার বিষয়বস্তুরূপে পরিগণিত হতে পারে। অবশ্য অনস্বীকার্য যে প্লটের বিবেচনায় এর গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয় এবং বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্বলতার সঙ্গে উক্ত সূত্রের যোগাযোগ কিছুমাত্র অবহেলার নয়।

দ্বিতীয় পর্ব, 'মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসের নব পর্যায়' মুখ্যত বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনী" উপন্যাস (যা লেখকের বিবেচনায় বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস) থেকে সুরু করে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। সূত্রপাতে লেখকের বক্তব্য, পাত্র-পাত্রীর সজীবত্বর অনেকখানিই মনস্তত্ত্বে বিধৃত, কারণ অভিজ্ঞতা বস্তুনির্ভর হলেও অভিজ্ঞতার আত্মমুখীন বিষয়টিও অনুধাবনযোগ্য। ঘটনা-উৎক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতা সাধারণভাবে বা বিশেষ মুহূর্তে পাত্র-পাত্রীর মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলে, সেই প্রতিক্রিয়া উপস্থাপিত করা ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব এবং এক্ষেত্রে তাঁর নির্বাচিত পদ্ধতি মনোবিকলনমূলক, এ-পদ্ধতি চরিত্রের আচার আচরণ বিশ্লেষণ করে ব'লেই মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসে আকস্মিক অতর্কিত অসম্ভব ঘটনার সংখ্যা প্রায় শূন্য। লেখককৃত এই পর্বটি জটিল ও বিতর্কের বিষয়। কারণ ঔপন্যাসিককৃত পাত্র-পাত্রীর ভাষা স্বগতোক্তিরূপে হলেই তা মনস্তত্ত্বসম্মত হয় না বা তাকে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করা চলে না। কারণ তত্ত্ব হিসাবে এ-সত্য অনস্বীকার্য যে অবচেতন ও অচেতন মনই মানুষের চেতনমনকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর যেহেতু এই অচেতন মন মানুষের আয়ত্তাতীত, সেহেতুই বহুলাংশে তার অসহায়তা। তদুপরি চেতনমনের অজ্ঞাতে উক্ত প্রক্রিয়ায় মানসিকতার জন্ম হওয়াতে, ব্যক্তির জাগতিক কর্মকান্ডও বহুলাংশে তার আয়ত্তাধীন নয়। এইপ্রকার আকস্মিকতালব্ধ মানসিকতা থেকে ব্যক্তিচেতনার উন্মেষের ফলে জাগতিক বহু সংঘাতের সূত্রপাত। হৃদয়বৃত্তিজনিত এই বিভিন্নতা অবশ্যই শিল্পীর বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু মন ও শরীরতত্ত্বের ক্ষেত্রে, ইউঙ্গ-এর ভাষায়, 'সাইকো-ফিজিওলজিকাল ইন্সটিংকটস অ্যান্ড রিফ্লেক্সেস'-এর প্রয়োগ সকল অর্থেই দুরূহ। সম্ভবত এ-কারণেই বাংলা উপন্যাস মনস্তাত্ত্বিকের আলোচনার বিষয়বস্তুরূপে পরিগণিত হতে পারে কিন্তু তার মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসাবে বিবেচিত হবার দাবি যথেষ্ট নয়। সম্প্রতি স্ট্রীম অব কনসাশনেস-এর লেবেল যে-সব বাংলা উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত, সেগুলির ক্ষেত্রেও উক্ত মন্তব্যই প্রযোজ্য।

সম্ভবত উক্ত তত্ত্বাবলী কার্তিক লাহিড়ীর অগোচর নয় এবং কার্যত এ-কারণেই উক্ত পর্বে বিধৃত অনেক উপন্যাস বিষয়ে তাঁর প্রশ্ন থেকেই যায়। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ্য যে "রজনী" প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'অন্ধের রূপোন্মাদের তির্যক, চক্ষুহীনতায় প্রতিরুদ্ধ, অভিব্যক্তি, শব্দ-স্পর্শের ভিতর দিয়া তাহার দেহমনে প্রেমের অমৃতস্পর্শ সুষ্ঠু মনস্তাত্ত্বিকতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে' ('বাংলা উপন্যাস')—স্বীকার করেই কার্তিক লাহিড়ী লেখেন, 'শচীন্দ্রের প্রথম স্পর্শের সময়, জলমগ্ন হওয়ার পূর্বমুহূর্তে রজনীর অনুভূতি, নিবিড় সুখ ও দুঃখ বোধের আলেখ্যটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।" এই মন্তব্যে সর্বাংশে আমি ঐক্যমত নই, সম্ভবত বলা উচিত উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। বরং কয়েক লাইন পরেই শচীন্দ্র প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য : 'শচীন্দ্রর কথা আপাতদৃষ্টিতে মনস্তত্ত্বমূলক মনে হলেও, আসলে এগুলি লবঙ্গর ভাষায় 'সন্ন্যাসীর কীর্তি'। আরও কয়েকটি স্থানের প্রশ্নবোধক জিজ্ঞাসাগুলি নাটকের স্বগতোক্তির মতই এক প্রকারের উচ্চারিত

স্বগলাপ।" এই পর্বে আলোচিত রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" উপন্যাসটিকেও আমি যথার্থ মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের মর্যাদা দিতে নারাজ, যদিচ লেখকের মতে, এই উপন্যাসে 'লেখকের বক্তব্য উপন্যাসের সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত, সেজন্য চরিত্রগুলি লেখকের হাতের পুতুল হয়ে ওঠে না, প্রতিটি চরিত্র স্বতন্ত্র ও সজীব, এবং উপন্যাসটির জগৎ আমাদের দৈনন্দিন জগৎ থেকে দূরে অবস্থিত নয় বলেই "চোখের বালি" বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসই নয়, প্রথম বাস্তব উপন্যাসও বটে।' এই উপন্যাসে অবশ্যই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসাবে রচনার যথেষ্ট উপকরণ ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি তার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করতে পেরেছেন ? আর পারলে কি নায়িকা বিনোদিনীর আকাশলোকবিহারী স্বপ্নময়তা মাটির স্পর্শ পেত না ? আর কেবলমাত্র জৈবিক আত্মনিবেদনে তার নিয়তি নির্ধারিত হতো লেখকের হাতে ? বিনোদিনীর এই আত্মনিবেদনের মুহূর্তে যেখানে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সর্বাধিক প্রয়োজনীয়তা ছিল, সেখানে রবীন্দ্রনাথ কি তার যথার্থ সদ্ব্যবহার করেছেন ! আত্মকথাকে সর্বদা মনস্তত্ত্বের আখ্যায় অভিহিতিকরণ বৈজ্ঞানিক চিন্তাচর্চাকে প্রশ্রয় দেয় না।

তৃতীয় পর্ব, 'মননধর্মী উপন্যাস : বাংলা উপন্যাসের আধুনিক পর্যায়ের সূচনা'। মুখ্যত রবীন্দ্রনাথের "চতুরঙ্গ" উপন্যাসের আধুনিকতা এই পর্বের আলোচ্য। কার্তিক লাহিড়ীর বক্তব্যে, মার্সেল প্রুস্ৎ, ডরোথি রিচার্ডসন্, ও জেমস জয়েসের পুস্তকাবলীতে যে আধুনিকতার সূত্রপাত, প্রকরণের ভিন্নতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ এঁদেরই সহযাত্রী। ডরোথি রিচার্ডসনের উপন্যাস সমালোচনা প্রসঙ্গেই সিনক্লেয়ার ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম স্ট্রীম অব কনশাসনেস কথাটির প্রয়োগ করেন। এই চৈতন্যপ্রবাহ সম্পর্কে উইলিয়ম জেমস্-এর বক্তব্য, consciousness does not appear to itself chopped up in bits . . . It is nothing jointed, it flows. Let us call it the stream of thought, of consciousness or of subjective life. বাংলা উপন্যাসে ডরোথী বা জেমস্ জয়েসের তুলনা খোঁজা অর্থহীন, এমনকি সাম্প্রতিক কালেও; তত্রাচ "চতুরঙ্গ"-এর শিথিল ও অযত্নবিন্যস্ত আঙ্গিকের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের যে মননশীলতা প্রকাশ পায়, তাকে আধুনিক নামকরণে আপত্তির হেতু নেই। দামিনীর আধুনিকতর স্বরূপ বিষয়ে কার্তিক লাহিড়ীর বক্তব্য এ-কারণেই যথার্থ : সে আত্মপরিচয়ের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যগ্র। সেজন্য বিলাসের মত মাঝারি গোছের ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘর বাঁধার সংকল্প সমস্ত দিক থেকেই দামিনীর পক্ষে ট্র্যাজিক। শচীশ দামিনীর আইডিয়া, তার কাঙ্ক্ষিত পুরুষ ও প্রেম, অথচ সেই আইডিয়া মানুষের নাগালের বাইরের জিনিস বলেই এত বেদনা ও যন্ত্রণা। এই ট্র্যাজিডি পরিবেশ বা বহিঃশক্তির ক্রিয়া নয়, দামিনীর অস্তিত্বের মূলেই নিহিত। এর ফলেই সে আত্মসচেতন, তাই আত্মপরিচয় ও আত্মানুসন্ধানের জন্য এত হাহাকার। এবং এইখানেই সে আধুনিক ব্যক্তি, মাত্র নারী নয়। আর এজনাই সে নিজে বিপন্ন, এবং সমস্ত জীবন (নিজের সত্তার প্রতিরূপ দেখার পর) অতৃপ্তি ও অতুষ্টির দাবানলে প্রজ্বলিত ও হাহাকারে মরুর মত ধুধু।'

এই গ্রন্থে উপসংহারের পূর্বে 'আখ্যানভঙ্গী' ও 'ভাষা' নামীয় দুটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সংযুক্ত করেছেন লেখক। এবং স্বীকার্য যে এই যোজনা ভিন্ন তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ হতো না। আমার ধারণায় এই গ্রন্থের উপসংহারটি সবিশেষ মূল্যবান এবং তা থেকে কিছু দীর্ঘ উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া কর্তব্য : 'আমাদের আলোচনার সীমা প্রথম যথার্থ উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" থেকে "চার অধ্যায়" পর্যন্ত প্রসারিত। তবু এ-বিচারণা প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্র,

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কেন্দ্রিত। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বয়স্ক মনন, এবং শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা এই পক্ষপাতিত্বের অন্যতম কারণ। আমরা ভাবাবেগতাড়িত জীব, তাই অতি সহজে শরৎচন্দ্রের ভাবালুতায় গা ভাসিয়ে চিন্তা-ভাবনা-বর্জিত উপন্যাসকে শ্রেষ্ঠ অভিধায় ভূষিত করি, সেই ভাবাবেগের তাড়নায় বলি, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতা ও অক্ষমতা শরৎচন্দ্র অতিক্রম করেছেন এবং শরৎ-উপন্যাস বাঙালী জীবন ও বাঙালী ঘরের অকপট প্রতিছবি।...বাংলা গদ্যের রূপ স্থিরীকৃত ক'রে ঘটনার বিবরণের মধ্যে জীবনের তাৎপর্য অনুসন্ধান কৃতিত্বের সন্দেহ নেই, বঙ্কিমচন্দ্র সেই কৃতিত্বের অধিকারী। উপন্যাস রচনা যে মননের ব্যাপার, সেই কথাটি বঙ্কিম-উপন্যাস পাঠ করলে সহজে বোঝা যায়, অবশ্য বাংলা উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের হাতেই যৌবন লাভ করেছে...' তথাপি, 'স্বীকারে লজ্জা নেই যে বিশ্বের অনবদ্য উপন্যাস-সাহিত্যের পাশে রাখার মত বাংলা সাহিত্যের একটি উপন্যাসেরও নাম করা যায় না।'

উক্ত মন্তব্যে কোন নতুন সত্য নেই এবং ইতিপূর্বেও হয়তো বলা হয়েছে কিন্তু তার অর্থ এ-নয় যে একবার উচ্চারিত হলেই সে-সত্য উচ্চারণে পরবর্তী লেখকের আত্মস্বাতন্ত্র্য ঘোচে। আর বাংলা উপন্যাসের সঙ্কট ঘোচাতে কবিতার প্রয়োগ? সে উপন্যাসের পক্ষে বাড়তিই হোক বা কমতিই হোক, তা এই শ্রীচৈতন্যের দেশে উপন্যাসের অপমৃত্যুর কারণরূপেই প্রতিভাত হবে এবং কোনক্রমেই তা কোন মঙ্গল বহন করে আনবে না। "কপালকুণ্ডলা" ও "চতুরঙ্গ"-এর যেটুকু ব্যর্থতা তা অবশ্যই উক্ত কারণে; আর "শেষের কবিতা"? সে প্রশ্ন না তোলাই শ্রেয়। আর কার্তিক লাহিড়ীর ভাষা? না, একেবারেই সুধীন্দ্রনাথ-অনুসারী নয়, অবশ্য হলে আমিই সর্বাধিক আনন্দিত হতাম; কিন্তু যাঁদের সামান্যতম ভাষাজ্ঞান আছে তাঁরাই জানেন সে-ভাষার অনুসরণ কী দুরূহ, কী পরিমাণ আয়াসসাধ্য!

নির্মল ঘোষ

লেখকের উত্তর

কার্তিক লাহিড়ীর "বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি"র পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে শ্রীনির্মল ঘোষ বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৯) আমার লেখা সমালোচনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন একাধিক ক্ষেত্রে। অবশ্য নামোল্লেখ করেননি কোথাও।

আমার আপত্তি ছিলো, বইটির পর্ববিভাগের মধ্যেই কার্তিকবাবুর আপোষপ্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। নির্মলবাবু লিখেছেন, 'স্বদেশে ও বিদেশে লেখকমাত্রেই অবগত যে এবম্প্রকার স্থূল পর্ববিভাগ করা ছাড়া লেখকের গত্যন্তর নেই।' কেন নেই, বুঝতে পারলাম না। তাহ'লে কি এ-বিষয়ে সব বই-ই এই এক ছাঁচে লিখতে হবে? লেখকের কলমের ওপর এমন নিষেধাজ্ঞা জারি করতে বয়লুও শিউরে উঠতেন নিশ্চয়ই। নির্মলবাবুর কাছে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অজানা নয়—তিনি নিজেই লিখেছেন। কিন্তু "বাংলা উপন্যাসের কালান্তর" বইটি তাঁর পড়া থাকলে দেখতে পেতেন, স্বল্প পরিসরে হ'লেও, আঙ্গিক আলোচনার ভিন্নতর পদ্ধতি বিদেশী ভাষায় নয়, বাঙলাতেই আছে।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যয়ের স্বরূপ প্রযুক্তির আলোচনায় অবশ্যই আসতে পারে। কিন্তু প্রত্যয় তো স্বয়ম্ভু নয়, তার শেকড় কোথায় ও কতো গভীরে, কীভাবে ও কোন্ মূল্যে সে-

প্রত্যহ অর্জিত (উপন্যাসের পরিভাষায় এই সমগ্রতাকেই বলে পাটার্ন)—আগের লেখাতেই বলেছিলাম, কার্তিকবাবুর বইতে সে-আলোচনার বিন্দুবিসর্গও আছে কি? থাকতে পারেও না, কারণ কার্তিকবাবুর মনে কোনো প্রশ্ন নেই।

কার্তিকবাবুর সাফাই যে তিনি তাঁর বইয়ের সব সিদ্ধান্তের সঙ্গে এখন আর একমত নন—নির্মলবাবু মেনে নিয়েছেন। মনে হয়, তিনি ভক্ত মানুষ। তিনি মানুন। আমার বক্তব্য : যদি তিনি একমত নন, যদি এভাবে লেখা এখন তাঁর মনোমতো না-হয়, তাহ'লে এভাবে বই তিনি ছাপতে দিলেন কেন? ৮ মে ১৯৭২ তারিখে লেখা 'লেখকের কথা ও কৃতজ্ঞতা'য় ডঃ লাহিড়ী লিখেছেন, বর্তমান গ্রন্থটি তাঁর ডি. ফিল. গবেষণাপত্রের 'আদ্যন্ত সংশোধিত পরিমার্জিত একটি সহজপাঠ্য রূপ'। বইটির প্রকাশকাল জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯। মন্তব্যের প্রয়োজন আছে কি?

উপন্যাসে কবিতার ব্যবহার এক, আর উপন্যাস কাব্য হ'য়ে-ওঠা অন্য ব্যাপার। "শেষের কবিতা"য় কবিতা ব্যবহৃত হয়েছে। "চতুরঙ্গ" কাব্য হ'য়ে উঠেছে। শ্রীচৈতন্য সত্ত্বেও যদি রঘুনন্দন রামমোহন বাঙলাদেশে জন্মে থাকেন, তাহ'লে মহৎ ঔপন্যাসিক জন্মাতে বাধা কোথায়? উপন্যাসের অপমৃত্যু ঘটার দায় তাঁর হ'তে যাবে কেন? আর কাব্যাশ্রয় মঙ্গল-জনক হবে কিনা সে তো নির্ভর করবে ঔপন্যাসিকের ক্ষমতার ওপর।

পঞ্চম, কার্তিকবাবুর লেখায় সুধীন্দ্রনাথের ভাষার অনুকরণচেষ্টা আছে কিনা তা ভাষাজ্ঞানীরাই বিচার করবেন। সে-ভাষার অনুসরণ 'দুরূহ' ও 'আয়াসসাধ্য' ব'লেই আয়াসের অভাবে শব্দের সংঘট্ট ঘটে মাত্র। নির্মলবাবু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেও অবশ্য তা ভালোভাবেই জানবেন।

জেম্‌স্‌-এর যে-উদ্ধৃতি নির্মলবাবু উৎকলন করেছেন, সেটি যে-বইতে আছে তার প্রকাশকাল ১৮৯০। মে সিন্‌ক্লেয়ার লিখছেন ১৯১৮-য়। তাহলে স্ট্রীম অব কনসাশনেস শব্দবন্ধ সিন্‌ক্লেয়ার 'প্রথম' প্রয়োগ করলেন কীভাবে? আসলে এটা শিশির চট্টোপাধ্যায়ের "উপন্যাস-পাঠের ভূমিকা" (পৃ. ২৬) অন্ধভাবে অনুসরণের ফল।

সাহিত্যে কোনো-একটি পদ্ধতি প্রয়োগে আধুনিকতার চূড়ান্ত সত্যে উপনীত হওয়া চলে—এ কথা যাঁরা মনে করেন তাঁরা পপ্‌-ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কেন,—অশিক্ষিত। কিন্তু তাই ব'লে তার মধ্যে কোনো 'শিক্ষণীয় ইঙ্গিত' গ্রহণেও যাঁরা নারাজ, তাঁরা কী?

স্বপন মজুমদার

স্থানাভাবে বর্তমান সংখ্যায় "রাজনগর" প্রকাশিত হলো না।